www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

তাযকেরাতুল আউলিয়া
বা
শ্রেষ্ঠ আউলিয়াদের জীবনী
(একত্রে)

সোলেমানিয়া বুক হাউস

তাযকেরাতুল আউলিয়া বা শ্রেষ্ঠ আউলিয়াদের জীবনী (একত্রে)

তাযকেরাতুল আউলিয়া
বা
শ্রেষ্ঠ আউলিয়াদের জীবনী
(একত্রে)

সোলেমানিয়া বুক হাউস

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ❑ ডিসেম্বর ২০০৪ ইং

প্রকাশক ❑ আলহাজ্জ সোলায়মান চৌধুরী
চৌধুরী এণ্ড সন্স
৩৬, বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ❑ সোলেমানিয়া প্রিন্টার্স

মূল্য ❑ ১২৫.০০ টাকা মাত্র

একমাত্র পরিবেশক
সোলেমানিয়া বুক হাউস
৩৬, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)	৫
খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ)	১৪
হযরত শাহজালাল (রহঃ)	২১
খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রহঃ)	৩৮
শেখ ফরীদউদ্দীন আত্তার (রহঃ)	৪৪
ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)	৪৯
ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)	৫৪
ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)	৫৮
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)	৬২
হযরত যুননুন মিসরী (রহঃ)	৬৬
হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)	৭৯
হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ)	১০৬
হযরত হাসান বসরী (রহঃ)	১১১
হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ)	১২৫
হযরত মালেক দীনার (রহঃ)	১৩৮
হযরত ওয়ায়েছ কারনী (রহঃ)	১৪৫
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ)	১৫০
হযরত আবু আলী শাকীক বলখী (রহঃ)	১৫৬
হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ)	১৬০
ইবনে জামান ও ওয়ায়েস (রহঃ)	১৭৬
হযরত ওয়াসে (রহঃ)	১৭৯
হযরত হাবীব আজমী (রহঃ)	১৮১
হযরত আবু হাশেম মক্কী (রহঃ)	১৮৭
হযরত ওতবা বিন গোলাম (রহঃ)	১৮৯
হযরত ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ (রহঃ)	১৯১
খলীফা হারুণ অর রশীদ (রহঃ)	১৯৪
হযরত বিশর হাফী (রহঃ)	২০০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ)	২০৫
হযরত হুসাইন মানসুর হাল্লাজ (রহঃ)	২১০
হযরত হারেস মোহাসেবী (রহঃ)	২১৯
হযরত আবু সুলায়মান দারানী (রহঃ)	২২১
হযরত মুহাম্মদ সাম্মাক (রহঃ)	২২৪
হযরত মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তুসী (রহঃ)	২২৫
হযরত আহমদ হারব (রহঃ)	২২৭
হযরত হাতেমে আসাম (রহঃ)	২৩০
হযরত মা'রুফ কারখী (রহঃ)	২৩৭
হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ তশ্‌তরী (রহঃ)	২৪০
হযরত সাররী সাকতী (রহঃ)	২৪৮
হযরত ফতেহ মুসেলী (রহঃ)	২৫৪
হযরত আহমদ সাওয়ারী (রহঃ)	২৫৫
হযরত আহমদ খাযরুইয়া বলখী (রহঃ)	২৫৬
হযরত ইয়াহইয়া মা'আয (রহঃ)	২৫৯
হযরত শাহ শুজা কেরমানী (রহঃ)	২৬৭
হযরত আবু তুরাব বলখী (রহঃ)	২৭০
হযরত ইব্রাহীম ইবনে দাউদ রুকী (রহঃ)	২৭২
হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)	২৭৩
হযরত ইউছুফ ইবনে হুসাইন রাযী (রহঃ)	২৮৯
হযরত আবু হাফস হাদ্দাদ খোরাসানী (রহঃ)	২৯৫
হযরত হামদুন কাচ্ছার (রহঃ)	৩০১
হযরত মানসুর আম্মার (রহঃ)	৩০৩
হযরত আহমদ ইবনে আসেম এন্তাকী (রহঃ)	৩০৫
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইক (রহঃ)	৩০৭
হযরত আমর ইবনে উসমান মক্কী (রহঃ)	৩০৮
হযরত আবু সাঈদ খাযযার (রহঃ)	৩০৯
হযরত আবুল হাসান নূরী বাগদাদী (রহঃ)	৩১৩
হযরত আসবাত (রহঃ)	৩১৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ

বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর নাম ও উপাধি ঃ ইতিহাস পাঠে জানা জায়, রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা আওলিয়া কুলের শিরোমণি হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ-এর কুনিয়াত আবু মোহাম্মদ। তাঁর উপাধি মুহিউদ্দীন। ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় পবিত্র ইরাকের অন্তর্গত ঝিলান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাকে জিলানী বলা হত। সত্যি কথা বলতে হয়, তিনি সারা বিশ্বের সর্বসাধারণের নিকট এই আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী নামে পরিচিত হলেও ধরাধামের বিভিন্ন অঞ্চলে তাকে বিভিন্ন গুণবাচক লকবে ভূষিত করা হয়ে থাকে। আমাদের এতদঞ্চলে সাধারণতঃ তিনি কুতবুল আফ্‌তাব, গাওসুল আযম এবং বড় পীর নামেই প্রসিদ্ধ। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথাও জানা যায় গাওসুল আযম বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ-কে কোন কোন মহলের জনসাধারণ তাকে কুতুবে রাব্বানী নামেও অভিহিত করে থাকে। কোন কোন স্থানের লোকেরা তাকে পীরানে পীর দাস্তেগীর আফযালুল আউলিয়া উপাধিতে ভূষিত করে থাকে। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে একথাও জানা যায়, কোন কোন স্থানে তিনি নূরে ইয়াযদানী নামেও পরিচিত। এমনি ভাবে তার আরও বহু গুণবাচক উপাধি রয়েছে। মুমীর লাখ নবী কর্তৃক রচিত সাওয়ানেহে ওমরী হযরত গাওসুল আযম নামক কিতাবে বহু কিতাবের হাওলা দিয়ে লিখিত হয়েছে। যে একদা সত্যের সৈনিক আওলায়ায়ে কুলের শিরমণি রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক বাগদাদ শহরের বাইরে গমন করলেন। যাবার পথে পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, কৃশতা ও দুর্বলতাবশতঃ সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পথের পাশে পড়ে আছে। পরিতাপের বিষয় হল জনৈক ব্যক্তি উঠবার জন্য পুনঃপুন আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিন্তু দুর্বলতার কারণে পড়ে যাচ্ছে। বিশ্ব নিয়ন্ত্রা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম রহমতে সে ব্যক্তি আকস্মাৎ মাহবুবে সোবহানী সাধক কুলে শিরমণি বড়পীর হযরত গাওসুল আযমের নূরানী চেহারা মোবারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কাকুতি মিনতি সহকারে আরয করল, "হে ব্যথিতজনের পৃষ্ঠপোষক আল্লাহর ওয়াস্তে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন এবং আপনার ঈর্ষা তুল্য ফুঁ দ্বারা আমার মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন দান করুন। যাই হোক তার কাকুতি মিনতী শুনে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে পড়লেন এবং তার হস্ত ধারণপূর্বক-ইল্লাল্লাহ বলে তাকে জমিন হতে উঠায়ে দিলেন। সত্যি কথা বলতে হয় মহান করুণার আঁধার আল্লাহ জাল্লাহ শাননুহুর অসীম রহমতে হযরত গাসুল আযম বড়পীর আব্দুর কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ সাহেবের পবিত্র হস্তের পরশ লাগামাত্র সেই মরণোন্মুখ বৃদ্ধ সবুজ খোরমা বৃক্ষের ন্যায় সতেজ ও সবল হয়ে উঠে দাঁড়াইল এবং বলতে লাগল- "হে মুহিউদ্দিন। আল্লাহর অসীম রহমতে আপনি আমাকে স্থায়ী জীবন দান করলেন। আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি আম্বিয়াকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ইসলাম ধর্ম। দুর্বলতাবশতঃ আমার এই মৃতপ্রায় অবস্থা হয়ে গিয়াছিল। বিশ্ব নিয়ন্ত্রা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লাখ লাখ শোকর তিনি আপনাকে সৃষ্টি করে আমাকে নবজীবন দান করেছেন। মহান করুণার আঁধার আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর তরফ হতে তাই আপনার উপাধি হল মুহিউদ্দিন, ধর্মকে সজীবকারী। যাই হোক তথা হতে বড়পীর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গাওসুল আযম আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ বাগদাদে এসে মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে দেখা মাত্রই একব্যক্তি হঠাৎ বলে উঠল-আসসালামু আলাইকুম ইয়া মুহিউদ্দিন। এরপর হতেই কেহ তাকে দেখলে মুহিউদ্দিন উপাধিতে সম্বোধন করতেন। ইতিহাস পাঠে এ কথাও জানা যায়-বড়পীর সাহেব মসজিদ থেকে নামাজ শেষ করে উঠলে সারা মসজিদে মহিউদ্দিন নামে উপাধি উচ্চারণে ধুম পড়ে গেল। সত্যি, আস্তে আস্তে তিনি সকলের নিকট মুহিউদ্দিন উপাধিতে পরিচিতি হয়ে গেলেন। ইতিহাসবেত্তা ও ইসলামী জ্ঞান তাপসগণ বলেন ইতিপূর্বে তার বহুল প্রচলিত উপাধি কেহই জানত না।

বংশ পরিচয় ঃ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাই-মাহবুবে সোবহানী রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ পিতা ও মাতার উভয় দিক হতে সাইয়্যেদ খানদানের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। ইতিহাস বেত্তারা বলেন, পড়পীর সাহেবের পিতার নাম হযরত সাইয়েদ আবু ছালেহ মুসা জঙ্গী দোস্ত। প্রিয় পাঠক পাঠিকার সুপ্ত হৃদয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে নামের শেষে কেন "জঙ্গী-দোস্ত" লাকবে ভূষিত করার কারণ ছিল, তিনি খুব আল্লাহ ওয়ালা, পরহেজগার লোক ছিলেন। ইসলামী জ্ঞানবীদগণ বলেন, তিনি ধর্মীয় জিহাদে অংশগ্রহণ করা খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর মাতার নাম ছিল ফাতেমা। তার কুনিয়াত ছিল উম্মুল খায়ের। তিনি বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খাছবান্দা ছিলেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এ কথা দেখতে পাই তিনি একজন সুফী সাধক শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ লোক-আবদুল্লাহ ছাওমাঙ্গের অতি আদরের কন্যা ছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আওলিয়া জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র তরীকত, হাকীকত, এবং শরীয়তে মোহাম্মদীয়া দিশারী হযরত বড়পীর সাহেব-এর পিতার উর্ধ্বতন বংশপরম্পরা সাইয়্যেদ কুলের শিরমণি হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত এবং মাতার উর্ধ্বতন বংশপরম্পরা সাইয়্যেদ কুলের গৌরব হযরত ইমাম হুসাইন ছিলেন, এই কারণে তাকে আলহাসানী ওয়াল হুসাইনী বলা হত।

পিতৃবংশ ঃ রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা সুফী সাধক হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ আবু ছালে মুসা জঙ্গী-দোস্ত রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ আবু আবদুল্লাহ আলজিবিল্লী রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ ইয়াহইয়া যাহেদ রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ দাউদ রহমাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ সানী রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ মুসালজুন রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ দাউদ রহমাতুল্লাহ আবদুল্লাহ আর মাহাস রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ হাসানুল মুসান্না রহমাতুল্লাহ ইবনে আমীরুল মু'মেনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালে কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু অর্থাৎ বেলায়েত জগতের সম্রাটের একাদশ ঔরসে সত্যের সেনানী সূফী সাধক হযরত বড়পীর ছাহেব রহমাতুল্লাহ আবির্ভূত হন।

মাতৃবংশ ঃ গাওসুল আযম হযরত বড়পীর সাহেবের রহমাতুল্লাহ মাতা হযরত সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের আমাতুল জাবদর ফাতেমা বিনতে হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ ছাওমার্দ যাহেদ রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ আবু জামাল রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ মাহমুদ রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ আবুল আতা আবদুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন ঈসা রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ আবু আলাউদ্দীন মোহাম্মাদুল জাউয়াদ রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ আলীউররেযা রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ মুসা আল কাসেম রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদুনা ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদুনা ইমাম যাকের রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদেনা যাইনুল আবেদীন রহমাতুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদুনা আমিরুল মু'মেনীন হযরত হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহু ইবনে সাইয়্যেদুনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর অষ্টাদশ ঔরসে জন্ম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, উপরোক্ত উভয় নসবনামার প্রেক্ষিতে তিনি হাসানী এবং হুসাইনী সাইয়্যেদ।

জন্ম ঃ ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হযরত গাওসুল আযম মহীউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ চারশত সত্তর মতান্তরে চারশত একাত্তর হিজরী সনের পবিত্র রমজান মাসের পহেলা কিংবা ২১শে প্রসিদ্ধ জিলান শহরে সুবিখ্যাত সাইয়্যেদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় প্রসিদ্ধ জিলান শহরটি পারস্য রাজ্যের অধীন পবিত্র ইরাক প্রদেশের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহর যারা ইতিহাসের পাতায় সীলান নামেও পরিচিত। প্রিয় পাঠক পাঠিকার সুপ্ত হৃদয়ে প্রশ্ন হতে পারে যে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী সাহেবের রহমাতুল্লাহ নামের শেষে কেন জিলানী সংযোগ করা হল জবাবে বলা যেতে পারে যে জিলানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলে তাকে জিলানী অর্থাৎ জিলান দেশীয় বলা হয়। ইতিহাস বেত্তারা বলেন প্রসিদ্ধ জিলান শহরটি বাগদাদ হতে ওয়াসেতের পথে একদিনের পথ। কোন কোন ইতিহাস বেত্তারা বলেন ৪০০ মাইল দূরে অবস্থিত।

নামকরণ ঃ ইসলামী জআনবীদদের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায়, আওলীয়াকুলের শিরমণি সুফী সাধক হযরত গাওসাল আযম আব্দুল কাদের জিলানী সাহেবের রহমাতুল্লাহ শুভ জন্মের কিছু সময় পরই নিখিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা সুপারিশের কাণ্ডারী নবীয়ে দোজাহান হযরত মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ স্বীয় প্রধান সাহাবায়ে কেরামকে সাথে লয়ে সূফী সাধক সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসার বাসগৃহে তাশরীফ আনলেন এবং সাইয়্যেদ আবু সালেহকে লক্ষ্য করে অদৃশ্য জগত হতে বললেন, হে আবু সালেহ। এ পার্থিব জগতে তুমিই অধিক ভাগ্যবান। যেহেতু তোমার গৃহে আওলীয়াকুলের শিরমণি রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা আল্লাহর ওলী আজ জন্মগ্রহণ করেছেন। তোমার ভাগ্যবান শিশুটির নাম রাখ মাহবুবে সোবহীনা। সে পার্থিব জগতের মানুষের কাছে আব্দুল কাদের নামে অর্থাৎ মহাশক্তিমান আল্লাহতায়ালার বান্দা নামে। আমি খাস করে তোমার শিশুর জন্য দোয়া করিতেছি। তোমার শিশু যেন জগত মাঝে সুনাম সুখ্যাতি ছড়ায়ে অমর কীর্তি স্থাপন পূর্বক চিরস্মরণীয় হয়। এহেন কথা শুনে কার হৃদয়ে আনন্দ না হয়। তদ্রুপই সত্যের সৈনিক সূফী সাধক আবু সালেহ রহমাতুল্লাহ এই বিস্ময়কর অদৃশ্য বাণী শ্রবণ করে অতি মাত্রায় আনন্দিত হলেন এবং তখনই দুই রাকাত শোকরানার নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর মহা করুণার আঁধার আল্লাহ জাল্লা শানহুর শাহী দরবারে অনেকক্ষণ যাবৎ মোনাজাত করলেন।

ফাযায়েলে গাওসিয়্যাহ নামক কিতাবে ইসলামের বীর সেনানী হযরত আলী রহমাতুল্লাহ হতে একটি রেওয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাইয়্যেদুর মুরসালিন হযরত মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ তার জীবনকালে মাহবুবে সোবহানী আওলীয়াকুলের শিরমণি হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ সম্বন্ধে এরূপ দোয়া করেছিলেনঃ হে পরওয়ারদিগার আপনি আমার সেই নায়েবের প্রতি রহমত বর্ষিত করুন, যে আমার পরে ধরাধামে আর্বিভূত হবে সেই সাধক কূলের শিরমণি আমার হাদীসমূহ বর্ণনা করে আমার দ্বীন শরীয়তের পথে পরিচালিত করবে।

ছেলে বেলার একটি কাহিনী ঃ ইতিহাস পাঠে জানা যায়, শাবান মাসের শেষ দিন। সন্ধ্যাবেলা আকাশে পবিত্র মাহে রমজানের চাঁদ উঠবে চাঁদ দেখার জন্য সবাই ভীড় জমালেন। চাঁদ দেখে সকলে রোযা রাখবে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল সেদিনের আকাশ ছিল মেঘলা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে জিলানী অধিবাসীরা কেহই চাঁদ দেখিতে পারল না। যাই হোক পরের দিন রোযা রাখতে হবে কিনা এ নিয়ে জিলানী অধিবাসীরা তার পিতা যিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ সাহেবের বাবা ছিলেন সেকালে মশহুর আলেম, জিলান অধিবাসীরা সমস্যা সমাধানের নিরসন কল্পে হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আব্দুল কাদের জিলানী সাহেবের রহমাতুল্লাহ সনামধন্য পিতার কাছে এলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল-এ সময় তিনি বাড়ী ছিলেন না। যাই হোক জিলান অধিবাসীদের সব কথাগুলো হযরত সাইয়্যেদা ফাতেমা শুনলেন। তাদের কথা শুনে কিছুক্ষণ পরই সাইয়্যেদা ফাতেমা বললেন এটা তো বাস্তব কথা যে চাঁদ দেখে রোযা রাখা উচিত। তবে আমার মনে হয় চাঁদ দেখা না গেলেও আজ পহেলা রমযান। জিলান অধিবাসীরা অনেকেই তার কথা মেনে নিলেন না। তারা সাইয়্যেদা ফাতেমাকে প্রশ্ন করলেন আপনি কিভাবে অনুধাবন করলেন যে আজ পয়লা রমযান। তিনি কিছু সময় ভাববার পর বললেন আজ আমার শিশু সন্তান-সেহরীর পর হতে আর দুধ পান করেনি। সত্যি শুনলে আপনাদের অবাক লাগবে, মুখে কিছু দিলেও সে খাচ্ছে না তাই আমার মনে হয় সে রোযা রেখেছে। তার আচরণ থেকে বুঝা যায় আজই প্রথম রোযা।-সত্যি সাইয়্যেদা ফাতেমার পবিত্র মুখের কথাগুলো শুনে সবাই অবাক হয়ে গেলেন বরং কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। ইতিহাস বেত্তারা বলেন পরদিনই অনেকেই মাহে রমযানের রোযা রাখলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথাও জানা যায় যে হযরত সাইয়্যেদা ফাতেমার কথাই ঠিক। গতকালই ছিল মাহে রমযানের প্রথম দিন। একথা দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল যে কুতবে রাব্বানী পীরে দাস্তেগীর হযরত শাহ মুহিউদ্দিন সাইয়্যেদ আবু মোহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ ছোটবেলা হতেই একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। বর্তমান যুগের ছেলেদের মত হৈ হুল্লার মধ্যে দিয়ে তিনি কাটাতেন না। তাকে দেখা যেত চুপচাপ বসে কি যেন ভাবতেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি নিরিবিলি থাকা পছন্দ করতেন। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী সাহেবের রহমাতুল্লাহ মাতা খুবই পরহেজগার ছিলেন। তার মাতা সর্বদা কোরআন শরীফ তেলওয়াত করতেন। এমন দেখা গেছে একটু সময় পেলেই তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন তখন সত্যের সৈনিক আওলীয়াকুলের শিরমণি হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ পাশে বসে শুনতেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ শুনলে অবাক হবেন, হ্যাঁ অবাক হবার কথাও। মায়ের কোরআন তেলাওয়াত শুনেই তিনি পাঁব বছর বয়সের সময়ই মহাগ্রন্থ আল কোরানের আঠারো পারা মুখস্ত করে ফেলেন। একথা বাস্তব সত্য কথা যে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবেন, জগৎ মাঝে যে তার সুনাম সুখ্যাতি ছড়ায়ে পড়বে ইতিহাসের পাতায় যে তার নাম সোনালী অক্ষরে লিখা থাকবে-এইসব আলামত তার শিশু জীবন হতেই প্রকাশ পেয়েছিল। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ। একটু চিন্তা করে দেখুন আওলিয়া জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবেন তা উক্ত কাহিনীতেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ সত্যের সেনানী আওলিয়াকুলের উজ্জ্বল নক্ষত্র বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ সাহেবকে তার যোগ্য পিতা জিলান নগরীর একটি মক্তবে বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য ভর্তি করান। মক্তবে ভর্তি হবার আগেই মাতার মুখে কোরআন তেলাওয়াত শুনে আল কোরানের বিরাট অংশ মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। ইসলামী জ্ঞানবীদদের দৃষ্টিকোন থেকে একথাও জানা যায় যে, গাওসুল আযম হযরত বড়পীর সাহেবকে রহমাতুল্লাহ প্রথমে শিক্ষার উদ্দেশ্যে মক্তর্বের পাঠানো হলে যাত্রাপথে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতা এসে তাকে বেষ্টন করে রইলেন এবং তাকে তারা বেষ্টন করে শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। ইতিহাস পাঠে একথাও জানা যায় হযরত বড়পীর সাহেবকে রহমাতুল্লাহ যখন মক্তবে নিয়ে যাওয়া হল তখন মক্তবে ছাত্রদের সংখ্যা অনেক ছিল। বসবার কোন স্থান ছিল না, তখন হঠাৎ তার সঙ্গী ফেরেশতাগণ গায়েব হতে আওয়াজ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিলেন তোমরা বিশ্বনিয়ন্ত্রা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় বান্দার জন্য স্থান প্রশস্ত করে দাও। সত্যি এহেন অদৃশ্য বাণী শুনে শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দ চমকিয়ে উঠলেন। যাই হোক সাথে সাথে শিক্ষক ছাত্রগণ আগন্তুকের জন্য জায়গা করে দিতে নির্দেশ প্রদান করলেন। যাইহোক ছাত্রগণ তৎক্ষণাৎ পার্শ্বের্রর দিকে চেপে বসে মাহবুবে সোরহানী রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী সাহেবের রহমাতুল্লাহ জন্য জায়গা করে দিলেন। ইতিহাসে বেত্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে একথাও জানা যায় মক্তবে ভর্তি করার পর ওস্তাদজী আওলীয়াকুলের শিরমণি সূফী সাধক হযরত বড়পীর সাহেবকে রহমাতুল্লাহ একেবারে প্রাথমিক স্তরে পড়তে বললেন সত্যি, মাথার তাজ সমতুল্য ওস্তাদজীর নির্দেশ মোতাবেক তিনি সর্বপ্রথম আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ শুনলে অবশ্যই অবাক হবেন। হ্যাঁ অবাক হবারই কথাও। আউযুবিল্লহ এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করতঃ আলিফ-লাম-মীম হতে আরম্ভ করে মহাগ্রন্থ আল কোরান কারীমের পনের পারার শেষ পর্যন্ত মুখস্ত পড়ে ফেললেন। শুধু মুখস্ত নয় বরং তারতীব তাজভীদ সহকারে পড়েছিলেন। তার পড়া শুনে ওস্তাদজী অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে কার নিকট হতে এত সুন্দরভাবে কোরান পড়া শিখেছ এবং কিভাবে পনের পারা কোরান শরীফ মুখস্ত করলে? ওস্তাদজীর কথার জবাবে সত্যের সেনানী মাহবুবে সোবহানী হযরত বড়পীর সাহেব উত্তর করলেন-আমার মাতা পনের পারা কোরআন শরীফের হাফেজ, তিনি তাহা প্রত্যহ তেলওয়াত করে থাকেন। তার তেলয়াত শুনে আমারও মুখস্ত হয়ে গেছে। ইতিহাস বেত্তারা বলেন, হযরত বড়পীর সাহেব রহমাতুল্লাহ সেই পনের পারার হাফেজ হয়ে দুনিয়ায় আসেন। তিনি যখন গায়ের মক্তবে পড়াশুনার জন্য ভর্তি হন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তবে বয়সের দিক দিয়ে কম হলেও পড়াশুনায় ছিলেন খুবই মনোযোগী। অল্পদিনের মধ্যে তিনি অনেক কিছু শিখে ফেললেন। এমনও দেখা গেছে অন্য ছাত্ররা সাতদিনে যতোটুকু পড়া আয়ত্ত করতে পারে নাই রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা মাহবুবে সোবহানী হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ তা দু'এক দিনেই আয়ত্ব করে ফেলতেন। ভাল ছাত্র হিসাবে তার সুনাম সুখ্যাতি মক্তবের বাইরেও ছড়ায়ে পড়লো। সত্যি, ওস্তাদগণ বড়পীর সাহেবের মেধার অবস্থা দেখে লোকমুখে বলতে লাগলেন আব্দুল কাদের ভবিষ্যতে নামকরা আলেম হবেন। রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা সত্যের সৈনিক বড়পীর সাহেব রহমাতুল্লাহ শুধু পড়েই সন্তুষ্টি ছিলেন না, জীবন জগৎ ও প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তাকে এমনও দেখা গেছে যখন যে বিষয়ে পড়াশুনা করতেন তা শেষ না করে ক্ষান্ত হতেন না, ওস্তাদগণকে আদব সহকারে নানারকম প্রশ্ন করতেন, যে প্রশ্নগুলো ছিল অনেক উচ্চস্তরের। শিক্ষকগণ বড়পীর সাহেবের অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে অবাক হয়ে যেতেন। আর দু'হাত তুলে মহান করুণার আঁধার আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর শাহী দরবারে তার জীবনের উন্নতির জন্য দোয়া করতেন। ঐতিহাসি দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় পরিতাপের বিষয় হল মক্তব্যের শিক্ষা সমাপ্ত হতে না হতেই তার পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। পিতার ইহধাম ত্যাগের পর থেকে সংসারের যাবতীয় ভার পরে মাহবুবে, সোবহানী হযরত আব্দুল কাদের রহমাতুল্লাহ-এর উপর। সাংসারিক অবস্থা তাদের তেমন ভাল না থাকায় নিজ হাতে অনেক কাজ করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর অসীম রহমতে সাংসারিক ঝামেলার মধ্যে পড়া সত্ত্বেও তার বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সাংসারিকত কাজ সমাধা করেই লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতেন। এমনও দেখা গেছে-যেদিন পড়াশুনা না করতে পারতেন সেদিন তার মন খুব খারাপ থাকত। একথা সর্বজনবিদিত যে ছোট বেলা তেকেই মাহবুবে সোবহানী সুফী সাধক হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। ধর্মের প্রতি ঝোঁক ছিল। ধর্মের প্রতিটি হুকুম আহকাম মেনে চলতেন। ছোটবেলা হতেই তিনি বেশি কাত বলা পছন্দ করতেন না। তার সহপাঠীদের সাথেও কোনদিন একটু বাজে আলাপ করেননি। সর্বদা তার খেয়াল ছিল পড়াশুনার দিকে, কিভাবে জ্ঞান অর্জন করা যায়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় হিজরী ৪৮৮ সালে যখন তার বয়স ১৮ বৎসর, তখন তিনি মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাজধানী ঐতিহাসিক বাগদাদে পদার্পণ করেন। উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে হলে সে সময় বাগদাদে যেতেই হত। রাজধানীর বাগদাদের সনদই সে কালে উচ্চস্তরের সনদ বলে গণ্য হত। মাহবুবে সোবহানী সূফী সাধক হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ যে বৎসর বাগদাদ নগরীতে পদার্পণ করেন, সেই বৎসরই খলীফা আলমুস্তাযহের বিল্লাহ খেলাফতের আসন গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একাথাও সুস্পষ্টভাবে জানা যায় এই খলিফাও সেই ৪৭০ হিজরী সনেই জন্ম, লাভ করেছিলেন। সে বৎসর রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা মাহবুবে সোবহানী হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। বড়পীর সাহেব গ্রামের পাঠশালার পড়াশুনা শেষ করে বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত মাদ্রাসায়ে নিয়ামিয়াতেই ভর্তি হলেন। এই নিযামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অনেক উন্নতমানের। এ সময় বাগদাদ নগরীতে দ্বীনি এলেমের নামকরা প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু তার মধ্যেও মাদ্রাসায়ে নিযামিয়া ছিল উর্ধ্বে। এই মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্র সমাজের সকলের কাছে উচ্চ শিক্ষিত বলে পরিচিত ছিল। একথা বাস্তব সত্য কথা যে বিশ্বের সেরা ওবাছাই করা নামকরা ওলামায়ে কেরাম নিযামিয়া মাদ্রাসায়ে অধ্যাপনা করতেন। এই মাদ্রাসার শিক্ষকগণ আদ্যাত্মিক বিদ্যায়ও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন।

গাওসুল আযম বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ বাগদাদ এসেই কুরানের তাফসী ও কেতাব প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়। সাহিত্যে তার ওস্তাদ ছিলেন সাহিত্য জগতের অন্যতম লেখক আবু যাকারিয়া তিববিয়া। ইলমে ফেকাহ এবং উসুল শাস্ত্রের ওস্তাদ ছিলেন সেকালের নামকরা মুফতী শেখ আবুল ওফা আলী বিন আকীর। হাদীস পাঠে জানা যায় মাহবুবে সোবহানী সাধক কুলের শিরমণি হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন শ্রেষ্ঠ হাদীসবীদ আবুল বরকাত তালহা আল আকুলী। আল্লাহর অসীম রহমতে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী সাহেব রহমাতুল্লাহ অল্প বয়সেই সুমনা সুখ্যাতি নিয়ে নিযামিয়া মাদ্রাসার সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা কামেল ক্লাশের সনদ লাভ করেন। এ বিদ্যা শিক্ষকালে সত্যের সৈনিক হযরত বড়পীর সাহেব অসীম কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। সে সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, "আমার মনে যখন দুঃখ-কষ্ট বেশির ভাগ অনুভব হত তখন আমি মাটিতে শুয়ে শ্বাশত বাণী আল কোরানের এই আয়াতটি পড়াতাম- "ইন্নামাল উসরি ইউসরা" অবশ্যই দুঃখ-কষ্ট বিনে সুখ হয় না যাই হোক নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা জীবনের ৯টি বছর কেটে গেল।

ইতিহাস পাঠে একথাও জানা যায় সত্যের দিশারী আওলীয়া জগতের উজ্জ্বল তারকা হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী সাহেব রহমাতুল্লাহ নয় বছরে সুনাম সুখ্যাতি নিয়ে তেরোটি বিষয়ে সনদ লাভ করেন। আরবী ভাষায় তার প্রচুর জ্ঞান ছিল। অনর্গল আরবীতে কথা বলতে পারতেন, আরবী ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে কবি বলেও পরিচিত ছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে সেকালে মাহবুবে সোবহানী হযরত গাওসুল আযম বড়পীর সাহেবের মত সেরা ছাত্র ছিল না। ছাত্র হিসাবে তিনি যে অধিক মেধাবী ছিলেন উহা একটা ঘটনার মাধ্যমেই অনুধাবন করা যাবে। হাদীস শাস্ত্রের সাফল্য অর্জন করার পর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাকে যখন সার্টিফিকেট দেওয়া হল, ঐ সময় তার ওস্তাদ তাকে বললেন হে আব্দুল কাদির, হাদীস শাস্ত্রে তোমাকে আজ আমরা যে সনদ দিচ্ছি এটা একটা প্রচলিত নিয়ম মাত্র। তোমার মেধার এ দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব না। কেননা হাদীসের অনেক ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ আমরা বহু সময় তোমার সাথে আলোচনা করেই জানতে পেরেছি। সত্যের অগ্রনায়ক আওলীয়াকুলের শিরমণি বড়পীর সাহেব উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে বসে রইলেই না। বিশ্ব নিয়ন্ত্রা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য লাভের জন্য তার ছিল দারুণ ইচ্ছা। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হবার পর থেকে দয়াময় আল্লাহর মহব্বত থাকে পাগল করে তুললো।

সূফী সাধক হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ সাহেব সর্বদা ভাবতেন কিভাবে মহান করুণার আঁধার আল্লাহ-জাল্লাহ শানহুর নৈকট্য লাভ করা যায়। আস্তে আস্তে দেখা গেল বড়পীর সাহেবের দুনিয়ার প্রতি কোন খেয়াল নেই। বড় বড় অলী আবদালের সোহবতে কাটালেন অনেকদিন। যাই হোক উন্নতি সাধনে গভীরভাবে মনোনিবেশ দিলেন। পার্থিব যাবতীয় সসম্পর্ক ছিন্ন করে একনিষ্ট চিত্তে মহান করুণার আঁধার আল্লাহ-জাল্লাহ শানহুর নৈকট্য লাভে ব্রতী হলেন। দুনিয়ার সকল প্রকার আরাম আয়েশ ত্যাগ করে এমন কি মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য ও ব্যবহার্য দ্রবাদি ত্যাগ করে বনে ফলমূল ও শাক-সবজি ইত্যাদি দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করতে লাগলেন। মানুষের সাথে মেলামেশা বাদ দিয়ে নিরবে নির্জনে বসবাস করতে লাগলেন। নিজের সম্পূর্ণ সময়টুকু বিশ্ব নিয়ন্ত্রা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করলেন। রাত্রের নিদ্রা নিজের জন্য হারাম করে সারারাত্রি ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। ইসলামী জ্ঞানবীদের দৃষ্টিকোণ থেকে একথাও জানা যায় যে মাহবুবে সোবহানী বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ সাহেব প্রতি রাত্রে নফল নামাজে কোরান শরীফ খতম করতেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে বিশ্ব নিয়ন্ত্রা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জিকির ও ধ্যান করতে করতে তিনি নিষ্পন্দ অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রয়েছে না জীবিত আছেন বলে কোন লক্ষণই পাইত না।

যাই হোক এমনিভাবে কঠোর সাধনার ফলে রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা সূফীকুলের শিরমণি হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ একজন কামেল ওলীতে পরিণত হয়েছেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ একটু চিন্তা করে দেখুন বড়পীর সাহেব কত সাধনার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব নিয়ন্ত্রা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জন করেছিলেন। বড়পীর সাহেব তার মনে লোভ লালসা, রাগ-হিংসা সম্পূর্ণ দমন করতে সক্ষম হলেন লাভ করলেন মহান করুণার আঁধার আল্লাহ-জাল্লা শানহুর নৈকট্য। অর্জন করলেন আল্লার পিয়ারা বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য।

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ ঃ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় হযরত আবু সাঈদ মাখদুমী রাহেমাহুল্লাহ কর্তৃক তার মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে মাহবুবে সোবহানী হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ উচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতার সহিত শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার সুযোগ্য শিক্ষ পদ্ধতির খ্যাতি সারা বাগদাদ শহরে ছড়িয়ে পড়ল। বহু দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে ছাত্র পঙ্গপালের মতো ছুটে আসতে লাগল এবং তার নিকট হতে শিক্ষা এবং ফায়েজ লাভ করতে লাগল। আস্তে আস্তে মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে স্থান খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ল। বড়পীর সাহেব সর্বদা তাফসীর, হাদীস, এলমে নাহু এলমে ছরফ এবং উসুলে ফেকাহর তালীম প্রদানে মসগূল থাকতেন। যাই হোক সুনাম সুখ্যাতির সাথে মাদ্রাসার শিক্ষকতা কাজ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম রহমতে অল্পদিনের মধ্যেই মাদ্রাসাটির সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বহু দূরের ছাত্ররা এসে বর্তি হতে লাগলো এখানে। সত্যি! আস্তে আস্তে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বড়পীর সাহেবের সুনাম সুখ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ল। মাদ্রাসার ছাত্রদের জায়গা দেওয়াই কঠি হয়ে পড়লো। বড়পীর সাহেব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন কিভাবে মাদ্রসার ঘর বৃদ্ধি করা যায়। ইচ্ছে করলেই তো আর বাড়ানো যায় না, এ জন্যে অর্থের প্রয়োজন। মাহবুবে সোবহানী গাসুল আজম হযরত বড়পীর সাহেব একটিদন এক বিরাট মজলিসে ব্যাপারটা তুলে ধরে সাহায্যের আবেদন জানালেন সত্যি কথা বলতে কি তার কথায় সকলের সাড়া দিল ধনী গরীব সকল স্তরের লোক অংশ গ্রহণ করলেন।

মাদ্রাসি-ই- কাদেরিয়া ঃ মহান করুণার আঁধার আল্লাহ জাল্লাহ শানহুর অসীম রহমতে জনসাধারণের মিলিত সহযোগীতায় দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের নতুন ঘর তৈরি হলো। সকলে বহুদিনের আশা পূর্ণ হল। তৈরি হল নতুন পরিবেশ। ইতিহাস পাঠে জানা যায় মাদ্রাসার নাম দেয়া হল মাদ্রাসা-ই-কাদেরিয়া মাহবুবে সোবহানী সত্যেই সৈনিক আওলিয়াকুলের শিরমণি হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ-এর সুযোগ্য পরিচালনার মাদ্রাসা যেন নতুন জীবন লাভ করলো।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ঃ এ কথা দিবালোকের মত সমুজ্জল যে সত্যের সৈনিক রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা মাহবুবে সোবহানী বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ শুধুমাত্র ইলমে শরীয়ত ও মারেফতের পন্ডিত ছিলেন না। বরং তিনি কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রের সুপন্ডিত ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি তার প্রণীত বহু কিতাব অদ্যাবধি এ কথার সাক্ষ্য বহন করছে। এসব কিতাবের মধ্যে ফুতহু গায়ব, গুনিয়াতুত তালেবিন, ফতহুর রব্বানী, কাসীদায়ে গাওসিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। আল্লাহর অসীম রহমতে এই সকল কিতাবের বাংলা তওজুমাও হয়েছে। যার দ্বারা অসংখ্য লোক সিরাতুল মুস্তাকিমের সঠিক সন্ধান পেয়েছে। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ হযরত বড়পীর সাহেব কেবল শরীয়ত মারেফাত বিদ্যায়ই পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তা নয়, তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে যাবতীয় ইসলামী আখলাখের অপূর্ব সমাবেশ ও বিকাশ ঘটেছিল হযরত বড়পীর সাহেবের জীবনে।

বড়পীর রহমাতুল্লাহ-এর কয়েকটি উপদেশাবলী ঃ একথা সর্বজন বিদিত যে রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা আওলীয়াকুলের শিরমণি হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ গোটা জীবনের সাধনাই ছিল মানব কল্যাণ। মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। সোনালী ইসলামের নির্মল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সত্যের সৈনিক গাওসুল আযম হযরত বড়পীর সাহেবের রহমাতুল্লাহ প্রধান ও একমাত্র জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য। তিনি শিক্ষকতা, পুস্তক প্রণেতা, ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মানুষদেরকে ইসলামের পথে আনার চেষ্টা করে গেছেন। মোট কথা মাহবুবে সোবহানী গাওসুল আযম হযরত বড়পীর রহমাতুল্লাহ ছিলেন ইসলামে একনিষ্ঠ খাদেম। বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় তিনি তার উপর নির্দিষ্ট দায়িত্ব সযত্নে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করেছেন। ইসলামী জ্ঞান তাপসদের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় হযরত বড়পীর সাহেব রহমাতুল্লাহ ইসলামের শরীয়ত ও মারফতের জ্ঞান সাধনা ও বিতরণকরে অন্তরে বাইরে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার সত্যিকার প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করে গিয়েছেন, যাহা বিশ্বের সকল মুসলমানদের পাথেয় সত্যের সেনানী বড়পীর সাহেব যাহা বলেছেন তাহাই মানবজাতীয় কল্যাণের জন্য করেছেন। তিনি ইসলাম প্রচার করতে যেয়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। হযরত বড়পীর সাহেব রহমাতুল্লাহ পরহেজগার ব্যক্তিবর্গের জন্য কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ রেখে গেছেন যা নিম্নে দেওয়া হল—

১। শপথ ও প্রতিজ্ঞা করা উচিত নহে। তবে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করে বসলে তাহা পালন করবেন।

www.AmarIslam.com

২। মিথ্যা কথা বলিও না। কোনভাবেই মিথ্যা বলতে নাই। উপহাস, ঠাট্টা, হাস্য-কৌতুক করেও মিথ্যা বলও না। সদা সর্বদা সত্য কথা বলবে।

৩। কখনও বিশ্বনিয়ন্ত্রা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাম শপথ করো না।

৪। কোন মুসলমানকে নিশ্চিতভাবে মুনাফিক কাফের বল না। মহান করুণার আঁধার আল্লাহ জাল্লাহ শানহু ছাড়া কে জানে না কে মুনাফিক, কে মুশরিক।

৫। কোন মানুষের নিকট কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা কর না।

৬। বিনয়ী হও। আদব-কায়দা, নম্রতা ও শিষ্টাচারের মধ্যে ধর্মভিরুতা রয়েছে। তোমার সৎ আচরণগুলি ইবাদতের সহিত সংশ্লিষ্ট।

৭। কাকেও অভিসম্পাত কর না। ধৈর্যধারণ পূর্বক যে কোন আপদ বিপদ দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন মুকাবিলা করবে।

৮. নিজের মর্তবা অর্জনের জন্য কারও উপর কার্যদায়িত্ব চাপাইয়া দিওনা। ইহা পুরাপুরিভাবে বিশ্বনিয়ন্ত্রা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দায়িত্ব। তিনিই তোমার রিজিকদাতা।

ইন্তেকাল ঃ একথা সর্বজন বিদিত যে মানুষ মরণশীল। প্রত্যেক মানুষেরই মৃত্যুর শরবত পান করতে হবে। পার্থিব জগতের কেহই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পানে না তদ্রুপই মাহবুবে সোবহানী আওলীয়াকুলের উজ্জল নক্ষত্র সূফী সাধক গাওসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ ও মৃতুর হাত থেকে রেহাই পাননি। তাকেও পার্থিব জগতের মায়া মমতা ছিন্ন করে পরপারে যাত্রা করতে হয়েছে। ইসলামী জগতে বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানীকে না জানে এমন লোক বিরল। সারা পৃথবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে তা অনুসারীরা। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে রয়েছে তার অগণিত ভক্ত অনুরক্তের দল। এই কুতুবুল আফতাব মুসলিম মিল্লাতকে এমিত করে। হিজরী ৬৬২ সালের ১১ই রবিউসসানী তার মাশুকের আলার নিকট গমন করেন। ইন্নালিল্লাহ ..... । ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। এটা বাস্তব সত্য কথা যে জাগতিক মৃত্যুর তুহিন শীতল সংস্পর্শে তার কর্মজীবনের অবসান ঘটলেও তার প্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও আদর্শ পৃথিবী প্রলয় পর্যন্ত অম্লান থাকবে। ইসলামের খিদমতের জন্য তিনি যেমন কাজ করেছেন সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের জন্য অনন্ত কাল ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। বড়পীর সাহেবের ইহধাম ত্যাগের দিন ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম মুসলমানদের জাতীয় পর্বে পরিণত হয়েছে। তার ইন্তেকালের বার্ষিকীতে সারা বিশ্বের মুসলিমগণ বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মিলাদ মাহফীল, কোরান খতম করে তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার রুহানী ফায়েজ হাসিল করার তওফীক দান করুন।

কাফন দাফন ঃ সত্যের দিশারী রুহানী জগতের অন্যতম সাধক হযরত বড়পীর সাহেবের রহমাতুল্লাহ ইহধাম ত্যাগের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদ শোনা মাত্রই মানুষ পঙ্গপাল পাখীর মত তার বাসভবনে ছুটে আসলেন। ঐতিহাসিক বাগদাদ শহরের সকল শ্রেণীর লোকেরা তাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ওস্তাদ পীর সাহেব কেবলা রহমাতুল্লাহ-কে শেষ দেখা দেখতে বন্যার স্রোতের মত এসে ভীড় জমাইলেন। সমস্ত দিন চলল শেষ দেখা লোকের সমগমে আর দিনের বেলায় তাকে দাফন করা গেল না। তার আদরের সুযোগ্য পুত্র শেখ আবদুল ওয়াহহাব তাকে শেষবারের মত গোসল করালেন এবং কাফন পরালেন। বড়পীর সাহেবের ভক্তবৃন্দের শেষ দেখা সমাপ্ত হলে তার পবিত্র মরদেহ তারই আজীবনের কর্মক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায়ে কাদেরিয়ার বারান্দায় চিরজীবনের জন্য শায়িত করা হল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী রহমাতুল্লাহ

পরিচিতি ঃ ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যে সকল মহান ব্যক্তির অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গ-ভাতরে সোনালী ইসলামের নির্মল আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে রূহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা সূফী কুলের শিরোমণি মর্দ্দে মুজাহিদ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

একথা বাস্তাব সত্য তিনিই যে তিনিই সাধক কুলের সম্রাট সুফীবৃন্দের গৌরব, তাপসগণের শিরমণি ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রনায়ক হযরত মঈনুদ্দীন, চিশতী রহমাতুল্লাহ-তাঁর বিচিত্র জীবন কাহিনী ধ্যানোপাসনার জন্য প্রেরণাদানকারী হিসাবে আমাদের নকট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাসের পাতা খুললে আমরা দেখতে পাই ইসলামের জন্য তার আত্মত্যাগ তাকে ইতিহাসের সোনালী পাতায় অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। সত্যি কথা বলতে কি তার জীবন কাহিনী বহু কর্তি ও সাধনা সমৃদ্ধ ছিল। আলেম কুলের শিরমণি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ সোনালী ইসলামের নির্মল আদর্শ প্রচারে বহু বাঁধা বিপত্তির সম্মুখিন হয়ে শেষ পর্যন্ত সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, বঙ্গ-ভারতের ইসলাম প্রচারে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তাহা ইতিহাসের পাতায় চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। তাকে কেন্দ্র করে অনেক উপাখ্যান রচিত হয়েছে। পরিশেষে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে সত্যের সৈনিক হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ এমন একজন আদর্শ স্থানীয় মানুষ ছিলেন যে পার্থিব ভোগ বিলাসিতা দূরের কথা কৃচ্ছ সাধনায়ই কেটে ছিল তা সারাজীবন। ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায়, আলেম কুলের শিরমণি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ-এর হাতে অসংখ্য মুসলমান ও অমুসলমান বাইয়াত গ্রহণ করে নিজেদের জীবন ধন্য করেছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ রূহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী সাহেবের জন্ম হয় সিস্তানের গনজর পল্লীতে। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায়, তা পিতা খাজা গিয়াসুদ্দীন ছিলেন একাধারে খোদাভক্ত আরেদ এবং বিত্তশালী ব্যক্তি। তিনি সর্বদা কুরান ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চেষ্টা করতেন। সুতরাং খাজা সাহেব বাল্যকালে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহের সাথে প্রতিপালিত হয়ে ছিলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশতী সানজারী রহমাতুল্লাহ। পবিত্র আরবের সুবিখ্যাত কুরাইশ বংশভূত হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর নিম্নতর বংশধর ছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তিনি মাতৃ বংশসূত্র ও পিতৃ বংশসূত্র উভয় দিক দিয়াই সত্যের সৈনিক শেরে খোদার সহিত ওঁতপোতভাবে জড়িত ছিলেন। সত্যের সেনানী হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দীন হাসান চিশতী রহমাতুল্লাহ এর জন্ম সাল ও তারিখ সম্বন্ধেও সুসাহিত্যিক লেখকদের মধ্যে বেশ মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

১। সিয়ারুল আকতারের লেখকের মতে সত্যের অগ্রনায়ক হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ রহমাতুল্লাহ এর জন্মসাল হল ৫৩৭ হিজরী। তিনি বহু চিন্তা ভাবনা যুক্তি-তর্ক ও বিস্তারিত আলোচনার পর তার জন্ম দিন হিসাবে ৫৩৭ হিজরী সালের ১৪ই রজব সোমবারকে মনোনয়ন করেছেন, এবং তিনি এ কথা বলেছেন যে সুফীকুলের শিরমণি ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রনায়ক খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ উক্ত তারিখেই ধরাধামে আগমন করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২। অন্যদিকে খাজা সাহেবের রহমাতুল্লাহ জন্মসাল ও তারিখ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সাজিনাতুন আসফিয়ার-এর লেখক উল্লেখ করেছেন যে আলেম কুলের শিরমণি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ হিজরী ৫৩০ সনের ১৪ই রজব সোমবার বোব্‌হে সাদিকের সময় এ ধরাধামে আগমন করেছেন। উক্ত আলোচনা হতে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, উভয় লেখকই দুইটি বিষয়ে একমত এবং একটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেছেন। যে বিষয়দ্বয়ে তাঁরা একমত প্রকাশ করেছেন তাহা হল ১৪ই রজব এবং সোমবার। কিন্তু সনের ক্ষেত্রে উভয় এমন মত পোষণ করেছেন যে এখন দুই মতের মধ্যে সাত বছরের ব্যবধান রয়েছে। তবে খাজা গরীব নেওয়াজ রহমাতুল্লাহ যে কোন সালেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী ঝান্ডাকে সমুন্নত করবার জন্য তিন যে অবদান রেখে গেছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণক্ষারে লিখা থাকবে।

নামকরণ ঃ ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সৈয়দা উমমুল ওয়ারা গর্ভাবস্থায় অনেক নেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। এমনও দেখা গেছে বহু সময় তিনি নিজের স্বপ্নের কথা সলজ্জভাবে স্বামী হযরত খাজা গিয়াসুদ্দীন রহমাতুল্লাহ এর নিকট ব্যক্ত করতেন। পূন্যবান ও বিচক্ষণ স্বামী তাকে নানাভাবে প্রবোধ দান করতেন এবং মনে মনে ভাবী সুসন্তানের চন্দ্র মুখ দেখবার প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন।

সত্যি কথা বলতে হয়, একদিন তাদের বাসগৃহে উজ্জ্বল করে রূহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা সত্যের দিশারী খাজা গরীব নেওয়াজ রহমাতুল্লাহ ধরাধামে পদার্পন করেন। তার আগমনে সারা পরিবারে আনন্দের ফোয়ারা ছুটলো। ইতিহাস বেত্তারা বলেন, তার আগমনের তিন কিংবা সাত দিন পর, নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় মঈনুদ্দীন কিন্তু বিবি উমমু ওয়ারা ও খাজা গিয়াসুদ্দীন রহমাতুল্লাহ তাকে হাসান নামেই ডাকতেন। যার কারণে ইতিহাস বেত্তারা ও জীবনীকার হাসান-শব্দটিকে তার আসল নামের সহিত সংযুক্ত করে তার নামকে মঈনুদ্দীন হাসান বলে উল্লেখ করেন।

বাল্যকাল ঃ ইসলামের দিশারী সুফীসুধক হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ এর বয়স যখন সাত বৎসরে উপনিত হয়েছে, তখন হতেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় করতেন। শুধু নামাজ আদায় করে ক্ষ্যান্ত হতেন না। এই বাচ্চা বয়সে তিনি নিয়মিত রোজা রাখতেন ও জিকিরের মজলিসে যোগ দিতেন। যদি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা তার কানে আসত, শুনিবামাত্রই তিনি বাঁধাবিপত্তি পেরিয়ে মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ একটু চিন্তা করলেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ বাল্যকালে কতদূর খোদাভীতি অর্জন করেছিলেন, যাহা নিম্নের ঘটনার দ্বারাই প্রতিফলিত হবে।

একদা তিনি স্বীয় পিতার সাথে ঈদের নামাজ পড়তে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, এহেন সময় পথিমধ্যে এক অন্ধ ও অসহায় বালককে ময়লা ও ছেড়া কাপড় পরিধান করে নামাজে যাইতে দেখলেন। সত্যি, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ উহা দেখিবামাত্রই কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ইহাতে তার হৃদয়ের মনিকোঠায় এক অজানা ব্যথার উদয় হল। তিনি এ বালকের অবস্থা দেখতে দাঁড়ায়ে বহুক্ষণ চিন্তা করলেন। ইতিহাস বেত্তারা বলেন, তাপর পিতার অনুমতি ও নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজের পরিধেয় নতুন বস্ত্র খুলিয়া অন্ধ বালকটিকে পরিধান করালেন এবং হরষিত চিত্তে মহান করুণার আঁধার আল্লাহ জাল্লাহ শানুর শুকুরিয়া আদায় করলেন এবং নিঃস্ব অবস্থায় ঈদের নামাজ আদায় করে মনের হরষে নিজ গৃহে প্রর্তাবত্যন করলেন। রূহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত খাজা মঈনউদ্দি চিশতী রহমাতুল্লাহ এর সমুদয় কার্য কলাপই হযরত খাজা গিয়াসুদ্দীন (রাঃ) অদূরে থেকে নিরীক্ষণ করলেন, এবং মনে মনে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুকর গুজারী করলেন। উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, সূফী সাধক আলেম কুলের শিরমণি হযরত, খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী রহমাতুল্লাহ ইসলামের ইতিহাসের তথা ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্কর হয়ে থাকবেন, তা তার বাল্যকালের প্রতিভা, চালচলন থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহমাতুল্লাহ ছিলেন দুনিয়ার গাওছে আজম, কুতুবুল আফ্‌তাব এবং সমগ্র জ্বিল ও ইনসানগণের পথ প্রদর্শক। তিনি যে বেলায়েতী গগনের দীপ্তিমান সূর্যস্বরূপ হবেন তা তার বাল্যকালের প্রতিচ্ছবি থেকেই অনুধবন করা যেত। ইসলামের ইতহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি মার্তগর্ভ হতে তিনি অলীরূপে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। একথা বাস্তব সত্য যে শিশুকাল হতেই তিনি অকল্পনীয় কারামত এবং ঐশী ক্ষমতাসমূহের অধিকারী ছিলেন। একথাও শুনা যায় কেবলমাত্র যখন সাত বৎসর বয়সে উপনিত হয়েছিলেন ঐ সময় তিনি অর্থসহ ঐশীগ্রন্থ আল কোরান হেফজ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি ইলমে হাদীস ও ইলমে ফেকাহ্‌ত পান্ডিত্ব অর্জন করেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ শুনলে অবাব হবেন সত্যের অগ্রনায়ক খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহমাতুল্লাহ মাত্র পনের বছর বয়সে এলমে তাছাউফ তত্ত্ব সম্পর্কিত একখানা মূল্যবান গ্রন্থ তৎকৃত প্রণীত হয়েছিল। বাল্যকালের এসব নিদর্শন থেকেই প্রমাণ করেছিল যে তিনি ইসলামের একজন হাদী হবেন।

ছাত্রজীবন ও অধ্যবসায় ঃ "যে ব্যক্তি এলমে দ্বীন হাসিলের উদ্দেশ্যে বের হয়, ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে।" (আল হাদীস)

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ সেই সময়ে দ্বীন অর্জনের নিমিত্ত ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করলেন। প্রথমে তিনি সমরকান্দ গমন করলেন। সে সময় সমরকন্দ ও বোখরা ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল। বড় বড় মোহাদ্দেছ, ফকীহ, দার্শনিক ও চিন্তাশীল পন্ডিতগণ সেখানে বাস করতেন। খাজা সাহেব প্রথমে কোরআন শরীফ হেফয করলেন। অতঃপর তাফসীর, হাদীছ, ফেকা, ওসূল মানতেক ইত্যাদি বিষয় অধ্যায়ন করলেন। তখনকার দিনে সাধারণতঃ মানুষের স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ এর স্মৃতিশক্তি ছিল তার চাইতেও প্রখর। কোরআন শরীফ হেফয করতে তার মাত্র গুটিকয়েক দিন সময় ব্যয়িত হয়েছিল। তাফসীর হাদীছ ইত্যাদি শিক্ষা করতেও তার খুব বেশি দিন লাগে নাই। বিশেষতঃ দুনিয়ার পিছনে তার কোন আকর্ষণ ছিল না বলিয়া একনিষ্ঠ ভাবে তিনি সাধনা করতে পেরেছিলেন এবং এর ফলেই শিক্ষাক্ষেত্রে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি প্রচুর দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যাহেরী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেও তার তৃষ্ণাতুর মনের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত হইল না। আধ্যাত্ম জগতের বিশেষ জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তাকে স্বস্তির বিশ্বাস ফেলতে দিল না। তিনি বোখরা পরিত্যাগ করে আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন।

খাজা ওসমান হারুনী রহমাতুল্লাহ নিকট বায়েত গ্রহণ ঃ ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়; তৎকালে নিশাপুরের অধিবাসী খাজা ওসমানহারুনী ছিলেন সুফী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। আলেম কুলের শিরমণি যুগবরেণ্য তাপস। ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রনায়ক। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ আধ্যাত্মিক জগতের শেষ প্রান্তে পৌছার মানষে দেশ বিদেশে যোগ্য মাশায়েখ খুঁজতেছিলেন। যাই হোক অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত যোগ্য মাশায়েক খাজা ওসমান হারুনী রহমাতুল্লাহ কে পেয়ে অবশেষে তার নিকট মুরীদ হয়ে আধ্যাত্মিক জগতের পথকে সুগম করলেন এবং নিজেকে ধন্য করলেন। ইতিহাস বেত্তারা বলেন, রূহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ আড়াই বছরকাল পীরের খেতমতে ছিলেন। কঠোর ইবাদত,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রিয়াজাতও মোরাকাবা মোশাহিদার মাধ্যমে তিনি বাতেনী কামালিয়াত অর্জন করে সফর শুরু করলেন। ইতিহাস বেত্তারা বলেন, প্রথমে তিনি মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়ে তিনি হজ্বব্রত পালন করলেন। এর পর মদিনা শরীফে নিখিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা সুপারিশের কান্ডারী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র রওজা মোবারক যিয়ারত করবার সময় শুনতে পাইলেন, নবীয়ে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাকে বলতেছেন, তোমাকে আমি হিন্দুস্থানের বেলায়েত অর্জন করতেছি। তুমি যেখানে যেয়ে সোনালী ইসলামের নির্মল আদর্শের কথা মানুষের মাঝে প্রচার কর। সত্য কথা বলতে কি, সত্যের সৈনিক হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ) যখন এই দেশে আগমন করলেন, তখন হিন্দাস্থানের প্রায় সর্বত্রই মুর্তি পূজার প্রচলন ছিল। সত্যি কথা বলতে হয় সিন্ধু বিঝয়ের ফলে এই দেশে মুসলিম সভ্যতা যতটুকু প্রসার লাভ করেছিল, কালের প্রভাবে তাও বিলিন হয়ে গিয়েছিল। খোদাদ্রোহীদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে এই দেশবাসী কল্পি দেব দেবীর পূজায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের শোচনীয় পরিনামের কথা স্মরণ করে রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ ভ্রান্ত মানবদিগকে সত্যিকার খোদার দিকে ফিরায়ে আনার জন্য আত্ম নিয়োগ করলেন।

দিল্লীর প্রতিকূল অবস্থা ঃ ইতিহাস বেত্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায়, যে, দিল্লীর রাজা ছিলেন তখন পৃথিরাজ। তারাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি বিপ্লবী বীর মুহাম্মদ ঘুরীর মত বাহাদুরকেও পরাজিত করেছিলেন। মুহাম্মদ ঘরীর এই আক্রমণ সমস্ত হিন্দু দিগকে মুসলিম বিদ্বেষী করে তুলছিল। হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে নীচ জাত ও ম্লেচ্ছ বলে ধারণা করত এবং তাদের কথা শুনলে চটে যেত। এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা আলেম কুলের শিরমণি মর্দ্দে মুজাহিদ খাজা সাহেব লৌহবর্ম শপথ নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে সর্বস্তরের মানুষকে সোনালী ইসলামের নির্মল আদর্শেল দিকে আহবান দিতে লাগলেন। সত্যি খাজা সাহেবের সুমিষ্টি ভাষণ শুনার জন্য দিশ বিদেশ হতে মানুষ তার দরবারে আসত। মহান করুণার আঁধার আল্লাহ জাল্লা শানুর অসীম কৃপায় খাজা সাহেবের সুমিষ্ট ভাষণ ও আন্তরিক রুহানিয়াতের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে লোকেরা সত্যের দিকে ঝুকে পড়ল। তার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে ও জোরালো যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণে বহু গোঁড়া হিন্দু তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ উক্ত আলোচনা থেকেই অনুধাবন করতে পারেন যে সত্যের সৈনিক হযরত খাজা সাহেব কত উচ্চ পর্যায়ের লোক ছিলেন। একথা দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জল যে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন সাধক কুলের শিরমণি ছিলেন। ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কিট তিনি একজন সর্বজন মান্য ও শ্রদ্ধাভাজন তাপস ব্যক্তি ছিলেন। সত্যি কথা বলতে হয় ইসলাম প্রচারে তার অবদান ছিল অনন্য।

আজমীর গমন ঃ খাজা সাহেব তার প্রাণপ্রিয় মুরীদ খাজা কুতুবুদ্দীনকে দিল্লীতে রেখে নিজে আজমীরের দিকে রওয়ানা হলেন। খাজা সাহেব আজমীরে গমন করে যেখানে নিজ আবাসভূমি স্থাপন করলেন তা ছিল হিন্দু রাজার উষ্ট্র চারণভূমি। আলেমকুলের শিরমণি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ-কে দেখে রাখালগণ বিরক্ত হলেন, শুধু বিরক্ত নয়, শেষ পর্যন্ত সেইখান হতে তাকে চলে যাওয়ার জন্য বলল। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ একটু ভেবে দেখুন খাজা সাহেব কতদূর আল্লাহর মুহেববীন বান্দা ছিলেন।

সন্ধ্যার সময় রাখালগণ উটগুলো সথাস্থানে রেখে চলে গেলেন। পরের দিন খুব ভোরে রাখালগণ এসে দেখলো উটের চামড়া মাটির সাথে যুক্ত হয়ে আছে। এহেন অবস্থা দেখে রাখালগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন, অগত্যা রাখালগণ সাধক কুলের শিরমণি খাজা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাহেবের পদপ্রান্তে পড়ে মাফ চাইল। মাফ চাওয়া মাত্রই দেখলো উটগুলো যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে এই অলৌকিক ঘটনা সর্বত্র ছড়ায়ে পড়। এই ঘটনার পর থেকেই তার কাছে বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আনা সাগরের তীরবর্তী মন্দির ঃ একথা সর্বজন বিদিত যে, রাজকীয় রাখালদের উৎপীড়নে সাধক কুলের শিরমণি হযরত খাজা সাহে ঐতিহাসিক আনা সাগর তীরবর্তী ঝর্ণার নিকট আস্তানা স্থাপন করেন, তিনি সেখান থেকে ইসলাম প্রচার করে চিলছেন। ইতিহাসবেত্তাদের মতে, ঐতিহাসিক আনা সাগরের দুই তীরে বহু সংখ্যক মন্দির বিদ্যমান ছিল। এখানে এসে তিনশত পূজারী পূজা করত। দেশর নামি দামি ব্যক্তিবর্গও রাজ পরিষদের লোকজন মাঝে মাঝে এসে এই সকল মন্দিরে পূজা করত। ইতিহাস বেত্তাদের মুখে একথাও শুনা যায় মন্দিরে প্রতিদিন তিন মন তেল খরচা হতো। বহুদিন ধরে পূজা সাধনের কাজ নির্বিঘ্নে চলে আসছিল। একদিন সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় পূজারীরা মধুমাখা আজানের ধ্বনি শুনতে পেয়ে ম্লেচ্ছ ফকীরের স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে গেল। পূজারীগণ রাজ সিংহাসনে গিয়ে অভিযোগ করল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অভিযোগ শুনে রাজা ক্রোধান্ধ হয়ে সেই মুহূর্তে একদল সিপাহী প্রেরণ করলেন। সত্যি কথা বলতে হয় রাজার আদেশ পেয়ে সিপাহীদল রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ সাবের উপর খেপে গেল। আক্রোশ করে খ্যান্ত হলেন না, বরং খাজা সাহেবকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হল। রাজকীয় সৈন্য বাহিনীরা সূফী কুলের শিরমণি হযরত খাজা সাহেবের নিকটবর্তী হয়ে নানা প্রকার গালাগালি বর্ষণ করতে লাগল। এদিকে সত্যের সৈনিক হযরত খাজা সাহেব আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। রাজকীয় সৈন্যবাহিনীরা যে তাকে বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ দিতেছে সেদিকে মোটেই তার খেয়াল ছিল না। যাই হোক খাজা সাহেব ধ্যান শেষে তারেকে নরমভাবে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি চাও? সত্যি, তোমাদের আমি বলি তোমরা সামনে আর এক কদমও এসো না, তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হবে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, রাজকীয় বাহিনী খাজা সাহেবের এই আদেশ অমান্য করে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। অগত্য খাজা সাহেব তাদের দিকে এক মুষ্ঠি ধূলি নিক্ষেপ করলেন। সত্যি, ধূলি নিক্ষেপ করা মাত্রই রাজকীয় বাহিনীর সৈন্যদল পাগল হয়ে চীৎকার করতে করতে পালায়ে বাঁচল। ইতিহাস বেত্তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট যে সৈন্য দলের কেউ অন্ধ, কেউ বধির, কেউ খঞ্জ আর কেউ মাতাল হয়ে গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই রাজার নিকট এই অলৌকিক কান্ডের কথা পৌছাল। প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণ এখান থেকেই অনুধাবন করতে পারেন যে, সত্যের সেনানী সূফী সাধক হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী কত উচ্চ পর্যায়ের আল্লার ওলী ছিলেন।

রামদেব ও অজয় পালের ইসলাম গ্রহণ ঃ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পৃথ্বিরাজ ভাবছিলেন যে আলেমকূলের শিরমণি হযরত খাজা সাহেব একজন অসামান্য যাদুকর, বহু চিন্তা ভাবনা করার পর শেষ পর্যন্ত তৎকালীন নামকরা যাদুকর রামদেবও অজয় পালকে পরপর তলব করলেন। জার আদেশ পেয়ে তারা তড়িৎগতিতে খাজা সাহেবের নিকট হাজির হল। ঐ সময় ঐ সাধক হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তাদের আগমনে ধ্যান ভঙ্গ করে তাদের প্রতি জ্যোতির্ময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে হেদায়েত করার মালিক একমাত্র আল্লাহই, সত্যিই মুহূর্তের মধ্যে রামদেব ও অজয় পালের হৃদয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। মহান করুণার আঁধার আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কুদরত কে বুঝতের পারে, তাৎক্ষণিকভাবে তারা রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত খাজা সাহেবের পদপ্রন্তে লুটিয়ে পড়ল এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিল। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ একটু ভেবে দেখুন আল্লার অলীকে তাড়াতে এসে তারা নিজেরাই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। আলেমকূলের শিরমণি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রামদেবের ইসলাম গ্রহণ করার পর তার নাম রাখলেন মুহাম্মদ সাদী, অভিধান সূত্রে জানা যায়, সাদী অর্থ ভাগ্যবান। পরবর্তীতে রামদেব কামেল ওলী হিসেবে সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অজয় পাল ইসলাম গ্রহণ করার পর খাজা সাহেব তার নাম রাখেন আবদুল্লা বিয়াবানী।

পৃথ্বিরাজের উপর খাজা সাহেবের অভিশাপ ঃ ইহিহাস বেত্তারা বলেন, প্রথম তারাইনের যুদেদ্মহাম্মদ ঘুরী পরাজিত হয়ে পুনরায় দ্বিতীয়বার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। অতীব সত্য কথা যে, এই যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে পরাজিত ও নিহত হলেন। ইতিহাসবিদগণ ও ইসলামী জ্ঞানতাপসগণ বলেন, দ্বিতীয় তারাইনের যুদ্ধের পশ্চাতে সূফী কুলেল শিরমণি হযরত খাজা সাহেব-এর অভিশাপ খুবই কার্যকরী হয়েছিল। **প্রথমত ঃ** সাধককুলের শিরমণি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ সাহেব পৃথ্বিরাজকে ইসলাম গ্রহণ করবার জন্য এক চিঠিতে দাওয়াত দিয়েছিলেন। খাজা সাহেব তার মূল্যবান চিঠির মধ্যে উল্লেখ করেন যে, পৃথ্বিরাজ একথা সর্বজন বিদিত যে, মূর্তি অচেতন পদার্থ তার কোন শক্তি নেই। সে মানব জাতির কোন প্রকার সার্থকতা থাকতে পারে না। মহান করুণার আঁধার আল্লাহ জাল্লা শানুহ এক, অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নেই। অতএব, তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোনালী ইতিহাসের নির্মল আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন কর। তোমার উপর আল্লাহর রহমতের করুণা বর্ষিত হবে। খাজা সাহেবের চিঠি পেয়ে পৃথ্বিরাজ ক্রোধে উন্মাদ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত ঃ পৃথ্বিরাজ খাজা সাহেবের এক ভক্ত মুরীদ কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে চাকুরী হতে বরখাস্ত করায় খাজা সাহেব একথা শুনে এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠান "আমি তোমাকে জীবিত অবস্থায় মুসলিম সৈন্যদের হাতে সোপর্দ করলাম। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা খাজা সাহেবের এই অভিশাপ সে সত্যে পরিণত হয়েছে, তা একটু খেয়াল দিয়ে শুনুন এবং চিন্তা করে দেখুন খাজা সাহেব কতদূর আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন।

চিশতীয় তরীকার ঃ একথা সর্বজন বিদিত যে ইলমে মারেফাতের অনেকগুলি তরীকার মধ্যে চারটি তরীকাই আসল, যথা ঃ-চিশতীয়, কাদিরীয়া, নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় চিশতী হিন্দুস্থানের একটি গ্রামের নাম। সাধক কুলের শিরমণি সত্যের সৈনিক হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ ও তরীকার অধিকাংশ তাপসগণ এই গ্রামে অবস্থান করতেন বলে তার নামানুসারে তাদের প্রবর্তিত তরিকার নাম চিশতীয়া তরীকা হয়েছে। ইতিহাস বেত্তারা বলেন, চিশতিয়া তরিকা যদিও খাজা সাহেবের আগেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই তরীকার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করে তারই সময় হতে। এই তরিকার অজিফা ও আমল অত্যন্ত সহজ ও সরল হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ অতি সহজে এই তরীকার চর্চা ও অনুসরণ করতে সক্ষম হয়।

খাজা সাহেবের কতিপয় বিশেষ উপদেশাবলী ঃ বিভিন্ন সময়ে সূফী সাধক হযরত খাজা মঈন্দুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ নিজ শিষ্যবর্গকে যে সব মূল্যবান নসীহত প্রদান করেছেন তার তুলনা হয় না। নিম্নে তার কতিপয় নসীহত দেওয়া হল।

১। এলেম গভীর সাগর সাদৃশ্য মারেফাত উহার তরঙ্গ।

২। দান করলেই খোদায়ী নেয়ামত লাভ করা সম্ভব।

৩। আরেফের নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্যুকে বন্ধু মনে করেন এবং প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে তিনি খোদাকে স্মরণ করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪। মুহাব্বতের নিদর্শন এই যে, বান্দা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করবে এবং সাথে সাথে তার এ ভয়ও থাকবে যেন তার নৈকট্য হতে সে বঞ্চিত না হয়।

৫। পিতামাতার দিকে ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানও এবাদত।

৬। হতভাগা সেই লোক, যে গুণাহর কাজে লিপ্ত থেকেও মনে করে প্রভু আমাকে কবুল করে লইবেন।

৭। পরিশ্রম ব্যতীত কোন কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়।

৮। চার শ্রেণীর লোক খুবই ভাল ঃ ১ম যে দরবেশ সর্বদা নিজেকে ধনী মনে করে। অর্থাৎ সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও যে নিজের দারিদ্র্য কখনও প্রকাশ করে না। ২য়ঃ যে ক্ষুধার্ত নিজেকে তৃপ্ত ভাবে, ৩য়ঃ যে চিন্তাক্লিষ্ট বিপন্ন সর্বদা হাসিমুখে থাকে, ৪র্থ যে লোক শত্রুর সহিত বন্ধু সুলভ আচরণ করে।

৯। সর্ব প্রথম যে বিষয়টি মানুষের উপর ফরয করা হয়েছে, তা হল আল্লাহর মারেফত।

১০। তাওবার স্তর কয়েকটি-জাহেলের সংসর্গ পরিত্যাগ করা, ভ্রান্তদের থেকে দূরে থাকা, অবিশ্বাসীদের সান্নিধ্য পরিহার করা, খোদার প্রিয় বান্দাদের সোহবত অবলম্বন করা ও নেক কাজে মনোনিবেশ করা।

১১। নেক করার চাইতে নেকবানের সোহবত যত উত্তম, পাপ করার চাইতে পাপীর সোহবত তত খারাপ।

১২। কোরআন শরীফ, কাবাগৃহ পিতামাতা, বোযর্গ আলেম ও ওস্তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবাদতের শামিল।

১৩। আরেফ যখন নীরব থাকেন, মনে করবে তিনি প্রভুর সাথে কথা বলতেছেন।

১৫। ঐ ব্যক্তি প্রকৃত দরবেশ যার কাছে এসে কোন লোক মাহরূম হয় না।

১৬। ভালবাসার প্রকৃত দাবিদার ঐ সকল লোক, যারা সর্বদা বন্ধুর কথা শুনতে ভালবাসে।

১৭। সত্যিকার বন্ধু ঐ ব্যক্তি, যে বন্ধুর দেওয়া বিপদকে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে।

১৮। একজন মুসলিম ভাইকে বে ইজ্জতি বা অপদস্থ করলে যত ক্ষতি হয় সারাজীবন গুনার কাজে লিপ্ত থাকলেও তত ক্ষতি হয় না।

১৯। যে সকল কথা বা কাজ আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন, বান্দাও যদি সেই সকল কাজ ও কথা ঘৃণা করতে শিখে, তবেই খোদার দোস্তী সে অনায়াসে লাভ করতে পারে।

২০। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, অভাবগ্রস্তের অভাবপূরণ ও শত্রুর সাথে সদাচরণ, চরিত্রের বিশেষ গুণ।

২১। ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত প্রেমিক যার ইহলোক ও পরলোকের সকল আশা ত্যাগ করে একমাত্র মহান মাহবুব আল্লাহ তায়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে।

২২। কোন লোক ততক্ষণ আরেফ হতে পারে না যাবৎ সে নিজ অস্তিত্ব একেবারে ভুলে না যায়।

২৩। প্রেমের পথে যে অটল থাকে, প্রেমাগ্নি তার অস্তিত্বকে বিলোপ করে দেয়।

ইন্তেকাল ও দাফন ঃ একথা সর্বজন বিদিত যে মানুষ মরণশীল। জন্মিলে মরতে হয়। এ নীতির উপর ভিত্তি করে বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় হাবীব নিখিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা সুপারিশের কান্ডারী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মত নবীও মৃত্যুর তুহিন শীতল করস্পর্শ হতে পরিত্রাণ পাননি। তদ্রুপ রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহ ও একদিন চির বিদায়ের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হলেন তার মহা প্রস্থানের সময় ঘনাইয়া আসল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তার মৃত্যু সম্বন্ধে কথিত আছে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে আলেমকুলের শিরমণি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী যে রাত্রে ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন, সেই রাত্রিতে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অষংখ্যক অলীআল্লাহ খাবে দেখতে পান যে সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলতেছেন মঈনুদ্দীন আল্লাহ পাকের বন্ধু। আমরা তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করবার জন্য আগমন করছি। ইতিহাস বেত্তারা বলেন, হিজরী ৬২৭ সালের ৬ই রজব তারিখে ইশার নামাজ আদায় করবার পর সূফী সাধক হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাহঃ) নিজ কক্ষে ঢুকলেন এবং ভিতর হতে উক্ত কামরা বন্ধ করে দিলেন, ক্রমে ফজরের সময় হল। অতীব দুঃখের বিষয় হল প্রতিদিনের মত আর হুজুরার দরজা খুলল না। খাদেমগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরিশেষে দরজা ভেঙ্গে দেখা গেল যে সূফী সাধক রুহানী জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী সাহেবের প্রাণ বায়ু শেষ হয়ে গেছে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। খাজা সাহেবের ইহধাম ত্যাগের সংবাদ শুনে জনসাধারণ অত্যন্ত মর্মাহত হয়। দেশ বিদেশ হতে মানুষের ঢল নেমে আসল। তার জানাযার নামাজে অসংখ্য লোক শরীক হন। তার সুযোগ্য পুত্র খাজা ফখরুদ্দীন রহমাতুল্লাহ জানাযার নামাজ পড়ান। তিনি যে হুজরায় মৃত্যু বরণ করেন সেই হুজরাতেই তাকে দাফন করা হয়।

হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ ওলি কুলের শিরোমণি হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আরব সম্রাজ্যের হেজাজ প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ইয়েমেনে ১৩২২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ শেখ বংশে মাহমুদ কোরাইশীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল মাহমুদ কোরায়শী। তিনিও একজন মহাক্ষমতাশালী বীর পুরুষ ছিলেন। শুধু বীর পুরুষই ছিলেন না বরং তিনি একজন খাঁটি ঈমানদার ও ইসলামের একজন মহান সেবকও ছিলেন। কোন মানুষ কষ্ট ক্লেশ ছাড়া উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করতে পারে না হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এর জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রথমে তার শিশু জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই অন্তরে দুঃখের ঝড় বয়ে যায়। শিহরে উঠে সমস্ত শরীর।

শিশু শাহজালাল মাত্র তিন মাস বয়সের সময় তাঁর মা জননী দুনিয়া থেকে চির নিদ্রায় শায়িত হন। (ইন্না লিল্লাহে .....রাজেউন)। এর পর তাঁর লালন-পালনের ভার স্বীয় পিতা মাহমুদ কোরাইশী গ্রহণ করে, মাহমুদ কোরায়শী সৈয়দ বংশের পূন্যবান একজন স্ত্রীকে পেয়ে খুবই সুখী হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন।

তিনি আর অন্য কোন নারীকে গ্রহণ না করে বাকী জীবন সংগীহীন অবস্থায়ই কাটিয়েছেন। বর্তমানেও দেখা যায় কোন ঘরে গৃহিণী না থাকলে সংসার চালাতে হয়। তাই তো হযরত শাহাজালালের মা জননী মারা যাওয়ার পর পিতা মাহমুদ কোরাইশী খুব কষ্ট ক্লেশ করেই সংসার চালাতেন শিশু শাহাজালালকে লালন-পালন করতেন। অন্য দিকে বীর মাহমুদ কোরাইশী ইসলাম প্রচারের জন্য অসংখ্য যুদ্ধ করেছেন এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন। অন্যদিকে তিনি ধন সম্পদেও ছিলেন প্রাচুর্যশীল। হলেও তিনি ধন্য সম্পদের উপর কখনও আসক্ত হননি। ইসলাম প্রচারের যুদ্ধ করেই তিনি জীবন কাটিয়েছেন।

এদিকে আস্তে আস্তে শাহজালালের জীবনেও নেমে আসে শোকের তুফান। কারণ পিতার স্নেহও বেশী দিন তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। মা জননীর মৃত্যুর কিছু দিন পরে দেশের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সীমান্তে যখন মুসলমানদের সংগে বিধর্মীদের বিরাট যুদ্ধ শুরু হয়। সে যুদ্ধে তখন বীর যোদ্ধা মাহমুদ কোরায়শীর ডাক পড়ে যায়। যখন মাহমুদ এই যুদ্ধের সংবাদ পেলেন তখনই তাঁর মন চিন্তিত হয়ে পড়ল। না জানি যুদ্ধ থেকে আর ফিরে নাও আসতে পারি। অপর দিকে শিশু শাহাজালালের কথাও ভাবতে লাগলেন যে আমি যদি এ যুদ্ধে থেকে ফিরে আসতে না পারি তখন মাতৃপিতৃ হারা শিশু শাহজালালের অবস্থাটা কি হবে। অন্য দিকে যুদ্ধেও যেতে মন চায়, তখন তিনি উভয় সংকটে পড়ে গেলেন। সে যাই হোক তিনি ঈমানী শক্তিতে ছিলেন শক্তিমান। আল্লাহর উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। তাই তিনি শিশু শাহজালালের প্রতিপালনের ভরসা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা পালনকারী মহান আল্লাহর উপর রেখেই ধর্ম যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের সীমান্তে কাফেরদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে ছুটে চললেন। যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে অনেক শত্রু তার হাতে নিহত হল। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় তিনিও শত্রুর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। আর তিনি যুদ্ধ ময়দান থেকে ফিরে এলেন না। শোক সাগরে ভাসতে লাগলেন শিশু শাহজালাল। এবার তিনি এ ধরায় এতিম হয়ে গেলেন। আল্লাহর লীলা বুঝবার শক্তি কার আছে? তিনি নদীর মাঝে পাহাড় গড়েন আবার পাহাড় ভেংগে নদী করন; যেমন কোন মানুষ কষ্ট ব্যতিরেখে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারেন না সেই কষ্টের নমুনা নেমে আসতে লাগল ইয়াতিম শাহজালাল-এর জীবনে। এদিকে মাহমুদ কোরায়শী গৃহত্যাগের সময় শিশু শাহজালাল রহমাতুল্লাহ ভরসা এক মাত্র আল্লাহর উপরই রেখেছেন। আল্লাহও তেমনি অসহায় শাহজালালকে তার মাতুলের মাধ্যমে আরাম আয়াশ ও সুখের মধ্যই লালন-পালন করিয়েছেন। এ কথা সর্ব বিদিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে আপন করে নিয়েছেন। তেমনি আল্লাহও তাকে সেইভাবে আপন করে নেন এই সুযোগই অসহায় শাহজালাল তা মামার সংসারে খুব সুখেই প্রতি পালিত হন।

তাঁর পিতা শহীদ হবার পর তার মামা সৈয়দ কবির আহম্মদ অসহায় ভাগীনাটির লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ তাঁর মামার সংসারে গিয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে লাগলেন। সাথে সাথে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যও লাভ করলেন। তিনি তাঁর জীবনকে ধর্ম প্রচারের জন্যই বিলীন করে দিয়েছিলেন।

মামার আশ্রয় দান ও শিক্ষা দীক্ষা ঃ একথা দিবা লোকের ন্যায় উজ্জ্বল যে, সকল মনীষী ধরার বুকে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ ছিলেন তারেদ মধ্যে অন্যতম। অতি অল্প বয়সে পিতামাহ হারালে মামা সৈয়দ কবির আহম্মদ তার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। এবং নিজের সন্তানের মতোই লালন পালন করন। কোন দিন থেকে কোন অভাব অনুভব করতে হয়নি। তাঁর কারণ তার মামা এই মনোভাব নিয়ে ভাগীনার প্রতিপালন করেছেন যেন কোন সময়ই পিতামাতার কথা তার মনে না উঠে। বা পিতামাতার অভাব অনুভব না করতে পারে অর্থাৎ সৈয়দ আহম্মদ কবির তার আপন সন্তাদের চেয়ে বেশী স্নেহ করতেন। আবার শুধু স্নেহ ভালাবাসা দিয়েই বড় করেননি বরং সাথে সাথে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছিলেন। তার মামা আহম্মদ কবিরও ছিলেন একজন ত্যাগী তাপস ও ধর্ম প্রাণ ব্যক্তি। এক দিকে যেমন ছিলেন বিদ্যোৎসাহী অন্য দিকে ছিলেন কামেল অলি। ফকির বা সুফীলোকদের রীতি-নীতি অনুযায়ী তিনিও অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করতেন। সকল খারাবিয়াত পরিহার করে একজন ত্যাগী পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। যারা আল্লাহর প্রেমের সুধা পান করে করেছেন তারা নির্জনতাকেই পছন্দ করতেন। হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এর জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনিও নির্জনতাকে পছন্দ করতেন এবং নির্জনে বসে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিন রাত মহা প্রভুর আরাধনা করে জগতের বুকে সিদ্ধ পুরুষ হয়েছিলেন। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাৎ যথা নিয়মে আদায় করতেন। সাথে সাথে ওয়াজ নছিহতের কাজও চালাতেন। অর্থাৎ ধর্ম বিরোধি মানুষের মাঝে ওয়াজ নসিহত করে তাদেরকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করতেন।

শিশু শাহজালাল তাঁর শিশুকাল থেকেই কঠোর সাধনায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আর অতি সযত্নের সাথেই নানাবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে লাগলেন। হযরত শাহজালাল বাল্যকাল থেকেই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী তেমনি ছিলেন আবার ধী-শক্তিসম্পন্ন। সেহেতু অল্প সময়ে বিভিন্ন শিক্ষায় পারদর্শী হয়েছিলেন। সৈয়দ আহাম্মদ কবির তাঁর ভাগীনাকে শুধু পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন না বরং পার্থিব শিক্ষার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ইবাদত সংযম ও নৈতিক শিক্ষার ভেতর দিক, যথা–শরীয়ত ও মারেফত শিক্ষা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারেন সে শিক্ষাও তাঁকে তাঁর মামা দিয়ে ছিলেন। এইজন্য তাঁর মামা তাকে প্রথমে আরবী ভাষা শিক্ষা দেন। এক সময় আদরের ভাগনাকে নিয়ে মক্কা শরীফও ছফর করেছিলেন।

একথা না বলে পারা যায় না যে, একজন ভাল ছাত্রের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন তা এক শাহাজালাল রহমাতুল্লাহ-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাঁর ধী-শক্তির প্রমাণ হিসেবে একথা বলা যায় যে, তিনি মাত্র সাত বছর বয়সের সময় ৩০ পারা কুরআন শরীফ মুখস্ত করেন। এরপর তিনি তাঁর মামাকে শিক্ষাগুরু হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে কোরআন, হাদিস তাফসির, ফেকাহ, তাসউফ ও বালগাত, মানতেক ইত্যাদি বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এক সময় তাঁর মামা সৈয়দ আহম্মদ কবির একার পক্ষে এতগুলি বিষয়ের অধ্যাপনা করা কষ্ট অনুভব করলেন। তখনই তার মামা উচ্চ শ্রেণীর আলেমকে বালক শাহজালালের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এবারে তারা উভয় বালক শাহজালাল কে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে লাগলেন।

তিনি শুধু জাহেরী ইলেমই শিক্ষা করেননি। বরং বাতেনী ইলেমও শিক্ষা করেছিলেন। তাইতো দেখা যায় বালকেরা যে বয়সে দুষ্টমী খেলাধুলার মধ্যে কাটায় সে বয়সে বালক শাহজালাল রহমাতুল্লাহ জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজেকে মনোনিবেশ করেছিলেন। জ্ঞানের সাধক হযরত শাহজালাল বাল্যকাল থেকে সকল আরাম আয়েশ আনন্দ উৎসব পরিহার করে গভীর জ্ঞান সাগরে সাধনায় মত্ত হয়েছিলেন। তার মামা তাকে শুধু জ্ঞানই শিক্ষা দেননি জ্ঞান শিক্ষার সংগে সংগে সার্বিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য যা কিছুর দরকার তাও তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য যা কিছুর দরকার তাও তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যার কারণে মানুষ তার সংযম, সততা, সরলতা, বিনয় কোমলতা প্রভৃতি মহৎ গুণ দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিল।

তার মামা সৈয়দ আহম্মদ কবির ছিলেন একজন বিচক্ষণপূর্ণ লোক, সেহেতু তার বিচক্ষণতার দ্বারা তার ভাগীনার পূর্ণ পরিচয় পেয়েছিলেন। সে অতি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বালক শাহজালাল একজন জগৎ বরেণ্য ব্যক্তি হবেন। বালক শাহজালাল এর অন্তরখানা ছিল আয়নার মত স্বচ্ছ ও নির্মল। তাইতো ঐতিহাসিকরা তাকে ইসলামের দর্পন বলেও আখ্যা দিয়েছেন। শৈশব হতেই কোন খারাপ কাজ করাতো দূরের কথা কোন দিন তার মধ্যে খারাপ কাজের রেখাপাতও ঘটেনি। ভবঘুরে লাগামহীন বালকদের মত এখানে সেখানে ঘোরা ফেরা করে কখনই সময় কাটাননি। মামা সৈয়দ আহম্মদ কবির তাঁর দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতেন, যাতে করে কোন খারাপ কাজে যেন শাহজালালকে স্পর্শ করতে না পারে।

এদিকে বালক শাহ জালাল তার মামার ও গৃহশিক্ষকের নিকট থেকে সবক লয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আদায় করতে লাগলেন। তাঁর মামাও তাকে উচ্চ হতে উচ্চ স্তরের ফয়েজ দিতে লাগলেন। আল্লাহ পাকের অপর মহিমায় বালক শাহজালাল এলেমের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উচ্চ হতে উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে লাগলেন। আল্লাহর খেলা বুঝা ভার-যাকে তিনি দান করেন অতি অল্প সময়েই মানযিলে মাকছুদে পৌঁছাতে পারেন। বালক শাহজালালের উপরও আল্লাহর অপর করুণার ধারা প্রবাহিত হল, সেহেতু তিনি মানযিলে মাকছুদে পৌঁছে ছিলেন। মামা সৈয়দ আহাম্মদ কবীরের অকৃত্রিম প্রচেষ্টা ও বালক শাহ জালালের আগ্রহে তিনি কামেলে ওলির স্তর লাভ করে ছিলেন। তাইতো তাকে আমরা ভক্তি ভরে স্মরণ করি। শুধু তাই নয় ইতিহাসের পাতায় আজ তার নামটি অমর হয়ে আছে।

মামার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঃ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় হযরত শাহজালাল-এর বাল্যকাল থেকেই তার চরিত্রের মাধুর্যতা ভিন্ন আভার ন্যায় প্রকাশ পেয়েছিল। অতি অল্প বয়সেই পূর্ণ আত্মা মানুষের যে সকল গুণ তাকা দরকার সে সবগুনের বিকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। আর সে সকল ঘুনগরিমার দ্বারাই তিনি অলিত্বের শীর্ষে স্থান দখল করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তার চলচলন, আচার-ব্যবহার ছিল সাধারণ মানুষের থেকে ব্যতিক্রম। মাঝে মাঝে বালক শাহ জালালের বিচক্ষণতা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারতেন না। তখন থেকেই তাঁর মামার বুঝতে বাকী রইল না। সে যাই হোক শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এর বয়স যখন বাড়তে লাগল তাঁর মামাও তাকে নানা পরীক্ষা করতে থাকে। এক সময় ভাগীনাকে একটি কঠোর পরীক্ষা করার মনস্থঃ করলেন কিন্তু পরীক্ষা করার কোন পন্থা পাচ্ছেন না। এমনই এক সময় একটা তাড়া খাওয়া পাগলা হরিণী এসে সৈয়দ আহাম্মদ কবীরের সম্মুকে হাজির হল। বলল, হুজুর আমার একটা দুঃখের নালিশ করার কাকেও পেলাম না তাই আপনার দরবারে হাজির হলাম। দয়া করে আমার এই বিচারটি আপনি করবেন।

এবারে সকল প্রাণীর ভাষাবিদ সৈয়দ আহম্মদ হরিণীর কথা বুঝতে পেরে বললেন, রে-হরণী এবারে তোমার ঘটনা খুলে বল। দুঃখিণী হরিণটির চোখের পানি ফেলে বলতে লাগল, হুজুর আমার একটি মাত্র দুগ্ধ সন্তান সেটিকে একটি ক্ষুধার্ত বাঘে নিয়ে হত্যা করে খেয়ে ফেলেছে। এখন আপনি ইহার বিচার করেন। সৈয়দ আহম্মদ কবির এবারে ভাগীনাকে পরীক্ষা করবার একটি পথ পেলেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ভাগীনাকে ডাক দিয়ে বললেন, যাও তুমি গিয়ে এই বাঘটিকে খুঁজে বিচার করে এস। শাহ জালাল বললেন, বাঘটি ক্ষুধার্ত হয়েইতো হরিণ ছানা খেয়েছে, এর আবার কি বিচার করা যায়। সে যাই হোক গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে গভীর বনের দিকে ছুটে চললেন। গিয়ে অনেক সন্ধানের পর বাঘটির সন্ধান পেলেন। বাঘটি দেখে তাঁর কাছে আসার জন্য ইশারা করলেন। বাঘটি তার হিংস্রত্ব পরিহার করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসল।

এদিকে তার মামা ভাগীনাকে বিচার করতে পাঠিয়ে ভাবতে লাগলেন যে, বাঘটির কি বিচার করা যায়; বাঘতো অন্য প্রাণী শিকার করেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তবে বাঘটিকে একটি চপেটাঘাত করে এই বলে দিলেই হয় যে, যেন এভাবে কোন প্রাণীর দুগ্ধ ছানাকে আহার না করে।

হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ ছিলেন একজন অগাধ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী। তাই তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে তার মামার মনোভাব জানতে পারলেন এবং সেই অনুসারে বাঘটিকে কাছে ডেকে ভীষণ এক চড় লাপিয়ে বললেন, যা দুষ্ট এভাবে আর কখনও কোন দুগ্ধ ছানাকে খাসনে যা বনে চলে যা। আর যেন তাদের বিরুদ্ধে কোন নালিশ না আসে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিরোমণি হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ বাঘের বিচার করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মামার কাছে চললেন। গিয়ে হাস্যবদনে বললেন মামা ওদের আর কি বিচার করা যায়? বনের পশু শিকার কে জীবিকা নির্বাহ করাই তো ওদের ধর্ম। তবে আপনার আদেশ পেয়ে আমি এই ভাবে বাঘটির বিচার করেছি যে, বাঘটিকে কাছে ডেকে এক চপেটাঘাত করে বলে দিয়েছি যেন এভাবে দুগ্ধছানা কখনও শিকার করিসনে।

মামা ভাগীনার মুখে সে একথা শুনে অতি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ভাবলেন আমি ধারণা করেছি সেটাই করেছে? আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তার আর বুঝার বাকী রইল না যে, এ ছেলে পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছে। তার মামার শত কষ্টের প্রতিফলন ঘটল সেখানে। তার অন্তরে বিন্দু মাত্র কষ্ট রইল না। আনন্দে ভরে উঠল তার অন্তর। ভাগীনাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে বললেন, বৎস। তুমি ধন্য আমার জীবনে সকল আশা আকাংখা তুমিই পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছ। শুধু তাই নয় তুমিতো সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করেছ। তুমি পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছ। উত্তীর্ণ হয়েছ আমার সকল পরীক্ষায়। এবার তুমি কর্ম ব্যস্তে ঝাপিয়ে পড়। শাহজালালের শ্রদ্ধেয় মামা তথা শিক্ষা গুরু ধর্ম গুরু ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী সেহেতু তিনি ভাবতে পারলেন যে অধিক জ্ঞানীদের এক স্থানে জড়ো হওয়া ঠিক নয়। তাই তার আদুরে ভাগীনাকে আদরের গন্ডির ভিতরে না রেখে বললেন, বাবা তুমি অন্যত্র চলে যাও। গিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু কর। এখানে আর আবদ্ধ হয়ে থাকার দরকার নেই। শত শত পথ ভোলা পথিককে সৎ পথে আনতে পারলেই তুমি হবে ধন্য। ইহ জগতে লাভ করতে পারবে আল্লাহর অশেষ করুণা। পর জগতেও লাভ করতে পারে জান্নাতে অগণিত সুখ শান্তি।

প্রত্যাদেশ লাভ ও দেশ ত্যাগ ঃ প্রকাশ থাকে যে সৈয়দ কবির আহম্মেদ তার স্নেহের ভাগীনাকে যে সকল পরীক্ষা করেছেন হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ তাঁর মামার প্রত্যেকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এতে তার কোন বেগ পেতে হয়নি। এবার তাঁর শিক্ষাগুরু তাকে যে দেশ ত্যাগের ইংগিত দিয়েছেন তখন থেকেই তার মনে কি যেন নব অধ্যায়ের সূচনা তিনি দেখতে লাগলেন। কি যেন অদম্য আকাংখায় অস্থির হয়ে উঠলেন।

তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর জীবনেও রয়েছে অনেক অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহর পেমে যখন তিনি অধীর হয়েছেন, তখন আল্লাহ তাওয়ালাও তাকে এমন জ্ঞান দান করলেন যাতে সকল ভিসয় বুঝতে পারেন। সেহেতু তিনি একথাও বুঝতে পারলেন যে আমার উপর যে সব দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে এগুলো শুধু আমার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য নয়। আল্লাহর সৃষ্ট জীব আশরাফুল মাফলুকাতের মঙ্গলের জন্য আমাকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে।

কিন্তু সে দায়িত্ব কর্তব্যটা যে কি, সেটা তিনি বুঝতে পারতেছেন না। শুধু রাত দিন ভাবতেছেন কি সে দায়িত্ব? এখন তিনি গুরুর সেবায়ে নিজেকে বিলীন করে দিতে লাগলেন। শুধু তাই নয় আল্লাহর ইবাদতেও মশগুল থাকতেন। এক দিন গভীর রাত্রে আল্লাহর আরাধনা করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখলেন কে যেন তাকে ডেকে বলছে, "হে শাহজালাল! তুমি যে কঠোর সাধনা ও তপস্যার দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সংযমতা অর্জন করেছ, এসব তোমার নিজের জন্য নয়। এবার তুমি মানব জাতির কল্যাণের জন্য নিজেকে নিয়োগ কর। পাপপাচার ধর্মান্ধ মানুষকে আহবান কর ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান কর। ইসলাম প্রায় অর্ধ বিলীনের পথে, তাই সকল মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে ইসলামের পতাকা পূর্ণ উত্তোলন কর। বিপথগামী মানুষকে আশ্রয় দিয়ে মুক্তির দিশা দাও। আর বসার সময় নয়। ইসলাম জগতের মহান আদর্শকে আবার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে তার দীপ্ত রশ্মিকে কুআচারে নিমগ্ন পাপী তাপীকে কলুষিত আত্মার থেকে আলোকিত করে তোল। ইসলাম আবার দুনিয়ার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুকে পূর্ণ জাগরুক হোক এটাই তো প্রতিপালকের পরম ইচ্ছা। সে ইচ্ছা পূরণের জন্যই আল্লাহ তোমাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করেছেন। আর বিলম্ব করার সময় নেই। ধর্ম প্রচারের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালনে তৎপর হও। যে স্থান থেকে ইসলাম বিলীনের পথে। মানুষ নানা অনাচার কুআচারে লিপ্ত সেখানে গিয়ে দায়িত্ব পালন কর।

এবারে তাঁর নিদ্রা ভাঙ্গল মনে পড়ল স্বপ্নে পাওয়া প্রত্যাদেশের কথা। সাথে সাথে বিস্তি হলেন, আবার আনন্দিতও হলেন। কারণ যে বিষয়টা নিয়ে তিনি চিন্তা ভাবনা করতে ছিলেন সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তাই তো তিনি আনন্দিত হয়ে পরের দিন ভোরে শিক্ষা গুরুর নিকট জানালেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না কোথায় সে জায়গাটি। কিন্তু মনোবল হালালেন না বরং আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন ভাবললেন তাহলে সেই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য কি আমাকে পাঠিয়েছেন? এই প্রত্যাদেশও কি একই উদ্দেশ্যে দিয়েছেন? আবার ভাবতে লাগলেন আল্লাহর এ প্রত্যাদেশও কি উপেক্ষা করা যায়? কখনই না। আমাকে এ পুণ্য দায়িত্ব পালন করতেই হবে। কিন্তু শত চিন্তা ভাবনার পরেও নির্দিষ্ট স্থানটি নির্বাচন করতে পারলেন না। এদিকে তার গুরু সৈয়দ আহম্মদ কবির তার প্রিয় ভাগীনার স্বপ্ন শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বললেন এ মহান দায়িত্ব তোমাকে পালন করতেই হবে।

আমিও তোমাকে অনুমতি দিলাম। যাও তুমি গিয়ে তোমার দায়িত্ব পালন কর। এবারে হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ তার মামার অনুমতি পেয়ে দেশ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলেন। পরের দিন ভোরে তার মামা সৈয়দ আহম্মদ কবির এক মুষ্টি মাটি ভাগীনার হাতে দিয়ে বললেন, যাও বাবা এখান থেকে পূর্ব দিকে চলে যাও। এবং যাত্রা পথে যেখানে রাত্রি যাপন করবে সেখানের মাটি পরীক্ষা করে দেখবে। এই মাটির সাথে যে স্থানের মাটির মিল হবে সেখানেই তুমি তোমার আস্তানা তৈরি করে বসবাস শুরু কর। এবং সেখানেই তোমাকে আল্লাহর কর্তব্য পালনে ব্যপ্ত হবে।

দেশ ত্যাগের পূর্বে মামার এ আদেশ পেয়ে স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে যে চিন্তা তার মনে দোলা দিতে ছিল সে চিন্তাও বিদূরীত হল। এবার তিনি ১২ জন শিষ্য সহচর নিয়ে ভারত বর্ষের দিকে রওয়ানা হলেন। অজানা অচেনা পথা ধরে চলতে লাগলেন। কিন্তু কোনরূপ বাঁধা বিঘ্নের কথা অন্তরে স্থান দিলেন না। আল্লাহর দেওয়া প্রত্যাদেশ পালনের জন্যই মানব সেবায় নিজেকে বিলীন করার উদ্দেশ্যেই নতুন পথ ধরে চলতে লাগলেন।

একথা সুউজ্জ্বল যে আলেম কুলের শিরোমণি হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ বেশি দিন ইয়েমেন থাকলেন না। ইয়েমেন থেকে তিনি পূর্ব বঙ্গ রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে তিনি দিল্লীতেও কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। তখন দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। আলাউদ্দীন খলজী। দিল্লীতে তৎকালে একজন প্রখ্যাত আওলিয়া বাস করতেন। তার নাম ছিল হযরত নিজামউদ্দিন আওলিয়া। তার সুনামও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ দিল্লীতে এসে তার নাম শুনে তার সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

যেই ইচ্ছা সেই কাজ। হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ নিজাম উদ্দিন আওলিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি শাহজালালকে সাধ্যানুযায়ী মেহমানদারী করলেন এবং ওখানে রাত্রি যাপনের জন্য অনুরোধ করলেন। শাহজালাল রহমাতুল্লাহ ওখানেই রাত্র কাটালেন। রাত্রে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া হযরত শাহজালালকে তার ওলিত্বের ব্যাপারে পরীক্ষা করতে চাইলেন।

নিজাম উদ্দিন আওলিয়া একটি কৌটায় কিছু আগুন ও তুলা ভরে কৌটার মুখ বন্ধ করে তার কাছে পাঠালেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মহা সাধক হযরত শাহজালাল নিজাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উদ্দিন আওলিয়ার মনভাব বুঝতে পেরে বিসমিল্লাহ বলে কৌটার মুখ খুললেন। দেখা গেল তুলাকে আগুন স্পর্শ করেনি। ইহা দেখে নিজাম উদ্দিন বুঝতে পারলেন শাহজালালের ব্যাপারে। এবং তার পায়ে পড়ে কাঁন্না শুরু করে দিলেন ও তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। দয়াদ্র চিত্তের মহা মানব হযরত শাহজালাল তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এবারে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-কে চিনতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং পরের দিন ওখান থেকে বাংলাদেশের দিকে রওয়ানা হলেন। তখন নিজাম উদ্দিন আওলিয়া তাকে ধূসর বর্ণের এক জোড়া কবুতর উপহার দিলেন।

সিলেট যে হাজার হাজার জালালী কবুতর দেখা যায়, ইহাদের আদি কবুতর সেই উপহার দেওয়া কবুতর দুটি। এখনও সিলেটের দরগাহ শরীফে অসংখ্য কবুতর দেখা যায়। শুধু সিলেটে নয় সারা বাংলাদেশে এই কবুতর দুটির বংশধর বিস্তার লাভ করেছে। বাঙ্গালী মানুষ তাকে এমন ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করে যেটা তার কবুতরের মধ্যেও কিছুটা বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি এই কবুতরের মাধ্যমে অনেকে ভাগ্য নির্দারণ করে থাকেন। যেমন কোন বাড়ীতে বা ঘরে এই জালালী কবুতর এসে বাসা বাঁধলে মঙ্গলের নিদর্শন হিসেবে ধরে নেয়।

পক্ষান্তরে কোন বাড়ী বসবাসকারী জালালী কবুতর যদি বাড়ী থেকে অন্যত্র চলে যায়, আর ফিরে না আসে, তাহরে সেটা অমঙ্গল হিসেবে ধরে নেয়া হয়। বাংলাদেশের কোন সম্প্রদায়ের লোকই এই কবুতরের গোস্ত ভক্ষণ করে না। এ কবুতরের নামও হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এ নামানুসারে নাম রাখা হয় জালালী কবুতর।

এদিকে হযরত শাহজালাল সকল স্থানেই তার মামার দেওয়া মাটি সহচর বৃন্দের দ্বারা পরীক্ষা করালেন কিন্তু এখন পর্যন্ত মিলাতে পারলেন না। তাই তার অগ্র যাত্রাও রুদ্ধ হল না। তাই তিনি সামনের দিকেই অগ্রসর হলেন। এবারে তিনি বাংলাদেশের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং এই দেশেই তিনি চলে আসেন।

গৌর গোবিন্দের পরিচয় ও তার অত্যাচার ঃ

প্রকাশ থাকে যে গৌর গোবিন্দের পূর্ব পুরুষ সম্পর্ক তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ঐতিহাসিকদের মতে জানা যায় তিনি এক মহিয়সী মহিলার জারজ সন্তান ছিলেন। কোন ঐতিহাসিক বলেন, গোবিন্দ সমুদ্রের বড় পুত্র। একদিন ত্রিপুরা রাজ্যের এক মহীয়সী রাজার অজান্তে সমুদ্র দেবতার সংগে অবৈধ মেলামেশা করে সেই মিলনে সমুদ্র দেবতার গর্ভধারণ করে যে বাচ্চা প্রসব করে তিনিই হল গৌর গোবিন্দ। তার দেহের আকৃতি এমন ভয়ানক ছিল যে তাকে দেখলেই মনে ঘৃণা আসত ও ভয় পেত।

সে যাই হোক এক সময় তার বুদ্ধির চালে কূটনীতির মাধ্যমে গৌর রাজ্যের অধিপতি হয়ে বস। সিলেটের উত্তর অঞ্চলে পাহাড়িয়া উচু টিলার উপর ছিল তার রাজ প্রাসাদ। তার রাজ প্রাসাদ এমন ভাবে নির্মাণ করেছিলেন সেখানে বাইরের কোন শত্রু প্রবেশ করতে পারত না। সে এমন অত্যাচারী ছিল যে এক সময় অনুভব করতে পারলে যে আমার অসংখ্য শত্রু রয়েছে। তখন থেকে প্রসাদের চার পাশে পাহাড়ের গুহায় একদল অস্ত্রধারী প্রহরী নিযুক্ত করল যাতে করে কোন শত্রু রাজার উপর আক্রমণ না করতে পারে।

গৌর গোবিন্দের রাজ্যের এখানে সেখানে অসংখ্য মুর্তি ছিল। রাজা ও মন্ত্রী সভাসদগণ সকলেই সর্বদা উহার পূজা করিত। রাজা এমন ভ্রমের মধ্য নিপতিত ছিল যে সেই মাটির তৈরী মূর্তির আদেশ উপদেশ অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করত এবং রাজ্যও সেই অনুপাতে চালাত তিনি এমন মনগড়া সংবিধানের উপর প্রতিষ্টিত ছিল যে, তার অস্ত্রাগারে একটি বৃহাদাকারের ধনুক ছিল। ভ্রান্ত রাজা উহার মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করত।

এবার আসা যাক তার অত্যাচারের দিকে। গৌর রাজা অত্যাচারের দিক থেকেই বেশী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খ্যাতি লাভ করেছিল। সমস্ত শিহট্ট তিন ভাগে বিভক্ত করে তিনজন রাজা শাসন করত। তার মধ্য গৌর রাজ্যের শাসক ছিল গোবিন্দ তাইতো তার নাম হয় গৌর গোবিন্দ। তখন তার মন অত্যাচারী উৎপীড়নকারী শাসক অন্য কোথাও দৃষ্টি মান হত না। তার অত্যাচারের বিক্রমে সকল স্তরের জনগণ সর্বদা ভয়ে কম্পমান থাকত। তার অত্যাচারের কথা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কারো অজানা ছিল না।

এক সময় তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের উপর তার অত্যাচারের হাত বাড়াল। তারাও রক্ষা পেল না। রাজা গোবিন্দ শাসকনীতি পরিহার করে পশুত্বের আচরণের দ্বারা পার্শ্ববর্তী রাজ্য দখল করে নিজ রাজ্যকে বিস্তার করেন। শুধু তাই নয় এক সময় তার রাজ্যকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেছিল।

ওলিয়ে কামেল হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এর সিলেট আগমনের পূর্বে সারা শ্রিহট্টকে বিধর্মীরা দখল করেছিল। মুসলমানদের কোন অধিকার ছিল না। সকল শ্রেণীর জনগণকে অত্যাচারী রাজা মূর্তি পূজায় বাধ্য করত। এই কুআচরণ থেকে কেউই রক্ষা পেত না। সকলে ঘরে ঘরে গৃহ দেবী নির্মাণ করে উহার পূজা অর্চনা করত। সেখানে ১২ মাসে ১৩ পূজার সমরোহ ঘটত। যারা রাজার পায়রুবী করত তারা বেশ সুখে-শান্তিতেই বসবাস করতে পারত। কিন্তু মুসলমানরা তার অত্যাচারের কারণে তাদের ধর্ম পালনে সকলে ব্যর্থ ছিল। গোবিন্দের শাসনামলে সিলেট মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল কম। মাঝে মধ্যে যারা দু'চার জন ছিল তাদের দুঃখ যাতনার সীমা ছিল না। কোন মুসলমান স্বীয় ধর্ম পালনে প্রকাশ্যে কোন কাজ করলে বা গোপনেও কিছু করলে তাকে রাজ দরবারে হাজির করে তার উপর নানা নির্যাতন উৎপীড়ন করত। কোন স্থানে কোন মুসলান আযান দিলে কুকুরের মত লালায়িত হিন্দু গোষ্ঠীরা তাকে ধরে নিয়ে অত্যাচারী গোবিন্দের কাছে নিয়ে যেত। এক কথায় মুসলমানরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারতেন না। এমন কি কোন মুসলমান গরু জবাই করতে পারতেন না বা কোরবানীও করতে পারত না।

গোবিন্দের অত্যাচারে সকল মুসলমান অতিষ্ঠিত হয়ে উঠল। সকলেই একা একা ভাবতে লাগল যে আমার শক্তি থাকলে গোবিন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারী করতাম। ঈমানী চেতনা তাদের মধ্যে কম ছিল না, কিন্তু কারো একার পক্ষে রাজার বিরুদ্ধে কিছু বলার ক্ষমতা ছিল না। এমনকি কোন স্থানে রাজ সভায় হাজির করে নানা উপায়ে শাস্তি দিয়ে মারধর করে পাঠিয়ে দিত। উচ্চস্বরে আযান একামত দিতে পারত না। নামাজের সূরা বা কোরআন তেলওয়াত করতে পারত না। যারা ধর্মে আগ্রহী ছিল তারা সকলেই চায় যে স্বীয় ধর্ম পালন করি তারই মুসলমানরাও এদের থেকে ব্যতিক্রমধর্মী ছিল না। সকল মুসলমানদের মনেই ধর্ম পালনের আগ্রহ ছিল কিন্তু অত্যাচারী শাসক গোবিন্দের কারণে কোন মুসলমান তাদের ধর্ম পালন করতে পারত না।

বুরহান উদ্দির ফরিয়াদ ঃ রাজা গৌর গোবিন্দের শাসনামলে শ্রীহট্টের এক পাদদেশে পুন্যাত্মার অধিকারী শেখ বুরহান উদ্দিন নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ছিলেন। তার ঈানও ছিল অটল। তিনি যখন যুবক বয়সে উপনীত হলেন তখন অনেক জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসল। কিন্তু বুরহান উদ্দিন যেমন পাকা ঈমানদার ছিলেন তার বুদ্ধি বিবেচনাও ছিল অনুরূপ। অন্য কোন ব্যক্তির ঈমান সম্পর্কে না জনলেও কতগুলো নিদর্শন তার জানা ছিল তাই সে সেই নিদর্শন খুঁজে তার মত একটি পূর্ণবান মেয়েকে স্ত্রীরূপে বরণ করলেন। বেশ সুখে-শান্তিতেই কয়েকটি বছর কেটে গেল। বুরহান উদ্দিন ঈমানে যেমন ছিলেন পরিপূর্ণ ধনে-জনে-মানেও তেমনি ছিলেন পরিপূর্ণ।

সেহেতু স্ত্রীকে নিয়ে মহা শান্তিতেই দাম্পত্য জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু বুরহান উদ্দিনের যখন যুবক জীবন কেটে প্রৌঢ় অবস্থায় পৌছলেন তখনও কোন সন্তানের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুখ দেখার সৌভাগ্য হল না। এতদিন বেশ সুখেই কাটল। যখন সন্তানের চিন্তা মাথায় ঢুকল তখন কে যেন তাদের সুখের ঘরে দুঃখের আগুন জ্বালালো। এখন আর মনে শান্তি নেই। নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। অনেকেই বন্ধ্যা বলে আখ্যা দিল। এছাড়া অনেক কটুক্তির দ্বারা তাদের মন মগজ খারাপ করে তুলল। তিনিও চিন্তায় অধীর হলেন, আল্লাহ যদি আমাদের কোন পুত্র সন্তান দান না করেন, তাহলে আমার বংশ এখানেই শেষ। কারণ সংসারে সন্ধ্যাবাতী জ্বালাবার কেউ থাকবে না। তাই চিন্তায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন সন্তান লাভের কোন চেতনাই ছিল না আল্লাহর লীলা বোঝা ভার। প্রায় বৃদ্ধাবস্থায় তাদের মনে সন্তানের আকাংখা জাগল। বুরহান উদ্দিন ছিলেন খাঁটি ঈমানদার তাই সন্তান লাভের জন্য কৃত্রিম কোন পদ্ধতি না নিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন।

তাদের উভয়ের মন থেকেই কে যেন শান্তি কেড়ে নিল। এমন অবস্থার তারা পৌছল যে খাওয়া দাওয়ার প্রতিও তাদের তেমন খেয়াল নেই। দিন রাত শুধু সন্তান লাভের আকাংখা নিয়ে আল্লাহর শাহী দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। "হে আল্লাহ! তুমি অসীম। তোমার গুণ, মাগফেরাত, দয়া সব কিছুই অসীম। তোমার ধন ভান্ডার সব সময় পরিপূর্ণ। তুমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করতে পার। তাই আমি তোমার কাছে কোন ধন সম্পদ চাই না। যে উদ্দেশ্যে এই গভীর রাত্রে আমরা তোমার দরবারে হাত তুলেছি তোমার কাছে তা অজানা নয়। "হে মাবুদ! তোমার কাছেই আকুল আবেদন তুমি আমাদের মনের আশা পূর্ণ করে দাও।"

বুরহান উদ্দিন ও তার স্ত্রী দিনের পর রাত আবার রাতের পর দিন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। মহান দানশীল আল্লাহর কাছে মন খুলে কিছু চাইতে পারলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন। এক সময় দেখতে পেলেন তার স্ত্রী গর্ভধারণ করেছে। কিন্তু তিনি ফরিয়াদ থেকে বিরত হলেন না। এক সময় তিনি ফরিয়াদ করতে গিয়ে বললেন, "হে মাবুদ তুমি আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান কর। জানি তোমার দানের হাত খাট নয়। হে প্রভু তুমি আমাকে একটি পুত্র সন্দান দান করিলে আমি একটি গুরু কোরবানী কর তোমার রাস্তায় বিলিয়ে দিব।" আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করে একটি পুত্র সন্তান দান করলেন।

বুরহান উদ্দিনের মান্নত আদায় ঃ একথা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল যে শেখ বুরহান উদ্দিনের যুবক জীবনে কোন সন্তানাদি হয়নি। পরিশেষে তার প্রার্থনা আর্তনাদধত্ত মান্নতের প্রতফলে তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হল। এক সময় দেখা গেল পুন্যবর্তী স্ত্রী গর্ভধারণ করেছেন। এখন আর মনে আনন্দ ধরে না। কে দেখে সে আনন্দ? যে জন্য তারা উভয়ে চাতক পাখীর ন্যায় আশ্বস্ত ছিল, আজ সে আশা পূরণের পথে। তাইতো তিনি দান সদকার হাতকে প্রসার করবেন। গরীব-দুঃখী তার কাছে এসে আনন্দেই ফিরে যায়। কারণ সে সকল ভিক্ষুককেই বেশী বেশী দান করতেন। ক্রমশঃ দীন পেরিয়ে যায় আনন্দও বাড়তে থাকে, আবার আকাংখাও বাড়তে থাকে, কোন দিন দেখবে সন্তানের মুখ। অন্য দিকে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনাও করতে থাকলেন হে প্রভু! তুমি আমাকে একটি নেক সন্তান দান কর। এদিকে তার স্ত্রীর নির্দিষ্ট সময়ও ঘনিয়ে আসল। একরাত্রে তার স্ত্রী প্রসব বেদনায় অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু মনে ছিল তার অপার আনন্দ। সে যাই হোক কিছুক্ষণ পরে বুরহান উদ্দিনের অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করে এক নবজাত পুত্রসন্তান পদার্পণ করল। তাদের উভয়ের মনে আনন্দের সীমা রইল না। সকলকে তিনি মিষ্টি মুখ করালেন। যারা তাকে কটুক্তি করেছিল তাদেরকেও ডেকে সে আপ্যায়ন করবেন। বাচ্চার চতুর্দশ দিবসে তার অঙ্গীকার পালনের জন্য তার নিজের পালিত মোটা তাজা গরুটিই আল্লাহর নামে কোরবানী করে দিলেন। সমস্ত গোস্ত গরীব মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। শুধু তাই নয় গরীব মিসকিনদের জন্য এক প্রীতি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভোজেরও আয়োজন করেছিলেন। খুব আনন্দের সাথেই কোরবানীর কাজ সমাধা করেছিলেন।

গৌর গোবিন্দের ক্রোধ ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা ১৭০৯৯৯ টি মাখলুকাতকে মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কারও থেকে শ্রম নিয়ে কারও গোস্ত ভক্ষণ করে মানুষ উপকৃত হয়। গরু এমন একটি প্রাণী যেটার দ্বারা মানুষ শ্রম ও ভোগ করে এবং ইহার গোস্তও ভক্ষণ করে। যে সব প্রাণীর গোস্ত আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে গরুর গোস্ত ছিল অন্যতম। তবে বামপন্থী দু একটা ধর্মে গরুকে ভগবতীর ন্যায় মনে করে উহাকে পূজা করে থাকে। সেহেতু তাদের নিকট গরু জবেহ করে তার গোস্ত ভক্ষণ করা খুবই জঘন্য অপরাধ মনে করে।

আবার অনেকে গো প্রাণীকে মায়ের সমান মনে করে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকে। দুর্ধর্ষ পৌত্তলিক ও আচারনিষ্ঠ হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দও ছিল বাম পন্থী ভ্রান্ত দলের শামীল। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই খুব অত্যাচারী লোক তার উপর আবার এহেন জঘন্যতম অপরাধে যে কত পরিবর্তন হয়েছে সেটা বলাবাহুল্য। তিনি এক বার গো হত্যাকে রাষ্ট্রবিরোধি কাজ বলে ঘোষণা করেছিল যাতে করে কোন মুসলমান স্বীয় ধর্ম ঠিকভাবে পালন করতে না পারেন।

সে যাই হোক আল্লহর খেলা বোঝা ভার। ধর্ম প্রাণ বোরহান উদ্দিন একটি পুত্র সন্তান লাভ করে মহান প্রভুর কাছে কৃত প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য তার গৃহে পালিত সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট গরুটাই আল্লাহর নামে কোরবানী করে উহার গোস্ত গরীব দুখীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এদিকে যখন গোস্ত বন্টন করতে ছিলেন। তখন একটি পাখি এসে ছোঁ মেরে এক টুকরা গোস্ত নিয়ে গেল। আল্লাহর লীলা কে বুঝতে পারে? হতভাগা সে পাখিটি গোস্ত টুকরা খেতে পারল না। যখন গৌর গোবিন্দের রাজপুরীর উপর দিয়ে পাখিটি গোস্ত টুকরা নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন রাজপুরীর পূজামন্দিরের আঙ্গিনায় গোস্ত টুকরা পড়ে গেল। কথায় বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়। শেখ বোরহান উদ্দিনের পালাও তাই। খুব গোপন সতর্কের সাথে গো জবাই করে গোস্ত বন্টন করেছিল। তারপরও তার সুখের সংসার তাসের ঘরের ন্যায় বালুর বাধের ন্যায় ফসকে গেল। তার জীবনে নেমে আসে অশান্তির হাহাকার।

মহান আল্লাহ যে বোরহান উদ্দিনের কষ্টের মাধ্যমে এ বাংলার মুসলমান জাতিকে মুক্তি দেবেন তা কে জানত? গোবিন্দ যখন শিব পূজায় রত ছিল, ঠিক সেই সময় মন্দিরের সেবায়েত পূজারী দৌড়ে এসে পূজারী কাঁপতে কাঁপত বলে উঠল, মহারাজ সর্বনাশ হয়েছে, জাত, ধর্ম আচার-অনুষ্টান সব কিছু সর্বনাশ হয়েছে। বেঁচে থেকে আর কি লাভ? বামন ঠাকুরের চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। এবার গৌর গোবিন্দ বামন ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলল তুমি অমন কর না, কি হয়েছে বামন ঠাকুর খুলে বল। বামন ঠাকুর তখন কম্পিত কণ্ঠে বলল, মহারাজ আমরা যাকে ধর্মে মা বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করি সেই গো মাংস মন্দিরের আঙ্গিনায়। একথা মুখে আনলেও নরকে যেতে হবে। ঠাকুরের কথা শেষ না হতেই সে গর্জে উঠল বলল, অসম্ভব আমরা রাজ্যে এমন কাজ করার সাহস কে পেল? তখন বামন তাকে সেখানে নিয়ে পড়ে থাকা গোস্তের টুকরাটি দেখাল। সাথে সাথে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। বামন ঠাকুর বলল, নিশ্চয়ই কোন মুসলমানই এ কাজ করার সাহস পেয়েছে। গৌর গোবিন্দ রেগে বলল, মোসলমান? কোথায় সে মুসলমান আমার রাজ্যে বসে এতবড় জঘন্য অপরাধ। কোন মুসলমানের বাচ্চায় সাহস পেল? তখনই রাজা তার লোক লস্করকে ডেকে পাঠাল কে সেই অপরাধী মুসলমান। মুহূর্তের ভিতরে আমার সম্মুখে হাজির কর। নিজ হাতে আমি তাকে শায়েস্ত করব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেই হুকুম সেই কাজ। রাজার লোক লস্কর সকলে রাজ্যের অলি গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক খোঁজা খুঁজির পর সংবাদ পেল যে শেখ বোরহান উদ্দিনই এই কাজ করেছে। এবারে সেখানে গিয়ে কয়েকজন লোক গিয়ে বোরহান উদ্দিনকে ধরে নিয়ে রাজ দরবারে হাজির করল। গোবিন্দ গর্জে উঠে বোরহান উদ্দিনকে জিজ্ঞেস করল, কেন তুমি এহেন কাজ করেছ? কে তোমাকে এমন কাজ করার সাহস দিল। তখন বোরহান উদ্দিন তার সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। অত্যাচারী গোবিন্দ ইহা শুনে আরো ক্রোধে ফেটে পড়ল। বলল একটি ছোট শিশুর মঙ্গলের জন্য এহেন জঘন্যতর অপরাধ করতে সাহস পেলে। আজ আর তোমার রক্ষা নেই।

এদিকে পাপিষ্ঠ নরাধম বোরহান উদ্দিনের সেই অনেক দিনের চাওয়া পাওয়া আকাংখিত নবজাত শিশুকে রাজ দরবারে আনার জন্য আদেশ করল। নিষ্টুর লোক গিয়ে বোরহান উদ্দিনের ঘরে হাজির হল। নির্দয় লোক গুলো গিয়ে বোরহান উদ্দিনের স্ত্রীর কোল থেকে মায়ের বুকের ধন সেই নবজাত শিশুটাকে কেড়ে নিয়ে এল। এবারে রাজার হুকুম জারী হল। বোরহান উদ্দিন যে ভাবে আমাদের ধর্মের অবমাননা করে গো জবাই করে মাংস টুকরা টুকরা করেছে সেই ভাবে তার সন্তানকে হত্যা করে টুকরা টুকরা করে পশুদের আহার বানিয়ে দাও। জল্লাদ আগে এসেই রাজ দরবারে হাজির হয়েছে। যখনই গৌর গোবিন্দ এই হুকুম করল জল্লাদও সংগে সংগে প্রস্তুতি নিয়ে সেই বোরহান উদ্দিনের আকাংখিত বস্তু তথা নবজাত সন্তানকে হত্যা করে ফেলল। এদিকে বোরহান উদ্দিনের উপর যখন এরূপ কঠোর নির্দেশ জারী হল, তখনই তিনি জ্ঞান বুদ্ধি হারা অচেতন নির্বাক হয়ে কাঠের পুতুলের ন্যায় দাড়িয়ে রইলেন। তিনি ভাল মন্দ বিচার করার শক্তিও হারিয়ে ফেললেন। তার সম্মুখে সেই আদরের সন্তানকে হত্যা করা হলেও কিছু বলার শক্তি তার ছিল না। এখানের অত্যাচারী রাজার অত্যাচারের হাত ক্ষান্ত হল না। আরো সম্মুখ দিকে অগ্রসর হল। এবার রাজা বলল, রে-বোরহান উদ্দিন তুমি যে হাতে গো-জবেহ করেছ সে হাতিটিও কাটা যাবে। রাজার যেই কথা জল্লাদের সেই কাজ। সাথে সাথে নিষ্টুর জল্লাদ বোরহান উদ্দিনের হাত খানও কেটে দিল। উ! কি সে হত্যা কান্ড। সে কি বিভীষিকাময় মুহূর্ত। বোরহান উদ্দিনের অন্তরে দুঃখের ঝড় বয়ে গেল। দুঃখের অন্ত রইল না। তবুও অটল বিশ্বাসী বোরহান উদ্দিন দ্বীন থেকে বিচলিত হলেন না। তিনি হাত তুলে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, হে প্রভু! তোমার আশাই পূর্ণ হোক। তবে সকল অবস্থায় যেন তোমার উপর অটল বিশ্বাস রাখতে পারি সে তাওফিক আমাকে দান কর।

বোরহান উদ্দিনের গোবিন্দের উপর আক্রোশ ঃ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় গোবিন্দ যেমন ছিল অত্যাচারী তেমন ছিল নিষ্ঠুর। এবারে তার নিষ্ঠুর খেলার নিপাত হল। মাসুম অবুঝ শিশুকে হত্যা করার সময় শিশুর কাঁন্নায় আসমান জমিন স্তম্বিত হল। বাতাস নদীর স্রোত থমকে দাঁড়াল। পশুর কলগান রুদ্ধ হয়ে গেল। গাছ পালা সব ঝিমুতে লাগল। পৃথিবীর দিকে তাকালে মনে হত সারাবিশ্ব যেন শিশুর কাঁন্নায় করুণ সুরে সুর মিলিয়ে কাঁন্না জুড়ে দিল। বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ল। শিশুহারা মায়ের হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে গেল। মায়ের কাঁন্না আসমান জমি এমনি আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

কিন্তু পাপিষ্ঠ নরাধম গোবিন্দের অন্তরে মোটেই ব্যথার উদ্রেক হল না। বরং আনন্দই পেল। আল্লাহর লিলা বোঝ ভার। বোরহান উদ্দিনের আনন্দ যে ভাবে গোবিন্দ নষ্ট করে দিল। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামী ও গোবিন্দের আনন্দকে নস্যাৎ সেভাবে করে দিলেন।

বোরহান উদ্দিন তার পুত্র শোকে ভীষণ ভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি যেন একেবারেই নির্বাক হয়ে গেলেন। তার অন্তরও যেন ভেংগে চুরে চুরমার হয়ে গেল। এক সময় শেখ বোরহান উদ্দিনের চেতনা ফিরে এল। এবারে মানসিক চিন্তা ছেড়ে ঈমানী বলে বলিয়ান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন। ধর্ম পালনের জন্যই যদি নবজাত শিশুর তাহলে আমাকে এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। শিশুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বাবা তুমি সুখে ঘুমাও আমি তোমার প্রতি ফোটা রক্তের প্রতিশোধ নিব ইনশাল্লাহ। এক সময় তিনি প্রতিশোধের পথ বের করে সে পথে চলতে লাগলেন।

গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান ঃ গৌর গোবিন্দ বোরহান উদ্দিনের পুত্র হত্যা করার শেখ বোরহান উদ্দিন পুত্র শোকে শোকাতুর যে পথ চলতেছেন আর গোবিন্দের প্রতিশোধ নেওয়ার পথ খুঁজতেছেন। এক সময় বুদ্ধি আটলেন গোবিন্দের প্রতিশোধ নিতে হলে কোন মুসলমান বাদশার সাহায্য নিতে হবে। নচেৎ একার পক্ষে কিছুতে তা সম্ভব হবে না।

তখন বাংলার রাজধানী ছিল সুবর্ণ গ্রমে। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন সামসউদ্দিন আহমেদ। বোরহান উদ্দিন সুলতানের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর কাছে বোরহান উদ্দিনের পুত্র শোক ও সকল মনের দুঃখ খুলে বললেন। শামস উদ্দিন বোরহান উদ্দিনের দুঃখের কথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। গর্জে উঠে বললেন, গোবিন্দের প্রতিশোধ নিতেই হবে। নরাধম পাপিষ্ঠ গৌর গোবিন্দকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর সুযোগ্য পুত্র সিকান্দার শাহকে সেনাপতি করে একদল সৈন্য বাহিনী পাঠালেন। শ্রীহট্টের পাহাড়িয়া গিরিপথ ধরে গৌর রাজধানীর দিকে চলতে লাগলেন। এদিকে দুরাত্মা গৌর গোবিন্দ সিকান্দার শাহের কবল থেকে মুক্তির জন্য একদল তিরান্দাজ বাহিনীকে গিরি পথের পাশে পাঠালেন। যখন মুসলিম সেনারা পথ চলতে ছিলেন হঠাৎ দুর্বত্তেরা তাদের উপর আকস্মাৎ হামলা চালিয়ে সেনাদলকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। এর পর সেকান্দার ব্যর্থ হয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। কিন্তু গৌর গোবিন্দের প্রতিশোধ নেবার মনোবল হায়াননি। উহার জন্য তিনি পুনরায় বিরাট এক বাহিনী তৈরী করলেন। এর মধ্যে তার পিতা ইন্তেকাল করেন। হলেও তিনি নেবার ইচ্ছা বাদ দিলেন না। এদিকে গৌর গোবিন্দ গোয়েন্দর দ্বারা জানতে পেল যে তার বিরুদ্ধে আবার অভিযান শুরু হবে। এবারে বাঁচার কোন পথ খুঁজে পেল না। অবশেষে তিনি এক কৌশল এঁটে সেকান্দার শাহের কাছে দূত পাঠালেন যে আমি মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাই। এই প্রস্তবে সিকান্দার শাহ সম্মত হলেন। তার সন্ধির শর্ত ছিল যে আমি মুসলমানদের উপর কোন অত্যচার-অবিচার করিব না। তাদের ধর্ম কর্মের উপর হস্তক্ষেপ করব না। বরং তাদের ধর্ম পালনের জন্য রাজ দরবারে একখানা মসজিদ নির্মাণ করে দিব। যাতে করে মুসলমানরা ঠিকভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে।

ধর্ম পরায়ণ সিকান্দার শাহ তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে তার অভিযান ক্ষান্ত রাখলেন। এতে বোরহান উদ্দিনের মনে শান্তি ছিল না। তার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল। তিনি সেকান্দার শাহের দ্বারা তেমন ফল না পেয়ে অন্য উপায় খুঁজতে লাগলেন। কিভাবে গোবিন্দের প্রতিশোধ নেয়া যায়। এর পর দ্বিতীয় পথ ধরে চলতে লাগলেন। তিনি ধর্ম পরায়ণ সুলতান ফিরোজ শাহ-এর দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি তার মনের সকল দুঃখ ব্যাথা সুলতানের কাছে খুলে বললেন। তিনি বোরহান উদ্দিনের মুখে এমন কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। যে মুসলমানদের উপর এমন অত্যাচার। তিনি ব্যথিত হবেনই বা না কেন? পাঠান আমলে তার মত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ অন্য কেউ ছিলেন না। এবারে তিনিও গৌর গোবিন্দের প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ হলেন। অপর দিকে পরগণার শাসন কর্তা নারায়নও মুসলমানদের উপর নানা উৎপীড়ন করত। তাই তার অত্যাচার অতিষ্টিত হয়ে সেখানের একজন মুসলমান ফিরোজ শাহের নিকট নালিশ করলেন। এবারে দুই দেশের অত্যাচারী হিন্দু দু'শাসকের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য সৈন্য বাহিনী গঠন করলেন। তিনি ইসলাম ধর্মের ইহেন অবমাননা শুনে ক্রোধ অধীর উঠলেন। তিনি তাদের উভয়কে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য তার ভাগীনে সিকান্দার

গাজীকে গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য নির্দেশ দিলেন। সিকান্দার গাজী মামার নির্দেশ পেয়ে সৈন্য বাহানী নিয়ে শ্রীহট্টের দিক যাত্রা করলেন। বোরহান উদ্দিনও তাদের সংগী হলেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে তিনি গন্তব্য স্থানে পৌছাতে পারলেন না। পথিমধ্যে তিনি বাঁধার সম্মুখীন হলেন। তখন ছিল বর্ষাকাল তাইতো সহসা ভীষণ ঝড় শুরু হল। সেই ঝড়ের ঠান্ডা অনেক সৈন্যই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। সিকান্দার গাজী তার অভিযানে সামনের দিকে আর অগ্রসর হতে পারলেন না। অনেক সৈন্য পথিমধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে মারাও গিয়েছেন। এ অবস্থা দেখে হতাশায় পড়ে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। অনেকে যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, তখন মৃত্যুর ভয়ে অনেক সৈন্য তার থেকে পলায়ন করে চলে গেল। যারা বেঁচে রই তারাও শক্তিহীন হয়ে পড়লেন।

এত বিপদের পরও তিনি নিরাশ হলেন না। তিনি পুনরায় দিল্লীর শাসন কর্তার নিকট দূত মারফতে তার বিপদের কথা জানালেন ও আরো কিছু সংখ্যক সৈন্য চাইলেন যাতে করে তার যাত্রাকে সফল করে তোলা যায়।

চির কুমার শাহজালাল ঃ যে সকল মহা মানব ধরার বুকে থেকে আল্লাহর প্রেম লাভে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ ছিলেন অন্যতম। আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দারা কোন দিন এই নশ্বর জগতে সংসার পাতাবার ইচ্ছা করেননি। হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এর জীবন ও ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবুও রক্ত মাংসে গড়া মানুষের সংগীনী নিয়ে জীবন চালাতে কার না ইচ্ছে হয়? হয়ত বা ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু শুধু আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ হয়েই তিনি জীবনের এ দিকটার প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।

অনেক সময় খুব সুন্দরী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রস্তাব আসত। কিন্তু কোন ক্রমেই তা তিনি গ্রহণ করেনি। কোন কোন সময় তার শিষ্যরা তার কাছে বিয়ে না করার কারণ জিজ্ঞেস করত। তারে উত্তরে তিনি একথাই বলতেন যে মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তার দায়িত্বই ঠিক ভাবে আদায় করতে পারিনি। সেহেতু আবার একটি বিয়ে করে সংসারের ঝামেলা মাথায় নেয়া উচিত মনে করি না। আবার তিনি শিষ্য সাগরেদরকে বলতেন তোমরা তো আমার বিয়ের জন্য বল, আসলে যার শরীর আছে, মাংস রক্ত আছে তার বিয়ের ও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমার সে শরীরই নেই এই যে দেহখানা দেখ এটাতো সম্পূর্ণ আল্লাতেই বিলীন করে দিয়েছি। অতএব, আমার বিয়ের প্রয়োজন হয় না। আর একবার হযরতের কাছে বিয়ের প্রস্তাব আসলে উহার উত্তরে তিনি বলেন, দুনিয়ার সকল অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে নারীরা তাই আমি সেই অমান্তির অতল গহবরে ডুবতে চাই না। চাই শুধু আল্লাহর প্রেম ও নৈকট্য। কোন মানুষের কাছে সংগীহীন জীবন যাপন করা খুবই কষ্টসাধ্য তাই বলে হযরত শাহজালালের বেলায় সেটা ঘটেনি। কারণ তিনি সদা সর্বদা আল্লাহকেই প্রকৃত সংগী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেহেতু বলা যায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে সংহীহীন দেখলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি সংগীহীন ছিলেন না।

তবে তিনি বিবাহ করেননি বলে সমাজে মোজাররাদ নামেও পরিচিত ছিলেন। ইহার অর্থ হল "চিরকুমার" তিনি দুনিয়ার লোভ-লালসা, ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের প্রতি কখনোই মত্ত হননি। তার জীবনের প্রধান কাজই ছিল জাহেলিয়াতের মধ্যে নিবদ্ধ জনগণের মধ্যে সুন্দর ও সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা। যারা অসৎ পথে চলে গেছে সৃষ্টি কর্তার কথা ভুলে গেছে তাদেরকে সৎপথে আনা।

আল্লাহর দেয়া এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি স্বীয় মায়ামমতায় বিজড়িত জন্মভূমিও ত্যাগ করেছেন এবং তার প্রচারের সঠিক জায়গাটা বেছে নেয়ার জন্য এশিয়া

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। পরিশেষে শ্রীহট্টেই হলো তার প্রকৃত ধর্ম প্রচারের স্থান। কোন এক সময় শীতের মৌসুমে হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ শীতে আক্রান্ত হয়ে বারংবার মুসলিম শাসক সেকান্দার গাজীকে জানালেন আমার জন্য শীতের একটা ব্যবস্থা করুন। এর জবাবে তিনি বললেন শাহজালাল শীতের দিনে শরীর গরমের জন্য একজন সুন্দরী নারী চান। রাজার যেই কথা উজিরদের সেই কাজ। সেকান্দার গাজীর হুকুমে একজন সুন্দরী নারীকে পালকিতে করে হযরত এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সংসার ত্যাগী হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ বললেন, হে সংসারসক্ত সেকান্দার গাজী! তুমি নিজেও এ নশ্বর জগতের মায়ায় অতল গহবরে ডুবেছ আর আমাকে ডুবাতে চাও। সেকান্দার গাজীর কারুকার্যে শাহজালাল বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি আমাকে এই নশ্বর জগতের মায়ায় ডুবাতে চাও এর চেয়ে তুমি একাই মর। আল্লাহর ওলির মুখে কথা কি আর বিফল যায়? এদিকে সেকান্দার গাজী পরমা সুন্দরীকে হুজুরের কাছ পাঠিয়ে নদীর ঘাটে বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে গেলেন। এদিকে হযরত যখন তাকে একাকী ডুবে মরার জন্য বললেন, সাথে সাথে সেকান্দার গাজী হোঁচট খেয়ে নদীতে পড়ে মারা গেলেন। এটা আল্লাহর ওলির অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া কিছুই নয়।

মহাসাধক হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহঃ নারী সংসর্গকে পছন্দ না করলেও তিনি নারীত্বের অবমাননা হতে দিলেন না। সে যাই হোক তিনি তার একনিষ্ট শিষ্য হাজি ইউসুফকে বললেন হে ইউসুফ! তুমি এই সুন্দরীকে বিয়ে করে নাও। হাজী ইউসুফও ছিলেন সংসার ত্যাগী তাই তিনি কোমল কণ্ঠে বললেন, ওহে হযরত! আমার নিজের ভরণ পোষণের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভরশীল তাই একে বিয়ে করে আবার কোন ঝামেলায় পড়ব? সে যাই হোক গুরুর কথা তিনি অমান্য না কর সেই পরমা সুন্দরীকে বিয়ে করলেন। বর্তমানে সেই শ্রীহট্টে শাহজালালের দরবার যার পরিচালনা করেছেন তারা সেই হাজী ইউসুফেরই বংশধর। পরিশেষে একথা বলা যায় যে, হযরত শাহজালাল চিরকুমার থেকেই আল্লাহর প্রেম লাভ করে জীবনকে ধন্য করেছেন।

শাহজালাল রহমাতুল্লাহ এর শেষ জীবন ঃ ওলিকুলের শ্রেষ্ঠতম সত্যের মহাসাধক হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ মহাসাধনার মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন আল্লাহর প্রেম। তাইতো মানুষ আজ তাকে স্মরণ করে ভক্তি করে। তিনি যেমন ছিলেন ওলিকুলের শিরোমণি সত্যের মহাসাধক ও ইসলাম প্রচারক তেমনি তিনি ছিলেন একজন জনদরদী সমাজ সেবক মহামানব। জনকল্যাণমুলক কাজের জন্যই তিনি আজ সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন। তিনি একথা জানতেন আল্লাহর সেবা করা মানেই তার সৃষ্ট জীব মানুষের সেবা করা। তাইতো তার সারাটি জীবনই জন সেবার লক্ষ্যে উৎসর্গ করেছেন। এমনভাবে তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য নিজেকে বিলীন করেছেন যে তিনি নিজের খাওয়া দাওয়ার কথাও ভুলে যেতেন। কিন্তু দুনিয়ার কোন সুখ-শান্তি তার অন্তরে স্থান পায়নি। তিনি সর্বদা এ নশ্বর জগতের মায়া মোহ-লোভ-লালসা, সুখ-শান্তি থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। যাতে করে আল্লাহর প্রেম বন্ধনের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। তিনি এমন কোন কাজ করতেন না যাতে আল্লাহ নারাজ হয়ে যান।

দিনের বেলায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতেন এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের সুখ সুবিধা দেখে তাদের মঙ্গলের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করতেন। অবসর পেতেন একটু রাত্রে। তাও তিনি বিছানায় শুয়ে আরামে নিদ্রা যাননি। সে অবসর সময়টুকও তিনি আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে কাটাতেন। তাইতো তিনি সকল প্রকার জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যখন ধর্মের ব্যাপারে আলোচনা করতেন তখন জনগণ বুঝতো তিনিই একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কার ও রাজনীতিবিদ ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুদক্ষ রাষ্ট্র পরিচালক। আবার যখন তিনি অর্থনীতির দিকে আলোকপাত করতেন, তখন সকলের মনে হত হযরত শাহাজালাল রহমাতুল্লাহ একজন অন্যতম অর্থনীতিবিদ কারণ তার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল ধর্ম নীতির সাথে রাজনীতি, অর্থনীতির সমাজনীতির সমন্বয়ে রাষ্ট্রকে সাধন ও প্রতিষ্টিত করা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তাই জীবন চলার পথে সর্বক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটাতেই ইসলাম সক্ষম। আর এ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদা। হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ ছিলেন রাসূলের সুন্দরতম পূর্ণ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেহেতু তিনি রাসূলের ন্যায়ই সকল কাজ করার চেষ্টা করতেন। ইসলাম যেমন ব্যাপক তিনি তেমনি ব্যাপক ভাবেই প্রচার করতেন। ইসলামকে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের মধ্যে সীমিত রাখেননি। শুধু কেবল কলেমা, নামাজ, রোজা হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ তাহলিল, মসজিদ ও খানকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। তিনি ইসলামের সকল নীতির উপর কড়া নজর রেখে সঠিক নীতির গুরুত্ব দান সহকারে ইসলাম প্রচার করেছেন।

ইসলাম শব্দের অর্থ ব্যাপক ভাবে পর্যালোচনা করে সেই ভাবেই প্রচার করতেন। তিনি সমস্ত জীবন এককেবারেই সাদাসিদের মধ্যে কাটিয়েছেন। বৃদ্ধাবস্থায়ও তার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু মানুষ হিসেবে দেহিক অবস্থা একটু দুর্বল হয়েছিল। তিনি তার জীবনে যাই কিছু করতেন। আল্লাহর রেজামন্দি হাসেলের জন্যই করতেন। তাইতো তিনি লাভ করেছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি।

হযরত শাহজালালের বিদায়ী ভাষণ ঃ একথা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল যে সকল ওলি আওলিয়ার ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে কিছু না জানলেও ইশারা ইংগীতের মাধ্যমেও নিদের্শনের মাধ্যমে ভবিষৎ সম্পর্কে কিছু অবগত হতে পারতেন। তাইতো হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ এক সময় বুঝতে পারলেন যে তার সময় শেষ হয়ে আসছে। জেসন্য তিনি সকল শিষ্য সাগরেদ, ভক্তবৃন্দ সকল অমুসলিম মুসলিমদেরকে ডেকে একত্র করে তাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দান করলেন।

তিনি তার ভাষণে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মানব সমাজ! তোমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস কর যে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নেই। তিনি কাকেও জন্ম দেননি বা কারো থেকে জন্ম নেননি। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সারা বিশ্বকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই প্রতিপালন করেন। তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য। আল্লাহ যখন ১৮ হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি করে মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত বলে আখ্যা দিলেন সে ভাবেই তো আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। তোমরা মনে রাখবে মানুষ সকলের চেয়ে সম্মান্তি তাই কোন মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন, এরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হিংসা করে ও মনে ব্যথা দিবে তার ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না।

একথাও তোমরা স্মরণ রেখ পৃথিবীর মানুষ পাপ পুণ্যে বিজড়িত। সেহেতু কোন মানুষকে পাপী বলে ডাকবে না। কারণ গভীর রাতের অন্ধকার যেমন আলোর পরশে বিদূরীত হতে পারে, তেমনি পাপী লোকেরাও পূণ্যবান লোকদের সংস্পর্শে এসে পূণ্যবান হতে পারেন। কোন মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার, মানুষে মানুষে বিবাদ ও ভেদাভেদ সৃষ্টি করা ইসলামে অমার্জনীয় অবরাধ আর এসবের মূলে হল নিজের জিহবা। এ সম্পর্কে রাসূলে মকবুল (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি স্বীয় জিহবা ও লজ্জাস্থান সংবরণ করবে আমি তার বেহেস্তের জামিন হব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব, বুঝা যায় যে, মানুষের জীবন চলার পথে লজ্জাস্থান ও জিহবাকে সংবরণ করতে হবে। নচেৎ জীবনে উন্নতির শিখরে আরোহন করা সম্ভব নয়। কোন দুঃখী গরীব দুঃখীদের সাথে কখনও কঠোর ব্যবহার করো না।

তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে। এবং তাদের সাহায্যের জন্য নিজেকে আত্ম নিয়োগ কর। প্রতিবেশী অনাহারে, অনিদ্রায় আর তুমি পেটপুরে খাবে এটা ইসলামে গর্হিত কাজ। কখনও ইসলাম তা পছন্দ করে না। সব সময় গরীবদের প্রতি খেয়াল রাখবে।

পাপ ছোট হলেও তাকে বড় মনে করে তা থেকে বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে ছোট হলেও তাকে বড় মনে করে তা আকড়িয়ে ধরবে। হাশরের ময়দানে তোমরা দেখবে সামান্য পাপের কারণেও মানুষ দোযখে যাবে আবার সামান্য সওয়াবের কারণে মানুষ বেহেস্তে যাবে। অতএব, খবরদার পাপের কাজ করাতো দূরের কথা পাপের পথেও পা ফেলবে না। উপস্থিত জনগণ হযরতের বাণী শুনে দুঃখে কাঁন্নায় ঢলে পড়লেন বুঝতে পারলেন যে হযরত শাহজালাল অতি শীঘ্রই আমাদের থেকে চির বিদায় নিবেন। শ্রীহট্টের জনগণ এবারে শোক সাগরে ভাসতে শুরু করলেন। সে যাই হোক পরিশেষে সকলকে নিয়ে হাতে তুলে দোয়া করলেন আয় আল্লাহ! আমি চলে যাচ্ছি তুমি আমার ভক্ত বৃন্দদেরকে সৎপথে চলার তৌফিক দান কর। এরপর তিনি সকলের গুণাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় সভা সমাপ্ত করলেন।

ইন্তেকাল ঃ প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর সাধ গ্রহণ করতে হবে। এ নশ্বর জগতে কেহই অমর হতে পারেনি। কোন নবী পয়গম্বর, ওলি আওলিয়া, রাজা বাদশাহ কেউই মৃত্যুর তুহিন পরশ থেকে রেহাই পায়নি। হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এর জীবনেও কোন বিপরীত হয়নি। এক সময় মহা তাপস হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এর ও মৃত্যুর ডাক এল। এ বিশ্বের বুক ঘোর তমসার অন্ধকার কেটে যখন আলোর দিশা পেল এ বাংলার মানুষ এহেন সন্ধিক্ষণেই সুবিশাল জীবনে মহাদায়িত্ব ভার পালন করে তার জীবনের সমাপ্তির রেখা টানলেন।

জনদরদী গরীবের বন্ধু মহাসাধক হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ ১৩৮৪ সালে জিলহজ্জ মাসের ২০ তারিখ সারা বাংলার মানুষকে শোক সাগরের অতল গহবরে ডুবিয়ে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে যান। ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন। মহা পুরুষ হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আজীবন নিষ্কাম কঠোর সাধনা সংযম ও পরিশ্রমের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছে। দুনিয়ার আবর্তে যখন তিনি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হলেন, তখনও কঠোর সাধনায় নিজেকে আত্ম নিয়োগ করেছেন। এত পরিশ্রম করায় শারীরিক দুর্বল হয়ে পড়াও ছিল স্বাভাবিক। এক সময় তিনি তার শারীরিক দুর্বলতাকে বেশী ভাবেই অনুধাবন করতে পারলেন এবারে আল্লাহর ওলি হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ বুঝতে পারলেন যে তার প্রস্থানের সময় এসে গেছে।

সেহেতু এক সময় হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ধনী, দরিদ্র, অসহায় দুঃস্থদের আহবান করলেন তাদের থেকে বিদায় নেবার জন্য এবার তিনি তার সুললিত কণ্ঠে জনতার উদ্দেশ্য বিদায়ী ভাষণ শুরু করলেন। তার ভাষণের প্রতিটি কথাই শ্রেতারা অনুধাবন করতে পারলেন বুঝতে পারলেন হুজুর আর বেশী দিন আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন না। তিনি কোন সম্প্রদায়ীকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কোন দল গোষ্ঠীর মধ্যে তার ওলিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। তাইতো উপস্থিত সকল ধর্মের সকল স্তরের মানুষ কাঁন্নায় ঢলে পড়ল। মনে হল দুনিয়ায় নেমে এসেছে এক শোকের অন্ধকার। শুধু মানব জাতিই নয় পশু পাখি, জীবন জানোয়া, গাছপালা, তরুলতা সকলেই যেন দুঃখের সাগরে ভেসে কাঁন্নায় ভেংগে পড়ল। সকলেই অনুভব করল তাদের প্রিয়জন দুনিয়ার বেশী দিন থাকবে না। সারা ময়দানে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুঃখের প্লাবন বয়ে গেল। ওলঠ পালট হয়ে গেল সকলের অন্তর। জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেল সকলের শরীর। সকলেই ধুকে ধুকে প্রার্থনা করতে লাগল হে প্রভু! এই রহমত আমাদের মাঝে আরো কিছু দিন বিদ্যমান রাখুন। আল্লাহর লীলাকে বুঝতে পারে। আল্লাহও তার প্রিয়বান্দা কে তার সান্নিধ্যে নেয়ার জন্য সঠিক সময়টি স্থির করে ফেললেন।

সে যাই হোক এক সময় বিদায়ী সভা ভেংগে গেল আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবারে তিনি স্বীয় হুজরায় ঢুকে ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। অনেকে তার হুজরায় ঢুকতে চাইলে হুজুর তাদেরকে নিষেধ করলেন কেইউ তার কাছে গেলেন না। লোকেরা দেখতে লাগল হুজুর হাত তুলে কি যেন বলছেন আর চক্ষু থেকে পানি বয়ে বক্ষদেশ ভিজে জমিনে পড়ছে। তিনি এমন মহাপুরুষ ছিলেন যে মৃত্যুর সময়ও নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের জন্য কাঁদেননি। এ বলেই তিনি ফরিয়াদ করেছেন হে প্রভূ! আমি আমার দয়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করতে পারছি কিনা এ ব্যাপারে নিজেই আমি সন্দিহান। তাইতো হে প্রভু তুমি আমাকে সকল অপরাধ ক্ষমা করে পরকালেও যেন তোমার প্রেম লাভ করতে পারি সেই তাওফিক দান কর।

এবারে তার শরীরের করুণ অবস্থা দেখে সবাই তার নিকটবর্তী হলেন। এভাবে বায়ুর গতিতে মহামতি আজরাইল হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এর কাছে আগমন করলেন। হযরত আবার বিষন্ন বদনে সকলকে দূরে যেতে বললেন। আবার সবাই একটু দূরে সরে গেল। কিছুক্ষণ পর সকলে শুনতে পেল হযরত শাহজালাল সুললিত কণ্ঠে কলেমা তাইয়্যেবা ও কলেমা শাহাদাত পাঠ করছেন। সকলে এ দুঃখময় ব্যাপারটা বুঝতে পারল কিন্তু কেউই তার হুজরায় ঢুকল না। সকলে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক সময় ধরে কোন টু শব্দটুকু নেই। এবার একজন ঢুকে দেখল হুজুর আর দুনিয়ায় নেই। দুধপায়ী সন্তানের ন্যায় তিনি চির নিদ্রায় শায়ীত হলেন। কেঁদে সকলে জারে জার হয়ে গেল। সারা বিশ্ব দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে কাঁন্নায় ভেংগে পড়ল। পশু পাখী গাছপালা ঝিমুতে লাগল।

সারা দুনিয়ায় নেমে এল ঘোর অন্ধকার। সকলের চোখেই সরষে ফুল ফুটল। শিষ্য সাগরেদরা এমন কাঁন্না শুরু করল দেখলে মনে হত যেন তাদের আপন জন পিতামাতা দুনিয়ায় থেকে বিদায় নিচ্ছে। দেশ-বিদেশ থেকে দলে দলে মানুষ এসে শেষ বারের মত দেখা করতে লাগল সিলেট বাসীরা হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ কে পেয়ে ধন্য হয়েছিল। তারা পেয়েছিল তার মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান। দেশের মানুষরা নামের পূর্বে লিখত শ্রী সেখানে আজ তারা লিখতে সক্ষম হল নামের শুরুতে মোহাম্মদ। সামাজিক জীবনেও তাঁর অবদান অপরিসীম। সেহেতু এক বাক্যে বলা যেতে পারে হযরত শাহজালাল ছিলেন সলেটের নবজীবনের জন্মদাতা। তাইতো তার মৃত্যুর শোক সংবাদ শুনে সিলেটের সকল স্তরের মানুষের অন্তরে শোকের ঝড় বইল। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় যে তিনি ১৩৫৪ খৃস্টাব্দে সিলেটে শুভ পদার্পণ করেন।

তবে তার জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়। মেন কোন এক ঐতিহাসিক বলেন, তিনি ১৩১৮ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৬২ বছর বয়সে ১৩৮০ খৃস্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় মত প্রকাশে কোন ঐতিহাসিক বলেন, ওলিয়ে কামেল হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ ১৩২২ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ৬২ বছর বয়সে ১৩৮৪ খৃস্টাব্দে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেন।

তবে একথায় সকল ঐতিহাসিকগণ যে একমত, তাতে কোন সন্দেহ নাই সেটা হল এই যে তিনি দুনিয়ার বুঝে ৬২ বছর বেঁচে থেকে জিলহজ্জ মাসের ৩০ তারিখে রোজ শুক্রবার ইহধাম ত্যাগ করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে যাই হোক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে বান্দার উপর সন্তুষ্ট থাকেন তার প্রতিটি কাজই সুফল জনক হয়ে থাকে। যার প্রত্যক্ষ উদাহরণ আমরা আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এর জীবনে দেখতে পাই। পবিত্র জুময়ার নামাজ বাদ ৫ সহস্রাধিক মানুষ জমায়েত হয়ে তার নামাজে জানাজা আদায় করেন। যুগে যুগে যে সকল মহাত্মা মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে তারা এই পাপাসক্ত পৃথিবীকে পা মুক্ত করে মানুষের মাঝে চির অমর হয়ে আছেন। মহাসাধক হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তাইতো আজো গোটা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে অসংখ্য মানুষ হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ-এর মাজার জিয়াত করার উদ্দেশ্যে সিলেটে আগমন করেন। আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমীন।

খাজা
নিজামউদ্দিন আউলিয়া
রহমাতুল্লাহ

জন্ম ও পরিচয় ঃ মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ হিজরী ৬৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরী ৭২৫ সালে এই পৃথিবী হতে চির বিদায় গ্রহণ যে, করেছিলেন। ঈসায়ী সালের হিসাব মতে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে। হিসেব করলে দেখা যায় যে, তিনি ৮৯ বছর এই জগতের ধুলায় অবস্থান করেছিলেন। এই ৮৯ বছরে তিনি রূহানী জগতে যে নবতর প্রাণ বন্যার জোয়ার এনেছিলেন এবং ধর্মসম্মত কার্যাবলী ও ঈমানের হেফাজতের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন, তা শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে নয় বরং মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র নতুন অনুরাগের পথ রচনা করতে পেরেছিলেন।

খোদা প্রেমিক ও আশেকানে রাসূলুল্লা (সঃ)-এর প্রতি তিনি এতই অনুরক্ত হয়েছিলেন যে, তিনি দিবারাত্রি আল্লাহ রাসূলের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এমন কি দ্বীন ও ইসলামের ব্যাপারেও জীবন উৎসর্গীকৃত করতে বিন্দুমাত্র অবহেলা করতেন না।

হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ যে একজন নির্বাচিত জীবন সন্ধানীই ছিলেন তা নয়, তিনি এবাদত বন্দেগীর দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্যও লাভ করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি জনসেবা ও ঐশী প্রেমর ক্ষেত্রে তৎকালীন জগতে তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। জাতি ধর্ম-গোত্র-নির্বিশেষে তিনি অগণিত মানুষেল সেবায় অহরহ ব্যাপৃত থাকতেন। সুতরাং ভারতবাসীদের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

শিক্ষা গ্রহণ ঃ জনক জননী ও আত্মীয় স্বজনদের আদর স্নেহে প্রতিপালিত হতে লাগলেন তিনি। ছেলেবেলাই কিশোর নিজাম উদ্দিন অন্য ছেলে পিলেদের চেয়ে একটু অন্য ধরণের বলে মনে হতে লাগল। শৈশব থেকে তাঁর মন মানসিকতা ধেকে পিতামাতা বুঝতে পেরেছিলেন এই ছেলে একদিন জগতের পুজনীয় ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হবে। তিনি ছোটকাল থেকেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর পিতা হযরত সাইয়্যেদ আহমদ রহমাতুল্লাহ দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে যখন চির বিদায় নিলেন। তখন নিজাম উদ্দিন আউলিয়া-এর ৫ বৎসর বয়স। তিনি পিতৃহারা বালক রূপে জীবন যাপন করিতে লাগলেন। মাতা জোলায়খা বিবি একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন। ঘর সংসারের কাজকর্ম সমাধা করা এবং প্রিয়পুত্রের লেখাপড়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যেভাবেই হউক তিনি পুত্রের এলমে দ্বীন শিক্ষা দিবেনই। তিনি ছেলেকে প্রাথমিক মক্তবে ভর্তি করে দিলেন। সর্ব প্রথমে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করলেন এবং হযরত মাওলানা

www.AmarIslam.com

আলাউদ্দিন উমুলীর নিকট ফিকাহ শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। একই সাথে মক্তবের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়সমূহের জ্ঞানও অর্জন করেন।

মক্তবের লেখাপড়া সমাপ্তি করার পর মায়ের আদেশানুসারে তাঁকে পাঠানো হল প্রখ্যাত কামিল ও শিক্ষাবিদ হযরত মাওলানা শামসুদ্দিন দামাগানী রহমাতুল্লাহ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য। প্রথম দর্শনেই মাওলানা শামসুদ্দীন রহমাতুল্লাহ সাহেব তাঁর প্রতি কেমন যেন অনুপম ও আকর্ষণ অনুভব করলেন। তিনি প্রথমে সবকেই বুঝতে পারলেন যে উক্ত ছেলেটির মধ্যে বিরাট প্রতিভা লুকায়িত আছে। তিনি সানন্দে নিজাম উদ্দিনকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করলেন। তখন ছিল প্রাচীনকাল। আর সেই সময়টায় ছিল দিল্লীর অধিস্বর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবান। তিনি মাওলানা শামসুদ্দিন দামগানী এর তাঁর পাণ্ডিত্য, কামালিয়াত ও বুযুর্গীর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের ন্যায্য মূল্য স্বরূপ তাঁকে 'শামসুল মূলক' উপাধিতে বিভূষিত করেছিলেন। ধর্মীয় শাস্ত্র ফিকাহ, উম্‌মূল আকায়েদ, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ হাদীস শরীফে উচ্চতর শিক্ষা লাভের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং তৎকালীন দিল্লীর সর্বশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ও হাদিস বিমারদ হযরত মাওলানা কামালউদ্দিন রহমাতুল্লাহ-এর খেদমতে হাজির হন এবং তাঁর সাহচর্যে হাদিস বিষয়ক কিতাবাদি অধ্যয়নে ব্রতী হন ও সুখ্যাতির সাথে জ্ঞানার্জন করেন। তখন হাদীস বিশারদ মাওলানা আহমদ তাবারিজির স্থানও ছিল অতি উচ্চে। তাঁর চেয়েও তিনি অধিক জ্ঞানী বলে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শুধুমাত্র হাদীস শরীফেই তার শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি একাধরে যেমনি একজন সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রকার ছিলেন তেমনি জ্যোতিবিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, তফসীর, বালাগত, উম্‌মূল ফিকাহ, আকায়েদ, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কেও বিভিন্ন মাশায়েখদের নিকট হতে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। একই সাথে তার তীক্ষ্ণ ধ্যান শক্তি প্রতুৎপন্ন সতিত্ব, অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতা মনজিলে মকসুদে পৌঁছে দিল। তাঁর মধ্যে কোনরূপ আড়ম্বর প্রিয়তা ছিল না। সবসময়ই তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। তাঁর অধাধ পাণ্ডিত্য সকলকেই বিমুগ্ধ করে তুলেছিল।

তরিকতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ ঃ মহান খোদা প্রিয় বান্দা মাহবুবে ইলাহী হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ এলমে জাহেরের সাথে সাথে এলমে বাতেনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, কিতাবী জ্ঞান কেমন যেন অপূর্ণ রয়ে গেল। জাহেরী ভাবে ধর্ম পুরোপুরি লাভ হয় না। তাই একমাত্র বাতেনের মাধ্যমেই কিছু আধ্যাত্ম সাধনায় গভীর মনোযোগের সাথে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি ভাবতেন কিভাবে এলমে বাতেনের পরিপূর্ণতা লাভ করা যায়, তজ্জন্য তিনি তৎকালী বাতেনের শিক্ষা লাভ করার জন্য শায়খ নাজিমউদ্দিন মুতাওয়াক্কিল রহমাতুল্লাহ দিল্লীর বিখ্যাত তাশতদার মসজিদের হুজরাখানায় অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন তদান্তীন সর্বশ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল হযরত বাবা ফরিদ উদ্দি গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ-এর ছোট ভাই। তরিকতের ক্ষেত্রে তিনি গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ-এর পথই অনুসরণ করে চলতেন।

অয্যোধ্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে তিনি হিজরী ৬৫৫ সালের ১০ই রজব তিনি শায়খ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ খানেকায় উপস্থিত হন। তাঁর খানকা শরীফ ছিল অয্যোধ্যায়। রহমাতুল্লাহ হযরত শায়খ ফরিদ গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ-কে পরম শ্রদ্ধাভরে কদমবুসি করলেন। প্রথম পর্বেই যেন সোনার সোহাগার মিলন ঘটল। গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ-এর যা কিছু দেবার ছিল, এর সবই মাহবুবে ইলাহী রহমাতুল্লাহ কে দান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন। তিনি স্বীয় চারতফি টুপী পরিয়ে দিলেন। স্বীয় খড়ম জোড়া ও খেরকাত তাঁকে দান করলেন।

– উক্ত যে সমস্ত চারতফিওয়ালা টুপি খড়ম তাঁর ছিল, ঐগুলো যে তাঁর কাছে অমূল্য রতন রূপে মনে হলো, তাঁর পর তিনি বললেন, 'আল্লাহর যে নেয়ামত আমার কাছে ছিল তা কাকেও দান করার কথা আমি ভাবছিলাম। পরক্ষণেই তিনি ভাবছিলেন হিন্দুস্থানের বেলায়েত কাকে দেয়া যায়, এ নিয়েও চিন্তা ভাবনার অন্ত ছিল না। এমন সময় গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে জানানো হল 'ধৈয্য ধর, নিজামউদ্দিন আসছে, হিন্দুস্থানের বেলায়েত তাঁকেই দান কর। এই রূপ ভাবেই হযরত নিজামউদ্দিন তার ওস্তাদের কাছ থেকে এলমে মারেফাতের বেলায়েত লাভ করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে মনোনিবেশ করিলেন।

মুর্শিদের দরবারে গিয়ে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা নিলেন ঃ মুর্শিদের দরবারে তিনি মারেফাতের কামিলিয়্যাত হাসিলের বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি যে দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন তা ছিল সেকালের বিখ্যাত দরবার শরীফ। যার কথা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। যে হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে সর্দ সর্বদাই বিখ্যাত সাধক ও আউলিয়াদের পদাচারণে অলংকৃত ছিল এবং তাঁদের সকলেই সাধ্যত পবিত্র দরবারের কাজে থাকতেন, আর দরবারের কাজেই তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল প্রেরণা বলে মনে করতেন। সেখানে অত্যন্ত দীনহীন বেশে সামান্য পানাহার গ্রহণ করে তারা এলমে মারেফাতের তালীম ও তরবিয়াত দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতেন এবং আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মুহব্বত লাভের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতেন, মারেফাত আয়ত্ব করার জন্যে।

কথিত আছে যে, হযরত গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ-এর মুরীদগণের মাঝে বেশি সংবেদন ছিলেন মাহবুবে ইলাহী রহমাতুল্লাহ একদিনের ঘটনা। তার সেদিন বাজার করার কথা, এমনকি নিজের কাছেও পয়সা ছিল না, হযরত নিজামউদ্দীন ভাবলেন সামান্য লবণ বা লবণ ছাড়া কোন ক্রমেই খাওয়া যাবে না। সেই জন্য তিনি অপর এক পীর ভাইয়ের কাছ হতে কিছু পয়সা ধার গ্রহণ করে লবণ খরিদ করে তরকারী পাক করে, হযরত গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ-এর সামনে পরিবেশন করলেন।

উক্ত ঘটনা কিন্তু পীর সাহেবের অগোচরে সংঘটিত হয়েছিল। যখন খাদ্য পরিবেশনের সময় হল, তিনি পীর কেবলা হযরত গঞ্জেশকর এর সামনে খাদ্য পরিবেশন করা মাত্রই তিনি বলে উঠলেন, আহার্য্য বস্তু প্রত্যক্ষ করে আমি জানতে পারলাম যে উক্ত আহার্য্য বস্তুতে অপচয়ের গন্ধ মিশে আছে। এই তরকারীতে ব্যবহৃত লবণ কোথা হতে সংগ্রহ করা হয়েছে?

মাহবুবে খোদা হযরত নিজামউদ্দীন রহমাতুল্লাহ বিপাক পড়ে গেলেন, তিনি বিনীত ভাবে বললেন হুজুর লঙ্গর খানায় লবণ ছিল না। এমনকি আমার কাছেও কোন পয়সা কড়ি ছিল না, ঋণ গ্রহণ করে সামান্য লবণ কিনে তরকারী পাক করলে হযরত আপনি তরকারী খেতে পারবেন এই মনে করে লবণ কিনেছি, হুজুর বললেন ঋণ করা তরকারী কিছুতেই খাওয়া যাবে না। বরং এর চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। তিনি বললেন, এ তরকারী সবগুলো গরীব মিসকিনদের মধ্যে দান করে দাও।

মাহবুবে খোদা হযরত নিজামউদ্দীন রহমাতুল্লাহ তৎক্ষণাৎ উক্ত তরকারীগুলো ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। তিনি জীবনে এরূপ কাজ আর করবেন না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। এবং আল্লাহর দরবারে তওবা করে মুনাজাত করলেন। এই তওবার কথা শুনে পীর কেবলা খুশী হয়ে স্বীয় আসনের কম্বল খানি হযরত মাহবুবে ইলাহী রহমাতুল্লাহ কে দান করলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হিজরী ৬৫৫ সালের ১০ই রজব হতে পরবর্তী সালের ২রা রবিউল আউয়াল পর্যন্ত তিনি তালিম, তারবিয়াত ও তাওয়াজ্জুত গ্রহণ করে ছিলেন। ১০ই রজব হতে পরবর্তী সালের ২রা রবিউল আউয়াল পর্যন্ত একটি বছর পর্যন্ত হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ স্বীয় পীর ও মোর্শদে কামেল হযরত শায়িখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ এর দরবারে অতিবাহিত করেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি রিয়াজত ও মোজাহাদার মাধ্যমে উত্তরোত্তর উন্নত স্তরে সমুন্নত হয়েছিলেন।

ওয়াদা পালনে তিনি ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক ঃ মহান রাব্বুল আলামীনের অলীগণ কৃত অঙ্গিকারের প্রতি সর্বদাই ছিলেন সতর্ক। কারণ তারা এ জগতকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন এবং এ জগতকেই একমাত্র মুক্তির পথ বলে স্বীকার করেন না। এ জগতকে তারা সাধারণ জীবনে অর্থাৎ জীব আত্মার আবাস স্থান হিসেবে মনে করেন, কিন্তু সাধক জীবন আরম্ভ হবে মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী। কাজেই প্রথমতঃ ব্যক্তি কেন্দ্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এখানে বলা হয়েছে জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করার কথা।

প্রথম ভাগ বলতে ব্যক্তি কেন্দ্রিক দায়িত্ব কর্তব্য। এবং দ্বিতীয়ত ঃ সমষ্টিগত বা সামগ্রিক দায়িত্ব। ওয়াদা পালন ব্যক্তি দায়িত্ববান ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। ওয়াদার বরখেলাপ জীবনে যেমন নানা রকম অসুবিধা দেখা দেয়। তেমনি সমষ্টিগত সমাজ ও জাতীয় জীবন এর ক্ষতিকর প্রভাব কোন অংশেই কম হয় না। সুতরায় এর পরিপ্রেক্ষিতে আল কুরআনে ও সহী হাদিসে ওয়াদা পালনের প্রতি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। এমন কি ওয়াদা ভঙ্গ করার কুফল সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি সর্বাগ্রে ওয়াদা পালনের পথ বেছে নিতেন। অন্যথায় প্রয়োজনবোধে অন্যান্য কাজকর্মে মনোনিবেশ করতেন।

দিল্লীর সম্রাটদের অনেকেই মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিজামউদ্দীনের মুরিদ ছিলেন। সম্রাটের পুত্র শাহাজাদা খেজেরখাঁও হযরত নিজামউদ্দীন রহমাতুল্লাহ এর নিকট বয়াত গ্রহণ করেন। এ সকল আমীর শাহাজাদাদের সাথে মাহবুব ইলাহী রহমাতুল্লাহ যেমন ব্যবহার করতেন ঠিক তেমনি ব্যবহার একজন গরীব দুঃখীর সাথেও তিনি করতেন। ধনী গরীব উচু নীচুর কোন প্রভেদ তার দারবারে ছিলো না।

বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট এ যুগবরেণ্য আউলিয়া, নিজামউদ্দীন আউলিয়ার খানকাহর জন্য পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা সুনিদিষ্ট করেন এবং আমীর কাশেফ হাজের এর মাধ্যমে এ মহান আউলিয়ার নিকট প্রেরণ করলেন। আমীর কাশেফ হাজের উক্ত মুদ্রা নিয়ে হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ এর সন্দিধানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ পূর্বকৃত ওয়াদার কারনে আমীর কর্তৃক প্রদত্ত রৌপ্য মুদ্রার প্রতি মোটেও তাকালেন না। বরং পূর্ব ওয়াদা পালনের যাবতীয় উপক্রম তিনি গ্রহণ করলেন।

হযরত মাহবুবে ইলাহি রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি পূর্বকৃত ওয়াদা সংক্রান্ত কাজে খুবই ব্যস্ত আছি এ সময় অন্য কিছুর প্রতি নজর দেয়া আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা অপেক্ষা ওয়াদা পালনের মূল্য আমার নিকট বেশি আমি মনে করি, ওয়াদা পালন করা আটটি বেহেশত হতেও উত্তম।

বাদশাহের আমীর প্রদত্ত টাকা নিয়ে ফিরে গেলেন এবং টাকা পয়সা ও অর্থ কড়ির প্রতি হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার রহমাতুল্লাহ এর বীতশ্রদ্ধ ভাবের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। দিল্লীর সম্রাট এতে মোটেও বিরক্ত ভাব প্রকাশ করলেন না। বরং সহাস্য আনন্দে প্রেরিত রৌপ্য মুদ্রার তোড়া সযত্নে তুলে রাখলেন।

খাজা সাহেবের উপদেশাবলী ঃ (ক) অহংকার ধ্বংসের মূল ঃ এ বিশ্ব জগতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন। তিনি স্বীয় চারতফি টুপী পরিয়ে দিলেন। স্বীয় খড়ম জোড়া ও খেরকাত তাঁকে দান করলেন।

উক্ত যে সমস্ত চারতফিওয়ালা টুপি খড়ম তাঁর ছিল, ঐগুলো যে তাঁর কাছে অমূল্য রতন রূপে মনে হলো, তাঁর পর তিনি বললেন, 'আল্লাহর যে নেয়ামত আমার কাছে ছিল তা কাকেও দান করার কথা আমি ভাবছিলাম। পরক্ষণেই তিনি ভাবছিলেন হিন্দুস্থানের বেলায়েত কাকে দেয়া যায়, এ নিয়েও চিন্তা ভাবনার অন্ত ছিল না। এমন সময় গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে জানানো হল 'ধৈয্য ধর, নিজামউদ্দিন আসছে, হিন্দুস্থানের বেলায়েত তাঁকেই দান কর। এই রূপ ভাবেই হযরত নিজামউদ্দিন তার ওস্তাদের কাছ থেকে এলমে মারেফাতের বেলায়েত লাভ করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে মনোনিবেশ করিলেন।

মুর্শিদের দরবারে গিয়ে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা নিলেন ঃ মুর্শিদের দরবারে তিনি মারেফাতের কামিলিয়্যাত হাসিলের বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি যে দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন তা ছিল সেকালের বিখ্যাত দরবার শরীফ। যার কথা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। যে হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে সর্দ সর্বদাই বিখ্যাত সাধক ও আউলিয়াদের পদাচারণে অলংকৃত ছিল এবং তাঁদের সকলেই সাধ্যত পবিত্র দরবারের কাজে থাকতেন, আর দরবারের কাজেই তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল প্রেরণা বলে মনে করতেন। সেখানে অত্যন্ত দীনহীন বেশে সামান্য পানাহার গ্রহণ করে তারা এলমে মারেফাতের তালীম ও তরবিয়াত দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতেন এবং আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মুহব্বত লাভের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতেন, মারেফাত আয়ত্ব করার জন্যে।

কথিত আছে যে, হযরত গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ-এর মুরীদগণের মাঝে বেশি সংবেদন ছিলেন মাহবুবে ইলাহী রহমাতুল্লাহ একদিনের ঘটনা। তার সেদিন বাজার করার কথা, এমনকি নিজের কাছেও পয়সা ছিল না, হযরত নিজামউদ্দীন ভাবলেন সামান্য লবণ বা লবণ ছাড়া কোন ক্রমেই খাওয়া যাবে না। সেই জন্য তিনি অপর এক পীর ভাইয়ের কাছ হতে কিছু পয়সা ধার গ্রহণ করে লবণ খরিদ করে তরকারী পাক করে, হযরত গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ-এর সামনে পরিবেশন করলেন।

উক্ত ঘটনা কিন্তু পীর সাহেবের অগোচরে সংঘটিত হয়েছিল। যখন খাদ্য পরিবেশনের সময় হল, তিনি পীর কেবলা হযরত গঞ্জেশকর এর সামনে খাদ্য পরিবেশন করা মাত্রই তিনি বলে উঠলেন, আহার্য্য বস্তু প্রত্যক্ষ করে আমি জানতে পারলাম যে উক্ত আহার্য্য বস্তুতে অপচয়ের গন্ধ মিশে আছে। এই তরকারীতে ব্যবহৃত লবণ কোথা হতে সংগ্রহ করা হয়েছে?

মাহবুবে খোদা হযরত নিজামউদ্দীন রহমাতুল্লাহ বিপাক পড়ে গেলেন, তিনি বিনীত ভাবে বললেন হুজুর লঙ্গর খানায় লবণ ছিল না। এমনকি আমার কাছেও কোন পয়সা কড়ি ছিল না, ঋণ গ্রহণ করে সামান্য লবণ কিনে তরকারী পাক করলে হযরত আপনি তরকারী খেতে পারবেন এই মনে করে লবণ কিনেছি, হুজুর বললেন ঋণ করা তরকারী কিছুতেই খাওয়া যাবে না। বরং এর চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। তিনি বললেন, এ তরকারী সবগুলো গরীব মিসকিনদের মধ্যে দান করে দাও।

মাহবুবে খোদা হযরত নিজামউদ্দীন রহমাতুল্লাহ তৎক্ষণাৎ উক্ত তরকারীগুলো ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। তিনি জীবনে এরূপ কাজ আর করবেন না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। এবং আল্লাহর দরবারে তওবা করে মুনাজাত করলেন। এই তওবার কথা শুনে পীর কেবলা খুশী হয়ে স্বীয় আসনের কম্বল খানি হযরত মাহবুবে ইলাহী রহমাতুল্লাহ কে দান করলেন।

হিজরী ৬৫৫ সালের ১০ই রজব হতে পরবর্তী সালের ২রা রবিউল আউয়াল পর্যন্ত তিনি তালিম, তারবিয়াত ও তাওয়াজ্জুত গ্রহণ করে ছিলেন। ১০ই রজব হতে পরবর্তী সালের ২রা রবিউল আউয়াল পর্যন্ত একটি বছর পর্যন্ত হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ স্বীয় পীর ও মোর্শদে কামেল হযরত শায়িখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহ এর দরবারে অতিবাহিত করেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি রিয়াজত ও মোজাহাদার মাধ্যমে উত্তরোত্তর উন্নত স্তরে সমুন্নত হয়েছিলেন।

ওয়াদা পালনে তিনি ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক ঃ মহান রাব্বুল আলামীনের অলীগণ কৃত অঙ্গিকারের প্রতি সর্বদাই ছিলেন সতর্ক। কারণ তারা এ জগতকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন এবং এ জগতকেই একমাত্র মুক্তির পথ বলে স্বীকার করেন না। এ জগতকে তারা সাধারণ জীবনে অর্থাৎ জীব আত্মার আবাস স্থান হিসেবে মনে করেন, কিন্তু সাধক জীবন আরম্ভ হবে মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী। কাজেই প্রথমতঃ ব্যক্তি কেন্দ্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এখানে বলা হয়েছে জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করার কথা।

প্রথম ভাগ বলতে ব্যক্তি কেন্দ্রিক দায়িত্ব কর্তব্য। এবং দ্বিতীয়ত ঃ সমষ্টিগত বা সামগ্রিক দায়িত্ব। ওয়াদা পালন ব্যক্তি দায়িত্ববান ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। ওয়াদার বরখেলাপ জীবনে যেমন নানা রকম অসুবিধা দেখা দেয়। তেমনি সমষ্টিগত সমাজ ও জাতীয় জীবন এর ক্ষতিকর প্রভাব কোন অংশেই কম হয় না। সুতরায় এর পরিপ্রেক্ষিতে আল কুরআনে ও সহী হাদিসে ওয়াদা পালনের প্রতি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। এমন কি ওয়াদা ভঙ্গ করার কুফল সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি সর্বাগ্রে ওয়াদা পালনের পথ বেছে নিতেন। অন্যথায় প্রয়োজনবোধে অন্যান্য কাজকর্মে মনোনিবেশ করতেন।

দিল্লীর সম্রাটদের অনেকেই মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিজামউদ্দীনের মুরিদ ছিলেন। সম্রাটের পুত্র শাহাজাদা খেজেরখাঁও হযরত নিজামউদ্দীন রহমাতুল্লাহ এর নিকট বয়াত গ্রহণ করেন। এ সকল আমীর শাহাজাদাদের সাথে মাহবুব ইলাহী রহমাতুল্লাহ যেমন ব্যবহার করতেন ঠিক তেমনি ব্যবহার একজন গরীব দুঃখীর সাথেও তিনি করতেন। ধনী গরীব উচু নীচুর কোন প্রভেদ তার দারবারে ছিলো না।

বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট এ যুগবরেণ্য আউলিয়া, নিজামউদ্দীন আউলিয়ার খানকাহর জন্য পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা সুনিদিষ্ট করেন এবং আমীর কাশেফ হাজের এর মাধ্যমে এ মহান আউলিয়ার নিকট প্রেরণ করলেন। আমীর কাশেফ হাজের উক্ত মুদ্রা নিয়ে হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ এর সন্দিধানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ পূর্বকৃত ওয়াদার কারনে আমীর কর্তৃক প্রদত্ত রৌপ্য মুদ্রার প্রতি মোটেও তাকালেন না। বরং পূর্ব ওয়াদা পালনের যাবতীয় উপক্রম তিনি গ্রহণ করলেন।

হযরত মাহবুবে ইলাহি রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি পূর্বকৃত ওয়াদা সংক্রান্ত কাজে খুবই ব্যস্ত আছি এ সময় অন্য কিছুর প্রতি নজর দেয়া আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা অপেক্ষা ওয়াদা পালনের মূল্য আমার নিকট বেশি আমি মনে করি, ওয়াদা পালন করা আটটি বেহেশত হতেও উত্তম।

বাদশাহের আমীর প্রদত্ত টাকা নিয়ে ফিরে গেলেন এবং টাকা পয়সা ও অর্থ কড়ির প্রতি হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার রহমাতুল্লাহ এর বীতশ্রদ্ধ ভাবের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। দিল্লীর সম্রাট এতে মোটেও বিরক্ত ভাব প্রকাশ করলেন না। বরং সহাস্য আনন্দে প্রেরিত রৌপ্য মুদ্রার তোড়া সযত্নে তুলে রাখলেন।

খাজা সাহেবের উপদেশাবলী ঃ (ক) অহংকার ধ্বংসের মূল ঃ এ বিশ্ব জগতে

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যতগুলো ধ্বংসকারী উপাদান আছে তন্মধ্যে অহংকার ও গর্ব সবচেয়ে ক্ষতিকর। তার কারণ স্বরূপ মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে অহংকার বর্জনের জন্য বার বার তাকীদ করেছেন। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহ পাক অহঙ্কারীকে পছন্দ করে না।" হাদীস শরীপে আছে, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, "অহংকার মানুষকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে।" কাজেই এ অহংকার ও গর্ব করা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে কোন ব্যক্তি আধ্যত্ম সাধনায় যেমন উন্নতি লাভ করা যায় না তেমনি তার পতনও হয় অনিবার্য। আল্লাহপাকের আজাব এবং গজব অহংকারীর উপর অবশ্যই পতিত হয়ে থাকে। ফেরাউনের কাহিনী নমরূদ ও সাদ্দাদের কাহিনী এবং তাঁদের সমূলে বিনাশ হওয়ার যে কারণ লক্ষ্য করা যায় তা ছিল অহঙ্কার।

একান্তা ভাবেই মানুষের পক্ষে অহংকার ও অহমিকা নানা ভাবে প্রকাশ পেতে পারে। ধনবল, জনবল, বাহুবল এবং বুদ্ধি চাতুরতার তীক্ষ্ণতা অধিকাংশ সময় মানুষকে অহংকারী করে তোলে। যাহা হউক, অহংকার এর ছোঁয়া হতে বেঁচে থাকা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

(খ) আল্লাহকে পাওয়া খুবই কঠিন, অথচ আবার একেবারেই সোজা ঃ এখন বান্দা শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দাস বা গোলাম। গোলামের উচিত স্বীয় মনিবের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং বিনিময়ের মাধ্যমে বান্দার প্রতি আল্লাহ পাকের অশেষ বরকত ও রহমতের ধারা বর্ষিত হতে থাকে। ফলে বিনয়ী বান্দাহ তার মহামানব আল্লাহ পাকের রহমত ও বরকত লাভে ধন্য হয়। রসূলে পাক (সঃ) বলেছিলেন, তোমরা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর। কেননা, বিনয় এবং নম্রতার মাঝে পরিপূর্ণ সফলতা বিদ্যমান। দুনিয়ার জীবনে আমরা যে সকল লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য মনস্থ করে থাকি এগুলো যতখানি সহায়তা স্থান করতে পারে, তার চেয়ে সঠিক উপকারী সহায়ক উপাদান হল বিনয় ও নম্রতা। বিনয়ী লোকের কোন শত্রু থাকে না। কারণ তার সহজাত বিনয় শত্রুতা সাধনের পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়। সুতরাং ইহ-লৌকিক ও পরলৌকক যাবতীয় কর্মকান্ডে সফলতা অর্জন করতে হলে বিনয় ও নম্রতার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা একান্ত দরকার।

(গ) অনিষ্টের মূর কারণ সমূহ হচ্ছে রিপুর তাড়নায় গর্হিত কাজের ভিত্তমূর রচনায় কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ ও মাৎসর্য্যঃ এ বিশ্ব ভ্রামাণ্ডের মাঝে মানব দেহের যে সকল ইন্দ্রিয় রয়েছে তন্মধ্যে ছয়টি ইন্দ্রিয় খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে, ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে ঃ (১) চোখের দৃষ্টি শক্তি (২) কানে শ্রবণ শক্তি (৩) নাকের ঘ্রাণ শক্তি (৪) জিহবার আস্বাদন শক্তি (৫) ত্বকের স্পর্শ শক্তি ও (৬) দেহের জৈবিক তাড়না শক্তি।

উপরোক্ত ছয়টি শক্তি হতে যে সকল কুরিপু মানুষের মাঝে আত্ম প্রকাশ করে তা হলো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মৎসয্য। এ রিপুগুলো যখন কোনও মানুষের মাঝে শাখা প্রশাখা ও পত্রপল্লবে পরিব্যক্ত হয়ে উঠে, তখন তার স্বাভাবিক মানবীয় গুনাবলী লোপ পায় এবং সে ক্রমে ক্রমে পশু স্বভাব ধারণ করে। তজ্জন্য মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করেও সে আর মানবীয় সত্তারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। এ জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্যকে কঠোর সাধনার মাধ্যম অবদমিত করে তুলতে পারে। তা না হলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

এ আধুনিক ধরার বুকে মানুষ উছিলা স্বরূ রাজ্য ও রাজা কিংবা কোনও নেতার সংস্পর্শহীন ভাবে কোন ক্রমেই টিকে থাকতে পারে না। প্রতিটি মানুষের জন্য একটি আবাসভূমির দরকার এবং ভূখন্ডের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার রক্ষার জন্য একজন সুদক্ষ রাজা বা প্রশাসক থাকা একান্ত অপরিহার্য। তা না হলে রাজ্যে বির্শঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেয়া স্বাভাবিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আধ্যাত্মিকতার ভাষায় রাজ্য বলতে এখানে বুঝায় দেহকে এবং মন হল তার রাজা বা প্রশাসক। মনের কার্য প্রতিক্রিয়া অনুসারে দেহের যাবতীয় অঙ্গ প্রতঙ্গ পরিচালিত হয়। তাই দেহ রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে মনকে কঠোর সাধনার বা সংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অতএব, মানুষের চিত্তবৃত্তিকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার জন্য যে কঠোর প্ররিশ্রম ও সাধনার দরকার, তাকেই জেহাদে আকবার হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

ইন্তেকাল ঃ ঐতিহাসিকের মতে হিজরী সাত পঁচিশ সালের ১১ই রবিউল আওয়াল মাস। দিল্লীর আকাশে বাতাসে দেখ গিয়েছে কাল মেঘের ঘনঘটা। দীর্ঘ ৮৯ বছর দ্বীন ও ইসলামের খেদমতে অতিবাহিত করে খাজা মাহবুবে ইলাহী সুলতানুল আউলিয়া হযরত নিজামউদ্দীন রহমাতুল্লাহ মহান প্রভুর চূড়ান্ত সান্নিধ্যে উপস্থি হলেন। তার মৃতুল পর দিল্লী তথা মুসলিম জাহানের ভাগ্যকাশে নেমে এল মহাদুর্যোগ।

মাহবুবে এলাহি খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ এর ইন্তেকালের পর অগণিত লোকের ঢল নেমে আসল গিয়াসপুরে। সকলের মাঝেই কেমন যেন এক শোকের ছায়া, বেদনার সুর। কি যেন ছিল কি যেন নাই, কেমন যেন এক শোকার্ত হাহাকারের দিল্লীর আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল। দিল্লীর আনাচে কানাচে একই ক্রন্দন রোল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইল্লাহি রাজিউন।

হযরত খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ যতদিন এ পৃথিবীর বুকে জীবিত ছিলেন, ততদিন কেউ তার মর্যাদা, ফযিলত ও রূহানী জগতের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেবহাল ছিল না। তবে যারা তার সত্যিকারে মর্যাদা ও ফযিলত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাদের মোঝেই তার বিরোধ বেদনার সুর প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। যে দিকেই তাকানো যায়, সে দিকেই শুধু হাহাকারের বেদনার একান্ত বিলাপ।

কবি প্রকৃতই বলেছিলেন,

তোমার হৃদয়ে যে কি সুর ছিল
কাঁদিছে তাই মোর হিয়া,
পাষাণ ভেদিয়া প্রবাহিত ধারা
চির জনমের তরে ব্যথিত করিলে মোরে।

উপরোক্ত কবিতার ছন্দে অবশ্যই করুণ সুর এর আভাস পাওয়া যায়। সেই শোকের ছায়া নেমে এসেছিল সারা দিল্লীর বুকে, জনমনে আজ আর কোন শান্তি নেই, আনন্দ নেই, নেই কোন সাচ্ছন্দ্য, তার তুলনা করা যায় না।

কোন কোন বর্ননায় জানা যায় হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ ৮৯ বছর বয়সে রবিউল আখের চান্দের আঠার তারিখে হিজরী ৭২৫ সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যুর তারিখ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। যে, ১১ তারিখ এবং ১৮ তারিখের মাঝে প্রভেদ পাওয়া যায় তবে যাই হোক, তিনি যে তারিখেই মৃত্যুবরণ করুন না কেন তাঁর মহা প্রস্থানে সারা ভারতীয় উপমহাদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকলের মাঝেই যে শোকের ছায়া এবং বেদনার ধরা নেমে এসেছিল একথা বলার অবকাশ রাখে না। মাহবুব ইলাহি হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ এর মৃত্যুকষ্ট বা যাতনা প্রকাশ পাওয়ার পর দিল্লীর সুলতান তুঘলোক শাহ এবং বহু গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁর চিকিৎসার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু হযরত সুলতানুল আউলিয়া রহমাতুল্লাহ পার্থিব কোন চিকিৎসা কিংবা ওষুধের প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তিনি সর্বদাই আল্লাহ পাকের জিকির এবং স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন। জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী এবং হুকুম আহকাম পালন করার জন্য তিনি তৎপর থাকতেন। পৃথিবীর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন বস্তুর প্রতিই তার কোন আকর্ষণ ছিল না। এ জন্য সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত রাজ হেকিম যখন তার নিকট চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন, ভালবাসার ব্যথায় পীড়িত ব্যক্তির একমাত্র ওষুধ হলো আশেকের দিদার লাভ করা। এ ছাড়া কোন কিছুই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। একথা বলার পর রাজ হেকিম চলে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরই হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ এর প্রাণ বায়ু দেহ পিঞ্জর ছেড়ে অমর ধামে প্রস্থান করল।

এই মৃত্যুর ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সম্রাট মোহাম্মদ তুঘলক এবং হযরত রুকুনুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী গিয়াসপুরে ছুটে আসলেন। হযরত মাহবুবে এলাহি রহমাতুল্লাহ এর জীবদ্দশায় সম্রাট মোহাম্মদ তুঘলক কখনও তার দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি পান নাই। ফলে এ মহাপুরুষের মৃত্যুর পর তার অন্তিম ক্রিয়ার অংশগ্রহণ করতে সুযোগ লাভ করে নিজকে ধন্য মনে করেছিলেন। এবং তাঁর চেহারা মোবারক এক নজর দেখে পরম স্বস্তি লাভ করেছিলেন। অসিয়ত অনুসারে তিনি তাকে যেন খানকায়ে সম্মুখে যে একটি বিরাট পুকুর বিদ্যমান ছিল সেই পুকুরের মাঝখানে যেন মৃত্যুর পরে দাফন করা হয়। ফলে সম্রাটের নির্দেশে অগণিত লোক পুকুর ভরাট করার কাজে যোগদান করল। অল্প সময়ের মধ্যেই সুচারু রূপে উক্ত পুকুরটি ভরাট হয়ে গেল এবং হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ এর অন্তিম জানাযা স্বয়ং সম্রাটসহ দিল্লীর এবং আশপাশের সকল শ্রেণীর নাগরিকগণ অংশগ্রহণ করে রূহে মাগফেরাত কামনা করে তাকে চির বিদায়ে সমাহিত করলেন।

শেখ ফরীদউদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ

পরিচিতি ঃ হযরত শেখ ফরীদউদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ -এর আসল নাম মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর ইব্রাহীম। ফরীদউদ্দীন তাঁর ডাক নাম। 'আত্তার' ছদ্মনামে তিনি কাব্য সাধনা করতেন। এক সময় আতরের ব্যবসা করতেন বলে মুসলিম দুনিয়ায় তিনি ফরীদউদ্দীন আত্তার নামেই পরিচিত।

তাঁর জন্ম ৫১৩ হিজরী সনে। অবশ্য জন্ম-তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। মধ্য এশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ নিশাপুরে তাঁর জন্ম। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি একমত। চেঙ্গিস খাঁর বাগদাদ আক্রমণের সময় এক তাতারীর হাতে তিনি নিহত হন।

বাল্য ও কৈশোর জীবনে লেখাপড়া সম্পন্ন করে তিনি ওষুধের ব্যবসায় নিয়োজিত হন। এই সময়ের একটি ঘটনায় তাঁর জীবনধারার আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। একদিন তিনি তাঁর দোকানে কর্মব্যস্ত। এক ভিক্ষুক এসে দোকানে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ব্যস্ততার দরুন তিনি কোন রূপ সাড়া না দেওয়ায় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ভিক্ষুক আরও জোরে দ্বিতীয়বার ভিক্ষার দাবী জানায়। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না। তখন হতাশ হয়ে ভিক্ষুক বললেন, সামান্য পয়সা খরচ করতে তুমি এত কুণ্ঠিত। না জানি প্রিয় প্রাণটা দেওয়ার ব্যাপারে তুমি কিরূপ কর। ভিক্ষুকের কথাটি এবার কানে যায় ফরীদউদ্দীনের। বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি যেমন ভাবে প্রাণ দিবে, আমিও তেমন ভাবেই দিব? বটে! ভিক্ষুক বলল, আমি যেভাবে দিব, তুমিও সেভাবেই দিবে? দেখা যাক, বলে সে তৎক্ষণাৎ তার কাঁধের ঝুলি মাথার নিচে দিয়ে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে বার বার কলেমা তাইয়্যেবা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আবৃত্তি করতে থাকে। আর ঐ অবস্থাতেই সে মারা যায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেলেন ফরীদউদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ। ভিক্ষুকের দাফন কার্য্য শেষ করে তিনি তাঁর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় জিনিসপত্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে সংসার বিবাগী হয়ে যান। প্রচুর ভাবান্তর সৃষ্টি হয় তাঁর মনে। মানসিক প্রশান্তির সন্ধানে তিনি হাজির হন হযরত রুকনুদ্দীন আফাক রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। তাঁর কাছেই তিনি মারেফাত জ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেন। পরে হজ্জ যাত্রায় মক্কা শরীফে গিয়ে সেখানে তরীকতের শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে হযরত শেষ মাজদুদ্দীন বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-এর কাছে মারেফাত জ্ঞানে দীক্ষিত হন। আর সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করে উচ্চ তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী হন।

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে যা জানা যায়, তা এরকম– তাতারী দস্যুরা নিশাপুর আক্রমণ করে সেখানে অবাধ লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। হযরত ফরীদউদ্দীনও তাদের আক্রমণের শিকার হন। এক তাতারী যখন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত, তখন কোন একজন বললেন, এ দরবেশকে হত্যা না করে, তার বদলে আমার কাছ থেকে দশ হাজার মোহর নাও। সঙ্গে সঙ্গে ফরীদউদ্দীন বলে ওঠেন, মাত্র দশ হাজার মোহরের বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করো না। আমার দাম যে এর চেয়েও অনেক বেশী। আততায়ী প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। আরও বেশী অর্থ পাওয়ার লোভে সে তাঁকে নিয়ে পথে চলল।

কিছুদূর যাওয়ার পর অন্য একটি লোক তাঁকে বন্দী অবস্থায় দেখে তাতারীকে বলল, তুমি হযরতকে হত্যা না করে আমাকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে এক বোঝা খড় দিচ্ছি। এবার ফরীদউদ্দীন বললেন, হ্যাঁ, তাই দাও। আমার দাম এর চেয়েও কম। তাতারী বুঝল, তামাসা করা হচ্ছে। রাগে উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সে তখনই তাঁকে এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। এভাবে দস্যুরা মানুষের ইতিহাসে চির কলঙ্কিত হয়ে থাকল। অপর দিকে, যুগ যুগান্তের জন্য আলোকময় উজ্জ্বল পুরুষ হিসেবে মানুষের হৃদয়ে ও ইতিহাসের পাতায় বেঁচে রইলেন হযরত ফরীদউদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ। আতরের সে সুরভি তা থেকে কোনদিন উবে গেল না।

বিখ্যাত মসনবী শরীফে বিশ্বনন্দিত মরমী কবি আল্লামা হযরত জালালুদ্দীন রুমী রহমাতুল্লাহ শেখ আত্তারের প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এমনকি, তাঁর একটি কবিতাও সংকলিত করেন মসনবী শরীফ গ্রন্থে।

হযরত ফরীদউদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ সম্পর্কে হযরত জালালুদ্দীন রুমী বলেন, দেড়শো বছর পর আল্লাহ পাক তাঁর ওপর আপন জ্যোতি অবতীর্ণ করেন। মশহুর পারসিক কবি আল্লামা জামী বলেন, শেখ ফরীদউদ্দীনের বাক্যে অহাদানিয়াতের যে মাহাত্ম্য ও মারেফাতের গুঢ় রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তা অন্য কোন সুফী কবির কবিতায় মেলে না। কেউ কেউ বলেন, তাঁর রচিত পদ্য ও গদ্য গ্রন্থের সংখ্যা একশো চৌদ্দ– কুরআন শরীফের সূরার সমসংখ্যক। এ বিষয়ে গাজী নূরুল্লাহ শোসতরী রহমাতুল্লাহ-ও তাঁর রচিত গ্রন্থ মাজালেসুল মুমিনীনে অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁর রচিত তাযকিরাতুল আউলিয়া, মানতিকততায়ির, মুসবিতনামা, আসরারনামা, তাইসিরনামা, ইলাহীনামা, পেন্দেনামা, অসিয়ত, দীউয়ান, শারহুল কলব, খুশরুগোল খুবই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এইসব গ্রন্থ সারা বিশ্বে বিপুলভাবে আজও সমাদৃত হয়। এগুলির জনপ্রিয়তা কল্পনাতীত। বহু গ্রন্থকার বই কাটতির জন্য নিজের নামের বদলে শেখ ফরীদউদ্দীন রহমাতুল্লাহ-এর নাম ব্যবহার করেছেন, এও এক অভিনব ঘটনা বৈকি। নকল নামের গ্রন্থের মধ্যে একখানি হল লিসানুল হাকীকত– যা এখনও লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সু-রক্ষিত আছে।

'তাযকিরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যা লিখেছেন, তাতে তাঁর চারিত্রিক

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় অনায়াসে। নম্রতা ও বিনয়ের সে এক উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব ছিলেন তিনি। নিজেকে অত্যন্ত দীন, হীন ও নিকৃষ্ট বলে মনে করতেন তিনি। আর বিনম্রবোধের কারণেই তত্ত্ব-জ্ঞানী ও আল্লাহ-প্রেমী হিসেবে মানুষের মনে তিনি চিরজাগরুক হয়ে রয়েছেন এবং থাকবেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীও অভিনব। সর্বপ্রথমে উচ্চারিত হয়েছে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রশংসা ও প্রশান্তি। পরের বিষয়ে এসেছে খোলাফায়ে রাশেদীনের খ্যাতি-সুখ্যাতি। তারপর শুরু হয়েছে আসল বক্তব্য। কিন্তু ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। কাহিনীর নায়কেরা উপস্থাপিত হয়েছে পাখি রূপে। যেমন, হুদহুদ, তোতা, মোরগ, পায়রা, শানা, বুলবুল, বাজ ইত্যাদি।

কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে পাখিদের নিয়েই। যেমন– উল্লিখিত পাখিরা একদিন এক সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্য থেকে একজন বাদশাহ নির্বাচন করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এ পদের জন্য সর্বপ্রথম ছী মোরগের নাম প্রস্তাব করল হুদহুদ পাখি। কিন্তু তার প্রস্তাবে কেউ রাজি হল না। কার কী আপত্তি, তাও তারা খুলে বলল। আর প্রত্যেকের বক্তব্য গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনে গেল হুদহুদ। তারপর, একে একে সকলের কথা খণ্ডন করল। তখন সর্বসম্মতি ক্রমে ছী মোরগকেই তারা তাদের বাদশা নির্বাচিত করল। তারপর তার কর্মধারা সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে গ্রন্থকার প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। সাধারণতঃ তরীকতপন্থীদের মনে যে বিষয়গুলি জেগে ওঠে, সেগুলিকেই তিনি সংশ্লিষ্ট করেছেন এ গ্রন্থের মাঝে। এ ধরনের একখানি গ্রন্থ হল 'মানতিকুত তায়ির'। পবিত্র কুরআনের সূরা নমল থেকে গ্রন্থখানির নাম চয়ন করা হয়েছে।

কুরআনে হুদহুদ পাখির উল্লেখ আছে। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর প্রিয় পাখি হুদহুদ। বুঝতে পারা যায়, বুদ্ধিমত্তায় হুদহুদ পাখিই পক্ষিকুল শিরোমণি। আর হযরত ফরীদউদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ-ও তাঁর রচনামালায় হুদহুদকে এক বুদ্ধিদীপ্ত পাখি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। পাখি নয়, যেন এক তত্ত্ব-জ্ঞানী হিসাবে কথা বলছেন।

কবিতা রচনার ব্যাপারেও তিনি সমকালের বহু কবিকে ছাড়িয়ে গেছেন। যাঁকে অদ্বিতীয় বলা চলে। কেউ কেউ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রশ্নে তাঁর সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু তাঁর জীবন ও সাহিত্য ছিল সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ও সুন্দর তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর।

এ গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গ ঃ 'তাযকিরাতুল আউলিয়া'র গ্রন্থণা সম্পর্কে হযরত ফরীদউদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ আল্লাহ পাকের এবং তার পরে রাসূলে করীমের স্তুতি প্রশংসার পর লিখেছেন, পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের পরে সাধক দরবেশগণের কালামই সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশীল। কেননা সেগুলি আল্লাহর প্রেমের প্রাচুর্যে উজ্জ্বল, পার্থিব কলুষতা তাঁদের স্পর্শ করে না বলেই তাঁরা সর্বজন মান্য বলে আমি মনে করি।

সাধকগণের মধ্যে কেউ মারেফাতপন্থী, কেউ আল্লাহ প্রেমিক। কেউ কেবল একত্ববাদী। আবার কারও মধ্যে হয়তো সব বৈশিষ্ট্যগুলিই বিদ্যমান। কারও মধ্যে হয়তো বা রয়েছে সাধারণ ধরনের নিম্নস্তরের গুণাবলী।

যাই হোক, এই মহান প্রেমিকদের কাহিনী রচনার পেছনে তিনি কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি মনে করেন, কাজটি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এগুলি পাঠ করে পাঠকের জ্ঞানের প্রসারতা যদি বৃদ্ধি পায়, তবে তাঁর লেখকের জন্য শুভকামনা জানাবেন। আর তাতে তাঁর কবরও প্রশস্ত হতে পারে। একে নাজাতের ওসিলাও করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

যেমন– বুআলী দাক্কাককে প্রশ্ন করা হয়, মহান তাপসগণের প্রত্যক্ষ উপদেশ যখন পাওয়া যায় না, তখন তাঁদের বাণী কোন মাধ্যম দ্বারা শুনে কি উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি ইতিচাচক উত্তর দিয়ে বলেন, মহৎ লোকদের ঘটনা শুনলে শ্রোতার মনে সৎ সাহস ও আল্লাহর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। অহমিকা দূর হয়। ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ জাগে। কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ তা তার চোখ দেখতে পায়। শেখ মাহফুজ রহমাতুল্লাহ বলেন, নিজের মানদন্ডে কাউকে বিচার করো না। বরং আউলিয়াদের মানদন্ড ব্যবহার কর। তবেই তাঁদের মহত্ব ও নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়, সাধক দরবেশের গল্পগাথা শুনে বিশেষ কি উপকার হয়? বাগদাদী রহমাতুল্লাহ বলেন, এদের পবিত্র বাণীগুলি আল্লাহর সৈন্যের ন্যায়। এগুলি দুর্বল মনকে সবল করে। অন্তরে সাহস এনে দেয়। পাঠক এগুলি থেকে সাহায্য পায়। কুরআন শরীফে আল্লাহ বলছেন, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার কাছে নবী-রাসূলের কাহিনী বলছি। এতে আপনার মনে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হবে এবং আপনি মনে শান্তি লাভ করবেন।

হযরম মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, ধার্মিক ও ওলীদের জীবন কাহিনী আলোচনা মাহফিলে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়। আর এ রহমত প্রাপ্তির আশায় যদি কেউ দপ্তর বিছিয়ে দেয়, তবে যতদূর সম্ভব তিনি বিফল হবেন না।

এই বিপর্যয়ের যুগে তাপসগণের জ্যোতির্ময় জীবন মানুষকে সাহায্য করে। মৃত্যুর পূর্বে সৌভাগ্য অর্জন করে ধরাধাম থেকে বিদায় নেওয়া সম্ভব হয়।

হযরত ফরীদউদ্দীন রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি যখন কুরআন-হাদীসের পর তাপসগণের বানীকে উত্তম এবং কুরআন-হাদীস অনুযায়ী তাঁদেরকে উত্তম বন্ধুরূপে দেখতে পেলাম, তখন তাঁদের জীবনালেখ্যের বিষয় আলোচনা করতে আত্মনিয়োগ করলাম। যদিও আমি তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত নই, তবুও তাঁদের এই কাজকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলাম। কেননা হাদীসে রয়েছে, যে লোক যে দলের অনুসরণ করে, সে রোজ কিয়ামতে সে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বলেন, যে নিজেকে হাকীকত-পন্থী বলে প্রকাশ করে, তুমি তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখ, তার চরণধুলি গ্রহণ কর। কেননা, তার মনে যদি এ ব্যাপারে সাহস না থাকত, তাহলে সে এই দাবী না করে অন্য যে কোন বস্তুর দাবী করত।

হযরত আত্তার রহমাতুল্লাহ বলেন, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন করা জটিল ব্যাপার। তবে সাধক দরবেশগণের জীবন-কাহিনী তা বোঝার জন্য ভাষ্য গ্রন্থের কাজ করে। অতএব, তাযকিরাতুল আউলিয়া' নামক এ গ্রন্থখানি ইরান, ইরাক ও তুরস্কসহ বিরাট এলাকার ভাষাভাষীদের জন্য ফারসী ভাষায় রচনা করা হল।

একটি সর্ববাদী নীতি হল, কেউ কারও ইচ্ছা-বিরোধী কথা বললে সে তার ওপর এমন বিরক্ত হয় যে, রাগের বশে তাকে মেরে ফেলতেও পারে। অথচ কথাটা মিথ্যে। এখন সহজেই ধরে নেওয়া যায়, একটি মিথ্যে কথার যদি প্রভাব থাকে, তাহলে সত্য কথার প্রভাব শতগুণ বেশী হবে। আউলিয়াদের জীবন-কাহিনী শততায় সমৃদ্ধ। অতএব, এর দ্বারা মানুষ পুরোপুরি প্রভাবিত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তিনি আরও বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে মনে এই আশা পোষণ করে আসছি যে, সাধক-দরবেশগণের আলোচনা ছাড়া আর কোন আলোচনা শুনব না ও হযরত বু'আলী রহমাতুল্লাহ বলেছেন, আমার দু'টি ইচ্ছা। এক, কুরআন পাকের আলোচনা শোনা। দুই, পূণ্যবান লোকের সাক্ষাৎ লাভ করা। যেহেতু আমি এখনও মূর্খ, লিখতে পড়তে বলতে জানি না; আমি এমন লোকের খোঁজ করি, যে আমাকে আল্লাহর ওলীদের কথা বলবে, আর আমি তা নীরবে শুনে যাব। অথবা, আমি তাঁদের কথা বলব, সে তা চুপচাপ শুনবে। এছাড়া আমার আর কিছুই কাম্য নয়। সত্য বলতে কি, যদি জান্নাতেও তাঁদের বিষয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোচনা না হয়, তাহলে অধম বু'আলী তেমন জান্নাত লাভেও প্রত্যাশী নয়। হযরত আত্তার রহমাতুল্লাহ বলেন, আমারও মনের এই কথা।

হযরত ইউছুফ হামদানী রহমাতুল্লাহ-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়, এ যুগ চলে গেলে আল্লাহর ওলীগণ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন, তখন আমরা কি নিয়ে থাকব, বা তখন আমাদের অবলম্বন কি হবে, আমরা মনকে সান্ত্বনাই বা দেব কিসের দ্বারা? তিনি জবাব দেন, এঁদের জীবনীগ্রন্থ থেকে প্রতিদিন কিছু কিছু পাঠ করবে। আর ঐসব নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে দিন কাটাবে।

হযরত আত্তার রহমাতুল্লাহ বলেন, ওলী-আউলিয়াগণের প্রতি আমার আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছেলেবেলা থেকেই। তাঁদের অমূল্য বাণী মনে শান্তি ও তৃপ্তি দেয়। নিয়ম হল, মানুষ তার প্রিয়জনের সান্নিধ্য চায়। আর তা সম্ভব না হলে, তার আলাপ-আলোচনায় মগ্ন থাকতে চায়। এটা মানুষের চিরন্তন রীতি। বলা বাহুল্য, এরই ভিত্তিতে আমি তাপস-জীবনের ওপর এই গ্রন্থ রচনা করলাম। বিশেষ করে, যুগটাও এমন, যখন আল্লাহর প্রিয়জনদের বাণী অবলুপ্ত-প্রায়।

তাছাড়া কিছু কিছু লোককে সাধক-দরবেশের বেশে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত ওলী একেবারেই দুর্লভ। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ একদা আল্লামা শিবলী রহমাতুল্লাহ-কে বলেন, দেখ ! তামাম দুনিয়া খোঁজ করে কোন প্রকৃত ওলী পাও কিনা। পেলে কথা নেই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভালো করে ধরে থাক।

হযরত আত্তার রহমাতুল্লাহ আরও বলেন, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এ যুগে মানুষ অতিমাত্রায় পাপাসক্ত হয়ে আল্লাহর ওলীদের একেবারে ভুলে যাচ্ছে। এইজন্য তাঁদেরই স্মরণার্থে এই গ্রন্থ রচনা করে আমি এর নাম দিলাম 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' অর্থাৎ তাপস স্মরণিকা– যেন বিপথগামী মানুষ এ গ্রন্থ পাঠ করে তাঁদের কথা স্মরণ করে ও তাঁদের রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের কল্যাণ সাধন করতে পারে।

দরবেশদের জীবন-কাহিনীও মানুষের কিছু উপকার করে। যেমন–

(১) তাঁদের অমূল্যবাণী মানুষের মন থেকে পার্থিব লোভ, মোহ ও ভালোবাসা দূর করে।

(২) পরকালের চিন্তা-ভাবনাও দূরীভূত হয়।

(৩) হৃদয়ে আল্লাহ প্রেমের সৃষ্টি হয়।

(৪) তাঁদের কাহিনী শুনে মানুষ পরকালের সম্বল লাভে তৎপর হয়।

আল্লাহর প্রতি প্রেম-বেদনায় পূর্ণ আল্লাহপ্রেমীদের হৃদয়গুলির বাস্তব রূপটি উপলব্ধি করা যায়।

হযরত আত্তার রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি একান্তভাবে আশা করি যে, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ এই 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থখানির বদৌলতেই হয়তো আমাকে নাজাত দেবেন। সব রকমের নৈরাশ্যের মাঝেও অন্ধকারে হয়তো মুক্তির আলো দেখাবেন।

শেষ কথা

সবশেষে তিনি দয়াময় দাতা আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা জানান, হে প্রভু! আপনি আপনার নবী-রাসূল ও তাঁর প্রিয় তাপস-তাপসীগণের উসিলায় আপনার মনোনীত পূণ্যবানদের থেকে এ অধম দাসকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না, আপনার অনুগ্রহ-দৃষ্টি থেকে বঞ্চিতও করবেন না।

করুণাময় প্রভু আমার! আমি আপনার প্রিয় বন্ধুগণের এক অধম দাস। আপনার দরবারে তার কাতর প্রার্থনা, আপনি তার এ গ্রন্থখানাকে আপনার দীদার লাভের উসিলা করে দিন। প্রভু গো, জানি আপনি প্রার্থনা কবুলকারী। আল্লাহুম্মা আমীন, সুম্মা আমীন!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম
জাফর সাদেক
রহমাতুল্লাহ

পরিচিতি ঃ পরম করণাময়, অনন্ত দয়াময় মহান আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জন্য যে ধর্ম নির্দিষ্ট করে দেন, সেই সর্বোত্তম অবিনশ্বর ধর্মের বাণী বহন করে যুগে যুগে একদল অত্যুজ্জ্বল আলোকময় পুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত এবং প্রেরিত। এই আলোকবাহী দূতগণকে আমরা রাসূল বা নবী নামে আখ্যায়িত করি। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত আলোক অভিযাত্রীগণের এ যেন এক সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন অভিযাত্রা। যেন প্রতিযোগিতার পদ্ধতিতে তাঁরা ধারাবাহিক এসেছেন সমকালের মানুষের মাঝখানে। একজনের দৌড় যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে তিনি তাঁর হাতের দায়ীত্ব তুলে দিয়েছেন অন্য জনের হাতে। দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনিও তখন দৌড় শুরু করেছেন। তারপর পরবর্তী জনের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে তিনিও থেমে গেছেন।

দীর্ঘ অভিযাত্রার শেষতম ব্যক্তি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। তাঁর আপাতত যাত্রা-বিরতি ঘটেছে ১২ রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী। সোমবার সকালবেলা। ইংরেজী ৭ জুন, ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১। আপাতত- বিরতি বলেছি এই কারণে যে, রাসূলে কারীমের ইন্তেকালের পরেও আলোকাভিসার বন্ধ হয়নি। বন্ধ হবেও না কোন দিন ইনশাল্লাহ্। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই নূরের আগুন কখনও নিভবে না। রাসূলুল্লাহ যে জীবন- ধর্মের আদর্শ রেখে গেছেন, তাঁর সুযোগ্য সোনালী জ্যোতির্ময় উত্তরপুরুষের দল সে আদর্শ বুকে বহন করে এসেছেন যুগের পর যুগ।

তাঁর পরে পরেই যাঁরা তাঁর আদর্শিক জীবন বহন করেন, তাঁরা হলেন, অব্যবহিত আলোকিত অনুগামীর দল- সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তারপরে তাবেয়ীদের স্থান। আর এঁদেরই একজন হলেন ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ।

বংশ-ঐতিহ্য ঃ জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ এর কুনিয়াত আবু মুহাম্মদ। হযরত আলী (রাঃ)-এর সুযোগ্য বংশধর তিনি। অতএব সে হিসাবে রাসূলে কারীমেরও আহলে বায়ত তথা পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভূক্ত। বলা হয়েছে, প্রসিদ্ধ বারো জন ইমামের মধ্যে তিনিও একজন। বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। কোরআন ও ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। আর আমরা যাকে বলি এলমে মারেফাত- তাও তাঁর দখল ছিল অপরিসীম সমকালের সেরা। এ বিষয়েও প্রচুর তত্ত্ব-পূর্ণ বাণী তিনি রেখে গেছেন। অর্থাৎ শরীয়তও মারেফাত– দু'দিক দিয়েই তিনি প্রজ্ঞাবান ছিলেন।

আধ্যাত্মিকা ঃ তখন মুসলিম- দুনিয়ার খলীফা ছিলেন মনসুর বিল্লাহ। হিজরী চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে তিনি খলীফার কার্যভার গ্রহণ করেন। ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)–এর আলোকময় ব্যক্তিত্বের নাম-খ্যাতি, জনগণের ওপর তাঁর

বিশাল প্রভাব, তাঁর প্রতি জনগণের অঢেল ভক্তি ও ভালোবাসা খলীফাকে চিন্তাতুর করে তুলল। হয়তো ঈর্ষা। অথবা ভয়। কে জানে, হয়তো তিনিই একদিন খিলাফতের দাবী করে বসবেন। অথবা তাঁর ভক্তজনেরা মনসুর বিল্লাহর তখ্‌তে ইমাম জাফরকেই বসিয়ে দেবেন। অতএব আগে ভাগে সাবধান হওয়া দরকার। মনসুর বিল্লাহ একদিন তাঁর মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন– জাফর সাদেককে বন্দী করে দরবারে আনা হোক। তিনি তাঁকে হত্যা করবেন।

চমকে উঠলেন মন্ত্রীবর। এ কী কথা! সম্পূর্ণ নিরীহ, নির্দোষ আপনভোলা একটি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মানুষ। পার্থিব জীবনের ভোগ-লালসা পরিহার করে যিনি অবিরাম আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে বিভোর, খলীফাকে এমনটি করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! খলীফা অনড়। তিনি তাঁর আদেশ বহাল রাখলেন। অগত্যা মন্ত্রীবর ইমাম জাফরকে বন্দী করার জন্য বে'রিয়ে গেলেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

খলীফা তাঁর ভৃত্যকে বলে রাখলেন, জাফর সাদেক যখন দরবারে হাজির হবে, তখন আমার দিকে লক্ষ্য রেখো। আমি যখন আমার মাথার চুপি উঠিয়ে রাখব। আর তখনই এক কোপে তুমি তাঁকে দু'ফাঁক করে দেবে।

কিন্তু যাঁর হাতে মরণ, সেই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী আল্লাহর কী অপার মহিমা? জাফরকে দরবারে ঢুকতে দেখে খলীফার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। কী অপার্থিব আলোর দ্যুতি জাফররের চোখে মুখে! আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্ষমতাভিমানী খলীফা। এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। তারপর জাফর সাদেককে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়ে সিংহাসনে এনে বসালেন। কি করতে চেয়েছিলেন আর কি হয়ে গেল! মহামান্য খলীফা শুধু যে নিজের আসন ছেড়ে দিলেন তাই নয়, বসে পড়লেন মহাতাপসের পায়ের তলায়। কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, আপনার কি প্রয়োজন?

সাদেক রহমাতুল্লাহ উত্তর দিলেন, আমার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু প্রার্থনা, ভবিষ্যতে এভাবে আমাকে ডেকে এনে আমার সাধানার বিঘ্ন ঘটাবেন না।

মনসুর কথা দিলেন। না, আর কখনও তা হবে না। অতঃপর তিনি তাঁকে স্বসম্মানে বিদায় দিলেন।

ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ যেমনি এসেছিলেন সে ভাবে দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া তখনও শেষ হয়নি। বরং তা আরও সক্রিয় হল। তিনি বিদায় নিতেই খলীফা অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। আর খুব সহজে তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন না। অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। পর পর তিন ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গেল।

আত্মীয়-স্বজন ও সভাসদবর্গ হতবাক। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, কেউ বুঝতে পারলেন না।

অবশেষে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থাটা কেটে গেল। মনসুর চেতনা ফিরে পেলেন।

এবার তাঁকে সবাই ছেঁকে ধরলেন। এ কী অবস্থা হুজুর। কি হয়েছিল আপনার?

মনসুর তখন সুস্থ। স্বাভাবিকভাবে বললেন, যখন ইমাম জাফর আমার দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন আমি দেখলাম তিনটি বিষধর সাপ ফণা বিস্তার করে আমাকে বলছে, দেখ মনসুর, জাফর সাদেকের কোন ক্ষতি করার যদি চেষ্টা কর, তাহলে আমরা তোমাকে দংশন করব। ঐ ভয়ঙ্কর সাপের ভয়েই আমি অমন সুন্দর ব্যবহার করে তাঁকে বিদায় দিলাম। কিন্তু মনের সে ভয় এখনও কাটেনি। তাই ঐ ভয়ে মূর্ছা যাই। আল্লাহর পথের যাঁরা পথিক, তাঁর ধ্যানে যাঁরা মগ্ন, পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁদের এতটুকু অনিষ্ট করতে পারে না। অপরিমেয় খোদায়ী শক্তি তাঁদের রক্ষা করে চলে অনুক্ষণ। মহাসাধকগণ সেই শক্তির অধিকারী।

সমকালের আরও একজন বিখ্যাত সাধকের নাম হযরত দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ। একদিন তিনি এলেন ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। বললেন, হুযুর, মনে হয় আমার অন্তর মলিন হয়ে গেছে। কিছু উপদেশ দিন। হযরত জাফর রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ তাপস। আপনার উপদেশ কি প্রয়োজন?

দাউদ রহমাতুল্লাহ বললেন, হযরত! আপনি রাসূলুল্লাহর বংশধর। এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে আমাদের উপদেশ দেওয়া আপনার কর্তব্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তখন জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ জবাব দিলেন, শুনুন, শেষ বিচারের দিনে নানাজী (রাসূলে করীম) যদি প্রশ্ন করেন, তুমি কেন আমার তাবেদারী করলে না, তখন আমি কি উত্তর দেব, সেই ভয়েই আমি তটস্থ। মনে রাখবেন, বংশ দিয়ে কিছু হয় না, আমল বা সাধনা দরকার। আমলই মুক্তি আনে।

এবার দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ কেঁদে ফেললেন। ওগো মাবুদ! যাঁর দেহে নবী-নারীমের রক্তপ্রবাহ, যাঁর স্বভাব-চরিত্রে নবী চরিত্রের আদর্শ, যাঁর নানাজী প্রিয় রাসূল, যাঁর জননী ধর্মনিষ্ঠা আদর্শ নারী– সেই তাপস-প্রধান জাফর সাদেকই যখন আপন কর্ম সম্বন্ধে হতাশ এবং মুক্তির বিষয়ে উৎকণ্ঠিত, তখন দাউদ তায়ী আর এমন কী মানুষ যে নিজের কর্ম সম্বন্ধে গৌরববোধ করবে?

আর একদিন হযরত জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ তাঁর সহচর বন্ধুদের বললেন, এস, আমরা আজ সকলে শপথ নিই, রোজকিয়ামতে আমাদের মধ্যে যে মুক্তিলাভ করবে, সে আর সকলের গুনাহ মাফীর জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করবে। তারা বলল, হুযুর, যেখানে সুপারিশ করার জন্য স্বয়ং আপনার নানাজী উপস্থিত থাকবেন, সেখানে আমাদের এমন শপথের কি কোন দরকার আছে?

জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ বললেন, শোন, আমার নিজের ব্যাপারে ঐদিন তাঁর দিকে তাকাতে আমার লজ্জা হবে। তাই তোমাদের এমন প্রস্তাব দিয়েছি।

এ ধরনের প্রচুর ঘটনা হযরত ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ-এর জীবনে আছে। প্রতিটি ঘটনাই বর্ণনাবহুল, চমকপ্রদ, আলোচিত। আত্মনিবেদিত একটি মানুষের এ কাহিনী আমাদেরও আঁধার-হৃদয়ে আলো এনে দেয়।

হযরত জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ-এর জ্ঞানগর্ভ বাণী ও কর্মসমূহ ঃ ১. একবার হযরত জাফর রহমাতুল্লাহ বেশ দামী পোশাক পরে আছেন। তা দেখে এক লোক বিদ্রূপের সুরে বলেন, হুযুর, আপনি নবী বংশের লোক। আপনার পক্ষে এমন পোশাক পরিধান করা শোভনীয় নয়। জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ তাঁর হাতখানি টেনে জামার ভেতরে ঢুকিয়ে দেখালেন, জামাটি ভেতরে পুরু আর খসখসে। বললেন, আমার একটি জামা আটপৌরে, মানুষের মাঝে চলাফেরার জন্য। আর অন্যটি হল আল্লাহর দরবারে নামায আদায়ের জন্য।

২. একবার দুই মহাজ্ঞানীর মিলন হল। ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ ও ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ। জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলেন, জ্ঞানী কাকে বলে? জ্ঞানীর সংজ্ঞা কি?

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ-এর উত্তর, জ্ঞানী সে ব্যক্তি, যিনি ভালো মন্দের বিচার জানেন।

জাফর রহমাতুল্লাহ বললেন, একটি জন্তুও তা জানতে পারে। কেননা, যে তাকে আদর-যত্ন করে সে তার ক্ষতি করে না। অপর দিকে যে তার যত্ন-আত্মি করে না, বরং মার দেয়, সে তার ক্ষতি করে।

তাহলে এবার আপনি জ্ঞানীর সংজ্ঞা বলুন, জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ তখন বললেন, জ্ঞানী সে ব্যক্তি, যিনি দু'টি ভালো কাজের মধ্যে বেশী ভালোটি আর দু'টি খারাপ কাজের মধ্যে কম খারাপটি গ্রহণ করেন।

৩. একদিন এক লোক ইমাম জাফর রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, আপনার মধ্যে বাহ্য ও আন্তর উভয় গুণই আছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, আপনি যেন নিজেকে কিছুটা বড় মনে করেন।

সাধক সাদেক রহমাতুল্লাহ বললেন, শুনুন, আমার যা কিছু নিজস্ব গৌরব বা গর্ব সব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি মুছে ফেলেছি। তবে কিছু কিছু আল্লাহ প্রদত্ত গৌরব থাকে যা আপনা থেকে প্রতিভাত হয়। সেখানে মানুষের কোন হাত নেই। সুতরাং তাকে অহঙ্কার বা অহমিকা বলা চলে না।

৪. একবার জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ-কে ঘটনাচক্রে এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে কয়েকদিন বাস করতে হয়। লোকটির একটি টাকার থলে ছিল। সেটি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কিন্তু সে সন্দেহ করল, জাফর রহমাতুল্লাহ-ই সেটি নিয়েছেন। তাই শেষ পর্যন্ত সে তাঁর কাছেই টাকার থলের দাবী জানাল। জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ কোনরূপ প্রতিবাদ করলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কত টাকা ছিল? সে বলল, দু'হাজার। তিনি লোকটিকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন। আর দু'হাজার টাকাই দিয়ে দিলেন।

কিন্তু এর মধ্যে সে তার হারানো টাকার থলে পেয়ে গেল। তখন সে লজ্জিত, অনুতপ্ত হল। জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ-এর কাছ থেকে নেওয়া দু'হাজার টাকা ফেরত দেবার জন্য সে আবার তাঁর বাড়ীতে এল। কিন্তু জাফর সাদেক তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, আমি যাকে যা কিছু দিই, তাকে একেবারেই দিয়ে দিই। আর ফেরত নিই না। কাজেই ও টাকা আর নেওয়া যাবে না। বেচারা তখন আর কী করবে! অতগুলো টাকা নিজের কাছেই রাখতে হল। কিন্তু জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ-কে চিনতে লজ্জায় মরে যেতে লাগল সে।

৫. মহাতাপস চলেছেন একা একা। মুখে আল্লাহর নাম, যিকির। ঐ পথে আরও একটি দুঃখী মানুষ চলছিল। এক দরিদ্র পথিক। ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ-এর মুখে আল্লাহর নাম শুনে সেও দেখাদেখি জোরেশোরে আল্লাহ আল্লাহ বলতে বলতে তাঁর পেছনে পেছনে চলছিল। আল্লাহর নাম জপ করতে করতেই জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, ওগো প্রভু! আমার জামা-কাপড়ের যে কী অভাব, আপনি তো নিজেই তা দেখছেন। আমাকে একটি জামা দান করুন। আল্লাহ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর জামা তাঁর কাছে এসে গেল। আল্লাহর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি জামাটি গায়ে দিলেন।

পেছনের দরিদ্র পথিক বললেন, হুযুর, আমি তো আপনার যিকিরের সঙ্গী ছিলাম। অতএব যিকিরের ফল স্বরূপ আপনি যা পেলেন, আমাকেও তার ভাগ দেওয়া উচিত। আপনি তো আল্লাহর দরবার থেকে পেয়ে গেলেন। এখন আমাকে আপনার পক্ষ থেকে দিন। আপনার পুরাতন জামাটি আমাকে দান করুন। পথিকের কথা শুনে জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের জামাটি খুলে দিয়ে দিলেন। আর কৃতজ্ঞতায় বিগলিত, কৃতার্থ মুসাফির তাঁকে প্রাণভরে দোয়া করে চলে গেলে।

৬. একদিন এক লোক এসে ইমাম জাফর রহমাতুল্লাহ-কে বলল, আমি আল্লাহকে দেখতে চাই। আপনি তার ব্যবস্থা করুন। জাফর রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ কি মূসা (আঃ)-কে বলেননি, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না?

লোকটি বলল, সে তো মূসা (আঃ)-এর কথা। সে জমানা চলে গেছে। এখন শেষ নবীর যুগ। এখন তাঁর দ্বীন চলছে। আমরা তাঁরই উম্মত। বিশেষ করে আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহর উম্মতগণের মধ্যে কোন এক ওলী বলতেন, আমার অন্তর আমার প্রভুকে দেখেছে। অন্য আরেকজন ওলী বলেছেন, তাঁকে না দেখে আমি তাঁর এবাদত করছি না।

লোকটির কথাগুলো শুনলেন ইমাম জাফর রহমাতুল্লাহ। তারপর তাঁর ভক্তদের বললেন, এর হাত পা বেঁধে একে নদীতে ফেলে দাও। আদেশ পালিত হল। নদীর পানিতে পড়ে বেচারা কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, হে নবীর বংশধর! আমাকে সাহায্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করুন। কিন্তু না। তাকে কোন রকম সাহায্য করা হল না। তাকে কেউ পানি থেকে তুলেও আনল না। অবশেষে যখন সে তলিয়ে যাচ্ছে গভীর পানির তলায়, বাঁচার কোন আশা নেই, তখন সে বলে উঠল, হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচান। জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ এবার তাঁর অনুগামীদের বললেন, যাও, লোকটাকে এবার তুলে আন।

অতএব, তাঁর নির্দেশে তাকে তুলে আনা হল। একটু পরে সে যখন সুস্থ হলো, তখন জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ বললেন, কী! আল্লাহর দেখা পেয়েছেন? সে বলল, হুযুর! যতক্ষণ আমার চোখের সামনে যবনিকা ছিল, ততক্ষণ মানুষের সাহায্য চেয়েছি কিন্তু তা যখন দূর হল, তখন চেয়েছি আল্লাহর সাহায্য। জাফর রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি যখন আমার সাহায্য চাইছিলেন, তখন আপনি ভুল ও অসত্য পথে ছিলেন। আল্লাহ কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, (আমি ছাড়া) কে আছে যে ব্যক্তির ডাকে সাড়া দিতে পারে? অতএব যান, এবার আপনার যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়েছে তাতে আশা করা যায় আর কখনও ঐ ধরনের কথা বলবেন না।

এই মহাসাধক মানুষের জন্য বহু মূল্যবান উপদেশ বা বাণী রেখে গেছেন। এখানে তার কিছু নমুনা দেওয়া হল ঃ

১. যে লোক বলে যে, আল্লাহ অমুক বস্তুর মধ্যে রয়েছেন বা ঐ বস্তু থেকেই তাঁর উদ্ভব ঘটেছে, সে কুফরী করল।

২. যে লোক আরাম ও নিরাপত্তার কামনায় এবাদত করে, আর এবাদতের পর আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে, সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। যে লোক এবাদত বন্দেগী অর্চনা করে নিজেকে আবেদ বলে ঘোষণা করে, সে পাপী। আর যে লোক পাপ কাজ করে লজ্জা পায়, সে আল্লাহর অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩. ইমাম জাফর রহমাতুল্লাহ-কে কেউ প্রশ্ন করেন, সহিষ্ণু দরিদ্র দরবেশ ও কৃতজ্ঞ ধনী ব্যক্তির মধ্যে কোন জন বেশী উত্তম? তিনি উত্তর দেন, ধৈর্য্যশীল দরবেশের মহিমা বেশী কেননা, তিনি কেবলমাত্র ভাবনা ও হিসাব-নিকাশে বহু সময় ব্যয় করেন।

৪. যে লোক কোন অন্যায় কাজ করার আগেই পাপের কথা ভেবে তওবা করে, সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

৫. আল্লাহর যিকিরের অর্থ হল, তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে অন্য যেকোন বস্তুকে একেবারে ভুলে যাওয়া।

৬. পাঁচ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার কথা বলেছেন তিনি। যেমন–

(ক) মিথ্যাবাদী– এদের সঙ্গে চলাফেরা করলে তার কথা বিশ্বাস করে মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

(খ) কৃপণ– নিজের সঞ্চয়-স্বার্থে সে মানুষের ক্ষতি করবে।

(গ) দয়াহীন ব্যক্তি– বিপদের সময় সে কোন দয়া করবে না। ফলে সর্বনাশ অনিবার্য।

(ঘ) কাপুরুষ– প্রয়োজনের সময় সে কোন কাজে আসবে না। বিপদে ফেলে রেখে নিজের নিরাপত্তা খোঁজ করবে।

(ঙ) ফাসেক– এদের লোভ-লালসা অন্তহীন। নিজের স্বার্থে কাউকে খুন করতে এরা পিছু পা হয় না।

ইমাম জাফর রহমাতুল্লাহ বলেন, জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যঞ্জনা রয়েছে পার্থিব জীবনেই। মানুষের সুখ শান্তি হল জান্নাতের রূপ। আর তার দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাই হল জাহান্নামের প্রতীক। জান্নাত যেমন চিরশান্তির স্থান, জাহান্নাম তেমনি যন্ত্রণার।

যিনি তাঁর সর্বস্ব আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন একমাত্র তিনিই জান্নাতের অধিকারী। আর যে প্রবৃত্তি বা নফসের হাতের ক্রীড়নক, জাহান্নামই তার চিরস্থায়ী আবাস।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ

একবার কয়েকজন মহিলা এলেন এক সুবিখ্যাত ইমামের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে। প্রশ্নটি হল, একজন পুরুষের এক সঙ্গে চার জন স্ত্রী রাখার অনুমোদন আছে। কিন্তু একজন স্ত্রী এক সঙ্গে দু'জন স্বামী গ্রহণ করতে পারে না, এর কারণ কি?

গুরুতর প্রশ্ন। ইমাম সাহেব সেই মুহূর্তে এর উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি অন্তঃপুরে এলেন। আর তাঁর বিদুষী বুদ্ধিমতী কন্যার কাছে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন। কন্যা বললেন, আপনি যদি আপনার নামের সঙ্গে আমার নামটি যুক্ত করেন, তাহলে আমি এর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি। পিতা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, মহিলাদের তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি মা। তুমি তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে দেবে।

তাই হল। মহিলারা তাঁর কাছে এলেন। তিনি তাঁদের সবইকে একটি ঘরে পেয়ালায় কিছু দুধ আনতে বললেন। দুধ আনা হল। এবার অন্য একটি বড় পেয়ালায় প্রত্যেকের আনা দুধ ঢালতে বলা হল। মহিলারা তাও করলেন। সকলের আনা দুধ বড় পেয়ালায় মিশে গেল। তিনি আবার বললেন, এবার আপনারা যে যতটুকু দুধ এনেছেন, তা আবার আলাদা করে দিন।

তাঁরা বললেন, তা কি সম্ভব?

তিনি বললেন, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে আপনারাই বলুন, কোন এক মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে আর সন্তান ভূমিষ্ট হলে তা কোন স্বামীর সন্তান তা চেনবার উপায় কী?

এ প্রশ্নের আর উত্তর দেবার দরকার হল না। মহিলারা বললেন, প্রশ্নের জবাব আমরা পেয়ে গেছি। খুব খুশী হয়ে ইমাম দুহিতার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে করতে তাঁরা চলে গেলেন। খুশী ইমাম সাহেবও। তাঁর কথামতো ঐ দিন থেকেই তিনি তাঁর প্রিয় কন্যার নাম নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। তাঁর নতুন নাম হল আবু হানিফা। অর্থাৎ হানিফার পিতা। কন্যার নাম ছিল হানিফা। মহাকালের পৃষ্ঠায় পিতা-পুত্রীর নাম চিরদিনের মতো মুদ্রিত হয়ে গেল।

বিশ্ব-নন্দিত ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ-এর আসল নাম নো'মান। পিতার নাম সাবিত। আর চিরভাস্বর উপাধি হল ইমাম আজম–ইমামগণের ইমাম, শ্রেষ্ঠ ইমাম। তাঁর সূর্যসম প্রতিভার আলোক-ধারায় শুধু শরীয়ত আর মারেফাতই উদ্ভাসিত হয়নি, পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর অন্তর্জ্যোতিও বিস্তীর্ণ হয়েছে। সূক্ষাতিসূক্ষ্ম মাসআলা-সমূহের সমাধানে ও জটিলতম বিষয়-সমূহের মর্মোদঘাটনে তিনি যে নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, জগতে তার কোন তুলনা নেই। বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী এই মহাপন্ডিত সাহাবায়ে কেরাম ও শ্রেষ্ঠ ওলী আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহচর্য লাভ করেন। যাঁদের সাহায্য লাভ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– আনাস ইবনে মালেক, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রুমী, ওয়াসেক বিন ওয়ারাকা রহমাতুল্লাহ প্রমুখ। হযরত জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন। হযরত ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ, বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ, দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ প্রমুখ তাপসগণের তিনি ছিলেন মারেফাত বিদ্যার শিক্ষক। আর শরীয়তী শিক্ষাধারায় তাঁর উজ্জ্বল শিষ্যগণ হলেন ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ, ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ অন্যান্য জ্যোতিষ্ক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কথিত আছে, পাক রওজায় উপস্থিত হয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া সাইয়্যিদাল মুরসালীন– হে রাসূলগণের সর্দার, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তখন রওজা মুবারক থেকে জবাব আসে, ওয়া আলাইকুমুস সালামু ইয়া ইমামাল মুসলিমীন– হে মুসলিমগণের ইমাম, আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যাকে মুসলিমগণের ইমাম বলে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁর মর্যাদা কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, চিন্তা করলে আবেগ আপ্লুত হতে হয়।

তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন এক রাতে। রাসূলুল্লাহর পাক রওজা থেকে তিনি পবিত্র অস্থি তুলে জমা করছেন এবং একখানা আরেকখানা থেকে পৃথক করছেন। এই স্বপ্ন দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে তিনি জেগে উঠলেন এবং বিখ্যাত স্বপ্নবিশারদ আল্লামা ইবনে সিরীনের এক শিষ্যের কাছে গিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলেন। তিনি বললেন, এ স্বপ্নের অর্থ আপনি মহানবীর জ্ঞানরাজী, ফেকাহ ও হাদীসশাস্ত্রে এরূপ বুৎপত্তি লাভ করবেন যে এর দ্বারা উক্ত শাস্ত্র-সমূহের ভাষ্যকার হবেন। আর সত্যকে অসত্য থেকে পৃথক করার ক্ষমতা আল্লাহ আপনাকে দান করবেন। বলাবাহুল্য, এ স্বপ্ন আক্ষরিক অর্থে ফলবতী হয়। তিনি আরও একবার স্বপ্ন দেখেন, নবী মুস্তফা (সাঃ) তাঁকে সম্বোধন করে বলছেন, হে আবু হানিফা, আল্লাহ আপনাকে আমার সুন্নত তরীকা জীবিত রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। নির্জনবাস করবেন না। শরীয়তের বিধান রক্ষার তিনি ছিলেন এক অতন্দ্র প্রহরী। এ বিষয়ে একটি ঘটনা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তখন মুসলিম দুনিয়ার খলীফা আল্ মনসুর। তিনি বাগদাদের প্রধান কাজী ও অন্যান্য ওলামাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন। ওদিকে খলীফা মনসুর তাঁর এক বিশেষ অনুচরকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন খলীফার প্রত্যেক সহচরের নামে কিছু কিছু জমি-জায়গা লিখে দেন। নির্দেশ অনুযায়ী সে কাজও সম্পন্ন হল। তারপর সাক্ষীস্বরূপ দস্তখত নেবার জন্য খলীফা তাঁর এক সহজর মারফত দলিলগুলি পাঠিয়ে দিলেন প্রধান কাজী শাবী ও অন্যান্য আলেমের কাছে। প্রথমে প্রধান কাজী ও পরে অন্যান্যরা সই দিলেন। কিন্তু বেঁকে বসলেন আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ। সই না করে রাজকর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেন, খলীফা এখন কোথায়? কর্মচারী জানালেন, তিনি এখন বালাখানায়। ইমাম আজম বললেন, হয় আমাকে ওখানে নিয়ে চলুন না হয় তাঁকে এখানে আসতে বলুন। তবে সাক্ষ্য সঠিক হবে। কর্মচারী বললেন, প্রধান কাজীসহ সবাই যখন সই করছেন, তখন আপনি অযথা আপত্তি করছেন কেন? ইমাম আজম বললেন, সে জেনে আপনার কাজ নেই। যা বলছি, করুন। শেষ পর্যন্ত এ ঘটনা খলীফার কানে গেল। তিনি প্রধান কাজীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি দস্তখত করার সময় তা উপস্থিত থেকে শুনেছেন বা দেখেছেন? কাজী জবাব দিলেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে, সেগুলি আপনার ইচ্ছাক্রমেই হয়েছে। তাই উপস্থিতির প্রয়োজনবোধ করিনি। খলীফা বললেন, আপনার এ কাজ ন্যায়সঙ্গত হয়নি। তাই আপনাকে আপনার পদ থেকে খারিজ করলাম। অতঃপর প্রধান কাজীর পদে চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যেকোন একজনকে নিযুক্ত করার কথা ভাবা হল। এঁরা হলেন- ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান, শোরায়হ ও ইমাম শা'বী। তাঁদের দরবারে ডাকা হল। একই সঙ্গে আসছিলেন তাঁরা। পথিমধ্যে ইমাম আজম বললেন, শুনুন, আমি যে কোনভাবে হোক, এই পদ গ্রহণ করব না। সুফিয়ান আপনি সরে পড় ন। শা'বী পাগলের ভান করুন। আর শোরায় পদটি গ্রহন করুন। তাঁর এ পরামর্থে সুফিয়ান সত্যিই সরে গেলেন। বাকী তিন জন দরবারে হাজির হলেন।

খলীফা প্রথমে আবু হানিফা (রাঃ)-কে পদটি গ্রহণ করার অনুরোধ জানালেন। তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বললেন, আমি আরবের লোক নই। অতএব আরব প্রধানগণ সহজে আমার হুকুম মানতে চাইবে না। জাফর বারমাকী নামে একজন আমীর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, গোত্রের সঙ্গে এ পদের সম্পর্ক কি? এবার ইমাম বললেন, আমি এ পদের যোগ্য নই। এর প্রমাণ হল, আমার এ কথা হয় সত্য, নয় মিথ্যা হবে। সত্য হলে তো আমি এ পদের উপযুক্ত নই। আর যদি মিথ্য হয়, তাহলে একজন মিথ্যাবাদীকে এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা ঠিক নয়। একথা বলে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ রেহাই পেলেন।

অতঃপর শা'বী এগিয়ে এসে খলীফার হাত ধরে বললেন, জনাব, আপনি কুশলে আছেন তো! আপনার পরিবার-পরিজন কেমন আছেন, খলীফা তাঁর কথাবার্তর ধরন দেখে বুঝলেন, নিশ্চয় ভদ্রলোকের মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে।

এবার শোরায়হের পালা। তিনি বললেন, আমি একজন পাগল এবং আমার মস্তিস্ক অত্যন্ত দুর্বল। আমার পক্ষে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা সম্ভব নয়। তাঁর কথা শুনে খলীফা বললেন, আপনি চিকিৎসা করান। রোগ সেরে যাবে। শেষ পর্যন্ত শোরায়হকেই কাজীর পদে বহাল করা হল। এরপর হতে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ শরীহর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এমনকি তাঁর সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করলেন।

কাজীর পদ গ্রহণ না করার কারণ হল, তখনকার আলেমগণ প্রায় সকলেই স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যাকে কাজী নির্বাচিত করা হয়েছে, তাকে ছুরি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ মন্তব্য জানা ছিল বলে তাঁরা এ ব্যাপারে খুবই সন্ত্রস্ত ছিলেন।

ইমাম আজমের বৈঠক শুরু হয়েছে। পাশে কয়েকটি ছেলে বল খেলছিল। হঠাৎ বলটি একবার এসে পড়ল আসরের মাঝখানে। আর কোন বালকই সেটা নিতে সাহস করল না। কিছুক্ষণ পরে একটি ছেলে সভাস্থ কাউকে সমীহ না করে, খুব অভদ্রভাবে বলটি আসর থেকে তুলে নিয়ে গেল। তার হাবভাব দেখে ইমাম বললেন, এ নিশ্চয় কোনও জারজ সন্তান। এতটুকু লজ্জাবোধ নেই এরপর জানা গেল, তাঁর কথাই সত্য। প্রকৃতই ছেলেটি এক অবৈধ সন্তান।

তাঁর ধর্মনিষ্টা কিংবদন্তিতুল্য। একবার কোন এক লোক তাঁর থেকে টাকা ধার নেয়। লোকটির বাড়ী যে পল্লীতে সেখানে ইমাম আজমের এক শিষ্য মারা যায়। তিনি সেখানে গেলেন তাঁর জানাযা আদায় করতে। তখন দুপুর। প্রচণ্ড গরম আর রোদও তীব্র। সেখানে ঐ কর্জ গ্রহণকারীর দালানের ছায়া ছাড়া মাথা বাঁচানোর আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন না। বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কাউকে কিছু ধার দিয়ে তার থেকে কোন উপকার গ্রহণ করবে না। অতএব, তার দালানোর ছায়ায় আরাম ভোগ করা ঠিক হবে না। কেননা, তা হবে সুদ গ্রহণের মতো।

দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ বলেন, দীর্ঘ বিশ বছর ধরে তিনি তাঁর সেবায় রত থেকেও তাঁকে প্রকাশ্যে বা গোপনে খালি মাথায় কখনও বসে থাকতে দেখেননি অথবা অবসন্ন অবস্থায় কোনদিন পা ছড়িয়ে বসেননি। যেখানে কোন লোকজন নেই, সেখানে একটু পা ছড়িয়ে বসলে দোষ কী? তাঁর এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, সেখানেও আল্লাহর সঙ্গে শিষ্ঠাচার রক্ষা করা চাই।

প্রতি রাতে তিনি তিন'শ রাকাআত নফল নামাজ পড়তেন। একদিন তাঁর কানে এল, এক মহিলা অন্য এক মহিলাকে বলছেন, ইনি প্রতি রাতে পাঁচ'শ রাকাআত নফল নামাজ পড়েন। সেদিন থেকে তিনি পাঁচ'শ রাকাআত নফল নামাজ পড়তে শুরু করলেন। আবার একদিন তাঁকে দেখিয়ে কয়েকজন লোক বলাবলি করছিল, ইনি রোজ রাতে হাজার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাকাআত নফল নামাজ আদায় করেন। সেদিন থেকে তিনি সত্যিই হাজার রাকআত নামাজ পড়তে লাগলেন। আরও কিছুদিন পর তাঁর এক শিষ্য এসে বললেন, লোকের ধারণা, আপনি সারা রাত নামাজে কাটিয়ে দেন। সেদিন থেকে সত্যিই তিনি সারারাত নফল নামাজে রাত কাটাতে শুরু করলেন। আর তখন থেকে একটানা ত্রিশ বছর এশার ওযুতে ফজর আদায় করতেন। মানুষের উচ্চ ধারণার কী অপরিসীম মূল্য তিনি দিয়েছেন।

হযরত দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ যখন শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি ইমাম আজমের পরামর্শ চান। তিনি বলেন, এখন থেকে তোমার এলেম অনুযায়ী কাজ করা উচিত। কেননা, এলেমানুরূপ কাজ যে করে না, তাঁর দেহ প্রাণহীন গোশত পিণ্ডের মতো।

একদিন শহরের এক হাম্মামখানায় এক উলঙ্গ ব্যক্তিকে দেখে তিনি চোখ বুজে ফেলেন। লোকটি তাঁকে বলল, কবে থেকে আপনার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, যেদিন থেকে তোমার হায়া- শরম নির্মুল হয়েছে।

একদিন বাজারে যেতে তাঁর কাপড়ে কিছু কাদামাটি লেগে গেল। তিনি তখনই নদীতে গিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন। কেউ তাঁকে বললেন, আপনি যে পরিমাণ ময়লা জায়েয রেখেছেন, এতো তার চেয়ে কম। না ধুলেও চলত। তিনি বললেন, আমি যা বলেছি, ওটা ফতোয়ার কথা। আর যা করলাম তা পরহেজগারী। রাসুলে কারীম (সঃ) একদিন হযরত বেলাল (রাঃ)- কে বললেন, কোন সময় আধখানা রুটি ও জমা করে রাখবে না। অথচ কোন এক সময় তিনি তাঁর পত্নীদের জন্য প্রায় এক বছরের খাবার ও জমা করে রেখেছিলেন।

এক ব্যক্তি ঈর্ষা-প্রণোদিত হয়ে হযরত ওসমান রহমাতুল্লাহ- কে ইহুদী বলত ইমাম আজম একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, আপনার কণ্যার সঙ্গে অমুক ইহুদীর বিয়ে দেব। সে বলল, আপনি নিজে মুসলমান হয়ে ইহুদীর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চান? ইমাম বললেন, কেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তো ইহুদীর সঙ্গে দু'দুজন মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, লোকটি তাঁর কথার মর্ম বুঝতে পেরে ভীষণ লজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে তওবা করে ক্ষমা চেয়ে নিল।

একদিন এক ধনী ব্যক্তিকে তার ধন সম্পদের জন্যই তিনি একটু বেশ সম্মান দেখান। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে এক হাজার বার কোরআন শরীফ খতম করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি আরও একটি নিয়ম পালন করতেন। কোন কঠিন মাসআলার সম্মুখীন হলে চল্লিশ বার পবিত্র কোরআন খতম করে সমাধানে রত হতেন।

তৎকালীন খলীফা রাতে স্বপ্ন দেখলেন, আযরাইল ফেরেশ্তাকে তাঁর আয়ুর কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে দেখালেন। বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছের স্বপ্নের ব্যাখ্যা চেয়ে ব্যর্থ হয়ে তিনি হযরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ–কে ধরলেন। তিনি বললেন, পাঁচটি আঙ্গুল দ্বারা পাঁচটি বিষয়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে- যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। সেগুলি হল–

(১) কিয়ামত কবে হবে, (২) বৃষ্টি কখন হবে, (৩) জরায়ুতে পুত্র সন্তান না কন্যা সন্তান আছে, (৪) কোন্ জায়গায় কার মৃত্যু হবে ও (৫) আগামীকাল কী ঘটবে।

হযরত আবু আলী রহমাতুল্লাহ বলেন, তিনি এক রাতে হযরত বেলাল রহমাতুল্লাহ–এর কবরের পাশে শুয়েছিলেন। সে রাতে স্বপ্ন দেখেন, তিনি যেন মক্কায় আছেন।

আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃদ্ধকে শিশুর মতো কোলে নিয়ে বনী শায়বা দরজা দিয়ে বের হয়ে এলেন। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর কদমবুসি করলেন। তিনি তখন অবাক হয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভাবছিলেন নবী করীমের কোলে কে এই বৃদ্ধ? নবীজী বললেন, ইনি মুসলিমদের ইমাম আবু হানিফা।

নওফেল ইবনে হাইয়্যান (সঃ) বলেন, ইমাম আজমের মৃত্যুর পর তিনি স্বপ্ন দেখেন– কিয়ামত হয়ে গেছে। সমস্ত মানুষ হাশরের মাঠে হাজির। রাসূলে কারীম (সঃ) দাঁড়িয়ে আছেন হাওজে কাওসারের কাছে। তাঁর ডানে-বামে প্রচুর বিজ্ঞ-জ্ঞানীর ভিড়। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন মহানবীর দিকে মুখ করে। ইমাম সাহেব রয়েছেন তাঁর পাশে। আমি তাঁকে সালাম করে বললাম, আমাকে একটু পানি পান করান। তিনি জবাব দিলেন, নবীজী নির্দেশ দিলে পানি দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশে আমাকে পানি দেওয়া হল। পানি পান করে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পাশে উনি কে দাঁড়িয়ে আছেন? তিনি বললেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বাম পাশে হযরত আবু বকর (রাঃ)। তারপর একে একে অন্যান্য বিশিষ্ট জনের পরিচয় নিয়ে আঙ্গুলের করে গুনে হিসাব করতে লাগলাম। আমি সতেরো জনের নাম গুনলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম আমার বুড়ো আঙুলটি করের সতেরো দাগেই রয়েছে।

খলীফা আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ-কে কারারুদ্ধ করেন। আর ঐ বন্দী অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর। সন ১৫০ হিজরী।

শোনা যায়, তাঁর জানাযায় প্রায় সাত লক্ষ লোক শামিল হয়েছিল। তিনি বহুবার হজ্জ করেন। প্রথম হজ্জ করেন ষোল বছর বয়সে। পবিত্র রমযান মাসেও তারাবীর নামাজে তিনি মোট একষট্টি বার কোরআন শরীফ খতম করতেন।

হযরত ইয়াহইয়া মাআয রহমাতুল্লাহ স্বপ্নযোগে একবার নবী করীম (সাঃ)– কে জিজ্ঞস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, আমাকে ইমাম আবু হানিফার কাছেই পাবেন।

হযরত
ইমাম শাফেয়ী
রহমাতুল্লাহ

অল্প বয়সী একটি ছেলে– বয়সের তুলনা রীতিমতো গম্ভীর আর ভাবুক। কোথাও বড় একটা যায় না। কোন দাওয়াতে কিংবা অনুষ্ঠানেও না। চুপচাপ বসে থাকে নির্জনে। আর কত কী ভাবে। সেই ছেলে একদিন এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, হে বালক! তুমি কে? বালক উত্তর দিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার এক অধম উম্মত। তিনি তখন তাঁকে কাছে ডাকলেন। আর তাঁর পবিত্র মুখের লালা বালকের মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, যাও, তুমি আল্লাহর বরকত লাভ করবে। ঐ রাতে সে আর একটি স্বপ্ন দেখল। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর হাতের আংটি খুলে তাঁর আঙ্গুলে পরিয়ে দিল।

এমন পরম সৌভাগ্যবান বালক পরবর্তীকালে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হন। পৃথিবী তাঁকে জানে হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ নামে। মাত্র তেরো বছর বয়সেই তিনি ঘোষণা করেন, কারোর কিছু জানার থাকলে তাঁর কাছে জেনে নিতে পারে। আর পনেরো বছর বয়সেই তিনি ফতোয়া দিতে শুরু করেন।

শরীয়ত ও মারেফত সমুদ্রের তিনি এক সফল ডুবুরী। হাকীকত ও তরীকতের ক্ষেত্রেও মণিপূর্ণ খনি। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ-এর মতো অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁকে প্রচুর সম্মান দিতেন। অনেক সময় তা দৃষ্টিকটু দেখাতো বলে কেউ কেউ বলতেন। একজন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিকে এমন সম্মান প্রদর্শন শোভনীয় নয়। হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বললেন, তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। আর তাঁর সাহচর্যে থেকেই আমি হাদীস শাস্ত্রের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা শিখেছি। তিনি না থাকলে, আমি জ্ঞানের দরজায় শুধু দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভেতরে যাওয়া সম্ভব হত না। আর ফেকাহ বিদ্যার দরজা চিরতরে বন্ধ থাকত। আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ-এর মতে, ইসলামে ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ-এর অবদানই সর্বাপেক্ষা বেশী। হযরত সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহ-এর মতে, যদি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ-এর জ্ঞান এক পাল্লায় আর পৃথিবীর অর্ধেক লোকের জ্ঞান অন্য পাল্লায় চড়ানো হয়, হযরত শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ-এর পাল্লাই ভারী হবে। হযরত বেলাল খাস রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি হযরত খিজির (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ এক বিশেষ শ্রেণীর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ প্রতি একশ' বছরের মাথায় একজন ধর্মজ্ঞানীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, আর তিনি ধর্মবিষয়ে পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দেন। হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ এমনই একজন আশীষ-প্রাপ্ত মানুষ– মহাজ্ঞানী, মহা-তাপস। তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু হযরত সলীম রায়ী রহমাতুল্লাহ।

উপযুক্ত মায়ের উপযুক্ত সন্তান তিনি। তাঁর বিদূষী জননীকে দেশের লোক যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি বিশ্বাসও করতেন। অনেকে তাঁর কাছে অনেক কিছু আমানত রাখতেন। একবার দুজন লোক কাপড় ভর্তি একটা বাক্স রাখলেন। কিছু দিন পর একজন এসে তা নিয়েও গেলেন। কিন্তু আবার কিছুদিন পর অন্যজন এসে আবার বাক্স চাইলেন। তাঁকে বলা হল, তাঁর সাথী বাক্সটি নিয়ে গেছেন। তখন তিনি বললেন, আমরা দুজনে যে জিনিসটা রাখলাম, আপনি তা একজনকে দিলেন কিভাবে?

বলা বাহুল্য ইমাম-জননী খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর লজ্জার সীমা রইল না। ইমাম ঘটনাটি শুনে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, কিন্তু আপনিই বা বাক্স নিতে একা এলেন কেন? আপনার সঙ্গীকেও আনতে হবে। তাঁর কথা শুনে বেচারা চুপ করে গেলেন। আর নিঃশব্দে চলে গেলেন সেখান থেকে।

তাঁর সর্বজনবিদিত গুরুর নাম ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহ। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ যখন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ তাঁর পীরের বাসভবনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন দারোয়ানের মতো। কেউ কোন ফতোয়া লিখে নিয়ে যখন বেরিয়ে যেতেন, তখন তিনি দরজায় বসে তা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে পড়ে দেখতেন। কোন অসঙ্গতি চোখে পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আবার ভেতরে ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহ-এর কাছে পাঠিয়ে দিতেন, যেন তিনি সেটি আবারও পরীক্ষা করে দেখেন। আর ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহ বুঝতে পারতেন তাঁর শিষ্যই ঠিক। বলাবাহুল্য শিষ্যের যোগ্যতায় তিনি যেমন আনন্দ, তেমনি গর্ববোধ করতেন।

বাগদাদের সিংহাসনে তখন খলীফা হারুনুর রশীদ। এক রাতে বেগম যোবায়দার সঙ্গে তাঁর তুমুল ঝগড়া। বেগম তো খলীফাকে বলেই বসলেন, জাহান্নামী। বাদশাহও কম যান না। পত্নীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনিও বললেন, যদি আমি জাহান্নামী হই, তবে তুমি তালাক। আর এরপরেই তাঁরা পরস্পরে পৃথক হয়ে গেলেন। ডাক পড়ল বাগদাদের বিজ্ঞজনের। সমস্যাটা তাঁদের সমীপে পেশ করা হল। সবাই বলতে লাগলেন, বাদশাহ জাহান্নামী না জান্নাতী, তা আমরা জানব কী করে? অর্থাৎ সমস্যার সমাধানে সূত্র পাওয়া গেল না।

এমন সময় এক বালক সভাস্থলে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে এ মাসআলার সমাধান দিতে আজ্ঞা হোক। বলে কী ছেলেটা! পাগল নাকি? বিদগ্ধজনেরা যা পারলেন না, সে তা পারবে বলে স্পর্ধা দেখায়! কিন্তু খলীফা তাকে অনুমতি দিলেন।

বালক বলল, জাহাপনা, আপনার নিকট আমার প্রয়োজন, না আমার নিকট আপনার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রয়োজন? খলীফা বললেন, তোমার নিকটই আমার প্রয়োজন। তাহলে আসন থেকে নেমে আসুন। তার কারণটাও সে বলে দিল। অর্থাৎ আলেমগণের স্থান উচ্চে। আল্লাহ্ তাঁদের বেশী সম্মান দিয়েছেন। খলীফা হারুনুর রশীদ সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এসে তাঁর আসনে বালককে বসিয়ে দিলেন।

এবার সে বাদশাহকে প্রশ্ন করে, আপনি কি কখনও শক্তি ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পাপের কাজ না করে কেবল আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত থেকেছেন? খলীফা বললেন, আল্লাহর কসম, বহু ক্ষেত্রেই এমনটি হয়েছে। ছেলেটি বলল, তাহলে আমি ঘোষণা করছি, নিঃসন্দেহে আপনি জান্নাতী। সঙ্গে সঙ্গে শোরগোল পড়ে গেল। বিদগ্ধ জনেরা সমস্বরে বলে ওঠলেন, তুমি কোন্ যুক্তি-প্রমাণে বলে একথা বলছ? সে বলল, কেন, পাক কোরআনেই তো এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত তার জন্য অবধারিত।

সভা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এত অল্প বয়সে যার এমন বিরল প্রতিভা, পরিণত বয়সে না জানি আল্লাহ্ তাঁকে আরও কত আলোকিত করবেন। আমরা জেনেছি, স্বপ্নযোগে যে বালক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ-বিহ্বরের লালা লাভ করেছিল, আংটি পেয়েছি বীরল-কেশরী হযরত আলী (রাঃ)-এর, এ সেই বালক। আর সেদিনের সেই বালকই পরিণত বয়সে হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ হিসেবে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে।

মহানবীর বংশধরগণের প্রতি তাঁর ভক্তি ও সম্ভ্রমবোধ ছিল অসাধারণ। আর এ ভক্তির সূত্রপাত বাল্যকালেই। শোনা যায়, পাঠ্যজীবনে তিনি একবার পড়াশুনা করছেন। নবী বংশী এক ছেলে দরজায় খেলা করছিলেন। তিনি যতবারই তাঁর সামনে এসেছেন, ততবারই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হুযুর (সঃ)-এর বংশের লোক আমার সামনে আসবে আর আমি বসে থাকব, এটা শোভনীয় নয়।

ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ জীবনে কখনও হারাম রুজি খাননি। একবার এক সৈনিকের আতিথ্য গ্রহণ করে তিনি তাঁর বাড়ীতে খান। পরে এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটানা চল্লিশ রাত ভোর পর্যন্ত নামাজ আদায় করেন।

অত বড় জ্ঞানী ও সাধক হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করতেন। একবার এক ধনী ব্যক্তি মক্কার সাধক-দরবেশগণের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু টাকা পাঠান। তিনি তা গ্রহণ করেননি এই বলে যে, তিনি তেমন পুণ্যবান সাধক নন।

রোমের খ্রীস্টান শাসক বাগদাদের খলীফা হারুনুর রশীদকে ফি-বছর বার্ষিক কর পাঠাতেন। একবার তিনি কিছু তত্ত্বজ্ঞানী পাদ্রী পাঠিয়ে খলীফাকে বললেন, আমার পাদ্রীগণের সঙ্গে আপনার মুসলিম পণ্ডিতগণ যদি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের হারিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমি নিয়মিত কর দেব। আর তা যদি না পারেন, তবে কর দেওয়া বন্ধ করা হবে। রোম থেকে চারশ' পাদ্রী এসেছিলেন।

খলীফা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে সমবেত করে তর্কানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। তর্ক বসল দজলা নদীর তীরে। মুসলিম আলেমগণের নেতৃত্ব করার জন্য হযরত শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ-কে বলা হল। তিনি তর্কসভায় উপস্থিত হয়ে দজলা নদীর পানির ওপর জায়নামাজ বিছিয়ে বসলেন। আর ডাক দিলেন খ্রীস্টান পাদ্রীদের। আসুন, আমরা এখানে বসেই আলোচনা আরম্ভ করি। কিন্তু এই অলৌকিক কান্ড দেখে তারা আর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন না। শুধু তাই নয়, সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর এ খবর যখন রোম সম্রাটের কাছে গিয়ে পৌছল, তখন তিনি বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এদেশে তর্কের স্থান নির্ধারিত হয়নি। তাহলে হয়ত দেশের সব খ্রীস্টান মুসলমান হয়ে যেত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি কিছুদিন মক্কা শরীফে অবস্থান করেন। তখন তাঁর পার্থিব অনটন ছিল। রাত্রে বই পড়তেন চাঁদের আলোয়। একজন কেউ বললেন, কাবা ঘরের কাছে যে আলো জ্বলছে, আপনি সেই আলোতে পড়াশুনা করতে পারেন। তিনি বললেন, ঐ আলো শুধু কাবার উদ্দেশ্যেই জ্বালানো হয়েছে। সুতরাং তাতে অন্য কিছু করা ঠিক নয়। তাঁর ধর্মনিষ্ঠার এ এক অসাধারণ উদাহরণ।

হযরত শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ-এর মর্যাদাহানির জন্য একদিন এক ব্যক্তি খলীফা হারুনুর রশীদকে বললেন, ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ কোরআন মুখস্থ করেননি। কথাটা বিশ্বাস হল না খলীফার। তবুও তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাঁকে রমযান মাসের তারাবহর নামাজে ইমাম নিযুক্ত করলেন। কেননা, তারাবীহর নামাজে কোরআন শরীফ খতম করার রীতি বরাবর চলে আসছে। সেখানে প্রমাণিত হবে, কোরআন তাঁর মুখস্থ কিনা। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ-এর অবশ্য একটু অসুবিধা হল। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে সজাগ ও তৎপর হলেন। প্রতিদিন দিনের বেলায় এক পারা মুখস্থ করতেন আর রাতে তারাবীহর নামাজে তা আবৃত্তি করতেন। এভাবে এক রমযান মাসে পুরো কোরআন শরীফ খতম হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখলেন।

একবার তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ যদি স্বেচ্ছায় নামাজ বাদ দিয়ে কাফের হয়ে যায়, তবে পুনরায় মুসলমান হতে হলে তার কী করতে হবে? ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আবার নামাজ পড়লেই সে মুসলমান হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ তাঁকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, যখন সে কাফেরই হয়ে গেল, তখন সে অবস্থায় নামাজ পড়লে তা শুদ্ধ হবে কিভাবে? ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ তাঁর এই সূক্ষ্ম উত্তরে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন।

হযরত শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ বলতেন, যার কাছ থেকে আমি নীতিমূলক একটি অক্ষরও শিক্ষা করেছি, তিনিই আমার শিক্ষাগুরু। তিনি আরও বলতেন, যিনি অযোগ্য ব্যক্তিকে বিদ্যা দান করেন, তিনি বিদ্যার মর্যাদা নষ্ট করেন। আবার যিনি যোগ্য ব্যক্তিকে বিদ্যার্জন থেকে বঞ্চিত রাখেন, তিনিও অত্যাচারীর ন্যায় অর্থাৎ তিনি বিদ্যার মর্যাদা রক্ষা করেননি। তিনি একজনকে বলেন, অন্যের মতো ধন সঞ্চয় করতে পারলে না বলে দুঃখ করো না। কারণ যে ধন সঞ্চয় করেছে সে তা ফেলে রেখেই মৃত্যুবরণ করেছে। তা দিয়ে তার কোন উপকার হয়নি। বরং তুমি ইচ্ছা পোষণ কর যে, অমুক লোক যেরূপ এবাদত করেছে, যদি তেমন এবাদত করতে পারতাম, তাহলে কত না ভালো হত। তিনি আরও বলেন, কেউই মৃত ব্যক্তির ওপর হিংসা করে না। অতএব জীবিতের ওপরও হিংসা করা উচিত নয়। যেহেতু জীবিতও একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

মানুষ টাকা-পয়সা হারায়। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ একবার হারিয়ে ফেললেন কাজের সময়। আর হারানো সময়কে খুঁজতে লাগলেন মসজিদে, মাদ্রাসায়, বাজারে। অবশেষে তাঁর সঙ্গে দেখা হল কয়েকজন সুফী সাধকের। তাঁরা বললেন, বিগত সময় আর ফিরে পাওয়া যায় না। এখন বর্তমানের মধ্যেই যা করার করে নিতে হবে। এ সময়ও যেন আবার হারিয়ে না যায়।

ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ বলেন, এক টুকরো রুটির বদলে আমাকে যদি কেউ দুনিয়া দিয়ে দেয়, আমি তা নেব না।

রবিয়ে খাসআম বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ-এর মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে স্বপ্ন দেখলাম, হযরত আদম (আঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে আর লোকজন তাঁর মরদেহ বাইরে আনার ব্যবস্থা করছেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে আমি এক আলেমের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইলাম। তিনি বললেন, বর্তমান কালের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এ দুনিয়া থেকে বিদায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নেবেন। হযরত আদম (আঃ) তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্যই ফেরেশতাগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হন। এ যুগে সেদিক দিয়ে ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ-ও যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা ঐ স্বপ্নের মাধ্যমেই প্রতীয়মান হয়।

মৃত্যুর আগে তিনি বলে যান, অমুক লোক তাঁকে স্নান করিয়ে দেবেন, কাফন পরিয়ে দেবেন। যাঁর কথা বলা হয়, তিনি তখন মিসরে ছিলেন। তিনি যখন দেশে ফিরলেন, তখন ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ আর ইহলোকে নেই। ইমাম সাহেবের ইচ্ছার কথা তাঁকে বলা হল। তিনি তাঁর অসিয়তনামা দেখতে চাইলেন। তা দেখানোও হল। তাতে হযরত শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ-এর সত্তর হাজার টাকার ঋণের কথাও লেখা ছিল। ঐ ব্যক্তি তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। আর বললেন, আমার দ্বারা গোসলের অর্থ হল এ ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ মাত্র চুয়ান্ন বছর বসে ২০৪ হিজরীতে জান্নাতবাসী হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ

ইসলামের ইতিহাসে মুতাজেলা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব একটি বিশেষ ঘটনা। তেমনি আশআরিয়া সম্প্রদায়ের আন্দোলনও উল্লেখের দাবী রাখে। এ ব্যাপারে মুসলিম জগতে বহু মতভেদ আছে। যেমন– মুতাজেলা গোষ্ঠী বলেন, কোরআন আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন না। এমন একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম হলেন হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ। তিনি বলেন, কোরআন সৃষ্ট নয়। আর এই জন্য বাগদাদের শাসক তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেন। তাঁর ওপর এক হাজার বার বেত্রাঘাত করা হয়। তাঁর পরনের পাজামা খুলে পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু আল্লাহ্ অলৌকিক দু'খানি হাত সৃষ্টি করে তাঁর ইজ্জত রক্ষা করেন। হাত দু'খানি পুনরায় তাঁর পাজামা পরিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু এত নিগ্রহ সহ্য করেও তিনি তাঁর বিশ্বাস ও মতবাদে অটল থাকেন।

কথিত আছে, তাঁকে যখন বন্দী করে আনা হয়, তখন দরবারের এক দারোয়ান তাঁকে একান্তে বলল, আপনার কোন ভয় নেই। আপনি আপনার মতে অবিচল থাকবেন। দারোয়ান আরও বলে, একবার চুরির দায়ে আমারও হাজার বেত্র-দণ্ড হয়। তবুও আমি আমার অপরাধ স্বীকার করিনি। শেষ পর্যন্ত মিথ্যার ওপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়েও আমি মুক্তিলাভ করি। কিন্তু আপনি তো দাঁড়িয়ে আছেন সত্যের ওপর। অতএব আল্লাহর রহমতে আপনার জয় সুনিশ্চিত। দারোয়ানটির কথা হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ আজীবন ভোলেননি। কেননা, সত্যিই সেদিন তিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ঐ বেত্রাঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনা বড়ই দুঃখজনক।

মৃত্যুকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, যারা আপনাকে এভাবে প্রাণত্যাগে বাধ্য করল, তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি জবাব দেন, তারা আমাকে গোমরাহ মনে করেই এরূপ করেছে। কাজেই রোজ কিয়ামতে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জানাব না।

সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে যে অপবাদ দেওয়া হল, তিনি তা থেকে মুক্ত ছিলেন। ধর্মনিষ্ঠার দিক দিয়ে তাঁর মর্যাদা যেমনি ছিল প্রশ্নাতীত, নির্যাতিত হয়ে অকালে তেমনি ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদিত এই মানুষটি অকারণে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধর্মাচরণে তিনি কতখানি সতর্ক ছিলেন তা একটি ঘটনায় অনুমান করা যায়। তাঁর পুত্র একবার একটি হাদীস পাঠ করে হাত বাড়িয়ে তাঁর শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। হাদীস হল– আল্লাহ্ স্বয়ং হযরত আদম (আঃ)-এর দেহের মাটির খামীর করেছিলেন। হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ তাঁর পুত্রকে বললেন, তুমি যখন এ হাদীসটির ব্যাখ্যা করবে, তখন কখনও ওভাবে হাত বাড়িয়ে তার অর্থ বোঝাবে না।

বাতের অসুখে ভুগছেন এক বৃদ্ধা। ওঠা-বসার ক্ষমতা নেই। তিনি তাঁর পুত্রকে পাঠালেন ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। তিনি যদি দোয়া করেন তাহলে আল্লাহ্ হয়তো তাঁকে রোগমুক্ত করবেন। পুত্র হযরতের দরবারে এসে মায়ের কথা নিবেদন করল। তিনি ওযু করে নামাজে নিমগ্ন হলেন। আর এ ফাঁকে তাঁর এক সেবক যুবকের কানে কানে বললেন, তুমি এখন চলে যেতে পার। তোমার মাকে দোয়া করার জন্যই তিনি নামাজে মশগুল হয়েছেন। তাঁর কথা শুনে যুবক বাড়ীতে ফিরল। আর অবাক হয়ে দেখল, মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

একবার এক লোক উঁচু জায়গায় বসে ওযু বানাচ্ছে। এমন সময় এলেন ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ। তিনি এক নিচু জায়গায় বসে ওযু করতে শুরু করলেন। লোকটিও তখন নিচে নেমে এসে ওযু সম্পন্ন করল। এই লোকটির মৃত্যুর পর অন্য একজন তাকে স্বপ্নে দেখে। সে বলে, সেদিন ইমাম সাহেবের তাজীমের প্রতি সে লক্ষ্য করেছিল বলে আল্লাহ্ তাঁকে মাফ করে দেন।

হযরত একদিন এক বনে পথ হারিয়ে ফেলেন। হঠাৎ এক বেদুঈনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তার কাছে রাস্তা জানতে চাইলে সে আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে থাকে। তারপর কাঁদতে শুরু করে। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর মনে হয়, বেদুঈন বুঝি ক্ষুধার্ত। তাই তিনি তাকে কিছু খাবার দিতে চাইলেন। তাতে সে বিরক্ত হয়ে বলল, আপনি কি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল নন? আপনি যে আমাকে আল্লাহর বদলে খাবার দিতে চাইছেন? অথচ আপনি নিজেই এক পথহারা পথিক। হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ্ বুঝলেন, আল্লাহ্ তাঁর পুণ্যবান প্রিয় দাসদের এভাবে এখানে-সেখানে লুকিয়ে রাখেন। আর তাঁর মনের এই একান্ত গোপন কথাটাও বেদুঈন ধরে ফেলল। বলল, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অবস্থা এরূপ যে, তাঁরা যদি আল্লাহর কাছে সমগ্র জমিনকে স্বর্ণে পরিণত করে দেওয়ার জন্য বলেন, তবে তাই হয়ে যায়। তাঁর এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ যখন চোখ তুলে তাকালেন তখন দেখলেন, সারা প্রান্তর স্বর্ণময় হয়ে উঠেছে। আর ঠিক এ সময় অদৃশ্য শব্দ ধ্বনিত হল– হে আমার অত্যন্ত প্রিয় বান্দা। এ যদি আমাকে বলে তবে তৎক্ষণাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে এর পদানত করতে পারি। হে আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ! এমন লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হল বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এরপর আর কখনও তুমি এর দেখা পাবে না।

হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর পুত্র এক বছর স্পেনে কাজী পদে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর বাবুর্চি পুত্রের আটার খামীরের সঙ্গে আরও কিছু আটা মিশিয়ে রুটি বানিয়ে তাঁকে খেতে দেয়। ইমাম সাহেবের কানে কথাটা কিভাবে চলে যায়। তিনি নিজে সে রুটি না খেয়ে তা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্য খানসামাকে নির্দেশ দিলেন। আর এও বললেন, খানসামা যেন তাদের বলে দেয়, এ রুটি স্পেনের পূর্বতন কাজীর এবং ইমাম সাহেবের। কিন্তু সে রুটি কেউ নিল না। চল্লিশ দিন পর্যন্ত কত ভিক্ষুক এল আর গেল, কিন্তু কেউই রুটি নিল না। অগত্যা তা ফেলে দেওয়া হল দজলা নদীতে। আর সেদিন থেকে ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ দজলা নদীর মাছ খাওয়াই ছেড়ে দিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আগেই বলা হয়েছে, ধর্মাচরণে তিনি অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। তিনি যদি দেখতেন কোন সুরমাদানী রূপার তৈরী, তাহলে তিনি আর তার ধারে-কাছেও যেতেন না।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহ মক্কায় অবস্থান করছেন। তাঁর কাছ থেকে হাদীস শোনার জন্য ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ মক্কায় গেলেন। প্রতিদিনই তিনি তাঁর দরবারে হাজির থাকেন। কিন্তু একদিন কোন কারণ বশতঃ এলেন না। হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ তাঁর খোঁজে এক শিষ্যকে পাঠালেন। খাদেম গিয়ে দেখেন, ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ শতছিন্ন একখানি কাপড় পরে চুপচাপ বসে রয়েছেন ঘরে– যেন আত্মগোপন করে আছেন। জানা গেল, তাঁর একমাত্র লুঙ্গী ও জুব্বা ধোপাকে ধুতে দিয়ে তিনি এ পোশাক পরে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করছেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে খাদেম বলল, হুযুর! আমি কিছু টাকা দিচ্ছি। আপনি পরনের কাপড় তৈরী করুন। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি মানুষের দান গ্রহণ করি না। খাদেম বললেন তাহলে আপনি ধার নিন। কিন্তু তাতেও তিনি রাজি হলেন না। তখন খাদেম বললেন, আপনি আমাদের ওখানে আর যেতে চান না। কিন্তু আপনি যতদিন না ওখানে যাচ্ছেন, ততদিন আমিও এখান থেকে যাব না। বেশ মুশকিলে পড়লেন ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ। বললেন, তাহলে এক কাজ কর, আমার একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি আছে। দেখ, যদি তা বিক্রি করতে পার। যদি বিক্রি হয়, তাহলে যা দাম পাওয়া যাবে তা দিয়ে দশ গজ মোটা কাপড় কিনে আনো। পাঁচ গজ দিয়ে পাজামা, আর বাকী পাঁচ গজ দিয়ে জামা বানানো যাবে। খাদেম বললেন, মোটা কাপড় কেন হুযুর? এবার ধমক দিলেন ইমাম সাহেব, যা বলছি তাই কর।

বাড়ীতে কাজ করছিল এক মজুর। সন্ধ্যায় সে যখন চলে যাচ্ছে, ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ তাঁর খাদেমকে বললেন, ওর যা দাবী, তার চেয়ে কিছু বেশীই দিও। বললেন, তখন হয়ত ওর মনে লোভ ছিল না। কিন্তু এখন সেটা সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, মানুষের মন সব সময়ে একরূপ থাকে না।

একবার তিনি তাঁর থালা বন্ধক রাখেন। যখন সেটা ছাড়াতে গেলেন, তখন তাঁকে দু'খানা থালা দিয়ে তাঁর নিজের খানা চিনে নিতে বলা হল। কিন্তু তিনি তা চিনতে না পেরে থালার দাবীই ছেড়ে দেন।

বহু দিন ধরে তাঁর ইচ্ছা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। একদিন ঘটনাক্রমে স্বয়ং আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ এসে পড়লেন ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। আর এ খবর তিনি পেয়ে গেলেন তাঁর পুত্র সালেহ মারফত। বলাবাহুল্য, হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ এ খবরে খুব খুশী হলেন। কিন্তু তাঁর পুত্রকে বললেন, আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ-কে নিয়ে তিনি যেন এখনই ঘরে না আসেন। অর্থাৎ, তিনি এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না।

পিতার কথায় পুত্র বিস্মিত হয়ে যান। যাকে দেখার তীব্র বাসনা তাঁর, তাঁর সঙ্গে তিনি কিনা এই মুহূর্তে দেখা করবেন না, আশ্চর্য! পুত্রের মনোভাব বুঝতে পেরে আহমদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি কী ভাবছি জান? তাঁর কথাবার্তা, আচার-আচরণ এত আকর্ষণীয় যে, তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পর আমি হয়ত তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ব। তারপর তাঁর বিচ্ছেদ-ব্যথা আমার পক্ষে দুর্বহ হবে। তার চেয়ে এই ভালো যে, তাঁর দর্শন প্রত্যাশা নিয়ে এভাবেই দিন ক'টি কাটিয়ে দেব। পরে এক সময়, এমন জায়গায় দেখা করব যে, আর বিচ্ছেদের কোন আশঙ্কাই থাকবে না।

তাঁর একটি অভ্যাস ছিল, কেউ পার্থিব বা সংসার সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন করলে তিনি নিজে তাঁর সদুত্তর দিতেন। কিন্তু সেটি যদি আধ্যাত্মিক প্রশ্ন হত, তাহলে প্রশ্নকারীকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পাঠিয়ে দিতেন হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। তিনি বলতেন, আল্লাহ পাক আমার প্রতি ভয়ের দরজা খুলে দেওয়ায় আমি তাঁর কাছে দোয়া করেছি। এর ফলে আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমি যেন একেবারে নির্বোধ হয়ে চলেছি।

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ বাগদাদে বাস করতেন কিন্তু বাগদাদের রুটি খেতেন না। তিনি বলতেন, হযরত ওমর রহমাতুল্লাহ যুদ্ধজয়ীদের জন্য বাগদাদের মাটি ওয়াকফ করে গিয়েছেন। তিনি মুসেল থেকে আটা এনে রুটি তৈরী করে খেতেন। তাঁর পুত্র সালেহ এক বছর স্পেনের কাজী ছিলেন। সালেহ খুবই ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। রাত্রে মাত্র দু'ঘটন্টার বেশী ঘুম যেতেন না। এবাদতে কাটিয়ে দিতেন। বাড়ীর সামনে একখানি ঘর তৈরী করে সেখানেই থাকতেন– কেননা কেউ যেন কোন নালিশ জানাতে এসে ফিরে না যায়। কিন্তু তবুও হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ পুত্রের এই পদ গ্রহণে কোন দিন খুশী হননি। বরং ঘৃণার চোখে দেখেছেন।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহর দীদার লাভ কিভাবে সম্ভব?

তাঁর উত্তর ঃ কোরআন শরীফের মাধ্যমে।

প্রশ্ন ঃ ইখলাস কি?

উত্তর ঃ কাজকর্মের বাধা-বিঘ্ন, তর্ক-বির্তক এড়িয়ে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করাই ইখলাস।

প্রশ্ন ঃ তাওয়াক্কুল কাকে বলে?

উত্তর ঃ আল্লার প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও নির্ভরতাই তাওয়াক্কুল।

প্রশ্ন ঃ রেজা কাকে বলে?

উত্তর ঃ যেকোন কিছু আল্লাহ পাকের খুশীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা।

প্রশ্ন ঃ ভালোবাসা কি?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নটি হযরত বিশর হাফীকে জিজ্ঞেস করা হোক। তাঁর বর্তমানে আমি এর জবাব দেব না।

প্রশ্ন ঃ যোহদ বা সংসার বিরাগ কি?

উত্তর ঃ এটি তিন প্রকার। যথা–

(ক) অবৈধ জীবিকা বর্জন। এটি সাধারণ সংসারবিরাগ।

(২) বৈধ জীবিকা থেকেও লোভ সংবরণ। এটি হল বিশেষ সংসার বিরাগ।

(৩) যে বিষয় বস্তুগুলো আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, তা বর্জন করা। এগুলো হল আরেফগণের সংসারবিরাগ।

প্রশ্ন ঃ যেসব মূর্খ সুফী তাওয়াক্কুল করে মসজিদে অবস্থান করছে তাদের সম্পর্কে কি বলা যায়?

উত্তর ঃ তারা মূর্খ নয়। বরং জ্ঞানই তাদের এরূপ করেছে।

প্রশ্ন ঃ মনে হয় এরা শুধু রুজি-রুটির ব্যবস্থার জন্যই এ পথ ধরেছেন।

উত্তর ঃ দুনিয়াতে এমন কেউ নেই যে রুজি-রুটির মুখাপেক্ষী নয়।

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তাঁর কথা বলতে বড় কষ্ট হয়। শুধু হাতের ইশারা চলে। এক সময় তাঁর পুত্র জিজ্ঞেস করেন, আপনার অবস্থা কিরূপ?

তিনি বললেন, এখন জবাব দেবার সময় নয়। সঙ্কটকাল উপস্থিত। এখন কেবল দোয়া করার সময়। আমার চারপাশে এখন যারা বসে রয়েছে, তাদের মধ্যে ইবলীসও আছে। সে আফসোস করে বলছে, আমি বুঝি তার হাত থেকে নিরাপদে পার হয়ে গেলাম। ওর কথা শুনে এখনও আমার ভয় হয়। যদি আল্লাহর অনুগ্রহে মুক্তি পেয়ে যাই–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তো এটুকুই শুধু ভরসা। কথাগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

কথিত আছে, তাঁর মরদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাবার সময় অনেক পাখী তাঁর ওপর উড়ছিল আর ছটফট করছিল। এ দৃশ্য দেখে প্রায় দু'হাজার ইহুদী, খ্রীস্টান ও অগ্নিপূজক ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে খোজাইমা রহমাতুল্লাহ বলেন, মৃত্যুর পর তিনি ইমাম সাহেবকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি ধীরপায়ে চলেছেন। কোথা যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করলে বললেন, দারুস সালাম (একটি জান্নাতের নাম)। আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, তিনি আমাকে মাফ করেছেন। মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন মর্যাদার তাজ, আর পরিয়েছেন সম্মানের জুতা। আর বলেছেন, কোরআন পাককে সৃষ্ট বস্তু বলে স্বীকার না করার ফলেই তোমার মর্যাদা এভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করলেন, সুফিয়ান সাওরীর নিকট যে দোয়াটি শিখেছ, তা পাঠ কর। আমি পাঠ করলাম– সব কিছুই আপনার কুদরতের মুষ্টিবদ্ধ। সব কিছুর উপরেই আপনি শক্তিশালী। আমি কী চাই তা জিজ্ঞেস করবেন না। আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই দান করুন। অতঃপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম।

এক তাপসকে জিজ্ঞেস করা হয়, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ-এর কাশফ শক্তি জীবিতকালে বেশী ছিল, না ইন্তেকালের পর? তিনি বলেন, ইমাম সাহেবের দুটি দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। দোয়া দুটি ছিল। হে দয়াময়! যাদের ঈমান দেননি, তাদের ঈমান দান করুন। আর যাদের ঈমান দিয়েছেন তাদের ঈমান যেন বহাল থাকে।

হযরত ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর জন্ম বাগদাদে, ১৯৬৪ হিজরীতে আর বাগদাদেই পরলোকগমন করেন ২৪১ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তর বছর। হাদীস শাস্ত্র শিক্ষার জন্য তিনি কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।

হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহ

এক দরবেশ তাঁর অনুচরবর্গসহ এক অরণ্যে গিয়ে পৌঁছালেন। আর অরণ্যের মধ্যে বিচরণ করতে করতে তাঁরা একটি ধনভাণ্ডার দেখতে পেলেন। রাশি রাশি সোনা আর রূপা স্তূপীকৃত ছিল সেখানে। বিপুল এ ধনরাশি দেখে অনুচরবর্গের আনন্দের সীমা রইল না। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। আর যা কিছু ছিল, সব নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলেন। কিন্তু দরবেশ কী করলেন? ধনাগারের দুয়ারে তিনি একটি কাঠের ফলক দেখতে পান। তাতে লেখা ছিল আল্লাহর পবিত্র নাম। অন্য দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি ঐ কাঠের ফলকখানি গ্রহণ করে পরম ভক্তিভরে বারবার চুমু দিতে লাগলেন।

ঐ রাতেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং আল্লাহ্ বলছেন, আপনার অনুগামীরা সোনা-রূপার দিকে আকৃষ্ট হল। কিন্তু আপনি ওসব লক্ষ্য না করে আমার নামাঙ্কিত কাঠের ফলককেই মহামূল্যবান মনে করলেন। অতএব আমি খুব খুশী। এর পুরস্কারস্বরূপ আমিও আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার দরজা খুলে দিলাম।

স্বয়ং আল্লাহ্র আশীর্বাদ-ধন্য এই মহা-তাপসের নাম হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহ মিসরের সাধক তিনি। মারেফাতপন্থীদের শিরোমণি, তৌহীদবাদীদের মধ্য-মণি। কিন্তু দুঃখের কথা, মিসরে তাঁর কোন কদর হয়নি। তারা তাঁকে 'কাফের' বলে

www.AmarIslam.com

চিহ্নিত করে। তাঁর আচার-ব্যবহারে অনেকেই সংশয় পোষণ করত। আর তিনিও তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেননি বলে তাঁর আসল পরিচয়ও তাঁর জীবিতকালে কেউ জানতে পারেনি।

প্রথম জীবনে তিনি এক তরুণ তাপসের নাম শুনে তাঁকে দেখতে যান। গিয়ে দেখেন, এক দরবেশ গাছের ডালে ঝুলে রয়েছেন। আর নিজের মনে বলছেন, হে দেহ! আল্লাহর আদেশ পালনে তুমি আমাকে সাহায্য কর। না হলে তোমাকে আমৃত্যু উপবাসী রেখে শাস্তি দেব। অর্থাৎ তিনি নিজের শরীরকে শাসন করছেন। তাঁর কথা শুনে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে ঝুলন্ত দরবেশ বললেন, এমন কেউ আছে কি, যে কম লজ্জাশীল ও বেশী পাপিষ্ঠ মানুষকে সাহায্য করে?

হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ এবার তাঁকে সালাম জানিয়ে তাঁর অবস্থার কথা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমার এ দেহ আল্লাহর এবাদতে আমাকে সাহায্য করছে না। আমি তাই একে শাস্তি দিচ্ছি। হযরত বললেন, আমি মনে করেছিলাম, আপনি হয়ত কাউকে হত্যা করেছেন অথবা কোন বড় পাপ করেছেন।

দরবেশ বললেন, না, তুমি ঠিক বোঝনি। লোক সংসর্গকেই আমি ঐ ধরণের অপরাধ সাদৃশ বলে মনে করি।

মনে হয় আপনি প্রকৃতই সংসারবিরাগী।

আমার চেয়েও বড় বিরাগী লোক আছেন। তাঁকে দেখতে চাও তো সামনের পাহাড়ের দিকে যাও।

তাঁর কথামতো হযরত যননুন রহমাতুল্লাহ ঐ পাহাড়ে গিয়ে দেখলেন, এক তরুণ একখানা পা বাইরে ফেলে রেখে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আর সে পায়ে অসংখ্য ক্ষত- পোকা কিলবিল করছে। হযরত তাঁকে সালাম জানিয়ে তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন।

তরুণ বললেন, একদিন আমি এই মসজিদে বসে ছিলাম। তখন এক রূপসী নারী এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে আমি এক পা অগ্রসর হয়ে যাই। তখন কানে আসে দৈববাণীঃ ত্রিশ বছর আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থেকে তুমি কিনা শয়তানের পথ অবলম্বন করলে! তুমি কি লজ্জাহীন? সঙ্গে সঙ্গে আমার চৈতন্য ফিরে আসে। সেই থেকে আমি এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি, আল্লাহ্ আমার কী ব্যবস্থা করেন। এই বলে তরুণ এবার হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, এবার বল, তুমি কি জন্য এখানে এসেছ? যদি সত্যিকারের সংসারত্যাগী দরবেশ দেখতে চাও, তাহলে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাও।

কিন্তু পাহাড়-চূড়ায় ওঠতে না পেরে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ আবার তরুণ দরবেশের কাছে ফিরে এলেন। তখন তরুণ নিজেই তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, ঐ পাহাড়ের মাথায় এক কুঁড়েঘরে এক সাধক বহু দিন ধরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। একবার এক ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বললেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া লোকের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব নয়। তাঁর কথা শুনে কেমন যেন জেদ চেপে গেল তাপসের মাথায়। তিনি নিজে রুজি-রোজগারের কোন চেষ্টা করবেন না। দেখি আল্লাহ্ রুজির ব্যবস্থা করেন কি না। আর সত্যিই তিনি কয়েকদিন পানাহার করলেন না। আল্লাহ্ মৌমাছিদের আদেশ দিলেন, তারা যেন তাঁকে নিয়মিত মধু সরবরাহ করে।

তাঁর কথা হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-কে স্পর্শ করে। তাঁর মনে এই প্রতীতি জন্মায় যে, আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা থাকলে তিনিই ব্যবস্থা করেন। দরবেশের কাছ থেকে ফেরার পথে তিনি দেখলেন, এক অন্ধ পাখী গাছের ডাল থেকে মাটিতে পড়ে গেল। তার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনে কৌতূহল জাগল, এই পাখীটি কিভাবে আহার যোগাড় করে দেখা যাক। দেখলেন, এটি ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁড়ে ফেলল। আর অমনি খাবার ভর্তি একটি সোনার পেয়ালা, আর পানিপূর্ণ একটি রূপোর পাত্র বে'র হয়ে এল। পাখী পানাহার সম্পন্ন করে আবার গাছের শাখায় ওঠে গেল আর পাত্র দুটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে তাঁর আল্লাহ্ নির্ভরতা আরও বেড়ে গেল। আর তিনি সফলও হলেন। আমরা দেখছি, স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর ওপর প্রসন্ন হয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দেন।

একদিন এক নদী তীরে বসে তিনি ওযু করছেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল সামনের বাড়ীর ছাদে এক রূপসীর ওপর। সে বলল, দূর থেকে তোমাকে আমি পাগল ভেবেছিলাম। কাছে এলে মনে হল তুমি এক আলেম। আরও কাছে এলে ভাবলাম বুঝি দরবেশ। তারপর দেখলাম, তুমি কিছুই নও।

হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ বললেন, কি করে বুঝলে?

সুন্দরী বললেন, তুমি পাগল হলে ওযু করতে না। আলেম হলে পর নারীর দিকে চাইতে না। আর দরবেশ হলে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে তুমি তাকাতেই পারতে না। একথা বলে মহিলা অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন তিনি বুঝলেন, আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হল।

একবার তিনি চলেছেন নৌকাযোগে। আরও অনেক যাত্রী ছিল নৌকায়। ছিল এক মুক্তা ব্যবসায়ী। হঠাৎ কি করে যেন তাঁর একটি মুক্তা হারিয়ে গেল। আর সবাই মিলে সন্দেহ করল হযরতকে। নানা কথা বলে তারা তাঁকে অপমান করতে শুরু করে। শেষে সহ্য করতে না পেরে তিনি আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন, আল্লাহ্ গো!! আপনি নিশ্চয় জানেন আমি চোর নই। অতএব আপনি আমার সম্মান রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তাঁর আকুল প্রার্থনার সাড়া দিলেন। দেখা গেল, নদীর অসংখ্য মাছ এক একটি মুক্তাদানা মুখে নিয়ে ভেসে উঠল নৌকার চারপাশে। তিনি তখন একটি মাছের মুখ থেকে মুক্তা খসিয়ে নিয়ে বণিককে দিলেন। যাত্রীরা এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। ক্ষমা চাইল। তিনি তাদের ক্ষমাও করলেন। এ ঘটনার পর থেকে তিনি যুননুন নামে পরিচিত হন। মাছের মালিককে যুননুন বলা হয়।

তাঁর সাহচর্যে এসে তাঁর বোনও এক মহিমান্বিতা তাপসী হয়ে ওঠেন। এই অপাপবিদ্ধা নারী পবিত্র কোরআন পাঠকালে সেই আয়াতটির সম্মুখীন হলেন, যাতে রয়েছে– আমি (বনী-ইসরাঈলদের) ওপর মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছি। আয়াতটি পাঠ করে তিনি প্রার্থনা করেন, আল্লাহ্ গো, আপনি বনী ইসরাঈলদের বেহেশতী খাবার উপহার দিলেন। অথচ রাসূলুল্লাহর উম্মতদের দিলেন না। আপনি যতক্ষণ না আমাকে তা দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমি বসব না। এই রইলাম দাঁড়িয়ে। আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন। আকাশ থেকে মান্না ও সালওয়া বর্ষিত হতে লাগল। অবাক বিস্ময়ে আল্লাহর এই প্রিয় সেবিকা আল্লাহর প্রেমে বিভোর হয়ে লোকালয় ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

একবার হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ এক পহাড়ের মাথায় প্রচুর কুষ্ঠরোগী দেখতে পেলেন। জানা গেল, এখানে এক কুটিরে এক দরবেশ থাকেন। বছরে মাত্র একবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রোগীদের শরীরে ফুঁ দেন। আর তারা রোগমুক্ত হয় তিনি আবার চলে যান তাঁর কুঁড়ে ঘরে। বর্তমানে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে। রোগীরা তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে তিনি সত্যিই বেরিয়ে এলেন। শীর্ণ আর দুর্বল শরীর। চোখ দুটি ঢুকে গেছে ভেতরে। কিন্তু হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ বুঝতে পারলেন, তাঁর বহির্গমনের প্রভাবে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সমগ্র পর্বত যেন কম্পমান। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি একবার সস্নেহ দৃষ্টি মেলে দিলেন রোগ-ক্লিষ্ট লোকগুলোর দিকে। তারপর আকাশের দিকে তাকালেন। পরে তাদের শরীরে ফুঁ দিলেন আর দেখতে দেখতে সব রোগী সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল। এবার তিনি ঘরে ঢুকলেন। হঠাৎ কাপড়ে পড়ল টান। তিনি হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-কে দেখতে পেলেন। যুননুন রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি জাহেরী রোগের চিকিৎসা করলেন। এবার আমার বাতেনী রোগের চিকিৎসা করুন হুযুর।

দরবেশ বললেন, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন যুননুন। তাঁকে ছেড়ে আপনি অন্যের আঁচল চেপে ধরছেন। এটা বিরক্তির সঙ্গে আল্লাহ্ লক্ষ্য করছেন। সুতরাং তিনি হয়ত এবার আপনাকে নিজের হাতে না রেখে তারই হাতে সোপর্দ করবেন। একথা বলে তিনি কুটিরে ঢুকে পড়লেন।

একদা হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ আকুল ভাবে কাঁদতে থাকেন। তার কারণ, তিনি এক রাতে সেজদাবনত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন। আর স্বপ্নে দেখেন, আল্লাহ বলছেন, তিনি এই সৃষ্টিজগতকে দশ ভাগে ভাগ করেন। তার ন'ভাগই দুনিয়ার প্রতি আসক্তি দেখান। মাত্র একভাগ কোন আকর্ষণ অনুভব করল না। এই এক ভাগকে আবার দশ ভাগ করা হল। আর তাদের সামনে রাখা হল জান্নাত। সেখানেও ন'ভাগই জান্নাতের প্রতি আকৃষ্ট হল। শুধু এক ভাগ রইল নির্বিকার। তিনি তখন তাদের সামনে জাহান্নামকে উপস্থাপন করলেন। কিন্তু তখনও তারা নির্বিকার। সামান্যতম ভয়ও তাদের স্পর্শ করল না। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জান্নাতের প্রতি অনুরাগ দেখালে না। আবার জাহান্নাম থেকেও মুক্তি কামনা করলে না। আসলে তোমরা কী চাও?

তারা বললেন, আমরা কী চাই, আপনি তা জানেন প্রভু। আমরা কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টি চাই। আমাদের অন্য কোন বাসনা নেই। আমরা শুধু আপনাকেই চাই। এই ক্ষুদ্র দলটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন কিনা, হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ হয়ত সেই কথা ভেবে অস্থির আবেগে কাঁন্নাকাটি করতে থাকেন।

একদিন একটি ছেলে এসে নিবেদন করল, হযরতের সেবায় সে এক লক্ষ দীনার দান করতে চায়। যুননুন রহমাতুল্লাহ তাঁকে সবর করতে বললেন। কেননা, ছেলেটি তখনও নাবালক। তাঁর কথা শুনে ছেলেটি ফিরে গেল। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে সে আবার এসে হযরতের দরবারে তওবা করে ঐ লক্ষ দীনার দান করে। কিছুদিন পরে ছেলেটি আবার তাঁদের কাছে এসে দেখতে পেল, তাঁরা খুবই অভাব-গ্রস্ত। অর্থের প্রয়োজন। অথচ তাঁরা কপর্দক-শূন্য। তখন সে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর কাছে গিয়ে আফসোস করে বলল, আমার কাছে যদি আরও এক লক্ষ দীনার থাকত, তাহলে আমি তাও দিয়ে দিতাম।

তার কথা শুনে হযরত বুঝলেন; ছেলেটি দরবেশ জীবনের গুরুত্ব এখনও অনুধাবন করতে পারেনি। তার মনে এখনও অর্থ-ভাবনা বেশ সক্রিয়, এ বিষয়ে তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত। তিনি তিন দেরহাম মূল্যের কিছু জিনিস কিনে আনার জন্য তাঁকে এক আতর বিক্রেতার কাছে পাঠালেন। ছেলেটি যা কিনে আনল, তা গুঁড়া করে তিনটি গুলি পাকিয়ে সূচ বিদ্ধ করে আনতে বললেন। সে তাই করল। এবার হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ গুলি তিনটির ওপর ফুঁ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো মূল্যবান মণিতে পরিণত হল। তিনি সেগুলোর দাম যাচাই করবার জন্য তাকে জহুরির কাছে পাঠালেন। কিন্তু বিক্রি করতে বারণ করলেন। নির্দেশমতো মণিগুলো জহুরিকে দেখালে তারা প্রতিটির জন্য এক লক্ষ দীনার মূল্য ধার্য্য করল। তখন তিনি ছেলেটিকে বললেন, দেখলে তো, দরবেশগণ অর্থের প্রত্যাশী নন। বরং তাঁরা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেন।

ছেলেটির চৈতন্যদয় হতে দেরী হল না। সে আল্লাহর কাছে তওবা করল। আর তার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মন থেকে অর্থের মোহ মুছে গেল চিরদিনের জন্য।

হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহ বলেছেন, তিনি অসংখ্য লোককে আল্লাহর পথে ডাক দিয়েছেন। কিন্তু সাড়া পেয়েছেন মাত্র একজনের কাছ থেকে। সে এক রাজকুমার। একদিন মসজিদের পাশ দিয়ে সে কোথাও যেন যাচ্ছিল। হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহ তখন উপস্থিত শ্রোতাদের বলছিলেন, যে দুর্বল সবলের বিরুদ্ধে দ্বন্দে লিপ্ত হয়, তার চেয়ে নির্বোধ আর কে আছে? কথাটা কানে গিয়েছিল রাজপুত্রের। সে এসে হযরতের কথার মর্ম জানতে চাইল। তিনি বললেন, দেখ, মানুষ কত দুর্বল। আর তার তুলনায় আল্লাহ্ কত লক্ষ কোটি গুণ সবল। তবুও দুর্বল মানুষ মহাশক্তিধর আল্লাহর বিরোধিতা করে। এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতার প্রমান আর কী আছে?

রাজপুত্রের মুখখানি মলিন হয়ে গেল। একটা কথাও সে বলল না। নীরবে চলে গেল। পরদিন এসে সে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর দীদার লাভের উপায় কি? হযরত বললেন, দুটি উপায় আছে। একটি ছোট, অন্যটি বড়। সে যদি ছোট উপায় অবলম্বন করতে চায়, তাহলে তাকে পাপ কাজ ছেড়ে দিতে হবে। দুনিয়ার কথা ভুলে যেতে হবে। পরিহার করতে হবে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা। আর যদি সে বড় উপায়টি গ্রহণ করতে রাজি থাকে, তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া তাকে সবকিছু ছাড়তে হবে। বুকটাকে খালি করতে হবে। দুটির মধ্যে অবশ্য বড়টিই উত্তম।

রাজকুমার উত্তম পথটিই বেছে নিল। তখুনই খুলে ফেললো তার মহামূল্যবান রাজ পোশাক। পরে নিল মোটা একটা কম্বল। আর দরবেশগণের আসরে বসে আল্লাহর ধ্যান-এবাদতে বিভোর হয়ে গেল। পরবর্তীকালে এই ভাগ্যবান রাজার দুলাল সিদ্ধ পুরুষে পরিণত হয়।

হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ বলেন, জড়-বস্তুও আল্লাহর ওলীদের কথা মেনে চলে। একদিন তিনি যখন তাঁর ভকতদের একথা বলছিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরত আবু জাফর আহরার রহমাতুল্লাহ। তাঁর বর্ণনা মতে, হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি যদি এই আসনখানাকে বলি যে, ঘরের চারপাশে একবার ঘুরে এস, তাহলে এটা তাই করবে। সত্যিই, তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আসনখানা ঘরের চারদিকে ঘুরে যথাস্থানে এসে স্থির হয়ে যায়। আর এই অলৌকিক কান্ড দেখে এক তরুণ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণত্যাগ করে। কথিত আছে, তাকে ঐ আসনেই স্নান করিয়ে কাফন-দাফন করা হয়।

একবার এক ঋণী ব্যক্তি ঋণ মুক্তির ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি মাটি থেকে একখণ্ড পাথর তুলে তার হাতে দিয়ে বললেন, এটি বাজারে বিক্রি করে দেনা শোধ কর। লোকটি দেখল, পাথরখণ্ডটি হঠাৎ জমররদ পাথরে পরিণত হয়েছে। আর বাজারে তা বিক্রি হয়ে গেল চারশ' দেরহামে। ঋণ পরিশোধ করতে অতঃপর তার আর অসুবিধা হল না।

মিসরের এক তরুণ বড় দরবেশ বিরোধী। তাঁদের প্রতি তার প্রচুর অনীহা। হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ তা জানতেন। তিনি একদিন তাকে একটি আংটি দিয়ে কোন এক রুটিওয়ালার কাছে বন্ধক রেখে একটি দীনার ধার আনতে বললেন। তার কাছে গেলে রুটিওয়ালা বললেন, এটি রেখে আমি মাত্র এক দেরহাম ধার দিতে পারি। তরুণ ফিরে এসে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-কে একথা জানান। তখন তিনি তাঁকে এক জহুরির কাছে যেতে বললেন। জহুরি সেটি এক হাজার দেরহাম দিয়ে কিনতে চাইল। আর তরুণ ফিরে এসে একথাও হযরতকে জানান। হযরত বললেন, দরবেশ সম্বন্ধে তোমার ধারণা ঐ রুটিওয়ালার মতো। বড় লজ্জা পেল তরুণ। তার অজ্ঞতা দূর হল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাধকদেরও সাধ থাকে। কিন্তু প্রবল সংযমের সাহায্যে তাঁরা তা অবদমিত করেন। একদা হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর মনেও সিরকা খাওয়ার ইচ্ছা জাগে। তিনি তা দমিয়ে রাখেন দীর্ঘ দশ বছর। কিন্তু এক ঈদের রাতে আর পেরে ওঠলেন না। তখন বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর মনকে বোঝালেন, আজ রাতে দু'রাকায়াত নামাজের মধ্যে যদি সমগ্র কোরআন খতম করা সম্ভব হয়, তাহলে সিরকা খাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মন রাজি হয়ে গেল। শর্ত মতো নামাজ শেষ করে তিনি যখন সিরকার পেয়ালা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলেন, তখন তাঁর ভেতরের মানুষটি বলে উঠল, এভাবে প্রবৃত্তিকে খুশী করা ঠিক নয়। তিনি পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন।

কিছুক্ষণ পরে এক লোক এক ডেকচি সিরকা এনে হাজির। গরীব দিন-মজুর সে। বহুদিন ধরে তার ছেলেমেয়েরা সিরকার বায়না ধরে আসছে। কিন্তু গরীব বলে সে তার আয়োজন করতে পারেনি। এখন ঈদ উপলক্ষে কোন রকমে সে গত রাতে সিরকা তৈরী করেছে। তারপর রাতে স্বপ্ন দেখে, রাসূলে করীম (সাঃ) তাকে বলছেন, হাশরের মাঠে তুমি যদি আমার সাফায়াত চাও, তাহলে তাড়াতাড়ি সিরকার ডেকচি নিয়ে যুননুন মিসরীর দরবারে চলে যাও। আর তাঁকে বল, সে যেন খুশী মনে এই ডেকচি থেকে কিছু সিরকা খেয়ে নেয়।

একথা শুনে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ কেঁপে ওঠলেন আর অনেকদিন পর তিনি কিছু সিরকাও গ্রহণ করলেন।

আগেই বলা হয়েছে, এই আধ্যাত্মিক পুরুষকে মিসরবাসীরা কাফের আখ্যা দেয়। তখন মিসর ছিল বাগদাদের অধীন। বাগদাদের খলীফা ছিলেন মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ্। খলীফার কাছে মিসরবাসীরা হযরত যুনযুন রহমাতুল্লাহ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। খলীফা তাঁকে গ্রেফআর করার আদেশ দেন। তাঁর হাতে পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে তাঁকে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। পথে এক বুড়ী তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় নেই বাছা। খলীফাও আল্লাহর বান্দা। আর এক ভিস্তি পানি পান করিয়ে তাঁর তৃষ্ণা মেটালেন। বিনিময়ে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ তাকে একটি মুদ্রা বখশিশ দিয়ে গেলেন।

কিন্তু সে এই বলে তা গ্রহণ করল না যে, বন্দীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা কাপুরুষতা। খলীফার নির্দেশে হযরত যুনযুন রহমাতুল্লাহ-এর চল্লিশ দিন কারাবাস হয়। এ সময় হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ-এর বোন প্রতিদিন তাঁকে একটি করে রুটি দিতেন। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর দেখা গেল, সব রুটি জমা আছে। একটিও তিনি খাননি।

হযরত বিশর রহমাতুল্লাহ-এর বোন বড় দুঃখ পেলেন। তাঁর প্রেরিত রুটি সম্পূর্ণ হালাল, নির্দোষ। তবুও হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ তা স্পর্শ করেননি। তার কারণ কী?

কারণটা এই, রুটি এসেছিল কারারক্ষীর অপবিত্র হাত দিয়ে। এই জন্য তিনি তা খাননি।

কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পথে তিনি পা পিছলে পড়ে যান। আর কপালে ভীষণ চোট পান। পরে তাঁকে খলীফার দরবারে হাজির করা হয়। খলীফা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। আর তিনি সেগুলোর সুস্পষ্ট উত্তরও দেন। ফলে, খলীফা ও তাঁর অমাত্যবর্গ অভিভূত হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সসম্মানে তাঁকে পাঠিয়ে দেন মিসরে।

হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর এক শিষ্য কঠোর সাধনায় লিপ্ত হন। তিনি একাধারে চল্লিশ দিন করে চল্লিশ বার নির্জন ধ্যানে রত হন। হজ্জও আদায় করেন চল্লিশ বার। তাছাড়া একটানা চল্লিশ বার সারারাত এবাদতে মগ্ন ছিলেন। অথচ তিনি একদিন গুরুর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, তাঁর সাধনার কোন ফল ফললো না। আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কথা বললেন না। তাঁর দিকে চোখ তুলেও তাকালেন না। বেলায়াতও দিলেন না। কোন গুপ্ত তত্ত্বও তাঁর কাছে প্রকাশিত হল না। তিনি আরও বললেন, এসব কথা বলে তিনি তাঁর নিজের গুণকীর্তন করছেন, তা নয়। বরং তাঁর দীনতা আর কাতরতার কথাই নিবেদন করেছেন মাত্র। আর আল্লাহর নিন্দা করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি এখনও কায়মনো-বাক্যে আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনে আগ্রহী। এবাদতে তাঁর হৃদয় শিথিল হয়ে আসছে, তাও তিনি বলতে চান না। তবে তাঁর আশংকা, হয়ত দিন ফুরিয়ে আসছে। এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই যদি জীবন শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাঁর কী হবে। সারাজীবন শুধু আশা পোষণ করে কেটে গেল।

শিষ্যের অভিমানী অনুযোগ শুনে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ বললেন, আজ রাতে পেট পুরে খাও-দাও। আর এশার নামাজ আদায় না করে সারারাত ঘুমাও। তোমার বন্ধু (আল্লাহ) যখন খুশী মনে দেখা দিলেন না, তখন হয়ত কঠোর রূপেই দেখা দেবেন।

গুরুর নির্দেশে তিনি তাই করলেন। এমনকি এশার নামাজ না পড়েই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু স্বস্তি পেলেন না। অতএব নামাজ আদায় করলেন। তারপর আবার বিছানায় গেলেন। ঐ রাতেই তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বলছেন, তোমার বন্ধু তোমাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, আমার দরবারে এসে যে ধৈর্য্যধারণ না করে বিরক্ত হয়, সে কাপুরুষ। আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে ধৈর্য্য অত্যন্ত জরুরী। তাতে বিরক্ত হওয়া চলে না। আল্লাহ্ আরও বলেছেন, তোমার চল্লিশ বছরের আশা পূর্ণ হবে। আল্লাহ্ তোমার প্রার্থিত বস্তু দান করবেন। তবে ঐ ডাকাত যুননুন রহমাতুল্লাহ-কে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে মিথ্যুক। তাকে আমি শহরের বুকে অপমান করে ছাড়ব। তাহলে সে আর আমার প্রেমিক ও শরণাগত দাসদের সঙ্গে বঞ্চনা ও প্রতারণা করবে না।

হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর শিষ্য জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করলেন। আর মুরশিদের কাছে গিয়ে স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বললেন। হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ যখন শুনলেন আল্লাহ্ তাঁকে সালাম জানিয়ে মিথ্যুক দরবেশ বলেছেন, তখন তাঁর চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এখন প্রশ্ন, হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর মতো একজন সিদ্ধ পুরুষ এশার নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ার পরামর্শ দিলেন কেন? এমন অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত কি করে হয়?

এর উত্তর– যিনি প্রকৃত মুরশিদ, তিনি মূলত একজন চিকিৎসকের মতো। চিকিৎসকগণ প্রয়োজনে বিষকেও ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করেন। হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ যখন বুঝতে পারলেন, ঐ ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে, কেবল তখনই তিনি ঐ রকম বিধান দেন। তিনি অবশ্য এও জানতেন যে, তাঁর শিষ্য নামাজ আদায় না করে পারবেন না। যেমন– আল্লাহ নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর পুত্র কোরবানী করার নির্দেশ দেন। কিন্তু আল্লাহ্ জানতেন, পুত্র কোরবানী হবে না।

এবাদতের ক্ষেত্রে এমন বহু ঘটনা দেখা যায় আপাতদৃষ্টিতে যা শরীয়ত বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তা শরীয়তসম্মতই বটে। যেমন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রথমে পুত্র কোরবানীর আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু পরে তা আবার নিষেধ করা হয়। হযরত খিযির রহমাতুল্লাহ এক নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করেন। আপাতদৃষ্টিতে তার কোন কারণ ছির না। কিন্তু তাও স্বয়ং আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়েছে।

এক চাষী খুব কষ্ট করে কাবা তওয়াফ করেছিল। তা দেখে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আল্লাহর বন্ধু?

জি হ্যাঁ।

তিনি তোমার কাছে না দূরে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাছেই।

তিনি তোমার পক্ষে না বিপক্ষে?

পক্ষে।

তাহলে তোমার এ দূরবস্থা কেন?

তিনি বললেন, বিরুদ্ধাচরণের কষ্ট যত বেশীই হোক, নৈকট্য অর্জনের শান্তির কাছে তা কিছুই নয়।

একবার এক মহিলাকে তিনি প্রশ্ন করেন, প্রেমের সীমা কোন্ খানে?

মহিলা উত্তর দেন, প্রেমের কোন সীমা নেই।

কেন নেই?

যেহেতু প্রেমাস্পদ অসীম।

এক আল্লাহ প্রেমী ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর বন্ধু বলে প্রচার করতেন। অসুস্থাবস্থায় হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ তাঁকে দেখতে গেলেন। কথায় কথায় ঐ ব্যক্তি বললেন, আল্লাহর দেওয়া কষ্টকে যে কষ্ট বলে মনে করে, সে আল্লাহর বন্ধু নয়। হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ সুযোগ পেয়ে বললেন, নিজেকে যে আল্লাহর বন্ধু বলে প্রচার করে, সে কখনও আল্লাহর বন্ধু হতে পারে না। এ কথায় লোকটির চৈতন্যোদয় হয়। তওবা করে তিনি বললেন, আজ থেকে আর কোনদিন নিজেকে আল্লাহর বন্ধু বলে প্রচার করব না।

একবার হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ পীড়িত হয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে এক ব্যক্তি বললেন, বন্ধুর দেওয়া অসুখ আরামদায়কই হয়। তিনি বলেন, তুমি যদি তা বুঝতে, তাহলে তাঁর কথা অমন অসৌজন্যমূলক ভাবে বলতে পারতে না।

তিনি একবার তাঁর এক বন্ধুকে লেখেন, আল্লাহ আমাদের দু'জনকে অজ্ঞতার চাদর দিয়ে ঢেকে পার্থিব বিষয় থেকে অদৃশ্য করে রেখেছেন। আমরা শুধু তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করব। আর তিনি আমাদের ওপর খুশী থাকবেন।

একবার বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি দেখেন, এক অগ্নি-পূজক বরফে ঢাকা মাঠের ওপর শষ্যবীজ বুনছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সারা মাঠ বরফে ঢাকা। পাখীরা শষ্যদানা খুঁজে পাচ্ছে না। তারা যাতে খাবার পায়, আর তাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ আমার ওপর দয়া বর্ষণ করেন, সেই জন্য এটা করছি। হযরত বললেন, আমি এ ধরনের কাজ পছন্দ করি না। সে বলল, আপনি পছন্দ করুন আর না করুন, এ কাজ আমার জন্য ফলদায়ক।

এর কিছুদিন পর হজ্জে গিয়ে তিনি দেখলেন, ঐ অগ্নিপূজক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মতো কাবা শরীফ তওয়াফ করছে। হযরতকে দেখে তিনি বললেন, দেখলেন তো, আমার সে দিনের ছড়ানো বীজগুলো আজ কেমন ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ সেদিন আমার কাজ কবুল করে খুশী হয়ে আমাকে এ পবিত্র কাবার পানে আহ্বান করেছেন। আর আমি তা তওয়াফ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

তাঁর কথা শুনে হযরতের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়। তিনি তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে বললেন, প্রভু গো! এক মুঠো শষ্যকণা ছড়ানোর পুরস্কারস্বরূপ আপনি চল্লিশ বছরের অগ্নি-পূজককে আপনার সন্তুষ্টি ও হেদায়াত নসীব করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য-বাণী শোনা গেল, আমার ইচ্ছা ও শক্তির কথা জানতে চেয়ো না। আমি যার প্রতি সন্তুষ্ট হই তাকে মহাসৌভাগ্যশালী করি। আমার ইচ্ছা ও কাজের ব্যাপারে কারও কিছু বলার নেই।

হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন বলতেন, প্রভু আমার! আপনার পাক দরবারে হাজির হবার জন্য আমি পা পাব কোথায়? আমার পা যে অপবিত্র! আর আমি কোন্ চোখ দিয়ে আপনার পবিত্র কেবলার দিকে তাকাব। আমার চোখ দুটি যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কলুষিত। আর কোন মুখে আমি আপনার প্রশংসা করব। আমার মুখ যে নিষ্পাপ নয়। তবুও নানা অযোগ্যতা সত্ত্বেও নির্লজ্জের ন্যায় আমি আপনার পবিত্র দরবারে এসে দাঁড়ালাম।

নামাজ শেষ করে তিনি আবারও মোনাজাত করতেন, প্রভু গো! এখন আমার সামনে যেসব বিপদ রয়েছে, আমি সেসব থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছি। আর শেষ বিচারের দিনে যেসব বিপদ-আপদ আমাকে ঘিরে ধরবে, সেগুলো থেকেও আপনার শরণ নিচ্ছি। আপনি নিজ গুণে সে দিনের লজ্জাজনক শাস্তি ও বিপদ থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন।

যুননুন মিসরীর অমূল্য উপদেশ ঃ

১. চোখের পর্দাই সেরা পর্দা। শরীয়ত-বিরোধী কাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে মানুষকে তা বাধা দেয়।

২. খাদ্য-পূর্ণ উদরে কখনও জ্ঞান ও বুদ্ধির ঠাঁই হয় না।

৩. যে তওবার পর মানুষ পুনরায় পাপ কাজে লিপ্ত হয়, সে তওবা মিথ্যা।

৪. পরহেজগারী রূপ-ধনে যাঁর অন্তর পূর্ণ, তিনিই বড় ধনবান।

৫. অল্প আহারে স্বাস্থ্যের উন্নতি আর অল্প পাপে আত্মার অবন সাধিত হয়।

৬. বিপদে ধৈর্য্যধারণ করা খুব বড় কথা নয়। বরং বিপন্ন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই হল বাহাদুরী।

৭. যার মনে আল্লাহ-ভীতি বিদ্যমান, সে সৎ পথ লাভ করে। তার বিপরীত ব্যক্তি পথ-ভ্রষ্ট। আর সাধকের সাধনাকে যারা ভীতির চোখে দেখে, তাদের ওপর আল্লাহর গজব পতিত হয়।

৮. ছয়টি কাজ মানুষের সর্বনাশের কারণ।
(ক) সৎ কাজ না করা,
(খ) শয়তানের অনুগত হওয়া,
(গ) মৃত্যুকে নিকটবর্তী না করা,
(ঘ) আল্লাহর খুশীর দিকে লক্ষ্য না রেখে মানুষকে খুশী করার চেষ্টা করা,
(ঙ) প্রবৃত্তির তাড়নায় নবীজীর নীতি বর্জন করা ও
(চ) জ্ঞানী সাধকগণের দোষ-ত্রুটিকে বড় করে দেখা।

৯. মারেফত হাসিল করার জন্য আল্লাহর সঙ্গে সেই বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে, যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গে।

১০. প্রেমের অমিয় সুধা পান করার শর্ত হল, প্রেমিকের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর করে, তা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে প্রেমের পথে অগ্রসর হওয়া।

১১. বিরহীর কাছে ভয়ের আগুন হল সমুদ্রের কাছে এক ফোঁটা পানির মতো।

১২. বন্ধু বিচ্ছেদের চেয়ে হৃদয়-বিদারক এ জগতে আর কিছু নেই।

১৩. তিনিই প্রকৃত সাধক যিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলেন। তাঁর মধ্যে যা নেই, তেমন কথা তিনি বলেন না। তিনি যখন নীরব থাকেন তখন তাঁর কাজগুলোই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে। প্রার্থিত বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর বৈরাগ্যই প্রকৃত অবস্থা।

১৪. তত্ত্ব-জ্ঞানী আল্লাহর ভয়ে সদা-সর্বদা ভীত। কারণ, তিনি প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কাছে উপস্থিত থাকেন।

১৫. প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানী হতে হলে আল্লাহ-ভীতি থাকতে হবে। অহঙ্কারী বা আত্মাভিমানীকে আরেফ বা তত্ত্ব-জ্ঞানী বলা চলে না। আল্লাহ্ বলেন, তাঁর দাসদের মধ্যে আলেমগণই তাঁকে সর্বাধিক ভয় করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৬. আরেফগণের অবস্থা সব সময় একরূপ থাকে না। অদৃশ্য ইঙ্গিতে তা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। কাজেই তিনি একই অবস্থায় থাকতে পারেন না।

১৭. মারেফতের জ্ঞানে সমৃদ্ধ বলে আরেফগণের জ্ঞান সবচেয়ে বেশী। মারেফত তিন প্রকার। যেমন–
(ক) আল্লাহর তৌহীদ-তত্ত্ব,
(খ) যুক্তি-তত্ত্ব ও
(গ) তৌহীদ সম্পর্কিত গুণাবলীর তত্ত্ব।

১৮. যিনি অন্তদৃষ্টি দিয়ে আল্লাহকে দেখেন। আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে এমন মারেফত-তত্ত্ব প্রকাশ করেন, যা দুনিয়ায় আর কারোর কাছে প্রকাশিত হয় না।

১৯. মারেফতের আসল বস্তু হল, আল্লাহর গুপ্ত-তত্ত্বের সন্ধান লাভ। যার ফলে নূরে এলাহীর সূক্ষ্ম-তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

২০. যিনি যত বড় আরেফ, আল্লাহর ভয়ে তিনি তত বেশী ভীত ও তওবাকারী হবেন। যে যতটা সূর্যের নিকটবর্তী হয়, সে ততটা তাপ পায়। প্রকৃত আরেফ যিনি, তিনি জ্ঞানের সাহায্যে গোপন তত্ত্বের গুণসমূহ অবলোকন করেন। আরেফ আল্লাহর নিকটে এমনকি তাঁর সঙ্গেই মিলিত থাকেন। তাঁর পরিবর্তন যেন আল্লাহরই পরিবর্তন। আল্লাহর কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়। তাঁর চোখ আল্লাহরই চোখ। রাসূলুল্লাহ বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন, আমি যখন আমার দাসকে ভালোবাসি, তখন প্রভু হওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁর কান হয়ে যাই, সে তখন তা দিয়ে শোনে। আমি তাঁর চোখ হয়ে যাই, সে তা দিয়ে দেখে। আমি তার মুখ হয়ে যাই, সে তা দিয়ে কথা বলে। আমি তার হাত হয়ে যাই, সে তা দিয়ে ধারণ করে।

২১. যাহেদ ও নির্লোভ ব্যক্তি আখেরাতের বাদশাহ আর আরেফ হল যাহেদগণের বাদশাহ।

২২. অসুস্থ হৃদয়ের চারটি লক্ষণ। যথা–
(ক) সে এবাদতে স্বাদ পায় না,
(খ) তার মনে আল্লাহর ভয় থাকে না,
(গ) পার্থিব কার্যকলাপ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না,
(ঘ) জ্ঞানের কথা শুনেও তার চর্চা করে না।

২৩. বিদ্যাচর্চা করাই বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য। আর চর্চার সঙ্গে ইখলাস এবং প্রেমের সাথে সততা অটুট থাকা খুবই জরুরী।

২৪. তওবা দু'রকমের। যথা–
(ক) আমিত্ব ত্যাগের উদ্দেশ্যে তওবা করা এবং
(খ) আল্লাহর দরবারে লজ্জাবশতঃ তওবা করা।

২৫. প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য তওবা রয়েছে। যেমন–
(ক) অবৈধ চিন্তা ত্যাগ করা মনের তওবা,
(খ) অশ্রাব্য কথা বলা থেকে বিরত থাকা কানের তওবা,
(গ) অবৈধ বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকা হাতের তওবা,
(ঘ) নিষিদ্ধ পথে গমন করা থেকে ফিরে থাকা পায়ের তওবা,
(ঙ) ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা হল গুপ্তাঙ্গের তওবা।

২৬. কোন কিছু চাইবে নম্রতা ও ভদ্রতার সঙ্গে, রুক্ষতা ও আদেশ-নির্দেশের ভঙ্গিতে নয়।

২৭. অন্যায় করা মাত্র আল্লাহর শাস্তির ভয় মনে জেগে ওঠাই হল লজ্জার লক্ষণ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৮. প্রকাশ্যে গুনাহ ও অবাধ্যতা প্রকাশ করা, গোপনে অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকা ও সর্বদা আল্লাহর ভয় মনে রাখাই হল ধর্ম-ভীরুতার লক্ষণ। ধর্ম-ভীরুগণ সর্বদা মনে করেন যে, আল্লাহ আমাদের সকল কাজ দেখেন এবং আমরা তাঁর চোখের সামনে আছি।

২৯. পবিত্র ও উত্তম বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যে বস্তুকে মহৎ, মহান ও শ্রেষ্ঠ করেছেন, তাকে মহান বলে জানবে। আর তুমি যে আল্লহর পথে ব্যয় করতে সক্ষম হলে, সেও আল্লাহর এক বিরাট দান বলে গণ্য করবে। আর যে বস্তু আল্লাহর কাছে অপ্রিয়, তা থেকে দূরে থাকবে।

৩০. বিষয়ী লোকদের সংসর্গ থেকে দূরে থাকা আর আল্লাহপ্রেমীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করারই শামিল। যেহেতু তাঁরা আল্লাহর প্রেমিক।

৩১. আল্লাহপ্রেমীগণ প্রেম রসে ডুবে গিয়ে যে কথা বলেন, তা যেন জান্নাতী আলোর বাক্য। আর তাঁরা ভীতি-বিহ্বল হয়ে যা বলেন, তা যেন জাহান্নামের আগ্নেয় বাণী।

৩২. চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-জ্ঞান এবাদতের চাবি আর রিপুর কামনার বিরোধিতা করা দীদারে এলাহীর দর্পণ-স্বরূপ। যিনি মনে-প্রাণে ধ্যানে লিপ্ত হন, তিনি আত্মিক জগতকে নিজের চোখে দেখতে পান।

৩৩. কঠিন বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন রাখার নাম হল সন্তোষ।

৩৪. যে আল্লাহর ইচ্ছা ও নিজের ভাগ্যের ওপর বিশ্বাসী ও সন্তুষ্ট, সেই প্রবৃত্তি বা রিপুকে চিনতে পেরেছে। চোখ দিয়ে দেখার সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক এবং অন্তদৃষ্টি দিয়ে অবলোকনের সঙ্গে বিশ্বাসের লক্ষণ হল তিনটি। যেমন–

(ক) প্রত্যেক বস্তুতে আল্লাহর নিদর্শন দেখা,

(খ) প্রতিটি কাজে আল্লাহর দিকে ফেরা ও

(গ) প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ডাকা। বিশ্বাস বাসনাকে দমিয়ে রাখে। বাসনার স্বল্পতা যোহদ ডেকে আনে। যোহদ প্রতিষ্ঠিত করে মারেফতকে। আর মারেফত দ্বারা আখেরাতে ফুল-ফল ও ফসল পয়দা হয়।

৩৫. সামান্য বিশ্বাস সারা দুনিয়া থেকেও সেরা। কেননা, আল্লাহর প্রতি এতটুকু বিশ্বাসই মনকে আল্লাহর দিকে প্রধাবিত করে।

৩৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া কেবল মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে যেন ফেরাউনের বিছানায় উপবিষ্ট হয়।

৩৭. যে লোক কু-প্রবৃত্তির প্রতারণার প্রতি লক্ষ্য করল না বা সতর্ক হল না, সে আল্লাহর দরবারে খাঁটি হতে পারল না।

৩৮. যিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন তাঁর কোন ভয় নেই। সত্য ছাড়া জগতের সব বস্তু দূর হয়ে গেলেও তাঁর ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, যিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন, তিনি সৃষ্টির কোন পরোয়া করেন না।

৩৯. সত্য প্রদর্শনের দাবীদার শুধু বঞ্চনার শিকার নয়, বরং তার দাবীও মিথ্যা হতে পারে। কেননা, প্রকৃত সত্য-দ্রষ্টা আত্ম-প্রকাশ অপরাধ বলে মনে করে।

৪০. কোন শিষ্যই প্রকৃত শিষ্য হওয়ার দাবী করতে পারেন না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের পর তার গুরু বা মুরশিদের আনুগত্য স্বীকার করে।

৪১. যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি দমন করে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়, আল্লাহ প্রকাশ্যে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

৪২. আল্লাহকে যে ভয় করে সে অবশ্যই আল্লাহর পথে অবিচল থাকে। আর যে আল্লাহর পথে অবিচল, সে অবশ্যই মুক্তি-প্রাপ্ত হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪৩. সম্ভোগ ও তৃপ্তির অধিকারী বান্দা নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত হয়। যে লোক নিরর্থক কাজে পরিশ্রম করে, তা তার জন্য নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়।

৪৪. যে ব্যক্তি সমস্যাসমূহ থেকে মুক্তির চেষ্টা করে, সে তার চেয়েও জটিল সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি অলাভজনক বস্তুর পশ্চাদ্ধাবন করে, তার লাভজনক বস্তু বিনষ্ট হয়।

৪৫. সৎ ও সত্য কথায় যার মনে দুঃখ লাগে, বুঝতে হবে তার মর্যাদা বোধ নেই।

৪৬. যে লোকের মুখ ও মন একরূপ নয়, তার থেকে দূরে থাকতে হবে।

৪৭. আল্লাহকে স্মরণকারী স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুকে সত্ত্বর ভুলে যায়।

প্রশ্নোত্তর ঃ

হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হল, দুনিয়া কি?

তিনি উত্তর দিলেন, যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে, তাই হল অধম দুনিয়া।

প্রশ্ন ঃ অধম ব্যক্তি কে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি দীদারে এলাহীর পথ পায়নি এবং সে পথের সন্ধানও করেনি।

প্রশ্ন ঃ কার সঙ্গ অবলম্বন করা ভাল?

উত্তর ঃ যার মধ্যে 'আমি' ও 'তুমি'র প্রভেদ নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি আল্লাহকে কিভাবে চিনলেন?

উত্তর ঃ আমি সত্তা ও গুণাবলী দ্বারা তাঁকে চিনেছি। আর সৃষ্টিজগতকে চিনেছি রাসূলে কারীম (সঃ)-এর উসিলায়। কেননা, আল্লাহকে স্রষ্টা হিসাবে চেনা যায়। আর রাসূল যেহেতু মখলুক বা সৃষ্টি, অতএব সৃষ্টিকে চিনতে হয় সৃষ্টি দ্বারা।

প্রশ্ন ঃ মানুষ আল্লাহর কাছে কখন সাহায্য চায়?

উত্তর ঃ সব দিক থেকে নিরাশ হবার পর।

তাঁর কয়েকটি উপদেশ ঃ

১. এমন সহৃদয় লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন কর, যে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তোমার শরীক থাকে। এমনকি তুমি তার সাথে বিপরীত ভাব দেখালেও সে তোমার সাথে তা দেখায় না।

২. যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে পাঁচটি বস্তু দেখা যায়, ততক্ষণ সে জান্নাতের দাবী করতে পারে না। যেমন–

(ক) সৎপথে অবিচল থাকা,

(খ) জ্ঞান পরিচালনার দ্বারা কর্মপন্থা করা,

(গ) প্রকাশ্যে-গোপনে উভয় অবস্থায় আল্লাহর ধ্যান করা,

(ঘ) মৃত্যুর কথা স্মরণে রেখে পরকালের সম্বল অর্জনে ব্রতী হওয়া,

(ঙ) রোজ কিয়ামত আসার আগেই নিজের আমলের হিসাব-নিকাশ করা।

৩. মানুষের মনে আল্লহার ভয়ের নমুনা হল– আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় না করা। আর দুনিয়ায় নিরাপদ সে ব্যক্তি, যে কারও সাথে বাক্যালাপ করে না।

৪. অতীত ও ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। আর যা হবে তা দেখা যাবে। তা নিয়ে এখনই চিন্তা করে কোন ফল নেই। বরং বর্তমানকে মূল্যবান মনে করে তাকে কাজে লাগানোই হল বিজ্ঞতার পরিচয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. যাঁরা যেকোন বস্তু অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন, আল্লাহ তাঁদেরকে বেশী ভালোবাসেন। আর তাঁরাই হল প্রকৃত সুফী।

৬. কোন এক লোক বললেন, হুযুর, আমি আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, যদি আল্লাহকে চিনে থাক, তোমার জন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তবে যদি আল্লাহর পরিচয় না পেয়ে থাক, তাহলে এমন লোকের সঙ্গে পরিচয় কর, যিনি আল্লাহর পরিচয় জানেন। তিনিই তোমাকে আল্লাহর পথ দেখিয়ে দেবেন।

অবশেষে একদিন চিরাচরিত বিধান অনুযায়ী তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার মনের ইচ্ছা কি? তিনি বললেন, ক্ষণিকের জন্য হলেও আমার প্রভুকে জেনে নেওয়া। অতপর তিনি একটি প্রেমের গান আবৃত্তি করলেন।

প্রভু গো! আপনার ভয় আমাকে রোগা করেছে।
আপনাকে দেখার ইচ্ছা
আমাকে জীবিত রেখেছে।
আপনার প্রেম-বাসনা আমাকে দুর্বল করেছে।
প্রভু আমার! মূলতঃ আপনিই আপনার
করুণা ও জ্ঞান দ্বারা আমাকে জীবিত রেখেছেন।

এর অল্পদিন পরেই তিনি রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর শিয়রে উপস্থিত ছিলেন ইউসুফ ইবনে হুসাইন নামে এক ব্যক্তি। তিনি কিছু জানতে চাইলে হযরত যুননুন (র ঃ) শেষবারের মতো বললেন, এখন আমি আল্লাহর অনুগ্রহে আত্মবিস্মৃত হয়ে আছি। তুমি আমাকে অন্য দিকে নেবার চেষ্টা করো না। এই তাঁর শেষ কথা। এটি বলার পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

শোনা যায়, তাঁর ওফাতের রাতে সত্তরজন ওলী স্বপ্নযোগে দেখেন, রাসূলে কারীম (সঃ) এসে বলছেন, আল্লাহর বন্ধু যুননুন মিসরী মহাযাত্রার পথে, তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হয়েছি।

মৃত্যুর পর দেখা যায়, তাঁর পেশানীতে লেখা আছে– ইনি আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহর প্রেমেই মৃত্যুবরণ করলেন। ইনি শাহাদত-প্রাপ্ত। আল্লাহর তরবারিতে শাহাদাত লাভ করেছেন।

তাঁর পবিত্র লাশ যখন কবরস্তানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন প্রচণ্ড রোদের তাপ। শোনা যায়, তখন নাকি অসংখ্য পাখী মাথার ওপর পাখা বিস্তার করে তাঁর মরদেহ ছায়াচ্ছন্ন করে রাখে।

মরদেহ বহনের পথে এক মুয়াযজিন আজান দিচ্ছিলেন। তিনি যখন বললেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' তখন ঐ মৃত দেহ শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে আল্লাহর একত্ব ও রাসুলে কারীম রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান করেন। তা দেখে সবাই কেঁদে উঠল। বলতে লাগল, তিনি মারা যাননি। জীবিত আছেন। তারপর লাশ রেখে দেওয়া হল মাটির ওপর। বহুক্ষণ অতিক্রান্ত হল। কিন্তু জীবনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আর উর্ধ্বোত্থিত শাহাদত আঙ্গুলটিকে বহু চেষ্টা করেও নামানো গেল না। অবশেষে এভাবেই তাঁকে দাফন করা হয়। যারা তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করত, তারা এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে খুব লজ্জা অনুভব করল। মিসরের এই মহান সন্তান মানুষের মর্যাদা চির-উন্নত করে চলে গেলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
বায়েজীদ বোস্তামী
রহমাতুল্লাহ

এক অন্তঃসত্ত্বা নারী যখনই কোন সন্দেহজনক খাদ্য গ্রহণ করতেন, তখনই অনুভব করতেন, তাঁর পেটের সন্তানটি অনবরত কাঁপছে। যতক্ষণ ঐ খাবার পেটে থাকবে, ততক্ষণ ধরে এই কাঁপুনি চলবে। শেষ পর্যন্ত মুখে আঙ্গুল পুরে বমি করে তাঁকে ঐ খাবার ফেলে দিতে হত। আর বাচ্চাটিও স্থির হয়ে যেত। মায়ের গর্ভে থেকেই ঐ শিশু বেলায়াত অর্জন করেন। আল্লাহর এ এক অমূল্য সম্পদ।

যথাসময়ে ঐ মহিমান্বিতা নারী এক মহাজ্যোতির্ময় শিশুর জননী হলেন। এই শিশুই হলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তপস্বী হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ।

বোস্তাম শহরে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন এক ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। কিন্তু পিতামহ ছিলেন একজন মূর্তিপূজক। অতি অল্প বয়সে বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ পিতৃহীন হন। কিন্তু জননী ছিলেন এক অলোকময়ী নারী। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর মতো এক মহাতাপসকে গর্ভে ধারণ করার জন্য তাঁর মতো এক জননীর প্রয়োজন ছিল। পিতার অবর্তমানে তিনিই পুত্রকে আলোর পথে এগিয়ে দিলেন। তাঁকে ভর্তি করে দিলেন এক মাদ্রাসায়।

একদিন পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন তিনি। ঐ আয়াতে ছিল– আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। সূরা লুকমানের আয়াত সেটি। তিনি তাঁর শিক্ষকের কাছে আয়াতটির মর্ম জেনে নিলেন। তাঁর মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি হল। শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন।

অসময়ে তাঁকে বাড়ী ফিরতে দেখে মা উৎকণ্ঠিত হলেন। কিন্তু বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি পবিত্র কোরআনে আল্লাহর নির্দেশ পাঠ করলাম যে, আল্লাহ্ ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কিন্তু মা গো! আমি তো একসঙ্গে তা পারব না। তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। হয় আপনি আল্লাহর কাছ থেকে আমার দাবী ছাড়িয়ে নিন, না হয় আমার ব্যাপারে আপনার অধিকার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। আমিও মনে-প্রাণে একজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আত্মনিয়োগ করি।

পুত্রের কথায় জননীর হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হল। তিনি পরম খুশীতে নিজের অধিকার ত্যাগ করে তাঁকে আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করলেন।

জননীর এ আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। তাঁর এই ত্যাগের মহিমায় আল্লাহ তাঁর পুত্রকে উন্নত মর্যাদা দান করেন। আর পুত্রও তাঁর মহীয়সী জননীর প্রতি ভক্তি নিষ্ঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন।

তখন অনেক রাত। মা বললেন, বাবা বায়েজীদ, আমাকে এক গ্লাস পানি দাও তো। বড় পিপাসা পেয়েছে। মায়ের জন্য পানি আনতে গিয়ে বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ দেখেন, বাড়ীতে কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই। তাহলে? ঐ রাতেই ছুটলেন নদী থেকে পানি আনতে। কিন্তু পানি এনে দেখলেন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম থেকে মাকে জাগানো ঠিক হবে না। কিন্তু তাঁরও ঘুমানো চলবে না। যেকোন সময় তিনি পানি চাইতে পারেন। অতএব পানির পাত্র হাতে নিয়ে তিনি সারা রাত মায়ের শিথানে দাঁড়িয়ে রইলেন। শীতের রাত। হিমেল বাতাসে আর কনকনে ঠাণ্ডায় তার হাত-পা অবশ হয়ে এল। ওদিকে দু'চোখ বেয়ে নামছে ঘুম। কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি মায়ের ঘুম ভাঙার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাত শেষ হল। পূর্ব আকাশে ফুটে উঠল আলোর গোলাপ-লাল ফুল। মায়ের চোখ খুলে যেতেই তিনি দণ্ডায়মান পুত্রকে দেখতে পেলেন। বিচলিত হয়ে বললেন, এই ঠাণ্ডায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সারারাত ধরে তুমি অত কষ্ট করতে গেলে কেন বাবা! পানির গ্লাসটা শিথানে রেখে দিলেই তো পারতে। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, মা গো! আপনার পিপাসার কথা মনে রেখেই আমি আর ঘুমুতে পারিনি। দাঁড়িয়েই আছি সারা রাত।

পুত্র গর্বে মায়ের বুক ভরে গেল। দু'চোখ বেয়ে নেমে এল আনন্দের আপ্লুত অশ্রুধারা। আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে তিনি মোনাজাত করলেন, প্রভু গো! আমার ছেলেকে আপনি আপনার বন্ধুদের নেতা বানিয়ে দিন। জননীর এই আকুল প্রার্থনা কি ব্যর্থ হয়?

আর একবার মা বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। ঘরের দরজা খোলা। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। তিনি ছেলেকে একখানি পাল্লা বন্ধ করতে বলে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু দরজার কোন্ পাল্লা তিনি বন্ধ করবেন? মাকে আর জিজ্ঞেস করা যায় না। কেননা, তাতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। আর তা হবে তাঁর পক্ষে কষ্টকর। তাই তিনি এখানা খুলে দিয়ে ওখানা বন্ধ করেন। আরেকবার ওখানা খুলে দিয়ে এখানা বন্ধ রাখেন। আর এভাবে রাত ভোর হয়। দরজার পাল্লা নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সারারাত।

মায়ের যখন ঘুম ভাঙল তখন ছেলেকে ঐ অবস্থায় দেখে বললেন, তুমি এরূপ করছ কেন বাবা? ছেলে সব কথা খুলে বললেন। ছেলের জন্য তাঁর কষ্ট হল খুব। কিন্তু আনন্দও কম পেলেন না। এমন পুত্র রত্ন পেয়েছেন বলে তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আর পুত্রের মঙ্গল কামনা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন।

বলাবাহুল্য, মহিমাময় আল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে মায়ের প্রার্থনা কবুল করেন। ধন্য জননী আর ধন্য পুত্র!

জননীর কাছে বিদায় নিয়ে তিনি সিরিয়া যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে একটানা তিন বছর নির্জন অরণ্যে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হন। শুধু তাই নয়, এ সময়ে তিনি অন্তত একশ' তেরোজন সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের প্রসন্ন দৃষ্টি ও আশীর্বাদ লাভ করেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন হযরত জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ।

একদিন হযরত জাফর রহমাতুল্লাহ তাঁকে তাক থেকে একখানি বই আনতে বললেন। কিন্তু বইখানি কোন্ তাকে রয়েছে তিনি জানতেন না। জিজ্ঞেস করলে হযরত জাফর রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি কতদিন ধরে এখানে আছো, অথচ কোন্ তাকে বই আছে জানো না?

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনার সামনে মাথা উঁচু করে এদিকে-ওদিকে তাকাবার তো আমার প্রয়োজন ছিল না। কোন কিছু দেখার জন্য আমি এ দরবারে আসিনি। হযরত বুঝলেন, তাঁর এ শিষ্যের এবাদত ও ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। তিনি তাঁকে তাঁর শহরে ফিরে যেতে বললেন।

পীরের নির্দেশে তিনি ফিরে এলেন মায়ের কাছে, বোস্তাম শহরে। পুত্র বিরহে বিরহাতুরা জননী তখন আল্লাহর কাছে মোনাজাত করছিলেন, প্রভু গো, আমার পুত্রের মঙ্গল করুন। আপনার ওলীগণ যেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁদের দোয়া যেন ফলপ্রসূ হয়। তাঁকে ধর্মবলে বলীয়ান করুন। হে আল্লাহ! তাঁর পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

মা তখন বৃদ্ধা। অতি দুর্বল। কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ। কিন্তু বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ এই মায়ের মরমী স্পর্শী প্রার্থনা শুনলেন। বুক ঠেলে কান্না এল তাঁর। তিনি এবার দরজায় করাঘাত করে ডেকে ওঠলেন, মা গো! আপনার অধম সন্তান আপনার কোলে ফিরে এসেছে।

মমতাময়ী মা দরজা খুলে দিয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন, বাছা আমার! এত দেরী করে এলে? কেঁদে কেঁদে আমি যে অন্ধ হয়ে গেছি। আমার পিঠ বেঁকে গেল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মা ও ছেলের এই আনন্দ-বিধুর মিলনে আকাশ ও পৃথিবী নড়ে উঠল।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ মার্জিত রুচির শিষ্টাচার-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁর বাড়ী থেকে মসজিদের দূরত্ব ছিল চল্লিশ কদমের মতো। কিন্তু নামাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে তিনি রাস্তায় কোনদিন থুথু নিক্ষেপ করেননি। এক সিদ্ধ-পুরুষকে তিনি কেবলার দিকে থুথু ফেলতে দেখেন। তা দেখে তাঁর মন এত অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে যে, তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েও তাঁর দরবার থেকে ফিরে আসেন।

কাবা শরীফ কোন সুলতান বাদশাহর দরবার নয়, আল্লাহর ঘর। অতএব সেখানে যথাসাধ্য দ্রুত যেতে হবে এমন কোন কথা নয়। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বলেন, বরং আল্লাহর পবিত্র ঘরের মর্যাদা ও সম্মানের প্রশ্ন সামনে রেখে সেখানে অন্যভাবে যাওয়া উচিত। তিনি তাই ধীরে-সুস্থে, নফল নামাজ আদায় করতে করতে দীর্ঘ বারো বছর ধরে পথ চলতে চলতে মক্কা মোয়াজ্জামায় উপস্থিত হন।

মক্কায় হজ্জ সম্পন্ন করে তিনি মদীনা গমন করেন। তিনি আলাদা করে মদীনার পাক রওজা ভূমি জিয়ারত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কেননা, তাঁর মনে হল, মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়ে ঐ সঙ্গে রওজা ভূমি জিয়ারত করা রওজার জন্য অমর্যাদাকর। সেখানে স্বতন্ত্র-ভাবে যাওয়া চাই। যাই হোক, তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্য প্রচুর লোক প্রস্তুত হয়। তিনি কিন্তু এত ভিড় পছন্দ করলেন না। কিন্তু তাদের নিবৃত্ত করাও সম্ভব হল না। অগত্যা দলবল নিয়েই তাঁকে যেতে হল। অবশেষে একদিন ফজরের নামাজ আদায় করে তিনি সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি যে তোমাদের প্রভু। তোমরা আমার সামনে উপাসনা করছ না কেন? তাঁর কথায় লোকজন অবাক। তারা ভাবল, নিশ্চয়ই তাঁর মাথা খারাপ হয়েছে। তাই নিজেরাই তাঁর কাছ থেকে কেটে পড়ল।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ যে ঐ ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করেন, তা তাঁর নিজের নয়। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানানোর ফলে ঐ কথা তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়।

আবার মদীনা থেকে তিনি যখন বোস্তামে ফিরছেন, তখনও ঐ একই অবস্থা। অজস্র লোক তাঁর প্রত্যুদগমনে ভিড় করে। এতে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। হয়ত তাঁর মনে অহঙ্কার দেখা দিতে পারে। হয়ত আল্লাহ্ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।

ভিড় বর্জন করার জন্য এখানেও তিনি একই পন্থা অবলম্বন করলেন। তখন রমযান মাস। অথচ দিনের বেলায় রুটি কিনে সকলের সামনে খেতে শুরু করলেন। আর তা দেখে লোকের ধারণা হল, সত্যিই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। সুতরাং এক-দুই করে সবাই তাঁর কাছ থেকে সরে গেল। কেউ কেউ আবার সহানুভূতি প্রকাশ করে বিদায় নিল।

তাঁর এ কাজটি আপতদৃষ্টিতে শরীয়ত বিরোধী মনে হলেও, অন্যদিক দিয়ে এর অনুমোদনও পাওয়া যায়। তিনি তখন মুসাফির। আর মুসাফিরের জন্য সফরকালে রমযান মাসে রোজা ভঙ্গ করার সুস্পষ্ট বিধান আছে।

একবার হজ্জ-ব্রত পালন করে তিনি তাঁর ও সঙ্গীদের মাল-পত্র চাপিয়ে দিলেন উটের পিঠে। একজন কেউ বললেন, উটের বোঝা ভারী হয়ে গেছে। আপনি কেবল আপনার মাল-পত্র রাখুন। বাকীগুলো আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তাঁকে বললেন, একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো। লোকটি অবাক হয়ে দেখে, সমস্ত মালপত্র উটের পিঠ থেকে অনন্তঃ এক হাত শূন্যে ঝুলছে। তখন বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি যদি আমার অবস্থা তোমাদের কাছে গোপন রাখি, তাহলে তোমরা আমাকে দোষী ব্যস্ত কর। আর যদি প্রকাশ করি, তোমরা তা দেখতে পাও না। আমার সমস্যা বুঝছ তো? আমি এখন কোন্ পথ ধরব বলতে পার?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সত্যিই হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর সাধনা বড় কঠিন জটিল এবং দুর্ভেদ্য।

উপমা সহকারে তিনি তাঁর সাধনার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের নফস বা কু-প্রবৃত্তি যেন কয়লা সদৃশ। প্রথমতঃ তিনি কয়লার প্রভাবে অর্থাৎ তামসিকতায় ভুগছেন। তখন এবাদত-বন্দেগীর অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়ে কয়লাকে তিনি উত্তপ্ত করেন। আর তওবা ও অনুতাপের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে তাকে আয়নার মতো স্বচ্ছ করেন। এ নিয়ে পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়। নানা ধরনের এবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে তিনি গড়ে তোলেন। পরে পুরো এক বছর নিজের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলে তিনি দেখতে পান, অহঙ্কারের রশি তাঁর কাঁধে। এ রশি ছিন্ন করার জন্য আরও পাঁচ বছর তিনি কঠোর সাধনায় রত হন। আর নব মুসলমান হয়ে যান। তখন মানব সমাজকে তাঁর মৃত বলে মনে হয়। তিনি তাদের ওপর জানাযা আদায় করে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যান। যেমন জানাযা আদায়কারীরা মৃত ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারপর তিনি আল্লাহর নৈকট্যলাভে সক্ষম হন।

একবার দেখা যায়, মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ কান্নাকাটি করছেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি নিজেকে ঋতু-মতী নারীর মতো মনে করছি। ঋতু অবস্থায় তারা যেমন মসজিদে ঢুকতে সাহস করে না, তেমনি আমিও আমার অপবিত্রতার কারণে মসজিদে ঢুকতে ভয় পচ্ছি।

একবার এক হাবশীর কথায় তিনি হজ্জযাত্রা থেকে ফিরে আসেন। হাবশী বলেছিল, আপনি আল্লাহকে বোস্তামে ফেলে রেখে যাচ্ছেন কেন?

আর একবার হজ্জের পথে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানান। তখন আবার প্রশ্ন, সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আছে কি? তিনি বলেন, আছে দুশ' দীনার। লোকটি বলল, আমি গরীব মানুষ। সংসার চালাতে পারি না। আপনি দয়া করে টাকাগুলো আমাকে দিয়ে দিন। আর আমাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে দেশে ফিরে যান। আপনার হজ্জ আদায় হবে। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তাই করলেন। টাকাকড়ি যা ছিল সব দিয়ে ফিরে এলেন মোস্তামে।

এক রাতে দেখা গেল, তিনি মসজিদের ছাদের ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন সারারাত। তিনি যখন প্রস্রাব করলেন, তখন দেখা গেল প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এর কারণ কি? তিনি বলেন, আমি যথাযথভাবে আল্লাহর এবাদত করতে পারিনি। আর ছেলেবেলায় একটি পাপ কাজ করেছিলাম। তাই আমি এত ভীতিগ্রস্ত যে, আমার হৃৎপিণ্ড বিগলিত হয়ে রক্তে পরিণত হয়েছে। আর তাই বেরিয়ে আসছে প্রস্রাবের সঙ্গে।

হযরত ঈসা বোস্তামী রহমাতুল্লাহ তাঁর ধ্যান সম্বন্ধে বলেন, দু'জানুর মধ্যে মাথা রেখে চোখের দৃষ্টি অবনত করে তিনি ধ্যানে বসতেন। অনেকক্ষণ পর যখন মাথা তুলতেন, তখন তাঁর মুখে থেকে শুধু আহ্ ধ্বনি উচ্চারিত হত।

একবার ধ্যান-রত অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে "আমার পবিত্রতা আমারই শ্রেষ্ঠতম গৌরব।" ধ্যান ভাঙলে তাঁকে তা বলা হল। তিনি চমকে ওঠলেন। সর্বনাশ! তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, আবার যদি তাঁর মুখ থেকে এ ধরনের কথা বের হয় তাহলে তারা যেন তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে। এতটুকু সমীহ করবে না। আল্লাহর কী ইচ্ছা। আবারও তিনি ধ্যান-রত অবস্থায় ঐ একই কথা উচ্চারণ করলেন। তাঁর নির্দেশ মতো শিষ্যরা যখন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হল, তখন দেখা গেল, সমস্ত ঘর জুড়ে বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর বিশাল আকৃতি। আর সেই বিরাট বিস্তৃত মূর্তির সঙ্গে ছোট ছোট আরও অসংখ্য বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর মূর্তি। শিষ্যগণ ঐ মূর্তির ওপরেই

ছুরিকাঘাত করতে শুরু করল। কিন্তু তাঁর কিছুই ক্ষতি হল না। তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত রইলেন। আরও কিছুক্ষণ পর, একটু একটু করে ক্রমশঃ তিনি স্বাভাবিক অবয়বে ফিরে এলেন। তাঁকে সমস্ত ঘটনা জানানো হল। তিনি বললেন, এর মধ্যে আমার কোন হাত নেই। যা কিছু ঘটেছে, সবই ঘটেছে আল্লাহর ইচ্ছায়।

একদিন তাঁর হাতে ছিল একটি পাকা আপেল। তিনি আপেলটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা লতীফ। লতীফ আল্লাহর এক নাম– যার অর্থ পবিত্র ও সূক্ষ্মদর্শী। তৎক্ষণাৎ দৈববাণী শোনা গেল, আমার নামকে তুমি আপেলের মধ্যে প্রয়োগ করলে? তোমার কি এতটুকু লজ্জা নেই? আর এই অপরাধের জন্য তাঁর মন থেকে আল্লাহর নাম ভুলিয়ে দেওয়া হল। চল্লিশ দিন ধরে তাঁর এই শাস্তি বহাল রইল। এরপর অনুতপ্ত হয়ে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, জীবনে আর কোন দিন বোস্তামের কোন ফল স্পর্শ করবেন না।

একবার তাঁর নিজেকে মনে হল, একালের তিনিই শ্রেষ্ঠ ওলী। অবশ্য সেই সঙ্গে তাঁর এও মনে হয় যে, এ তাঁর অহমিকা। যাই হোক, প্রচুর অস্বস্তি নিয়ে তিনি খোরাসানের পথে রওনা হলেন। তারপর এক জায়গায় পৌঁছে তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, যতক্ষণ না তাঁর এ দ্বন্দ্ব দূর হয়, ততক্ষণ ওখান থেকে এক পাও নড়বেন না। তিন দিন তিন রাত কেটে গেল। চতুর্থ দিনে দেখলেন, দূর থেকে এ উষ্ট্রারোহী তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর খুব কাছে এসে উট সওয়ার ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, বায়েজীদ! তুমি কি এই চাও যে, বায়েজীদ-সহ সমগ্র বোস্তাম শহর ধ্বংস করে দিই? তাঁর কথা শুনে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর সম্বিৎ ফিরে আসে। তিনি আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। তিনি কোথা থেকে আসছেন, তাও জানতে চান।

আগন্তুক বললেন, তুমি যখন আল্লাহর দরবারে শপথ করছিলে, তখন আমি ছিলাম এখান থেকে তিন হাজার মাইল দূরে। সেখান থেকে আমি আসছি। তোমাকে সাবধান করে গেলাম, তুমি তোমার মন নিয়ন্ত্রণে রেখো। এই কথা বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এ অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল তাঁর। হযরত আবু মূসা রহমাতুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য আপনাকে বড় কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কি?

তিনি বললেন, আসলে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মনকে তাঁর দিকে নিয়ে যাওয়াই কঠিন। আর তিনি যদি এ ব্যাপারে সাহায্য করেন, তাহলে আর কষ্টের কিছু নেই।

হযরত আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ-এর এক শিষ্য সাধনাবলে মারেফত বিষয়ে উচ্চস্থানের অধিকারী হন। আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ তাঁকে বললেন, হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর সাহচর্য তোমার পক্ষে খুব কার্যকর হত। শিষ্য বললেন, আমি তো বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর প্রাপ্ত আল্লাহকে রোজ শতবার দেখে থাকি। আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি তা দেখছ তোমার হিসাবে। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্য পেলে তুমি তাঁকে দেখতে বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর হিসাবে। বস্তুত দীদারে এলাহীর রকমফের রয়েছে।

মুরশিদের কথায় আবু তুরাব এর শিষ্য একদিন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তখন কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। আর যেই শিষ্যের চোখের সঙ্গে তাঁর চোখ মিলল, অমনি বিপুল ভয়ে শিষ্যের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর চাহনি তিনি সহ্য করতে পারলেন না। শরীরে শুরু হল কম্পন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা গেলেন।

হযরত ইয়াহইয়া মাআয রহমাতুল্লাহ একজন সিদ্ধ সাধক ছিলেন। তিনি হযরত

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ-কে একখানি পত্র লেখেন। যার মর্ম নিম্নরূপ ঃ

হযরত! এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা, যিনি আজলের এক পেয়ালা পানি পান করে আত্ম-বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন এবং এখনও ঐ অবস্থায় রয়েছেন? আর এক কথা। আপনার কাছে একটি গোপন কথা জানতে চাই। তবে যখন আপনি আর আমি জান্নাতের তুবা গাছের ছায়াতলে বসে বিশ্রাম নেব, তখন সেটি আপনার কাছে প্রকাশ করব।

এক পত্র বাহক মারফত তিনি পত্রখানি পাঠিয়ে দিলেন। আর সেই সঙ্গে একখানি রুটি পাঠান। অনুরোধ করেন, তিনি যেন সেটি খান। কেননা, সে রুটির খামির তৈরী হয়েছে পবিত্র যমযমের পানির দ্বারা।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ এর উত্তরে লেখেন, এখান এমন এক ব্যক্তি আছেন, যিনি আজলের দরিয়া সমূহের সমস্ত পানি পান করে চীৎকার করছেন, আরও আছে কি?

আর শুনুন ভাই, তুবা গাছের ছায়ায় বসার জন্য জান্নাতের কী দরকার। যেখানে আল্লাহর স্মরণে থাকেন, সেখানেই জান্নাত। সেখানেই তুবা গাছ। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ-এর গুপ্ত প্রশ্নটিরও উত্তর লিখে দেন। পত্রের শেষে তিনি লেখেন, আপনার পাঠানো রুটি খেতে পারলাম না। কেননা, যমযমের পানি দিয়ে এর খামির প্রস্তুত হলেও আটা কোন্ জায়গার তা লেখেননি।

চিঠির উত্তর পেয়ে হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ হযরত বোস্তামী রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর বাড়ীতে যখন পৌছালেন তখন রাতের প্রথম প্রহর প্রায় অতিক্রান্ত। এত রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে সারা রাত তিনি বাইরে কাটিয়ে দিলেন। জানতে পারলেন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ কবরস্থানে রয়েছেন। তিনিও সেখানে গেলেন। দেখলেন, তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন– সেই সন্ধ্যা থেকে।

রাত শেষ হয়ে যখন পূবালী আলো ফুটে উঠল আকাশে, তখন নীরবতা ভঙ্গ করে গভীর সুরে তিনি তাঁর প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বলে ওঠলেন, প্রভু গো! আমি আপনার কাছে আপনার সাহায্য ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু চাই না। হযরত মাআয রহমাতুল্লাহ মনে করলেন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। তাই তিনি তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে সালাম জানালেন। তার গত রাতের অবস্থা জানতে চাইলেন। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আল্লাহ্ পাক আজ রাতে আমাকে বিশটি মাকান চিনিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি বললাম, প্রভু গো! ওসবে আমার প্রয়োজন নেই। কেননা, সেগুলো শুধু পর্দা বা আবরণ বিশেষ, হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ বললেন, প্রভু যখন নিজে থেকে আপনাকে দিতে চাইলেন, তখন আপনি মারেফতের প্রার্থনা করলেন না কেন?

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, মারেফতে আমার কী প্রয়োজন? একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুতেই আমার প্রয়োজন নেই। তখন ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ তাঁর কাছে কিছু উপদেশ চাইলেন। তিনি বললেন, যদি আল্লাহ্ আপনাকে হযরত আদম (আঃ)-এর মতো দানশীলতা, হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মতো পবিত্রতা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতো বন্ধুত্ব, হযরত মূসা (আঃ)-এর মতো প্রেমানুরক্তি, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মতো বিশুদ্ধতা ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মতো ভালোবাসা দান করেন, তবুও আপনি কেবল আল্লাহকেই কামনা করবেন। অন্য কিছুর ওপর মনোযোগ দেবেন না। কেননা, সবকিছুই উদ্দেশ্য পূরণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব, আপনি শুধু আল্লাহর সাহায্য সম্বল করে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একবার হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহ তাঁর কাছে একখানি খুব সুন্দর জায়নামাজ পাঠান। তিনি বললেন, জায়নামাজে দরকার নেই। তবে একখানা মসনদ হলে ভালো হয়।

অতএব, একদিন মসনদও এল। কিন্তু আসলে তিনি তো মসনদ চাননি। জায়নামাজ নেবেন না বলেই মসনদের উল্লেখ করেন। কাজেই তিনি মসনদও ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর কথা হল, যার কাছে মহান প্রভুর ভালোবাসার মসনদ বর্তমান, তার আবার অন্য মসনদের দরকার কী?

শীতের এক রাত। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ শুয়ে ছিলেন এক গভীর জঙ্গলে। তাঁর গায়ে ছিল পশমের এক পুরু কম্বল। নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর যা হল, তাতে স্নানের প্রয়োজন। কিন্তু প্রচণ্ড শীত। স্নান করতে মন গড়িমসি করতে লাগল। তখন তিনি ভাবলেন, প্রবৃত্তিকে শাস্তি না দিলে সে জব্দ হবে না। অতএব, একটি কুয়ার পানিতে সুন্দরভাবে স্নান করে সারারাত সেই ভেজা কম্বল পরেই কাটিয়ে দিলেন।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ ফিরছেন কবরস্থান থেকে। পথে এক যুবকের সঙ্গে দেখা। এক আমীর তনয়। বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এন্তার ফুর্তি করছে। তিনি নরম কথায় তাকে থামতে বললেন। তাতে যুবকের রাগ হল। সে তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করতে শুরু করল। তখন তিনি পাঠ করলেন– লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সুমতি দেবার শক্তি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর নেই। তাঁর কথা শুনে যুবক আরও বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় সজোরে আঘাত করল। আর মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে তাঁর সারা শরীর লাল হয়ে গেল। ঐ অবস্থায় তিনি বাড়ী ফিরলেন। অবশ্য যুবকের বাদ্যযন্ত্রটিও ভেঙে যায়।

পরদিন সকালে তিনি বাদ্যযন্ত্র মূল্য বাবদ কিছু টাকা ও হালুয়া মিষ্টি এক লোক মারফত যুবকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আর একখানি চিঠিও দিলেন। গতকাল আমার মাথায় আঘাত করায় তোমার বাদ্যযন্ত্রটি ভেঙে গেছে। তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু টাকা পাঠালাম। আর তোমার মুখে যে তিক্ততার পরিচয় পেলাম, তা দূর করার জন্য কিছু মিষ্টি হালুয়াও পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি তা খেয়ে মুখের তিক্ততা দূর করবে।

চিঠি পড়ে যুবক হতবাক। যাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করলাম, মাথা ফাটিয়ে সর্বাঙ্গ রক্তে রঞ্জিত করলাম, আর সে কিনা...। বুকের ভেতর যেন ভাবনার ঘূর্ণিপাক খেয়ে গেল। সে ছুটে গেল হযরত বোস্তামী রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। আর লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে ক্ষমা চাই, ক্ষমা...। বলা বাহুল্য, বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন।

এক গলিপথ দিয়ে তিনি চলেছেন। সঙ্গে রয়েছে শিষ্যের দল। হঠাৎ উল্টো দিক থেকে এসে পড়ল এক কুকুর। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ ও শিষ্যগণ একপাশে সরে গেলেন। কুকুরটি চলে গেল। শিষ্যগণ জিজ্ঞেস করলেন, মানুষ হল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আর কুকুর নিকৃষ্ট। তৎসত্ত্বেও আপনি তাকেই পথ ছেড়ে দিলেন? হযরত বললেন, কুকুরটি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আজকের দিনে আমাকে কুকুর আর আপনাকে শ্রেষ্ঠ ওলী হিসাবে কেন নির্দিষ্ট করা হল? আমার এমন কি অপরাধ ছিল, আর আপনারই বা এমনকি পুণ্য ছিল, যার ফলে এমন তারতম্য হল? এই প্রশ্নটি উদয় হওয়ায় সৌজন্য প্রকাশে আমি ওকে পথ ছেড়ে দিয়েছি।

আর একদিন একটি কুকুর তাঁর পাশ দিয়ে গেলে তিনি তাঁর কাপড়ের আঁচল সরিয়ে নিলেন। কুকুর বলল, আপনি এরকম করলেন কেন? আমার শরীর শুকনা হলে তো নাপাক নয়। আর যদি ভেজাও হয়, তাহলে আপনার ছোঁয়া লাগলে আপনি পানি দিয়ে ধুয়ে পাক করে নিতে পারতেন। কিন্তু আপনি যা করলেন, তা নিছক অহঙ্কার ছাড়া কিছু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নয়। আর এ অহঙ্কার রূপ অপবিত্রতা সাত সমুদ্রের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেও তা কখনও পবিত্র হবে না।

হযরত বলেন, তা ঠিক। তোমার অশুচিতা বাইরের। আর আমার অপবিত্রতা ভেতরের। অতএব এস, আমরা একত্রে অবস্থান করি, তাতে আমার অশুচিতা কিছুটা দূর হতে পারে। কুকুর বলল, তা হতে পারে না। কেননা, আমি আল্লাহর বিতাড়িত ও ঘৃণিত জীব আর আপনি তাঁর প্রিয় দাস। দ্বিতীয়ত আমি বর্তমান ছাড়া অন্য দিনের একখানা হাড়ও সঞ্চয় করি না। কিন্তু মানুষ সারা বছরের খাবার সংগ্রহ করে রাখে আমাদের উভয়ের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিগত ব্যবধান।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ দুঃখ করে বললেন, হায় কী আফসোস! আমি একটি কুকুরের সংস্পর্শে থাকারও উপযুক্ত নই। তাহলে মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের উপযুক্ত কিভাবে হতে পারি? প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্ পাকের, যাঁর সৃষ্ট এক নিকৃষ্ট জীব থেকেও মানুষের শিক্ষা নেওয়া দরকার।

বোস্তামের এক বিখ্যাত সাধক প্রায় ত্রিশ বছর ধরে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি একদিন দুঃখিত চিত্তে বললেন, কত নামাজ রোজা, এবাদত করলাম, কিন্তু মুরশিদ বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ যে মারেফত শেখাচ্ছেন তা থেকে কোন ফল পাওয়া গেল না। এর কারণ কী?

বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ বললেন, ত্রিশ বছর কেন, ত্রিশ হাজার বছরও যদি এবাদত কর আর তোমার স্বভাব না বদলায়, তাহলে মারেফতের এক বিন্দু ঘ্রাণও তুমি পাবে না। তার কারণ কী হুজুর? তিনি বললেন।

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তার কারণ, তুমি তোমার জীবনকে পার্থিব পোশাক দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

এর প্রতিকারের উপায় কি?

উপায় আছে। কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করবে কি?

নিশ্চয়ই। আপনি বলুন হুযুর।

তবে যাও। মাথা মুড়িয়ে ফেল। পরনের সুন্দর পোশাক খুলে ফেলে মোটা কম্বল পর। শহরের যে এলাকার লোক তোমাকে ভালো করে চেনে, সেখানে গিয়ে বস। আর কিছু আখরোট নিয়ে শিশুদের ডেকে বল, তোমাদের মধ্যে যে একটি ধাক্কা দেবে তাকে একটি আর যে দুটি ধাক্কা দেবে তাকে দুটি আখরোট দেব। এভাবে শহরের সব এলাকায় ঘুরে ঘুরে যেখানে তোমাকে সবচেয়ে বেশী অপমান করা হবে, তুমি সেখানে অবস্থান করবে। এই হল প্রতিকার বা সংশোধনের একমাত্র উপায়।

তাঁর সাধক-শিষ্য বলে ওঠলেন, সুবহানাল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, একজন কাফের বা মুশরেক এই পবিত্র বাক্য পাঠ করে মুসলিম হয়ে যায়। কিন্তু তুমি এ কালাম পাঠ করে মুশরেক হয়ে গেলে।

সে কী হুযুর!

তুমি এ কালাম পাঠ করে নিজের গৌরববোধ করলে, আর এর দ্বারা আল্লাহর গৌরবহানি করলে।

হুযুর! আমি আপনার এ নির্দেশিত উপায় অবলম্বন করতে পারব না।

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তাই আমি বলেছিলাম, তুমি স্বভাব পরিবর্তনের পন্থা গ্রহণ করবে না।

সমকালের অন্যতম বিখ্যাত পীর হযরত শাকীক বলখী রহমাতুল্লাহ। তাঁর এক মুরীদ

www.AmarIslam.com

হজ্জে যাবে। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ জানতেন, বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ মক্কা শরীফে অবস্থান করছেন। তিনি মুরীদক শিষ্যকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। মুরীদ হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁর পীরের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মুরীদ বললেন, তিনি হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ-এর শিষ্য। তাঁর গুরু সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাওয়াক্কুলকে শক্তভাবে ধরে আছেন। আকাশ যদি তামার মতো আর মাটি লোহার মতো হয়, জমি যদি ফসল না দেয়, আকাশ থেকে যদি বৃষ্টি না ঝরে, পৃথিবীর সকল প্রাণী যদি তাঁর পরিবার-ভুক্ত হয়, তবুও তিনি তাওয়াক্কুল ছেড়ে দেবেন না।

মুরীদের কথা শুনে হরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, এ যে একেবারে কুফরী ও শেরেকীর লক্ষণ। বায়েজীদ যদি একটি কাক হয়ে যায়, তবুও সে যেন তার শহরে কখনও উড়ে না যায়। তিনি শাকীক বলখী রহমাতুল্লাহ-এর মুরীদকে আরও বললেন, ক্ষুধার্ত হলে মানুষের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে তুমি ক্ষুধা দূর করবে। এটা কোন অন্যায় নয়। সেক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলের কথা মুখে পর্যন্ত আনবে না। কারণ, আমার ভয় হয়, ঐ অবস্থায় তুমি এমন পাপ করে বসবে, যার ফলে তোমার শহর পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

মুরীদ দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর মুরশিদকে সব কথা বললেন। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ-এর কথার মর্ম বুঝতে পারলেন। আর তাঁর নিজের ভুলও ধরে ফেললেন। কিন্তু সেটা শিষ্যকে জানতে দিলেন না। বললেন, হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ নিজে কেমন লোক, তা কেন তুমি জিজ্ঞেস করলে না? মুরীদ কোন জবাবে দিতে না পেরে আবার চলে গেলেন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। আর তাঁর পীরের প্রশ্নটি তুলে ধরলেন। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, এ তোমাদের মস্ত বড় একটি ভুল। আগেই বলেছি, আমি মুতাওয়াক্কেল নই। যদি তাই হতাম, তাহলে একটা কেউকেটা হতাম। কিন্তু যেহেতু আমি কিছুই নই, অতএব আমার তাওয়াক্কুলের প্রশ্নই ওঠে না।

শাকীক রহমাতুল্লাহ-এর শিষ্য বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ-এর এ কথার গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে না পেরে আবার ফিরে এলেন হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। এসে দেখলেন তিনি মুমূর্ষ। মৃত্যু আসন্ন। দেরী না করে তিনি বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ-এর কথাগুলো গুরুর কাছে নিবেদন করলেন। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ অন্তিম মুহূর্তে তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। আর তওবা করলেন। কিছুক্ষন পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হযরত আহমদ খাযরুইয়া রহমাতুল্লাহ সমকালের এক বিখ্যাত সাধক। তাঁরও শিষ্য ছিল অসংখ্য। একজন শিষ্য তো হাওয়ায় ভেসে বা পানিতে হেঁটে যেতে পারতেন। প্রায় এক হাজার শিষ্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনিও একদিন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে হাজির। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা যাদের আছে একমাত্র তারাই আমার সঙ্গে এস। সবাই ভেতরে গেলেন। শুধু একজন দাঁড়িয়ে রইলেন দরজায়।

আর হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তাঁদের বললেন, আপনাদের মধ্যে যে সর্বোত্তম, তাঁকে ভেতরে ডাকুন। অতঃপর লোকটিকে ডেকে আনা হল। শুরু হল আলাপ-আলোচনা।

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, ভাই আহমদ, এভাবে এখানে-ওখানে আর কত ঘুরে বেড়াবেন?

হযরত আহমদ খাযরুই রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনার হয় জানা নেই, পানি এক জায়গায় আবদ্ধ থাকলে তার রং ও গন্ধ খারাপ হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তাহলে আপনি সমুদ্র হয়ে যান না কেন? সমুদ্রের পানির বর্ণ-গন্ধ বিকৃত হয় না।

আলোচনা ক্রমশঃ মারেফতের উচ্চস্তরে ওঠে গেল। আর খাযরুইয়া রহমাতুল্লাহ সেসব কথার গূঢ়ার্থ অনুধাবন করতে না পেরে বার বার বলতে লাগলেন, দয়া করে একটু সহজভাবে বলুন।

তখন বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ আলোচনার স্তর নামিয়ে দিলেন। আর তিনি বুঝতেও পারলেন।

আহমদ খাযরুই রহমাতুল্লাহ বললেন, এখানে আসার আগে আপনার বাড়ীর সামনে আমি ইবলীসকে বন্দী অবস্থায় দেখলাম। এটা যদি একটু বলেন।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আমার সঙ্গে সে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, বোস্তাম শহরে সে প্রবেশ করবে না। কিন্তু সে তার কথা রাখেনি। তাই তাকে বন্দী করে রেখেছি।

শয়তানকে যিনি বন্দী করতে পারেন, তাঁর আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

মাঝে মাঝে দেখা যেত, হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর বাড়ীতে মহিলাদের প্রচুর ভিড়। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ওঁরা ফেরেশ্‌তা। কালাম শেখার জন্য তাঁর কাছে আসে। একবার প্রথম আকাশের একদল ফেরেশ্‌তা এসে তাঁর সঙ্গে এবাদত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি তাঁদের জানান, আল্লাহর সাধনা করার শক্তি তাঁর নেই। কিন্তু তবুও সপ্ত আকাশ থেকে দলে দলে ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়ে ঐ একই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আর তিনিও ঐ একই উত্তর দিলেন।

তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, আপনার এ শক্তি কি কখনও হবে? তিনি বলেন, শেষ বিচারের দিনে যখন হিসাব-নিকাশ শেষ হবে, তখন তিনি আল্লাহর ধ্যান করতে করতে পবিত্র আরশ প্রদক্ষিণ করবেন।

এক রাতে অপার্থিব আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠল হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর ঘর। তিনি তখন আলোর উদ্দেশ্যে বললেন, হে আলো। এ যদি শয়তানের কারসাজি হয়, তাহলে আমাকে প্রতারিত করার সাধ্য তোমার নেই। আর তুমি যদি আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশ্‌তাগণের তরফ থেকে এসে থাক, তাহলে তোমাকে সেবা করার সুযোগ দাও, যাতে আমি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে মরতবা হাসিল করতে পারি।

এক রাতে এবাদত করে তিনি কোন তৃপ্তি অনুভব করলেন না। তিনি তাঁর সেবককে বললেন, দেখ তো বাড়ীতে কিছু আছে কিনা। খাদেম খুঁজে পেল এক গুচ্ছ আঙ্গুর। তিনি তখনই সেগুলো গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বললেন। আর সেটা করা মাত্র তিনি এবাদতের স্বাদ পেতে লাগলেন।

প্রতিবেশীদের প্রতি তিনি যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। এক দরিদ্র ইহুদী রুজি-রোজগারের জন্য প্রায়ই বাইরে বাইরে কাটাতো। তাতো তার পরিবারবর্গের খুবই অসুবিধা হত। এমনকি তেলের অভাবে ঘরে আলো জ্বলত না। তার একটি শিশু সন্তান ছিল। রাতের বেলায় সে খুব কান্নাকাটি করত। হযরত বায়েজীত রহমাতুল্লাহ ঐ ঘরে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করে দেন।

ইহুদী ফিরে এসে এ কথা শুনে খুশী। হযরতের প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, শুধু বাইরের আঁধারে নয়, আমরা রয়েছি ভেতরের আঁধারে চল, তার কাছে গিয়ে এ আঁধার দূর করি। স্বপরিবারে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে গিয়ে তিনি ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইসলামের আলো এসে তাদের মনের কালিমা ও আঁধার দূর করে দেয়।

এক অগ্নিপূজককে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হয়। তিনি বললেন, বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ যে ইসলাম পালন করেন, তা অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তোমরা যে ইসলাম নিয়ে আছ, তার প্রতি আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। অর্থাৎ বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ কতদূর ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, তার মন্তব্য থেকে বেশ স্পষ্ট হয়।

একদিন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তাঁর শিষ্যদের বললেন, আল্লাহর একজন ওলী আসছে। চল, আমরা তাঁকে স্বসম্মানে এগিয়ে আনি।

সত্যিই সেদিন একটি গাধার পিঠে চড়ে হযরত ইব্রাহীম হারাবী রহমাতুল্লাহ এসে হাজির। তিনি হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, আপনি কী করে জানলেন যে আমি আসছি? হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আল্লাহ্ আমাকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর এক বন্ধু আসছেন। তাঁকে স্বসম্মানে বরণ করে তাঁর দ্বারা আল্লাহর দরবারে আমি যেন সুপারিশ করিয়ে নিই।

হযরত হারাবী রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনার এবং আমার মিলিত সুপারিশ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুপারিশের তুলনায় খুবই নগণ্য। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ চুপ করে রইলেন।

যাই হোক, পরে তাঁরা এক সঙ্গে খেতে বসলেন। কিন্তু হযরত হারাবী রহমাতুল্লাহ-এর মনে হল, এ খাবার বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর মত এক জ্ঞানী সাধকের পক্ষে সঙ্গত নয়। বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ তাঁর মনের কথা টের পেলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। আহার ও বিশ্রামের পর তাঁকে নিয়ে গেলেন ঘরের এক দেওয়ালের কাছে। হাত দিয়ে দেওয়ালে আঘাত করা মাত্র একটি ফুটো হয়ে গেল। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তাঁর অতিথিকে বললেন, এই ফুটো দিয়ে বাইরে দেখুন। হযরত ইব্রাহীম হারাবী রহমাতুল্লাহ বললেন, ওখানে স্নান করার শক্তি নেই আমার। আল্লাহ্ আমাকে তেমন ক্ষমতা দেননি। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি বন-জঙ্গলের যবের যে রুটি খান, তাতে বুনো জন্তুরা মলত্যাগ করে। আপনি সে খবর রাখেন না। অথচ মনে মনে ভাবেন, যারা উপাদেয় খাবার খায় তারা ধর্মনিষ্ঠ হতে পারে না।

এ কথায় বড় লজ্জা পেলেন হযরত হারাবী রহমাতুল্লাহ। বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ-এর কাছে তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

একবার বোস্তামে শুরু হয়ে গেল দুর্ভিক্ষ। অনাবৃষ্টির দরুণ এ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শহরবাসী আল্লাহর দরবারে আকুল প্রার্থনা জানাল। বৃষ্টির জন্য এস্তেস্কা নামাজ আদায় করল। কিন্তু কিছুই হল না। এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরল না আকাশ থেকে। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তখন শহরের বাইরে ছিলেন। হঠাৎ তিনি ফিরে এলেন। আর সবাই তাঁকে ধরে বসল, তিনি যেন বৃষ্টির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ দুই জানুর মধ্যে মাথা রেখে আল্লাহর উদ্দেশে কী যেন বললেন কিছুক্ষণ। তারপর জনগণকে বললেন, যাও, বাড়ী ফিরে গিয়ে পানি নিষ্কাশনের নালাগুলো পরিষ্কার কর। এক্ষুণি বৃষ্টি হবে। আর তারা বাড়ী পৌঁছাবার আগেই সারা আকাশ ছেয়ে গেল ঘন কালো মেঘে। মুষলধারে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। তা স্থায়ী হল দীর্ঘক্ষণ।

শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর। চুপচাপ বসে আছেন। এভাবে বসে থাকতে থাকতে দেহ অবসন্ন হয়ে এল। একবার পা দু'খানি সামনের দিকে ছড়িয়ে দিলেন। সেদিকে শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বসে ছিলেন। হযরতের দেখাদেখি তিনিও তাঁর পা দু'খানি। প্রসারিত করলেন। বড় অহঙ্কারী ব্যক্তি তিনি। হযরতের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাও ছিল। মাঝে মাঝে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর সভায় এসে

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বসতেন। আর চুপচাপ তাঁর কথা শুনতেন। কিন্তু সেদিন তিনি যখন দেখলেন, হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তাঁর পদযুগল প্রসারিত করলেন, তখন তাঁর খুব রাগ হল। আর তিনিও তার পা ছড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে। সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বলে উঠলেন, আহা! থাক না। উনি একটু আরামে বসুন।

কিছুক্ষণ পর হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ পা গুটিয়ে পুনরাং স্বাভাবিকভাবে বসলেন। আর ভদ্রলোকও পা টেনে বসতে চাইলেন। কিন্তু তা আর হল না। পা গুটানো গেল না। সোজা হয়েই থাকল।

এবার তিনি বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহর বন্ধুর প্রতি তিনি যে ঈর্ষা পোষণ করেন, বা আজ যে অশিষ্ট আচরণ দেখিয়েছেন, এ তারই ফল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর পা জড়িয়ে কেঁদে ওঠলেন। আমাকে মাফ করুন হুযুর। আমি বুঝতে পারিনি।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, আমি আপনাকে মাফ করেছি। মনে রাখবেন, মনের পবিত্রতাই মানুষের পরম সম্পদ। যার মন পবিত্র ও কালিমাশূন্য, আল্লাহ্ তার ইচ্ছা পূরণ করেন।

বোস্তাম শহরের এক দরবেশের মনেও তেমনি অহঙ্কার ছিল। হযরত বায়েজাদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ-কে তিনিও তাঁর চেয়ে ক্ষুদ্র বলে মনে করতেন। অবশ্য তিনিও মাঝে মাঝে হযরতের দরবারে গিয়ে বসতেন। আর এমন ভঙ্গি করতেন, যাতে মনে হত, হযরতের তুলনায় তিনি সত্যিই এক উঁচু দরের সাধক।

একদিন তিনি হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে একটি বিষয় জানেত চাইলেন। তিনি তা বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু মনে যার ব্যাধি, তিনি অত সহজে বুঝবেন কেন? তাই, আবারও বললেন, বিষয়টি আরও বিশদ করুন। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তার মনের কথা খুব ভালো করে জানতেন। তাই বললেন, আরও বিশদ জানতে হলে আপনাকে যেতে হবে ঐ অদূরবর্তী গুহায়। ওখানে আমার এক বন্ধু আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে জেনে আসুন।

কথামত দরবেশ সত্যিই সেখানে গেলেন। গুহার মধ্যে ঢুকতে যাবেন, একটি বিশাল বিষধার সাপ ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করে তাঁর দিকে তেড়ে এল। কোন রকেম প্রাণ নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। আর হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে এসে বললেন, আপনি আমাকে মেরে ফেলার যোগাড় করেছিলেন আর কী!! খুব বেঁচে গেছি। তখনও আতঙ্কে ভয়ে তিনি ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তার অবস্থা দেখে বললেন, সামান্য একটি প্রাণী দেখেই আপনার এত ভয়! আল্লাহর সামনে গিয়ে যেদিন দাঁড়াবেন, না জানি সেদিন আপনি কী করবেন।

আত্মাভিমানী সাধকের সব অহঙ্কার গুঁড়িয়ে গেল। একদিন আবু সাঈদ সাইখোরানী নামে একজন সাধক এলেন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর অলৌকিক শক্তি পরখ করে দেখতে। আর তিনি তা বুঝেও ফেললেন। তাই বললেন, আপনি আমার শিষ্য আবু সাঈদ রায়ীর কাছে যান। আপনার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

আবুও সাঈদ রায়ী তখন ধ্যান-মগ্ন। সাধক সাইখোরানী এলেন। উপাসনা শেষ করে তিনি দরবেশের আগমনের হেতু জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি কিছু আঙ্গুর খেতে চাই। আবু সাঈদ রায়ীর হাতে ছিল একখানি কাঠের ছড়ি। সেটিকে দু'টুকরো করে এক টুকরো তাঁর সামনের মাটিতে পুঁতলেন। আরেক টুকরো দিলেন আগন্তুক দরবেশের হাতে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল-দু'খণ্ড ছড়িই দু'টি ফলন্ত আঙ্গুর গাছে পরিণত হয়েছে। থোকা থোকা আঙ্গুর ঝুলছে। তবে দরবেশের হাতে যে খণ্ডটি ছিল, সে গাছের আঙ্গুর কালো। আর তিনি যেটি মাটিতে পুঁতেছিলেন, সে গাছটির আঙ্গুর সাদা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অভিমানী দরবেশ এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আবু সাঈদ রাযী বললেন, এর কারণ হল নিয়ত। আমি খোলা মনে আল্লাহর কাছে এই অলৌকিক শক্তি কামনা করেছি। আর আপনি এটা দেখতে চেয়েছেন আমাকে পরীক্ষা করতে। যেকোন কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। আপনার নিয়ত ছিল কালো। অতএব আঙ্গুরও হয়েছে তাই। তারপর তিনি তাঁকে একখানি সাদা কম্বল দিয়ে খুব সাবধানে রাখতে বললেন। কম্বলখানা নিয়ে ঐ দরবেশ গেলেন হজ্জ করতে। তিনি খুব সাবধানেই রেখেছিলেন। তবুও আরাফাতের ময়দানে তা হারিয়ে গেল। এরপর তিনি যখন আবার বোস্তামে এলেন, দেখলেন, কম্বলখানা রয়েছে আবু সাঈদ রায়ীর কাছেই।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর মুরশিদ বা পীর ছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। একবার এক বনের পাশে তাঁর সঙ্গে বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর দেখা হয়। মাথায় আটার বস্তা নিয়ে তিনি পথ চলছিলেন খুব কষ্ট করে। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-কে দেখে তাঁকে সেটি তাঁর বাড়ী পৌঁছে দিতে বললেন। আর ঠিক ঐ সময় বন থেকে বেরিয়ে আসে একটি বাঘ। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বাঘটিকে কাছে ডেকে তার পিঠে আটার বস্তা তুলে দিয়ে বৃদ্ধার বাড়ীতে দিয়ে আসতে বলেন। বাঘ রাজি হয়। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, পাড়ায় গিয়ে তিনি লোকজনকে কি বলবেন?

বৃদ্ধা জাবাব দেয়; বলব যে, আজ এক আত্মভিমানী অত্যাচারীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, সে কি! আমি আবার আত্মভিমানী হলাম কিভাবে?

বৃদ্ধা বললেন, বাঘ কখনও বোঝা বয় না। অথচ তুমি তার পিঠে বোঝা চাপিয়ে দিলে। এটা কি বাঘের ওপর জুলুম করা হল না? আর তোমার মনের ইচ্ছাটা এই যে, তোমার অলৌকিক শক্তির কথা আমাদের পাড়ায় প্রচারিত হোক। আর সবাই তোমার স্তুতি প্রশংসা করুক। এটা কি আত্মম্ভরিতা নয়?

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তাঁর কথা উল্লেখ করে বলতেন, ঐ বৃদ্ধাকে আমি আমার শ্রেষ্ঠ মুরশিদ হিসাবে গণ্য করেছি।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হযরত আহমদ খাযরুইয়া রহমাতুল্লাহ স্বপ্নযোগে আল্লাহ্ পাকের পবিত্র জ্যোতির সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি তখন বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর মর্যাদা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। আল্লাহ্ জানান, তোমরা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের কথা বল। কিন্তু বায়েজীদ শুধু আমাকেই খোঁজে। তার মধ্যে অন্য কিছু নেই। সুতরাং আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা কতখানি উন্নত ছিল, এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

একবার হযরত শাকীক বলখী রহমাতুল্লাহ তাঁর শিষ্য আবু তুরাবকে নিয়ে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে আসেন। সেখানে আরও অতিথি ছিল। যথাসময়ে অভ্যাগতদের নিয়ে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ খেতে বসলেন। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ ও তাঁর শিষ্য সেদিন রোজা রেখেছিলেন। তবুও দাওয়াত রক্ষা ও হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য শাকীক বলখী রহমাতুল্লাহ নফল রোজা তরক করে আহারে অংশগ্রহণ করলেন। কিন্তু আবু তুরাব খেতে রাজি হলেন না।

তখন বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর অন্যান্য অতিথি ও শিষ্যগণ বললেন, নফল রোজা তরক করে যদি দাওয়াত রক্ষা করা হয়, তাহলে রোজা ও দাওয়াত রক্ষা– দুটি পুণ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও আবু তুরাব রোজা ভাঙতে সম্মত হলেন না। এবার কথা বললেন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ। বললেন, তোমরা হয়ত জান না, এ লোকটি আল্লাহ্ থেকে বহু দূরে পড়ে রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কয়েকদিন পর দেখা গেল, চুরির অপরাধে আবু তুরাব গ্রেপ্তার হয়েছেন। আর বিচারে দোসী সাব্যস্ত হওয়ায় তাঁর হাত কাটা হয়েছে।

তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধও ছিল অসাধারণ। একবার জামে মসজিদের কোণায় হাতের ছড়িখানা দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি নামাজ পড়ছিলেন। কোনভাবে সেখানা মেঝেতে পড়ে যায়। আর এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আবার তা খাড়া করে রাখেন। নামাজ শেষ করে ঘটনাটি শোনামাত্র তিনি ঐ বৃদ্ধের বাড়ী গিয়ে তাঁর এ কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পাছে মনের মধ্যে এক বিন্দু অহঙ্কার আসে, এই ভয়ে তিনি সদা সতর্ক থাকতেন। একবার দজলা নদী তাঁর সম্মানে স্ফীত হয়ে তরঙ্গোচ্ছ্বাস নিয়ে তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। তাতে বিন্দুমাত্র গৌরববোধ করেননি তিনি। বললেন, তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সংগ্রাম ও সাধনা নিমেষের মধ্যে নষ্ট হোক, এ তিনি চান না। তিনি শুধু তাঁর প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশী। অলৌকিকতা তাঁর কাম্য নয়।

একবার তিনি স্থির করেন, পরিবার-পরিজনের গুরুদায়িত্ব আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দেবেন। আর এই মর্মে মোনাজাতের জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে প্রায় হাত ওঠাতে গেছেন, হঠাৎ মনে হল, কাজটা নবীজীর সুন্নতের বিরুদ্ধে যাবে। কেননা, রাসূলে কারীম (সঃ) তাঁর পরিবার-পরিজনের ভার আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেননি। তার সেটা মনে হওয়া মাত্র তিনি তাঁর সংকল্প পরিত্যাগ করলেন। তিনি বলেছেন, তারপর থেকে আল্লাহ্ অবশ্য এ ব্যাপারটি খুব সহজ করে দেন।

ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করে মসজিদে বসেছেন বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ। ইমাম সাহেবও তাঁর কাছে এসে বসলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ-কে তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জানালেন, প্রথমে তাঁর নামাজের কাজা আদায় করে তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব দেবেন।

অবাক হয়ে ইমাম বললেন, এই মাত্র তো নামাজ পড়লেন। কাজা পড়বেন কেন?

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর সুস্পষ্ট উত্তর, যিনি রুজিদাতাকেই চিনতে পারেননি, তাঁর পেছনে নামাজ পড়া দুরস্ত হয়নি। বলাবাহুল্য, ইমাম সাহেব আর কথা খুঁজে পেলেন না। তাঁর শিক্ষা হয়ে গেল। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ নিজেই বলেছেন, তাঁর আপাত-অসংগত কার্যকলাপ দেখে যারা তাঁর পেছনে নিন্দাবাদ করে, তারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়, আর যারা তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে তার প্রশংসা করে, তাঁরা পুণ্যের অধিকারী হয়।

তিনি প্রায় বলতেন, যদি রোজ কিয়ামত একটু তাড়াতাড়ি আসে তাহলে তিনিও তাড়াতাড়ি জাহান্নামের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেন। তাহলে জাহান্নাম কিছুটা স্নিগ্ধ হয়ে যেত আর জাহান্নামবাসীরাও ঈষৎ শান্তি পেত।

কিছু লোক তাঁকে বলল, হাতেম ইবনে আসাম (রঃ) বলেন, যারা কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে না, তারা আমার মুরীদই নয়। এ কথা শুনে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আর যারা জাহান্নামবাসীদের জান্নাতে পাঠাবার জন্য নিজেরা জাহান্নাম বরণ না করবে, তারা আমার মুরীদ নয়। অর্থাৎ গুণগত দিক দিয়ে তাঁর শিষ্যবর্গকে কেমন হতে হবে তিনি তাঁর আভাস দিলেন।

আল্লাহ্ যখন তাঁকে প্রভূত অলৌকিকতা দান করেছেন, তখন তাঁর উচিত ছিল পথ-ভ্রষ্টদের সরল পথে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু তিনি তা করছেন না কেন? তাঁকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, যারা নিজেরাই দূরে সরে যায়, তাদের আমি কিভাবে আল্লাহর পথে টেনে আনতে পারি?

মাথা নিচু করে তিনি বসে আছেন। তিনি উপবিষ্ট বটে। কিন্তু তাঁর মধ্যে তিনি নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর ঠিক এ অবস্থায় এক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন। বললেন, আপনাকে এমন চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

তিনি কোন উত্তর দিলেন না। বরং প্রশ্ন শোনামাত্র আরও চিন্তাক্লিষ্ট হলেন। তারপর আচমকা জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলে ওঠলেন, প্রভু গো! কেন জানি না, আপনি আজ আমার মুখ থেকে নিজের মারেফতের কথা প্রকাশ করালেন। আল্লাহর ভয়ে ভীত এই মানুষটি একদিন কাঁপছেন, একজন কেউ তাঁর এ অবস্থার কথা জানতে চাইলে বললেন, দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কঠোর সাধনার বলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা তুমি বুঝবে না।

আরবের মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই খ্রীস্টান সেনাদের। যুদ্ধক্ষেত্র রোম। রোমক সেনাদের তুলনায় মুসলিম বাহিনী বেশ দুর্বল। কিন্তু তবুও তাঁরা সাধ্যমতো যুদ্ধে যাচ্ছেন। কিন্তু এক সময় হটে আসতে বাধ্য হন। তখন হঠাৎ কিছু মুসলিম সেনার মুখ থেকে বেরিয়ে এল বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ আমরা বিপন্ন। সাহায্য করুন। আর এই আর্তকণ্ঠ গিয়ে পৌঁছাল কয়েকশ' মাইল দূরে, যেখানে বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বোস্তামে অবস্থান করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক মুঠো ধুলো নিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। আর যুদ্ধরত মুসলিম সেনারা দেখতে পেলেন, বিশাল এক অগ্নিশিখা একদিক থেকে ধেয়ে আসছে খ্রীস্টান বাহিনীর দিকে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণরক্ষার তাগিদে তারা যে যেদিকে পারলেন ছুটে পালালেন যুদ্ধে জয়ী হলেন মুসলিম সেনাদল।

সশিষ্য তিনি মোরাকাবায় মগ্ন। আর এ সময়ে এলেন এক দরবেশ। তিনিও মোরাকাবায় বসলেন। ধ্যানভঙ্গ হবার পর দরবেশ তাঁকে শুধালেন, এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন? হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আল্লাহর দরবারে। দরবেশ বললেন, আমিও তো ছিলাম সেখানে। কই, আপনাকে তো দেখলাম না?

তিনি বললেন, আপনি ছিলেন পর্দার বাইরে। আর আমি ভেতরে। আমাকে দেখবেন কী করে? তিনি আরও বললেন, যে ব্যক্তি তরীকতের সুন্নত অনুসরণ না করে নিজেকে তরীকত-পন্থী বলে, স্পষ্টতই সে মিথ্যাবাদী। সত্য এই যে, শরীয়ত বাদ দিয়ে কখনও তরীকত লাভ করা যায় না।

বিপদের সময় তিনি আল্লাহর কাছে ধৈর্য্যধারণের শক্তি প্রার্থনা করতেন। বলতেন, প্রভু! আপনি যখন খাবার জন্য আমাকে রুটি দিয়েছেন, তখন তরকারিও দান করুন তবেই তো ভালোভাবে রুটি খেতে পারব। অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি বিপদ দিয়েছেন তো ধৈর্য্যের ক্ষমতাও দান করুন।

একবার হযরত আবু মূসা রহমাতুল্লাহ তাঁর কাছে জানতে চান, কিভাবে তাঁর রাত কাটে। তিনি বললেন, আল্লাহর ধ্যানে থেকে কখন দিন যায় রাত আসে, তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়েছেন, এবাদত যথেষ্ট হয়েছে। এবার তিনি যদি তাঁর সাক্ষাত চান তো তাঁর দরবারে সুপারিশের জন্য দু'টি বস্তু পাঠান, যা তাঁর খাজাঞ্চিখানায় নেই। কিন্তু বস্তু দু'টি কী? আল্লাহ্ জানান, সে দু'টি হল, বিনয় ও নম্রতা। তিনি আরও বললেন, অপদস্থ হও। বিপদ-আপদ বরণ কর। কেননা, আমার মধ্যে এ বস্তু দু'টি নেই।

এই মহাজ্ঞানী মহাতাপস যখন আল্লাহর গুণাবলীর বিবরণ দান করতেন, তখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতেন। কিন্তু যখন আল্লাহর সত্তা সম্পর্কিত বক্তব্য রাখতেন, তখন নিজের মধ্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারতেন না। এই অবস্থায় প্রায়ই তিনি বলতেন, যখন যেখানে থাকি, আল্লাহকে খুব কাছেই দেখতে পাই। অন্য যেকোন সাধকের তুলনায় তাঁর তত্ত্ব-জ্ঞান ছিল গভীর। একজন দরবেশ বললেন, আমি আল্লাহর সেই দাসের প্রতি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আশ্চর্যবোধ করি, যে আল্লাহকে জানার পরও তাঁর এবাদত করে না, কিন্তু হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি আশ্চর্যবোধ করি সেই লোকের প্রতি, যে আল্লাহকে জানার পর এবাদতে রত হয়। তাঁর এই মন্তব্যের অর্থ হল, আল্লাহকে সত্যিকারের জানা বা চেনার পর মানুষের আর স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে না। তখন তার পক্ষে এবাদতের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজের কথা বললেন। প্রথমবার হজ্জ করতে গিয়ে তিনি কাবাঘর জিয়ারত করেন। দ্বিতীয়বারে কাবাঘরের মালিক অর্থাৎ আল্লাহর জিয়ারত করেন। কিন্তু তৃতীয় দফায় না কাবা, না তার মালিক, কাউকে দেখতে পাননি। কেননা, তখন তিনি আল্লাহকে এত বেশী স্মরণ করতে থাকেন যে, তিনি তাঁর ভিতরের এবং বাইরের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

আল্লাহর ধ্যানে তিনি এমন গভীরভাবাবেগে মগ্ন হন যে, তাঁর আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে। একদিন এক অভদ্র লোক তাঁর বাড়ীর দরজায় এসে 'বায়েজীদ কোথায়', 'কোথায় বাজেয়ীদ' বলে চীৎকার করতে থাকে। বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, অনেক দিন থেকে আমিও তাঁকে খুঁজছি। কিন্তু কোথায় তিনি! লোকটি হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-কে চিনত না। সুতরাং এ কথার মর্ম উপলব্ধি করার ক্ষমতা তার ছিল না। এ ঘটনার যারা প্রত্যক্ষদর্শী, তারাও কিন্তু বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ-কে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করল না। তারা এর গূঢ়ার্থ জানতে চাইল মিসরের প্রখ্যাত সাধক হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ বললেন, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন। তাই এখন আর নিজেকে চিনতে পারেন না।

তাঁর সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন। বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ে। তবে নিম্নতম স্তরের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বললেন, নফস বা প্রবৃত্তিকে আল্লাহর পথে আকৃষ্ট করার জন্য তিনি একবার খুব চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রবৃত্তি তাঁর কথা শোনে না। তিনিও নাছোড়বান্দা। সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি তার পানি বন্ধ করে দিলেন। আর তাকে বলে দিলেন, যদি এখনও তুমি এবাদতে রত না হও, তাহলে পিপাসায় ছটফট করে মারা যাবে।

অতএব তাঁর সাধনা যে বড় কঠোর ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। সুতরাং পার্থিব কোন কিছুই তাঁর মনে থাকত না। এই আত্ম-ভোলা মানুষটির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁর এক শিষ্য দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে। কিন্তু যখনই তিনি তাঁকে কোন কাজ করতে বলতেন, তখনই তাঁর নাম জিজ্ঞেস করতেন। বেচারা একদিন জিজ্ঞেস করেই বসলেন, আপনি কি আমাকে পরিহাস করছেন হুযুর? এভাবে বারবার আমার নাম জানতে চান কেন? হযরত বললেন, না, না। আমি পরিহাস করছি না। তবে আল্লাহর নাম আমার অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে দখল করেছে। সেখানে তাই অন্য নামের কোন ঠাঁই নেই। আর আমিও সব কিছু ভুলে যাই।

তাঁর উচ্চ মর্যাদা লাভ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, ছেলেবেলার এক চাঁদনী রাতে তিনি বাইরে বেড়াতে গিয়েছেন। হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হয় এক অনিন্দ্যসুন্দর দরবার, যার তুলনায় পৃথিবীটাও তুচ্ছ হয়ে যায়। তিনি তখন তাঁর প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনার এই অনুপম দরবার সকলের দৃষ্টির আড়ালে কেন প্রভু? তখন অদৃশ্য বাণী ধ্বনিত হয়– আমার এ দরবারে কেবল উপযুক্তরাই আসতে পারে। তখন মনে হয়, যারা অনুপযুক্ত তিনি তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন। কিন্তু পরক্ষণে মনে হল, এ কাজ তো শুধু রাসূলে করীমের। তখন আবারও উচ্চারিত হল অদৃশ্য বাণী– তুমি আমার প্রিয় নবীর প্রতি যে সম্মান দেখালে তার পুরস্কারস্বরূপ আমিও তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলাম। দুনিয়াতে তুমি সুলতানুল আরেফীন নামে খ্যাত হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একবার এশার নামাজ শেষ করে তার মনে হল, ঠিক কবুলের উপযোগী হল না। কাজেই তিনি আবার নামাজ পড়লেন। এবারেও মনে হল, নামাজ শুদ্ধ হয়নি। সুতরাং আবার নামাজ পড়লেন। কিন্তু তারপরও সেই একই অবস্থা। যথাযথভাবে নামাজ আদায়ের জন্য তিনি সারারাত ধরে এশার নামাজ পড়লেন। কিন্তু তবুও তাঁর আত্মতুষ্টি এল না। হতাশ হয়ে তিনি ভাবলেন, যেমন তিনি, তেমনি তাঁর নামাজও। ওটা কি করে ভালো হবে? তখন তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন, নামাজনিষ্ঠ দাস হবার বহু চেষ্টা করলাম কিন্তু সব বৃথা গেল। এখন আমি আর কী করতে পারি? আপনি আমাকে আপনার বে-নামাজী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর প্রভাতী সাধনা প্রত্যক্ষ করার জন্য একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে থাকল। সে দেখল, 'আল্লাহ্' বলে খুব জোরে চীৎকার করে ওঠে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তাতে তাঁর মাথায় ভীষণ চোট লাগল। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর আরশের কাছাকাছি গিয়ে আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ কোথায়? তখন উত্তর হল, তাঁকে দুনিয়ায় বসবাসকারী মানুষের ভয়ার্ত ও ব্যথিত হৃদয়ের মধ্যে খোঁজ কর। অতঃপর আমি যখন তাঁর নিকটবর্তী হলাম, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি কী চাও বল?

আমি বললাম, যা কিছু হয় দিন। তখন বলা হয়, আমার স্থায়ী নৈকট্য লাভ করতে হলে নিজেকে বিলীন করে দাও। আমি আবার বললাম, কিছুটা বরকত ও ফয়েজ হাসিল ব্যতীত আমি এখান থেকে বিদায় হব না। তখন আবার জিজ্ঞেস করা হল, তুমি আর কী চাও বল। তখন আমি সমগ্র সৃষ্টির মাগফেরাত প্রার্থনা করলাম।

বলা হল, ভালো করে তাকিয়ে দেখ। আমি দেখলাম, প্রতিটি সৃষ্টির সঙ্গে তার মুক্তির জন্য একজন করে সুপারিশকারী রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ পাকের সর্বাধিক করুণা এসেছে আমার ওপরে। তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবার বললাম, ইবলীসকেও ক্ষমা করুন।

এবার উত্তর হল, সে যে আগুনের তৈরী। আগুনের সঙ্গে আগুনেরই মিল, কিন্তু তুমি যে আগুন থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা কর।

অতপর আল্লাহ্ আমার সামনে দু'টি বিশেষ প্রতিদান রাখলেন কিন্তু আমি তার কোনটিই গ্রহণ করতে রাজি হলাম না। তখন আবার প্রশ্ন, তবে তুমি কী পেতে চাও বল। আমি উত্তর দিলাম, আমি কোন কিছুরই প্রত্যাশী নই। অপ্রত্যাশিতভাবে যা পাওয়া যাবে, আমি তাতেই খুশী।

একজন কেউ হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে দোয়া চান। তিনি আল্লহাকে বললেন, প্রভু গো! আপনার দাস আমাকে উসিলা করে আপনার নিকট প্রার্থনা করছে। তার মনের ইচ্ছা কী আপনি জানেন প্রভু। আল্লাহ্ বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ হেঁটে চলেছেন রাজপথ ধরে। হঠাৎ তাঁর এক ভক্ত এসে পদচিহ্নের ওপর পা ফেলে ফেলে পেছনে পেছনে আসতে লাগল। আর বলতে লাগল, একেই বলে মুরশিদের কদমে চলা বা প্রকৃত অনুবর্তিতা। কিছুক্ষণ পর অনুসরণকারী নিবেদন করল, আপনি আপনার ছেঁড়া কম্বলের একটি টুকরা দান করুন। আশা করি তার বরকতে আমি উপকৃত হব।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তোমার দুটো কথা ও দুটো ধারণাই ভ্রান্ত। প্রকৃত অনুবর্তিতা হল কথা ও কাজের চর্চা করা। কম্বলের টুকরো চাওয়াও অবান্তর। যতক্ষণ না তুমি আমলের মতো আমল করছ, ততক্ষণ কম্বল তো দূরের কথা, আমার পায়ের চামড়া তুলে নিলেও তা কোন কাজে আসবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একদিন তিনি রাস্তায় দেখলেন, এক পাগল বারবার আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলছে, প্রভু! আমার ওপর কৃপা বর্ষণ কর। তিনি পাগলকে বললেন, তুমি এমন কি পুণ্য করেছ যার দ্বারা আল্লাহর কৃপা কামনা করছ? পাগল বলল, প্রভুর কৃপা বর্ষিত হলেই তো আপনা থেকে পুণ্যচর্চা শুরু হয়ে যাবে। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তোমার এ কথাটি অবশ্যই অর্থবহ।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আল্লাহর এবাদত দ্বারা অভিষ্ট অর্জনের পথের বাধা সত্তরটির পৈতা ছিঁড়তে তিনি সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু অবশিষ্ট রয়েছে একটি, সেটিও ছিন্ন করার শক্তি কামনা করে আল্লাহর দরবারে তিনি বহু কান্নাকাটি করলেন। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল, ওটা ছিঁড়ে ফেলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি আরও বেশী করে কঠোর সাধনার দ্বারা আল্লাহর দরবারে বারবার আঘাত হানলেন। সর্বশেষে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীনও হলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে যদিও বা পৈতা ছিন্ন করলেন, কিন্তু দৃঢ় হৃদয়ে আল্লাহর দরবার অভিমুখী অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত তিনি গৌরবময় সোপানে আরোহণ করতে পারেননি। পরে অবশ্য আল্লাহর অশেষ কৃপায় সাফল্য লাভ করেন।

একবার তিনি তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুই কামনা করো না। আল্লাহ্ যখন তোমাদের হয়ে যাবে, তখন দেখবে, সব কিছুই তোমাদের। অজ্ঞতাবশত মানুষ অনেক কিছু কামনা করে। কিন্তু সেগুলো তাকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রথম দিকে আমি নিজেও এই ধরনের ভুল করি। অর্থাৎ ত্রিশ বছর ধরে আমি আল্লাহর দরবারে নানা জিনিস চেয়েছি। কিন্তু যখন মারেফতের প্রথম স্তর অতিক্রম করলাম, তখন আমার অজ্ঞতা দূর হল। আমি আল্লাহকে বললাম, প্রভু গো! কোন কিছুই আমার চাই না। শুধু আপনি আমার হয়ে যান। এর ফল আমি পেয়েছি। যখন সত্যিই আমি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী থাকলাম না, তখন একবার হজ্জে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। দেখলাম, এর আগে যে কাবাঘর আমি প্রদক্ষিণ করেছি বহুবার, এবার সেই কাবাঘরই আমাকে প্রদক্ষিণ করছে।

হযরতের কাছে শেষ রাতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কেননা, তিনি বলতেন, ঐ নিস্তব্ধ প্রহরে প্রেমময়ের সঙ্গে যে প্রেম হয়, তা অন্য সময় সম্ভব নয়। আর এই জন্য, শেষ রাতের একটি পলকের বিনিময়ে তিনি আট জান্নাত বা দু'জগতের রাজত্ব গ্রহণ করতেও রাজি ছিলেন না।

একদিন বোস্তাম শহরে এল এক রূপসী বারাঙ্গনা। আর মক্ষিরাণীর মতো সে শহরের তরুণদের আকৃষ্ট করল। এবাদত, ধর্ম-সব যায় যায়। অভিভাবক সমাজ এর প্রতিকার কামনায় হযরতের দ্বারস্থ হলেন। তিনি প্রতিকারের আশ্বাসও দিলেন।

কর্মপন্থা স্থির করে ওই রাতেই তিনি রূপসীর ঘরে গেলেন। সঙ্গে কিছু টাকাও নিলেন। রূপসী তাঁকে চেনে না। একজন খদ্দের বলেই ভাবল। সুতরাং নিয়মমাফিক তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসার আসন দেখিয়ে দিল। তিনিও যথারীতি আসন গ্রহণ করলেন। আর গণিকার কাছ থেকে বেশী টাকার বিনিময়ে সারারাত তাঁর হুকুম তামিলের প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিলেন।

এবার তিনি টাকাগুলো সামনে রেখে বললেন, ওযু গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে তুমি আমার সঙ্গে দু'রাকআত নামাজ আদায় কর। বারাঙ্গনার জীবনে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এমন খদ্দের সে এর আগে কখনও দেখেনি। তাঁর কথাবার্তা, হাবভাবও বিচিত্র মনে হচ্ছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়। তাকে নিয়ে দু'রাকআত নফল নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে তিনি হাত ওঠালেন আল্লাহর দরবারে, প্রভু গো! আপনার এই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পথ-ভ্রষ্টা দাসীকে আমি জায়নামাজের ওপর আপনারই দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলাম। আপনার চরণমূলে ঝুঁকিয়ে দিলাম তার মাথা। এবার আপনি তার অন্তরকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করুন।

হযরতের প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেল। গণিকার মনে সৃষ্টি হল ভাবান্তর। যেন অন্তর জুড়ে শুরু হল তুমুল আলোড়ন। সারা জীবনের সঞ্চিত পাপের কথা ভেবে সে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। আর লুটিয়ে পড়ল মহাতাপসের পদ-প্রান্তে। হে মহান! তওবা করিয়ে আমাকে পাপ-মুক্ত করুন। আমি চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। হযরত সঙ্গে সঙ্গে তাকে তওবা পড়িয়ে দিলেন। কথিত আছে, এই বিখ্যাত বারাঙ্গনা পরবর্তীকালে এক বিশিষ্ট সাধিকায় রূপান্তরিত হয়।

চারজন জ্ঞানী ব্যক্তি এসেছেন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। সূক্ষ্ম মারেফত তত্ত্বের আলোচনা হবে। একটি ঝকঝকে সাদা পেয়ালায় কিছু মধু ও একগাছি চুল এনে আলোচনা সভায় রাখা হল। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এর উদ্দেশ্য অনুমান করে এ বিষয়ে নিজ নিজ মত ও মন্তব্য প্রকাশ করলেন।

প্রথম জন ॥ মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি এই পেয়ালা থেকেও অধিক স্বচ্ছ। বিদ্যা এ মধু থেকেও উপাদেয়। আর মমতা এ চুল থেকেও সূক্ষ্ম।

দ্বিতীয় জন ॥ স্বর্গের পেয়ালা এ পেয়ালা থেকেও উত্তম। জান্নাতের মধুর স্বাদ এ মধুর চেয়েও উৎকৃষ্ট। আর পুলসিরাত এ চুল থেকেও সরু।

তৃতীয় জন ॥ মুমিনের অন্তর এ পেয়ালা থেকেও উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। এ মধুর মিষ্টতার চেয়ে আল্লাহর কালামের মাধুর্য আরও উন্নত। আর হক হকুকের জ্ঞান এ চুল থেকেও সূক্ষ্মতম।

চতুর্থ জন ॥ ইখলাসের পরিপাট্য এ পেয়ালা অপেক্ষা বেশী। এবাদত-ধ্যান এ মধুর চেয়েও মধুরতর। আর পবিত্রতা ও ধর্মনিষ্ঠা এ চুলের চেয়েও সূক্ষ্মতর।

সব শেষে মুখ খুললেন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ। বললেন, মারেফত বিদ্যা এ পেয়ালা থেকে বেশী সাদা, বেশী স্বচ্ছ। আল্লাহর প্রেমের স্বাদ এ মধুর চেয়েও মধুরতর। আর আল্লাহর ভয় চুল অপেক্ষাও সরু, তীক্ষ্ণ।

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর উপদেশ বাণী ঃ আরেফ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

১. আরেফের চরিত্রে আল্লাহর গুণাবলী থাকবে।

২. ধ্যান ও এবাদত-বন্দেগীর তরবারি দিয়ে যিনি যাবতীয় কামনা-বাসনা কেটে ফেলেছেন, তিনিই খাঁটি আরেফ।

৩. আরেফের কাছে মারেফতের তুচ্ছ একটি বিন্দু জান্নাতের লক্ষ লক্ষ বালাখানা থেকেও মূল্যবান।

৪. আরেফ যখন নীরব, তখন তাঁর ইচ্ছা হয় আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে। আর যখন তিনি মুদিত আঁখি, তখন তাঁর ইচ্ছা হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। যখন দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে তিনি চোখ বুজে থাকেন, তখন তিনি ভাবতে থাকেন, এখন ইস্রাফীল যদি শিঙায় ফুঁ দিতেন, তাহলে মাথা তুললে মাবুদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়ে যেত।

৫. আল্লাহ্ যেমন একা, সঙ্গীবিহীন। একা থাকেন আর একা থাকতে ভালোও বাসেন, তেমনি আরেফও মানুষের ভিড় পছন্দ করেন না। একা থাকতে ভালোবাসেন।

৬. আরেফকে কেউ প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু সবই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৭. আরেফ নিজেকে নির্বোধ মনে করেন। কিন্তু নির্বোধেরা নিজেদের আরেফ বা বিজ্ঞ মনে করে।

৮. আরেফ হল উড়ন্ত পাখী। আর যারা আরেফ নয়, তারা হল চতুষ্পদ প্রাণী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৯. আরেফের অন্তর হল স্বচ্ছ কাচে ঘেরা বাতির মতো। তার অত্যুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয় আলমে আরওয়াহ।

১০. আরেফ পানাহার করেন নিজের সঙ্গে, কেনাকাটা করেন নিজ থেকে। বিক্রি করেন নিজের নিকট। আবার নিজ থেকে তিনি দূরে সুদূরেও থাকেন। নিদ্রায় কিংবা জাগরণে তিনি আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। আল্লাহ্ ছাড়া কারো সঙ্গে তিনি মিলিতও হন না। আর নিজের মনের কথা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে প্রকাশও করেন না।

১১. আরেফের জন্য যা অবশ্য পালনীয়, তা হল বিষয়-বিভব থেকে নিস্পৃহ থাকা। জান্নাতের ভরসা না করা ও জাহান্নামের পরোয়া না করা।

আল্লাহর আনুগত্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

১. আল্লাহর আনুগত্য অক্ষুণ্ন রাখতে হলে মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণ কর।

২. ক্ষুধার্ত থাকায় লাভ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ক্ষুধার্ত থাকলে ফেরাউন 'আমি তোমাদের আল্লাহ'–এই কথা বলার সুযোগ পেত না।

একজন বলল, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে মনে হয় অলৌকিক ক্ষমতাও অন্তরায়। যেমন– আপনি পানির ওপর হাঁটতে পারেন, শূন্যে উড়তে পারেন, এক রাতে মক্কায় পৌঁছাতে পারেন। এগুলো কি মনের মধ্যে অহঙ্কার সৃষ্টি করে না? তিনি বললেন, এ তোমার ভুল ধারণা। এক টুকরা কাঠও পানিতে ভাসতে পারে। ক্ষুদ্র বালুকণাও বাতাসে উড়তে পারে। জাদুকরও এক রাতের মধ্যে হিন্দুস্তান থেকে বেলুচিস্তানে যেতে পারে। অতএব, অলৌকিক শক্তি কী এমন বস্তু যে, তার দ্বারা অহমিকা সৃষ্টি হবে?

৩. আল্লাহর অনুগত লোকের কর্তব্য কি? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য দিকে মন না দেওয়া।

৪. আল্লাহকে পাওয়ার পথ কি?

তার উত্তর, অহম্ বা আমিত্ব বর্জন করা।

৫. তিনি বলেন, দু'টি জিনিস ধ্বংস ডেকে আনবে। যথা–

(১) আল্লাহর সৃষ্টিকে সম্মান না করা ও

(২) আল্লাহর অবদান স্বীকার না করা।

৬. আল্লাহ্ আপন ইচ্ছায় কি তাঁর দাসদের জান্নাতবাসী করেন না?

তার উত্তর, হ্যাঁ, তা করেন বৈকি! তবে কথা হল, আল্লাহ্ যাকে উচ্চস্তরে নিয়ে গেছেন, তার আর জান্নাতের দরকার কি?

৭. আল্লাহকে যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা জান্নাতের শোভা বর্ধন করেন ঠিকই। কিন্তু জান্নাত তাঁদের জন্য এক আযাব ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৮. আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়জনদের তিনটি স্বভাব দান করেন। যেমন–

(১) সমুদ্রতুল্য বদান্যতা,

(২) সূর্যসম উদারতা ও

(৩) ভূতলতুল্য নম্রতা।

৯. আল্লাহ্ যাকে যোগ্য ও উপযুক্ত মনে করেন, তার পেছনে এক ফেরাউন লাগিয়ে দেন।

১০. সৎ-সংসর্গ সৎ-কার্য থেকে উত্তম। আর কু-সংসর্গ -কুকার্য থেকে নিকৃষ্ট।

১১. গৌরব ও মর্যাদার লোভে যে বিদ্যালাভ করে তার থেকে দূরে থাক। কেননা, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর রহমত তার পেছনে দূরে সরে যায়।

১২. মুসলমান হয়ে মুসলমানের ক্ষতি করা কঠিন পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৩. মানুষের মনোভাব এরূপ হতে হবে যে, আমার মতো খারাপ আর কেউ নেই। আমার কোন মূল্যই নেই। এ ধরনের মনোভাব ত্যাগ-তিতিক্ষা, জ্ঞানার্জন ও পুণ্যচর্চা থেকেও উত্তম।

১৪. জ্ঞান অর্জন করতে হবে জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে।

১৫. মানুষ যদি নিজেকে নিজে চিনতে পারত তাহলে কত যে ভালো হত! নিজেকে নিজে চিনতে পারলে পূর্ণ মারেফত অর্জিত হয়।

১৬. দুনিয়ার এমন কী মহিমা আছে যে, মানুষ তাকে ভুলতে পারে না? আল্লাহর প্রেমিক যাঁরা, দুনিয়াকে ভুলে যাওয়া তাঁদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

১৭. যারা আল্লাহকে চেনে না, আগুন তাদের শাস্তি দেয়। কিন্তু যারা চেনে, আগুনের পক্ষে তারা অসহ্য।

১৮. যে আল্লাহকে চিনেছে, কারো কাছে তার কিছু চাইবার নেই। কিন্তু যে আল্লাহকে চেনেনি, সে অপরের মুখাপেক্ষী এবং মর্যাদাহীন।

১৯. পূর্ণ মাত্রায় প্রয়াস ও প্রযত্ন করে আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা রাখতে হবে।

২০. পার্থিব সম্পদের প্রতি (লোভ করলেও) আকৃষ্ট হতে নেই। দুঃখ-দুর্দশায় হতাশ হতে নেই। কেননা, আল্লাহর সামান্যতম নির্দেশে তা দূর হতে পারে।

২১. রিপুর বাসনা যে ত্যাগ করেছে, সে আল্লাহকে পেয়েছে। আর যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে, সব কিছু তার নাগালে এসে গেছে।

২২. নিজেকে যে উত্তম মনে করে, নিজের এবাদতকে ত্রুটি-হীন ভাবে, নিজের অন্তরকে বিশুদ্ধ বলে মনে করে, সে হিসাবের মধ্যেই গণ্য নয়। আর পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যে অন্তরে মৃত, মৃত্যুর পর তাকে লা'নতের কাফন পরিয়ে অপদস্থতায় মৃত্তিকাতলে দাফন করা উচিত। আর যে রিপুর কামনা-বাসনা অবদমিত করেছে, মৃত্যুর পর তাকে প্রশংসার কাফনে আবৃত করে শান্তির ভূমি-তলে দাফন করা চাই।

২৩. যে শিষ্য চীৎকার করে, হা-হুতাশ করে, সে একটি ক্ষুদ্র কূপ সদৃশ। আর যে মৌনতাবলম্বন করে সে রত্ন-গর্ভ সমুদ্রের ন্যায়।

২৪. দুনিয়ার আলোড়ন ও নীরবতা সবই আল্লাহর কাছ থেকে– এ কথা অন্তরে উপলব্ধি করার নামই হল মারেফত।

২৫. আগামীকালের কথা না ভেবে বর্তমাননিষ্ঠ হওয়াকেই বলে নির্ভরতা।

২৬. যে ধ্যান একাগ্র নয়, তা খুব বেশী হলেও ধ্যান নয়।

২৭. পরোপকারী ও সমব্যথী ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোন মানুষের চেয়ে আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী।

২৮. আল্লাহকে স্মরণ করার নামই হল নফসকে ভুলে যাওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের মতো করে চেনে, সে মৃত, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে আল্লাহর মতো করে চেনে, সে জীবিত।

২৯. আল্লাহর সঙ্গে সহাবস্থান করা ফরজ আর দুনিয়ার কাজ করা সুন্নত।

৩০. কেউ কিছু দান করলে প্রথমতঃ আল্লাহর শোকর আদায় কর। পরে দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৩১. কোন অসৎ ব্যক্তি তোমার কাছে এলে তুমি তার প্রতি অসদাচরণ না করে উত্তম আচরণ কর। তাতে তার স্বভাবের পরিবর্তন হবে।

৩২. জান, এ কার সৃষ্টি? তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁকে ভয় করে চল। যেহেতু তিনি তোমার সব কিছুই জানেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩৩. যিনি পীড়িতের সেবা করেন, মানুষের দোষ-ত্রুটি মাফ করেন, আর সত্য ঘটনা গোপন করেন না– এমন লোকের সংসর্গ অবলম্ন কর।

৩৪. আল্লাহর প্রতিটি কাজ পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক। তিনি যদি কোন মানুষকে অবনতি ও দুর্গতির চরম সীমায় পৌছে দেন, তবুও তা পরম পুলকে বরণ করা চাই।

৩৫. আল্লাহকে কিভাবে পাওয়া যায়?

তার উত্তর, অন্ধ, বধির ও মূক হয়ে যাও।

৩৬. দুনিয়াদারের জন্য দুনিয়া এক গৌরবের স্থান। পূন্যবানদের জন্য পরকাল এক আনন্দের স্থান। আর আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্তাপন করা সাধকগণের জন্য এক নূর ছাড়া আর কিছু নয়।

৩৭. হজ্জযাত্রীরা স্বশরীরে মক্কায় গিয়ে কাবাঘর তওয়াফ করতে আর সেখানে থাকতে চান। আর আল্লাহর প্রেমাস্পদগণ আত্মিক ভ্রমণে যান জান্নাতে আর আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করতে চান।

৩৮. আল্লাহর দীদার লাভের আগে যত কিছু বাকবিতন্ডা, দীদার ঘটে গেলে যাবতীয় তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটে।

৩৯. এমন এক বিদ্যা আছে যা আলেমগণের জ্ঞানের বাইরে। আর এমন এক ত্যাগ রয়েছে, যা বিরাগীদের জ্ঞানের বাইরে।

৪০. যে নিজেকে নিজে আরেফ বলে, সে মূর্খ। আর যে নিজেকে মূর্খ বলে ঘোষণা করে, সে আরেফ বটে।

৪১. যে মানুষের সম্মান রক্ষা করে, সে আল্লাহর নিকটবর্তী। আর যে মানুষের সম্মান নষ্ট করে, সে আল্লাহর দূরবর্তী।

৪২. জ্ঞান মানুষের জীবনী-শক্তি। মারেফত তার হৃদয়ের শান্তি। আর এবাদত এক আস্বাদপূর্ণ বস্তু।

৪৩. নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের প্রচার করা উচিত। অথবা যেমন প্রচার করে তেমনি হয়ে যাওয়া।

৪৪. মানুষের কুপ্রবৃত্তি প্রবল হলে অন্তর দুর্বল হয়। আর অন্তর সবল হলে কুপ্রবৃত্তি দুর্বল হয়।

৪৫. আল্লাহ্ তাআলার একত্ব ছাড়া অন্য বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে যে মতভেদ দেখা যায়, তা আল্লাহরই বৈকি।

৪৬. আপনি রাতে নফল নামাজ পড়েন না কেন?

তার উত্তর, আমি প্রতি রাতে আত্মিক জগতে ভ্রমণ করি।

৪৭. তবলীগ করার গুরুত্ব কী?

তার উত্তর, সেটি উত্তম কাজ। তবে তুমি এমন জায়গায় বসবাস কর, যেখানে তার দরকার নেই।

৪৮. যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনেছে সে কথা বন্ধ করেছে।

৪৯. আল্লাহর দীদারের অবস্থা কিরূপ?

তাঁর উত্তর, মানুষকে পানিতে ডুবতে দেখেছ কি? সাগরে ডুবে সে মারা গেলে আর এ জগতে ফিরে আসে না। তেমনি কেউ যদি আল্লাহর দীদার লাভ করে, তাহলে তাতেই ডুবে থাকে চিরদিন।

৫০. দরবেশ কে?

তাঁর উত্তর, যে ব্যক্তি অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করে একটি গুপ্ত কক্ষের সন্ধান পায়, মোতির সিন্দুক লাভ করে, সেই দরবেশ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫১. মানুষের উত্তম কাজ কি?

তার উত্তর, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন দিকে ধাবিত না হওয়া।

৫২. আপনার আয়ু কত?

তাঁর উত্তর, মাত্র চার বৎসর।

সবাই বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি তাঁর কথার ব্যাখ্যা দেন যে, সত্তর বছর পর্যন্ত তিনি পার্থিব ঝামেলায় জড়িত ছিলেন। মাত্র গত চার বছর ধরে তিনি তাঁর মাবুদকে দেখছেন। অতএব ঐ চার বছর ছাড়া বাকী জীবনকে তিনি আয়ুর মধ্যে গণ্য করেন না।

৫৩. যদি তুমি মন্দ স্বভাবে অভ্যস্ত হও, তাহলে তা পরিবর্তন করে সৎ স্বভাবে অভ্যাস করার চেষ্টা কর।

৫৪. মানুষ কখন সাফল্য অর্জন করে?

তাঁর উত্তর, যখন মানুষ সৃষ্টিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে নিজের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে। এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্যও লাভ করা যায়।

৫৫. হযরত আহমদ খাজুরাই রহমাতুল্লাহ-এর আক্ষেপ, প্রাণপণ ধ্যান–এবাদত ইত্যাদি করেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া গেল না। তিনি বলেন, আপনি তো মর্যাদার চরম শিখরে আরোহণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অথচ তা হল আল্লাহর নিজস্ব ব্যাপার। সেটি লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

৫৬. নামাজের খাঁটি ও আসল পরিচয় কি?

তাঁর উত্তর, যার দ্বারা আল্লাহর দীদার লাভ হয়। তবে তা হওয়া খুবই কঠিন।

৫৭. আরশের প্রকৃত অর্থ কী?

তাঁর উত্তর, আরশ তো আমি নিজেই।

প্রশ্ন ঃ কুরসী কী?

তাঁর উত্তর, কুরসীও আমি নিজেই।

প্রশ্ন ঃ কলম কী?

তাঁর উত্তর, কলমও আমি নিজেই।

এরপর তাঁকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ঐ একই উত্তর দেন।

জবাব শুনে প্রশ্নকর্তা নির্বাক হয়ে গেলে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি নিজেকে আমার প্রভুর মধ্যে বিলীন করে দিয়ে দেখতে পেলাম, সৃষ্টির সকল বস্তু আমার অস্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

তাঁর আধ্যাত্মিক ঃ

১. আমি পৃথিবীকে তিন তালাক দিয়ে সম্পূর্ণ একা হয়ে বলতে শুরু করলাম, হে আমার প্রতিপালক! আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তবে আপনি যখন আমার, তখন সব কিছুই আমার।

২. আমি যখন আল্লাহর দরবারে সম্পূর্ণ খাঁটি বলে বিবেচিত হলাম, তখন তিনি আমাকে প্রথমে এই নেয়ামত দান করলেন যে, আমার মধ্যে যা কিছু কালিমা ও কলুষতা ছিল তা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিলেন।

৩. আর আল্লাহ পাকের এই অফুরন্ত করুণার ফলে আমার মানসিকতা ও অনুভূতির পরিবর্তন ঘটল।

৪. অনুভব করলাম, যারা আল্লাহর আদেশ পালন করেছে, তারা তার পুরস্কার লাভ করেছে ও পুরস্কারের প্রতি আসক্ত হয়েছে। কিন্তু আমি আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুতেই আসক্ত হইনি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. আমার মনে আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করার ইচ্ছার উদয় হল। কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, আমার প্রতি তাঁর প্রেম তো অনেক আগে থেকেই রয়েছে।

৬. দেখলাম, সবাই নিজ নিজ কাজে মশগুল। কিন্তু আমি শুধু আল্লাহ পাকের করুণা সাগরে সাঁতার কাটছি।

৭. মানুষ মরণশীল মানুষের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছে। কিন্তু আমি জ্ঞান লাভ করেছি স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে, যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর কখনও মৃত্যু নেই।

৮. সব মানুষ আল্লাহর কালাম নিজে উচ্চারণ করে। কিন্তু আমি উচ্চারণ করি আল্লহার তরফ থেকে।

৯. আমি যখন আমার প্রবৃত্তিকে আল্লাহর দিকে নিতে চাইলাম, আর সে তা প্রত্যাখ্যান করল, তখন আমি একাই আল্লাহর দরবারে হাজির হলাম।

১০. আমি ভেবে দেখেছিলাম, আমার শান্তি পাওয়ার মূলে কোন্ বস্তু? তা আলস্য বা শৈথিল্য ছাড়া আর কিছু নয়। বোঝা গেল, সামান্য গাফিলতির চেয়ে জাহান্নামের আগুনও তেমন কিছু ভয়াবহ নয়।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর দীদারে ইলাহীর স্বরূপ ঃ হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ একদিন আল্লাহ্ পাককে স্বপ্নে দেখলেন। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মনের ইচ্ছা কি? তুমি কি চাও?

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, প্রভু আমার! আপনার ও আমার ইচ্ছার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তখন প্রভু বললেন, তাহলে আমি যেমন তোমার, তেমনি তুমিও আমার হও। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনার দিকের পথ আমাকে দেখিয়ে দিন। আল্লাহ্ বললেন, আমিত্ব বর্জন কর। পথ মিলে যাবে। তিনি প্রভুর নির্দেশ মেনে নিলেন।

অতঃপর তিনি একাগ্র চিত্তে তাঁর দিকে চোখ মেলে চাইলেন। আল্লাহ্ তাঁকে পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করলেন। আলোকিত করলেন তাঁর জ্যোতি দিয়ে। বহু গুঢ় কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন। তাঁর গরিমা ও শান-শওকত দেখালেন। তখন বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ তাঁর নিজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, আল্লাহ পাকের গরিমাময় ঐশ্বর্য্য আর আভিজাত্যের তুলনায় তাঁর নিজের গৌরব অতি নগণ্য ও নিষ্প্রভ। সে তুলনায় তাঁর জ্যোতিও অনুজ্জ্বল।

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর সম্মান মর্যাদা তাঁর প্রতিপালকের সম্মান-মর্যাদার কাছে নিতান্ত হেয় প্রতিপন্ন হল। কিন্তু আরও গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, তাঁর নিজের নূর তাঁরই নূর থেকে, সম্মানও তাঁরই সম্মান থেকে। তিনিই তো সব কিছুর উৎস। তিনি নিবেদন করলেন, প্রভু গো! এ কী ব্যাপার? প্রভু বললেন, হ্যাঁ তাই। সব কিছুই আমি এবং সব কিছুই আমার। আমি ও আমার ছাড়া কোন কিছু নয় ও কোন কিছুই নেই। শুধু কাজটি তোমার দ্বারা প্রকাশ পায় মাত্র। আর তা করার শক্তি, সাধ্য ও সফলতা আমার দ্বারাই ঘটে।

অতঃপর তাঁর প্রভু তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি ঢেকে দিলেন। আর এ অবস্থায় তিনি তাঁর তৌহীদের রূপ প্রদর্শন করলেন তখন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে হৃদয়কে সঞ্জীবিত করলেন। এবার প্রভু খুব দয়া করে তাঁর গুপ্ত তত্ত্বে তাঁকে প্রকাশ্য জ্ঞান দান করলেন। আর এই জ্ঞানের দ্বারা তিনি তাঁকে অনুভব করলেন অর্থাৎ তাঁর দীদার লাভে ধন্য হলেন।

এবার তাঁর পার্থিব কামনা-বাসনা নির্মূল হল। আর এভাবে সব কিছু পরিহার ও পরাভূতঃ করে তিনি কিছু দিন একা একা কাটিয়ে দিলেন।

অতঃপর দয়াময় প্রভু তাঁর প্রতি আরও দয়াপরবশ হলেন। তিনি তাঁর নূর দিয়ে হযরত

www.AmarIslam.com

বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর চোখ দৃষ্টি করলেন। আর তা দিয়ে তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করলেন।

তারপর তাঁরই প্রদত্ত জ্ঞান বলে তিনি তাঁরই কাছে নিবেদন করলেন, প্রভু গো! আমি আপনাকে ছাড়া অবস্থান করব তা আমার কাম্য নয়, আমি আপন অস্তিত্বে সন্তুষ্ট নই। প্রভু! আমাকে আপনি 'আমি' ছাড়া করে রাখুন।

প্রভু বললেন, তা উত্তম। কিন্তু শরীয়তের সীমা রক্ষা করে চল। আদেশ নির্দেশের সীমা লঙ্ঘন করো না। তবেই তোমার সাধনা সফল হবে।

তাঁর দাস বললেন প্রভু আমি তো নিজে কিছুই জানি না, বুঝি না। একেবারেই অজ্ঞ। আপনিই আমাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করুন।

প্রভু প্রশ্ন করলেন, এ কথা তুমি কোথায় শিখলে?

দাস উত্তর দিলেন, প্রশ্ন কর্তাই তা বেশী জানেন। কেননা, এ প্রশ্ন ও জবাব তাঁরই।

ক্রমে ক্রমে মনে হল, প্রভু তাঁর ওপর খুশী হয়েছেন। তিনি দাসের মনে আনন্দের ঢেউ তুলে দিলেন। তারপর বললেন, তোমার মনে যে বাসনা রয়েছে তা প্রকাশ কর।

তাঁর উত্তর, প্রভু গো! আমার বাসনা তো শুধুই আপনি। আমি কেবল আপনাকে চাই। আর কিছুই আমার কাম্য নয়।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে প্রভু বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি আল্লাহরই প্রত্যাশী। আর এ জন্যেই দেখতে ও শুনতে পেলে।

দাস বললেন, তা আমার ক্ষমতায় নয়। বরং তা প্রভুর ইচ্ছায় ঘটেছে। তারপর তিনি তাঁর মহান প্রতিপালকের প্রশংসা করলেন।

এবার প্রভু তাঁকে তাঁর গৌরবের পাখা দান করলেন। মাথায় পরিয়ে দিলেন গৌরবের তাজ। আর গৌরবের পাখায় ভর করে তিনি গৌরবের আকাশে উড়তে লাগলেন। প্রভুরই সাহায্যে তাঁর অপূর্ব গুণাবলী অবলোকন করলেন। তিনি এবার তাঁর একত্বের দুয়ার খুলে দিলেন। আর তাঁর দপ্তরে দাসের নামও নথি-বদ্ধ করলেন। এবার তাঁর কাছে প্রভুর তৌহীদ আবিষ্কৃত হল।

অতঃপর তাঁর প্রতিপালক বললেন, এখন আর কেউ তোমার ভেতরে আমিত্বের লক্ষণ দেখবে না। তারপর এক পরীক্ষায় আগুনে পুড়িয়ে পবিত্র করে তিনি তাঁর দাসকে জিজ্ঞেস করলেন, বল, এ দুনিয়া কার? বল এ রাজত্ব কার?

দাস বললেন, আপনার।

বল, ক্ষমতা কার?

সবই আপনার।

অতঃপর দাসকে পরিয়ে দেওয়া হল ধৈর্যের পোশাক। এর ফলে দাস মানবীয় স্বভাব মুক্ত হলেন আর অর্জন করলেন তৌহীদের জবান। মনে হল, তাঁর আল্লাহর রহমতের প্রশংসাতে, তাঁর চোখ আল্লাহর অনুপত সৌন্দর্যরাশিতে এবং তাঁর হৃদয় আল্লাহর অনির্বচনীয় আলোকমালায় রূপান্তরিত হল। এখন তাঁর দৃষ্টি সসীম নয়, অসীমের পানে প্রসারিত। তিনি এখন চিরঞ্জীব। তার আর মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। এখন তিনি নিজে চলেন না। নিজে এবাদত করেন না। সব কিছু অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহিমাময় প্রভুর ইশারা-ইঙ্গিতে। তিনি কেবল উপলক্ষ মাত্র।

অতঃপর তিনি তাঁর প্রতিপালককে বললেন, হে প্রভু! আমি তো এখন আপনার দরবারেরই অধিবাসী। প্রতিপালক বললেন, কিন্তু মানুষ যে তোমাকে দেখতে চায়। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, কিন্তু আমি তো তাদের দেখতে চাই না। তবে আপনি যদি আমাকে মানুষের মাঝখানে রেখে দিতে চান, আমার আপত্তি নেই। কেননা, আপনার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শক্তি বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কিছু করার নেই। তবে জনসমাজে আমাকে যদি থাকতে হয়, তাহলে তারা যেন আপনার গুণাবলী আমার মধ্যে দেখতে পায়। বিশেষ করে আপনি আপনার তৌহীদ দিয়ে আমাকে সাজিয়ে দিন। লোকে আমার দিকে তাকিয়ে যেন আপনাকেই দেখে।

আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাঁর মাথায় মর্যাদার তাজ পরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এবার আমার সৃষ্টির নিকটে এস। তিনি দরবার থেকে পা বাড়ানো মাত্র একটা আছাড় খেলেন। তখন প্রভু বললেন, তোমরা আমার বন্ধুর অবস্থা দেখ। সে আমাকে ছাড়া কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না। আমার পথ ছাড়া তার অন্য কোন পথ জানা নেই।

যাই হোক, তিনি দরবেশগণের শেষ সীমানায় উপনীত হয়ে নিজেকে নবী-রাসূলগণের পংক্তির কাছাকাছি দেখতে পেলেন। তারপর ক্রমশঃ তিনি আল্লাহ্ পাকের এত কাছাকাছি পৌঁছলেন যে, মনে হল, এত কাছে আর কোন মানুষ পৌঁছায়নি। তখন গভীর দৃষ্টি মেলে দেখলেন, তাঁর মাথা রয়েছে আল্লাহর এক নবীর পায়ের নিচে। তখন তিনি বুঝলেন, আওলিয়াদের মর্যাদার শেষ সীমা হতে নবী-রাসূলগণের মর্যাদা শুরু।

অতঃপর তাঁর আত্মাকে যখন ফেরেশতা ও জান্নাত-জাহান্নাম দেখানোর উদ্দেশ্যে একদিকে আহ্বান করা হল তখন নবী-রাসূলগণের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাত হয়ে গেল। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে সালাম জানালেন। সব শেষে পৌঁছালেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র আত্মার কাছে। কিন্তু সেখানে রয়েছে অসংখ্য অগ্নী-সমুদ্র। ভয়ে তার পা বাড়াবার সাহস হল না। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। প্রভুর দীদার লাভ হল বটে। কিন্তু তৌহীদের প্রান্তর অতিক্রম করে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিজস্ব দরবারে আর পৌঁছানো গেল না। আল্লাহর নিজস্ব দরবারেই রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর শিবির দৃষ্টিগোচর হল। প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও তিনি সেদিকে আর অগ্রসর হতে পারলেন না। প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন মনে। এতদূর এসেও শেষ অবধি ওদিকে আর যাওয়া হল না। প্রভুর কাছে এ দুঃখের কথা তিনি প্রকাশও করলেন। প্রভু বললেন, ওদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে যদি যেতে চাও, তাহলে আমার প্রিয় বন্দু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সুন্নত ও তরীকা মজবুত করে ধর।

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর মোনাজাত ঃ

জীবনের অন্তিম পর্বে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বড় করুণ সুরে তাঁর প্রতিপালকের দরবারে মোনাজাত করেন। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী সে মোনাজাত যা নিম্নরূপ।

প্রভু আমার! আর কতদিন আপনি আর আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব? আমার আমিত্ব দূর করে দিন প্রভু। তবেই আমি আপনার মধ্যে বিলীন হতে পারব। প্রভু গো! আমি যখন আপনার সঙ্গে থাকি। তখন আমি সকলের শীর্ষে অসীম ও প্রবল হয়ে বিরাজ করি। কিন্তু আমি যখন একা, তখন আমি অধম-সসীম ও দুর্বল হয়ে থাকি।

প্রভু গো! আপনারই অসীম কুদরতে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা আমাকে আপনার নিকটবর্তী করেছে।

হে মাবুদ! জ্ঞান-গুণী হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাহলে আপনার প্রিয়জনের তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করুন, আপনার গোপন রহস্যের ঘ্রাণ দান করুন।

হে প্রভু! আমার অশান্ত হৃদয়ে আপনার বাণী যে কত মধুর, পাপীদের প্রতি আপনার আশ্বাস যে কত সান্ত্বনা, আর অচেনা-অজানা পথে আপনার জ্যোতি যে কত উজ্জ্বল আর আশাব্যঞ্জক, পার্থিব জীবনবাদীরা তার কিছুই বুঝতে পারে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রভু! আমি আপনার এক অন্ধ-প্রেমিক। আমি দুর্বল, অনাথ ও মুখাপেক্ষী। আশ্চর্য! মহাপরাক্রম-শালী বিশ্ব অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও আপনি এই হীন অভাজনকে প্রেম দান করেন।

প্রভু গো! আমি আমার জীবন-ব্যাপী সাধনা কিংবা গভীর রজনীর নামাজের কথা বলছি না। কোরআন পাকের খতমসমূহের হিসাব করছি না। দরূদ মোনাজাতের কথা উল্লেখ করছি না। আপনি ভালোভাবেই জানেন, আমার এতটুকু নির্ভরতা, বিশ্বাস বা গৌরব নেই। তবে এসব আমি উল্লেখ করছি এই জন্য যে, আমার কৃতকর্মের জন্য আমি খুবই লজ্জিত।

প্রভু আমার! আপনার অন্তহীন করুণার কথা কিভাবে বলব! ঐ কৃপাগুণেই আমি এরূপ ভাবতে পারছি। না হলে আমার যে সবই ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রভু গো! আপনার কোন কাজই কোন কারণের অধীন হয়। আর এবাদত আপনার সমীপে উপস্থিত হওয়ার সম্বল নয়। আর পাপীরা যে আপনার দরবারে স্থান পাবে না, তাও কোন কথা নয়। আপনার কুদরত পরিসীম, অন্তহীন। যাকে ইচ্ছা পাপ-সমুদ্রে ডুবে থাকলেও ক্ষমা দ্বারা তাকে পবিত্র করেন।

ওগো দয়াময়! আমার আমলকে খুব বেশী মূল্য ও গুরুত্ব দিয়ে আমি তাতে লিপ্ত হয়েছি। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, তার মুল্য আপনার মর্জির ওপরে। আমার আবেদন, আমার যে আমলগুলো আপনার দরবারে অনুপযুক্ত, সেগুলোকে বাতিল করে আমার ওপর দয়া বর্ষণ করুন। আর আমার পাপের ময়লাও ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে আমাকে নিষ্কলঙ্ক করুন– যাতে আমার আমলসমূহ আনপার দরবারে গ্রহণের উপযুক্ত হয়।

ইন্তেকাল ঃ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ দীর্ঘজীবী ছিলেন। আজীবন মারেফতের গভীর গহীন পথে দুরূহ সাধনায় নিমগ্ন থেকে অবশেষে একদিন প্রিয় মাশুকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়েন। আর মাশুকও তাঁর পরম প্রিয়জনকে নিজের কাছে নেবার জন্য ডাক পাঠালেন সে ডাকে সাড়া দিয়ে তিনিও তাঁর অগণিত শুভানুধ্যায়ীকে পেছনে ফেলে রেখে ১৩৪ হিজরী সনে মাটির পৃথিবী ছেড়ে লাব্বায়েক বলে তাঁর কাছে চলে গেলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

শোনা যায়, মৃত্যু আসন্ন হলে আল্লাহু আল্লাহু বলে তিনি যিকিরে মগ্ন হন। একেবারে চরম মুহূর্তে উচ্চারিত হয় ঃ

হে প্রভু! আজীবন আমি আপনার নাম স্মরণ করেছি উদাসীন-ভাবে। আর এখন, এই শেষ মুহূর্তেও আমি আপনার স্মরণ থেকে উদাসীন রয়েছি। আমি চরম অকৃতজ্ঞ। জানি না, আপনার সঙ্গে মিলিত হবার যোগ্য বলে আমি বিবেচিত হব কিনা।

তিনি যখন এই শেষ প্রার্থনা উচ্চারণ করছেন, তখন তাঁর পবিত্র আত্মা ধীরে ধীরে পার্থিব দেহ থেকে বিদায় নিচ্ছিল।

ইন্তেকালের পর ঃ ঐ রজনীতে তাঁর প্রিয় শিষ্য হযরত আবু মূসা রহমাতুল্লাহ অন্যত্র ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহর আরশ মাথায় নিয়ে হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ আসমানে ঘুরছেন। পরদিন ভোরেই স্বপ্নের তাৎপর্য জানার জন্য তিনি মুরশিদের উদ্দেশ্যে রওনা হন। গিয়ে দেখেন, তাঁর মরদেহ নিয়ে লোকজন কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর এই দৃশ্য দেখে তিনি ছুটে গেলেন লাশবাহী খাটে কাঁধ লাগাতে। কিন্তু কাঁধ লাগাবার মতো সামান্যতম জায়গাও পেলেন না। তখন তিনি ঢুকে পড়লেন খাটের তলায়। আর খাটের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

এতক্ষণ ধরে স্বপ্নের কথা তাঁর স্মরণে আসেনি। হঠাৎ তা মনে পড়ল। আর তখন মাথায় খাট নিয়ে চলতে চলতেই তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। আর ঐ অবস্থায় দেখলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি গত রাতে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, এই ঘটনাই তার ব্যাখ্যা।

আবু মূসা রহমাতুল্লাহ অবাক বিস্ময়ে সরবে বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! সবাই স্বপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, এই মাত্র হযরত বায়েজীদ বোস্তামী স্বয়ং হাজির হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে গেলেন।

আর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তাসাওউফের অর্থ কি?

তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, আরাম-আয়েশ বর্জন করে দুঃখ-কষ্ট বরণ করাই তাসাওউফ।

তাঁর এক শিষ্য স্বপ্নে তাঁকে অনুরোধ করেন, দয়া করে আপনি আপনার কবরের ঘটনা বলুন হুযুর! তিনি বলেন, মুনকার নকীর এসে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহকে আপনি প্রভু বলে স্বীকার করেন কিনা?

আমি বললাম, এ প্রশ্নের জবাব দ্বারা আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। কেননা, আমি অসংখ্যবার তাঁকে আমার প্রভু বলে স্বীকার করলেও তিনি যদি আমাকে তাঁর দাস বলে গ্রহণ না করেন, তাহলে আমার স্বীকৃতিতে কী লাভ হবে? আপনারা বরং ফিরে গিয়ে তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন, আমাকে তিনি তাঁর বান্দা বলে স্বীকার করেন কিনা। গ্রহণযোগ্য হলে তো তাঁর কথাই আমার কথা একথা শুনে তাঁরা তখনই চলে যান। তাঁদের তরফ থেকে আমার ওপর আর কোন বিষয় দেখা দিল না।

হযরত
সুফিয়ান সাওরী
রহমাতুল্লাহ

এক অন্তঃসত্ত্বা নারী প্রতিবেশিনীর অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকেই একটি পাত্রে রক্ষিত কোন খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করলেন আঙ্গুলের ডগা দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান থর থর করে কেঁপে উঠল। বুদ্ধিমতী, ধর্মভীরু নারী এর কারণ উপলব্ধি করে প্রতিবেশিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আর ক্ষমা পাওয়া মাত্র জঠর কম্পন থেমে গেল।

এই গর্ভস্থ সন্তান হলেন পরবর্তী কালের এক বিখ্যাত সাধক হযরত সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহ। সাওর তাকেই বলা হয়, যে গরুর মতো অবোধ আচরণ করে। হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-এর এ পদবীটি প্রক্ষিপ্ত। একদিন মসজিদে ঢোকার সময় ডান পায়ের বদলে তিনি বাম পা বাড়ান। আর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য শব্দ শোনা যায়, হে সাওর! তুমি কি করছ? অর্থাৎ তুমি যে বলদের মতোই কাজ করছ। আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে তিনি সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহ নামে পরিচিত হতে থাকেন।

দৈববাণী শোনামাত্র আতঙ্কে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। যখন প্রকৃতিস্থ হলেন, তখন নিজের হাতে দাড়ি আকর্ষণ করে তিনি নিজের গালেই চড় মারতে শুরু করলেন। আর বলতে লাগলেন, রে মন! তুই যখন আল্লহার ঘরের আদব রক্ষা করলি না, তখন সেটার প্রতিফল খুব ভালো করেই পেলি। আল্লাহ্ তোর নামকে পশুর সঙ্গেই রেখে দিয়েছে। অতএব এখনও সতর্ক হয়ে চল যেন আর কোনদিন এমন স্পর্ধা না হয়।

না, তাঁর মন আর তেমন স্পর্ধা দেখায়নি। পরবর্তীকালে তিনি আল্লাহর প্রিয় বন্ধুদের অন্যতম বলে স্বীকৃত হন। এমনকি সুলতান, বাদশাহ খলীফা না হয়েও তিনি আমীরুল মু'মিনীন নামে খ্যাত হন। তাঁর শিষ্টাচার সৌজন্য আর নম্রতা তাঁকে বিশিষ্ট করে তোলে। আর দ্বীনী এলমের জন্য তিনি তো জগদ্বিখ্যাত। তাপসকূল শিরোমণি। বিখ্যাত বসরা শহরে হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অসাবধানতা বশতঃ তিনি একবার এক শস্য খেতে পা দিয়ে ফেলেন। আর তখনও তাঁকে শুনতে হয় আল্লাহর ভর্ৎসনা। ওহে গরু, তুমি দেখে-শুনে পা ফেলছ না কেন? আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকে বুঝি প্রতি পদে এমন সাবধান করে দেন। অর্থাৎ কোন সময়েই যেন তাঁর প্রিয় বন্ধুর পদস্খলন না ঘটে।

হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ বলেন, জীবনে আমি এমন কোন হাদীস শুনিনি যার ওপর আমি নিজে আমল করিনি। তিনি হাদীস-বেত্তাদের বলতেন, আপনারা কি হাদিসের যাকাত আদায় করেন? তাঁরা বলতেন হাদীসের আবার যাকাত কি? তিনি বলতেন, মালের যেমন শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হয়, তেমনি আপনারাও শোনা হাদীসের শতকরা মাত্র আড়াই ভাগের ওপরে চর্চা করে থাকেন কি?

হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ একবার তৎকালীন খলীফার পাশাপাশি নামায পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যে খলীফা দাড়িতে হাত বুলালেন। নামায শেষে হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ তাঁকে বললেন, এটা ঠিক নয়। হাশরের মাঠে এ ধরনের নামাযকে নাপাক গোলার আকারে নামাযীর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হবে।

তার কথা শুনে খীলফা দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শূলে চড়াবার নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-এর কানে গেলে তিনি বললেন, প্রাণের জন্য আমার কোন মায়া নেই। তবে দ্বীনের রীতি-নীতির প্রতি আমার অন্তরে রয়েছে অফুরন্ত প্রেম।

পরদিন তাঁকে শূলে চড়ানো হবে। তিনি সুফিয়ান ইবনে ওআইনায়ার রহমাতুল্লাহ দু'জানুর ওপর মাথা রেখে তাঁর প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বলছিলেন, হে প্রভু! আমি আপনার ন্যায্য কথা বলেছি– যার জন্য খলীফা আমাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। আজ তা কার্যকর হবে। আপনার নিকট এ বিষয়ে বলার কিছু নেই। যেহেতু আপনি সব কিছুই প্রত্যক্ষ করছেন।

ওদিকে খলীফা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁকে দরবারে হাজির করার হুকুম দিলেন। খলীফার আদেশ পালন করার জন্য তাঁর অনুচরবর্গ যেই দরবার থেকে বের হয়েছেন, অমনি আল্লাহ্ পাকের গজবস্বরূপ দরবার কক্ষের ছাদ ধ্বসে পড়ল। আর পারিষদসহ খলীফা নিহত হলেন।

এ ঘটনার পর কেউ বলেন, হুযুর! দোয়ার ফলাফল এত দ্রুত ও ভয়ঙ্কর ভাবে ফলতে কোথাও দেখিনি। হযরত বললেন, হক কথা বলার জন্যই দোয়ার ফল এতটা তীব্র হয়েছে।

খলীফার অপমৃত্যুর পর নতুন খলীফা নির্বাচিত হলেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরির পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই সাধক সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে কোনরূপ অশিষ্টাচরণ না করে সুসমপর্ক বজায় রেখে চললেন। কিছু দিন পর দেখা গেল, হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ ব্যাধি গ্রস্ত হয়ে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগলেন। তখন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে খলীফা সরকারী চিকিৎসক নিযুক্ত করলেন। ঘটনা-ক্রমে ঐ চিকিৎসক ছিলেন অগ্নি উপসাক। তিনি নানাভাবে চিকিৎসা করে বুঝলেন যে, বাহ্যত তাঁর কোন রোগ ব্যাধি নেই। তাঁর মূত্র পরীক্ষা করে দেখলেন, অত্যধিক আল্লাহ–ভীতির কারণেই কলজে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আর তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা প্রস্রাবের সাথে নির্গত হচ্ছে।

এ অবস্থা দেখে চিকিৎসকের মনে ভাবান্তর দেখা দেয়। ভাবতে থাকেন, যে ধর্মে এমন আল্লাহ-ভীরু লোক থাকেন, তা কখনই সত্য খাঁটি না হয়ে যায় না। তিনি তখন সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-এর কাছে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। একথা শুনে খলীফা মন্তব্য করলেন, আমি চিকিৎসক পাঠালাম রোগীকে রোগ-মুক্ত করার জন্য। এখন দেখছি তিনি গিয়েছিলেন তাঁর নিজের চিকিৎসার গরজে। আর তাঁর উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যৌবনেই তিনি কুঁজো হয়ে যান। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তাঁর এক জ্ঞানী শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি একদিন দুঃখ করে তাঁকে বলেন, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষকে তিনি সৎ পথ দেখিয়ে আসছেন। অথচ এখন তারা পথ প্রদর্শনের যোগ্য নয় বলে তাঁকে আড়িয়ে দিচ্ছে। গুরুর মুখে এ কথা শুনে তাঁর দুঃখেই তাঁর পিঠ বেঁকে যায়।

এক যুবক একদিন তাঁকে দু'থলে আশরাফী উপহার দিয়ে পাঠালেন। বলে পাঠালেন, হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে তাঁর পিতার বন্ধুত্ব ছিল। তারই নিদর্শন-স্বরূপ এ উপহার। তিনি নিজেই এগুলো উপার্জন করেছেন। অতএব সম্পূর্ণরূপে বৈধ। কিন্তু হযরত সেগুলো গ্রহণ না করে লেখে পাঠালেন, তোমার পিতার সঙ্গে আমার কেবল দ্বীনি বন্ধুত্ব ছিল, কোনরূপ পার্থিব সম্পর্ক নয়। কাজেই এ আশরাফী নেওয়া গেল না।'এ ঘটনা হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-এর পুত্র শুনতে পেয়ে বললেন, আমি অনেকগুলো সন্তানের পিতা এবং অভাব-গ্রস্ত। আপনি ঐ আশরাফী ফেরত না পাঠিয়ে আমাকে দিলে আমার বড় উপকার হত। পুত্রের কথা শুনে হযরত বললেন, দ্বীনি সম্পর্ককে এভাবে পার্থিব বিষয় দিয়ে নষ্ট করতে পারি না। তবে সে যদি নিজে তোমাকে কিছু দেয়, তুমি তা নিতে পার।

তিনি কারো কাছ থেকে কোন উপহার গ্রহণ করতেন না। এক ব্যক্তির উপহার গ্রহণ না করায় তিনি বলেন, এমন নয় যে,- আপনি আমাকে উপদেশ দান করেছেন, আর তার বিনিময়স্বরূপ আমি এ উপহার দিচ্ছি। অতএব আপনি এটা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক কেন? তিনি বললেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিইনি ঠিকই। তবে উপহার ছাড়াই আমি তোমার বহু মুসলিম ভাইকে উপদেশ দিয়ে থাকি। প্রয়োজন হলে হয়তো তোমাকেও দেব। তোমার তোহফা গ্রহণ করলে তোমার প্রতি আমার কিছুটা আকর্ষণ বেড়ে যেত। আর এর নামই হল দুনিয়া- যা থেকে আমি দূরে থাকতে চাই। আল্লাহ্ ছাড়া কোনদিকেই আমার এতটুকু ঝোঁক নেই। তুমি তা সৃষ্টির জন্য মোটেই চেষ্টা করো না।

তিনি চলেছেন কোন প্রাসাদের পাশ দিয়ে। তাঁর সঙ্গী বেশ মনোযোগ সহকারে প্রাসাদ দেখতে লাগলেন। তিনি তা লক্ষ্য করে বললেন, ধনী লোকেরা এভাবে বৃথা ব্যয় করে। আর সেগুলো যারা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে, তারাও পাপে লিপ্ত হয়।

একবার তিনি এক মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সবাই সে ব্যক্তির গুণগান করছে। এসব দেখে শুনে তিনি বললেন, তোমরা যে যা-ই বল, লোকটি কিন্তু মোনাফেক ছিল। আগে জানলে আমি তার জানাযায় শামিল হতাম না। সে যে মোনাফেক ছিল, তার প্রমাণ হিসেবে তিনি বললেন যে, দুনিয়ার লোক তার প্রশংসা করছে। অর্থাৎ দুনিয়াদারদের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। এটা সুলক্ষণ নয়।

একদিন দেখা গেল, গায়ের জামাটি উল্টা করে পরেছেন। কে যেন বলল হুযুর, জামাটি ঠিক করে নিন। তিনি বললেন, তোমাদের চোখে ভালো দেখাবার ইচ্ছায় আমি জামা পরিনি। পরেছি কেবল আল্লাহর জন্য।

মক্কা মোয়াজ্জমায় গিয়ে এক ব্যক্তি হজ্জ না পেয়ে দারুণ মর্মাহত। হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি চারবার হজ্জ করেছি। একটি শর্তের বিনিময়ে আমি ঐ চারটি হজ্জের পুণ্য তোমাকে দিতে পারি। শর্তটি হল, তুমি তোমার অনুশোচনামূলক 'আহা' শব্দের পুণ্য আমাকে দিয়ে দেবে।

লোকটি তো পরম খুশী। সে রাজি হয়ে গেল। আর হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-ও খুশী মনে তাঁর চার হজ্জের পুণ্য তাকে দান করে তার 'আহা' শব্দের পুন্য গ্রহণ করলেন।

ঐ রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, এক শান্ত-সৌম্য জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁকে বলছেন, তুমি ঐ লোকটির কাছ থেকে যে পুণ্য অর্জন করেছ, তা যদি আরাফাতে সমবেত সমস্ত হজ্জযাত্রীর মধ্যেও বন্টন করে দাও, তবুও প্রত্যেকেই পুণ্যের দিক দিয়ে বড় ধনী হয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একদিন এক হাম্মামখানা থেকে তিনি এক অল্প বয়স্ক দাড়িগোঁফশূন্য কিশোরকে বে'র করে দিতে বললেন। এর কারণ হিসেবে বললেন, প্রত্যেক নারীর সঙ্গে একটা শয়তান থাকে। আর দাড়িবিহীন গোঁফশূন্য সুশ্রী বালকের সঙ্গে থাকে আঠারোটি। শয়তান মানুষের চোখে এদের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়ে দেয়।

আর একদিন খাবারে সময় একটি কুকুর এলে তিনি তৎক্ষণাৎ এক টুকরা রুটি ছুঁড়ে দেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি পরিবার-পরিজনদের নিয়ে খেতে বসেন না কেন? তিনি উত্তর দেন, আপনজন হলেও তারা আমার এবাদতে বিঘ্ন ঘটায়। অথচ এ কুকুরটি রাত্রে পাহারায় নিযুক্ত থেকে লোকজনদের বাধা দেয়। ফলে আমি নিরিবিলি এবাদত করতে পারি।

একবার হজ্জযাত্রার প্রাক্কালে তিনি বড় কান্নাকাটি করেন। লোকজন জিজ্ঞেস করেন, পাপের ভয়ে আপনি এমন করে কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন, না, পাপের ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত খুবই ব্যাপক ও শক্তিশালী।

তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন, মানুষ উপাদেয় খাবারের জন্য বড় আগ্রহী। কিন্তু কোন উপাদেয় বস্তু বিস্বাদ হতে কতক্ষণ? খাদ্যবস্তু কণ্ঠনালীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত থাকে, ততক্ষণই স্বাদ কিংবা বিস্বাদ। এর নিচে গেলে তো আর কিছুই থাকে না। তাহলে এই ক্ষণস্থায়ী বস্তুর প্রতি এত মোহগ্রস্ত হয়ে কী লাভ!

তিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই, আরেফকে মারেফাত দান করেন, আবেদকে নৈকট্য দেন, হাকিমকে হেকমত দিয়ে থাকেন অন্য কেউ নয়। তিনি আরও বলেন, ক্রন্দন দশ রকমের। তার মধ্যে নয় প্রকার হল রিয়া। শুধু একটিই আল্লাহর ভয় মিশ্রিত। আল্লাহর ভয়ে নির্গত এক ফোঁটা অশ্রু সারা জীবনের ক্রন্দনের চেয়ে শ্রেয়। তিনি আরও বলেন, পুণ্যবানদের পুণ্য কর্মগুলো ফেরেশ্তাগণ পুন্যের দপ্তরে লেখে রাখেন। কিন্তু পুণ্যবানরা যদি পুণ্য কর্ম করে অহঙ্কার প্রকাশ করেন তবে সেগুলো রিয়ার দপ্তরে লিখিতি হয়।

উপাসকগণ যদি সুতলান-বাদশাহ বা আমীর-ওমরাদের সংস্রবে থাকেন, তবে অচিরেই তাঁরা রিয়াকার হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'যাদেহ' তাঁকে বলে' যে এবাদত করে অথচ তা নিয়ে কোন গৌরব করে না বা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তা প্রচারও করে না। আর 'যেহাদ -এর প্রকৃত অর্থ হল মামুলি খাদ্য গ্রহণ করা।' মোটা বস্ত্র পরিধান করা, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া এবং আশা-আকাঙ্খা বাড়িয়ে না তোলা। তিনি বলেন, নির্জনবাসীগণ পরকালের মুক্তি অর্জন করবেন। নির্জনবাসে রুজি মিলবে কি করে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যাদের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি বর্তমান, তাদের রুজি কোত্থেকে আসে, তা তারা টেরও পান না। তিনি বলেন, দুনিয়াদারদের পক্ষে নিদ্রা জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, তারা ঘুমন্ত অবস্থায় দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি আরও বলেন, যাহেদের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপনকারী যাহেদ অপেক্ষা উত্তম।

তাঁর মতে, পাঁচ ধরনের মানুষ সবার প্রিয়। যেমন ঃ (১) ত্যাগী বিদ্বান, (২) সাধক সুফী, (৩) বিনয়ী ধনী, (৪) কৃতজ্ঞ দরবেশ ও (৫) ভদ্র সুন্নী।

তিনি বলেন, যিনি বিশ্বাসী, তিনি শত দুঃখ-কষ্টেও অকৃতজ্ঞ হয় না। তিনি আরও বলেন, সে-ই আমার প্রিয় বন্ধু যে আমাকে কষ্ট দেয় ও আমার ধন-সম্পদ আত্মসাত করে।

ইয়াকীন বলতে তিনি বুঝতেন কলবী আওয়াজকে। যার মধ্যে ইয়াকীন থাকে তিনি মারেফত হাসিল করতে পারেন। আর এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, যার মধ্যে ইয়াকীন রয়েছে তিনি যেকোন বিপদ-বিপর্যয়কে আল্লাহর ইচ্ছা বলে গণ্য করেন।

'অতিরিক্ত গোশত ভক্ষণকারী আল্লাহর শত্রু' রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ কথার মর্ম কি?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর উত্তর ঃ এখানে গোশত ভক্ষণ করার অর্থ পরনিন্দ-পরচর্চা করা। কেননা, পরনিন্দা বা গীবত হচ্ছে মৃত দেহের গোশত ভক্ষণ করা। গীবতকারীকে আল্লাহ্ শত্রু বলেই জানেন।

হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ হযরত হাতেম ইবনে আসাম রহমাতুল্লাহ-কে চারটি বিষয় সম্বন্ধে বলেন। সেগুলো হল (১) মানুষের প্রতি অপবাদ আল্লাহর নির্দেশের প্রতি উদাসীন করে দেয়। (২) কোন মুমিন লোকের উন্নতি দেখে হিংসা পোষণ করা অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ। (৩) নিষিদ্ধ বস্তু উপার্জন করা ও (৪) আল্লাহর রহমতের প্রতি নৈরাশ্য প্রকাশ করা কুফরীর লক্ষণ।

তিনি তাঁর সফর-উদ্যত শিষ্যদের চমৎকার একটি কথা বলতেন। বলতেন, তোমরা কোথাও যদি মৃত্যু দেখতে পাও তবে তা আমার জন্য কিনে আনবে।

কেননা, মৃত্যু তাঁর কাছে একটি মহার্ঘ্য বস্তু। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তিনি বলতে থাকেন, এতদিন তো মনের ঝোঁকে মৃত্যু চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন বুঝছি, মৃত্যু খুবই কঠিন বস্তু। পৃথিবীতে লাঠির ওপর ভর দিয়ে চলা (অর্থাৎ বেঁচে থাকা)। বেশ কষ্টকর। তার মানে, আল্লাহ্ পাকের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়।

মৃত্যু আসন্ন জেনে প্রচণ্ড ভয়ে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁকে বলা হয়, তিনি তো জান্নাতী লোক। তাঁর এতদূর ভীত হওয়ার কারণ কি? তিনি মাথা নেড়ে বললেন, তোমরা কি মনে কর আমি জান্নাতের যোগ্য? জান্নাতী লোকের নিদর্শন অন্য রূপ।

তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বসরা শহরে। শহরের শাসনকর্তা তাঁকে খুঁজে বে'র করার জন্য নির্দেশ দেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল কঠিন উদরাময়ে ও পেটের যন্ত্রনায় তিনি অস্থির। কিন্তু তখনও আল্লাহর ধ্যানে বিভোর। ঐ রাতে অন্তত ষাটবার ওযু করলেন। আর সারারাত নামাজ পড়লেন। তাঁকে বলা হল, আপনি পীড়িত। এতবার ওযুর কী দরকার? তিনি জবাব দেন, তাঁর আশঙ্কা, তিনি হয়ত অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সমীপে নীত হবেন।

অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন। তাঁর নির্দেশে হযরত আবদুল্লাহ মাহেদী তাঁকে মাটির ওপর রেখে দিলেন। তারপর বাইরে গেলেন তাঁর শেষ বিদায়ের কথা সবাইকে বলতে। বাইরে গিয়ে আবদুল্লাহ মাহেদী অবাক। অসংখ্য মানুষ এসে ভিড় করেছে সেখানে। তিনি তাদের ভিড় জমাবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জনতার পক্ষ থেকে বলা হল, গত রাতে তারা স্বপ্ন দেখেছে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর কাফন-দাফনে তাদের আজই যোগ দিতে বলা হয়েছে। আর এ খবর শুনে তারা এখানে ছুটে এসেছে।

অতঃপর লোকজন যখন ভেতরে তাঁর অন্তিম শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল তখন তিনি তাঁর মাথার পার্শ্বস্থিত বালিশের তলা থেকে এক হাজার টাকার একটি থলে বে'র করে দিয়ে সেগুলো গরীব-দুঃখীদের দান করতে বললেন। অনেকের মনে প্রশ্ন এল, তিনি নিজে সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে বলতেন অথচ নিজে এতগুলো টাকা জমা করেছেন। হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ মানুষের মনে প্রশ্ন অনুধাবন করে বললেন, ঈমান রক্ষার প্রয়োজনে আমি এগুলো জমা করে রেখেছিলাম। যখন ইবলীস আমাকে জিজ্ঞেস করত, তোমার ভরণ-পোষণ কোত্থেকে আসবে? আবার যখন সে বলত, তোমার কাফন জুটবে কোত্থেকে? তখনও তাকে এই টাকার কথা বলতাম। সে আমার কাছে পাত্তা পেত না। আসলে, আমার নিজের কোন প্রয়োজনে নয়, শয়তানের প্রতারণ থেকে বাঁচবার জন্যই এটা জমা রেখেছিলাম। শেষ কথাগুলো শেষবারের মতো উচ্চারণ করে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করলেন। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

বোখারায় একজন আল্লাহর বন্ধু ছিলেন। তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁর

মৃত্যুর পর তাঁর কিছু নগদ টাকা হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-এর হেফাজতে গচ্ছিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-এর বয়স মাত্র আঠারো। বোখারার কাজীর মাধ্যমে টাকা গচ্ছিত রাখার সংবাদ পেয়ে তিনি সেখানে যান। বোখারার বিদ্বৎ সমাজ তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানান। আর তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় আল্লাহর ওলীর রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদ। সে সম্পদ মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তা দীন-দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

কথিত আছে, তাঁর মৃত্যুর দিন সবাই এক অদৃশ্য শব্দ শুনতে পান। 'মাতাল ওয়ারা-মাতাল ওয়ারা' পরহেজগার ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পরহেজগার ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

খুব দয়ালু দাতা ছিলেন হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ। এমনকি পশু-পাখীর প্রতিও তিনি দয়ার্দ্র চিত্ত ছিলেন। একদিন বাজারে খাঁচায় বন্দী একটি পাখী দেখতে পান। বাইরে বেরোবার জন্য বেচারা ছটফট করছে। তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি তখনই পাখীটাকে কিনে নিয়ে আকাশে ছেড়ে দিলেন। কথিত আছে, পাখিটি নাকি প্রায়ই তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। তিনি নামাজে নিমগ্ন হলে চুপ করে বসে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। কখনও কখনও তাঁর গায়ের ওপরে গিয়ে বসত। মৃত্যুর পর যখন মরদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন পাখীটি বসেছিল ঐ খাটের ওপরেই। যখন তাঁর মরদেহ কবরস্থ করা হলা, তখন প্রিয়জনের মতো বিরহ-বেদনায় ছটফট করে বিলাপ শুরু করল। পাখীর এ অভিব্যক্তি দেখে প্রতিটি চোখ অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে। আর তখন কবরের মধ্য হতে আওয়াজ শোনা গেল- আমি জীবে দয়া করতাম বলে আল্লাহ্ আমাকে দয়া করেছেন।

হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ সমাহিত হওয়ার পর এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কবরের দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে আপনি একা কেমন করলেন?

তিনি বললেন, আমার কবরকে আল্লাহ্ জান্নাতের বাগান করেছেন।

অন্য এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেন, তিনি একটি পাখীর মতো জান্নাতের এ গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন; হুযুর আপনি এমন মহিমা কিসে অর্জন করলেন?

তাঁর জবাবঃ ত্যাগ ও ধর্মভীরুতার দ্বারা।

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ

একজন ভাগ্যবান পুরুষ হলেন হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ। ভাগ্যবান এই অর্থে যে, তিনিও সেই সোনালী যুগের সন্তান। নবীর শহর মদীনাতে তাঁর জন্ম। তাঁর মা ছিলেন উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমা (রাঃ)-এর একজন পরিচারিকা। তাঁর সৌভাগ্য এই যে, শিশু অবস্থায় তিনি উম্মে সালামার (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্তন্য পান করেছেন। মা কাজে ব্যস্ত। শিশু হাসান হয়ত ক্ষুধার কারণে কান্না শুরু করেছেন, তখন হযরত সালামা (রাঃ) নিজের স্তন তাঁর মুখে পুরে দিতেন। আর সেই স্তণ্য পান করে তিনি শান্ত হতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজে নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু তিনিও মাঝে মাঝে ক্রন্দনরত শিশুকে পরম আদরে তুলে নিয়ে বুকের দুধ পান করাতেন। নিঃসন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্তন থেকে দুধ বের হতো। সবই আল্লাহর অপার মহিমা। এর চেয়ে ভাগ্যবান কে আছে! আর মুসলিম দুনিয়ার দুই জননী, দুই নবী পত্নীকে তিনি জননী হিসাবে পেয়েছেন। তাঁদের বুকের পীযুষধারা পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুধু তাই নয়, পেয়েছেন মহানবীর সানুরাগ সংস্পর্শ। একদিন তো স্বয়ং রাসূলে কারীমের পানির পেয়ালার পানি পান করে ফেললেন শিশু হাসান। পেয়ালায় পানির পরিমাণ কম দেখে রাসূলুল্লাহ রহমাতুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, পানি পান করল কে?

উম্মে সালামা (রাঃ) বললেন, হাসান।

নবীজী বললেন, আমার পানির পেয়ালা থেকে যে পরিমাণ পানি সে পান করেছে, আল্লাহ্ তাকে সেই পরিমাণ দ্বীনী এলম দান করবেন। এক হাদীসে দেখা যাচ্ছে, একদিন হযরত যখন উম্মে সালামা (রাঃ)-এর ঘরে এলেন, তখন তিনি হাসানকে রাসূলুল্লাহর কোলে তুলে দিলেন। তাঁকে কোলে নিয়ে তিনি তাঁর জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া জানালেন। বলাবাহুল্য, নবী মুস্তফার এই দোয়ার কারণেই হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর জীবনে সাফল্য আসে আল্লাহর তরফ থেকে। তাই বলছিলাম, তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান কে আছে আর?

এমনকি নামটির পেছনেও সৌভাগ্যের সঙ্কেত আছে। শোনা যায়, ভূমিষ্ট হওয়ার পর কে যেন ঐ ফুটফুটে শিশুকে নিয়ে যায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে। নবজাতককে দেখে তিনি বলে ওঠেন, 'ভারী সুন্দর' চেহারা তো! চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেন এর নাম রাখা হয় হাসান। 'হাসান' শব্দের অর্থ সুন্দর। তখন থেকে তিনি 'হাসান' নামেই পরিচিত হয়ে গেলেন। অর্থাৎ তাঁর নামের পেছনে রয়ে গেল মুসলিম বিশ্বের আর এক উজ্জ্বল মানুষের স্নেহময় অভিব্যক্তি। নিজের সন্তান না হলেও হযরত সালমা (রাঃ) তাঁকে পুত্র-বৎ স্নেহ করতেন। তাঁর জন্য দোয়া করতেন। আল্লাহ্ যেন তাঁকে মুসলিম-জাহানের ইমাম বানিয়ে দেন, এই ছিল তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা।

তাঁর সৌভাগ্যের আরও প্রমাণ এই যে, তিনি কম করে হলেও একশ কুড়ি জন আলোকিত পুরুষের সংস্পর্শধন্য। হযরত আলী (রাঃ)-এর পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ)-এর কাছে তিনি বিদ্যার্জন করেন। শরীয়তী জ্ঞান ছাড়াও মারেফতের দীক্ষাও তিনি তাঁরই কাছ থেকে পান। অবশ্য 'তোহফা' নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ আসলে হযরত আলী (রাঃ)-এর শিষ্য।

কখন কী হয় ঃ নবারুণের মতো প্রদীপ্ত তরুণ হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ ছিলেন রত্ন ব্যবসায়ী। ব্যবসা উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করতেন। সমকালের বিশ্ব বিখ্যাত সাম্রাজ্য হল রোম। রোমের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

একবার রোমে পৌঁছেই হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ দেখলেন, মন্ত্রী বর কোথায় যেন যাবার জন্য প্রস্তুত। বন্ধুকে দেখে তিনি খুব খুশী। বললেন, বড় ভাল সময়ে এসেছেন আপনি। চলুন, আমার সঙ্গে গিয়ে একটি অনুষ্ঠান দেখে আসবেন।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাঁরা যাত্রা করলেন।

গন্তব্যস্থলে গিয়ে দেখা গেল, এক মাঠের প্রান্তে স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য খচিত রেশমী বস্ত্রের একটি সুদৃশ্য অপূর্ব তাঁবু। তাঁবুর চারপাশে ঘুরে ঘুরে একদল সু-সজ্জিত সৈন্য নিজেদের ভাষায় কী যেন বলতে লাগল। তারপর চলে গেল। এরপর এলেন একদল অভিজ্ঞ পণ্ডিত মানুষ। তাঁবু প্রদক্ষিণ করে তাঁরাও যেন কি বললেন আর চলে গেলেন। তারপরে এক একদল রূপসী মহিলা। মাথায় মণিমাণিক্য ভর্তি স্বর্ণের থালা, তারাও ঘুরল তাঁবুর চারদিক। কী যেন বলল আর চলে গেল। সব শেষে এলেন স্বয়ং রোম সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী। তাঁদের সঙ্গে এবার প্রধানমন্ত্রী গিয়ে যোগ দিলেন। আর সবাই ঢুকলেন তাঁবুর ভেতরে। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর তাঁরা বেরিয়ে এলেন তাঁবুর বাইরে। কিন্তু তাঁরা অশ্রু-সজল।

মন্ত্র মুগ্ধের মতো সবকিছু দেখে গেলেন হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ। এসবের কী

কারণ, কী ব্যাখ্যা, তা জানার জন্য তার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। মন্ত্রী যখন ফিরে এলেন তাঁর কাছে, তখন তাকেই এ ঘটনার মর্ম জিজ্ঞেস করলেন।

মন্ত্রী বললেন, আমাদের সম্রাটের এক পুত্র ছিল। তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন। হঠাৎ ছেলেটি এক কঠিন অসুখে পড়ল। দেশ-বিদেশ থেকে নামী-দামী চিকিৎসকরা এলেন তার চিকিৎসা করতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, সে মারা গেল। তাকে এখানে কবর দেওয়া হয়। তার কবরের ওপর রয়েছে ঐ সুদৃশ্য তাঁবুটি। রাজপুত্রের স্মরণে প্রতি বছর এখানে এ অনুষ্ঠান হয়।

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বললেন, কিন্তু এখানে যাঁরা এলেন আর কী কী কথা বলে চলে গেলেন, তা তো বুঝলাম না।

মন্ত্রী বললেন, প্রথম যে সেনাদল দেখেছেন, তারা বলে গেল, হে রাজকুমার! আপনার যা ঘটেছে, আমাদের বাহুবল ও অস্ত্রবল দিয়ে যদি তা প্রতিহত করা যেত, তাহলে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে আপনার প্রাণ রক্ষা করতাম। কিছুতেই এ অবস্থার শিকার হতে দিতাম না। কিন্তু যাঁর ইশারা-ইঙ্গিতে এমনি হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চলে না। তিনি এমন অমিত শক্তির অধিকারী যে, তাঁর শক্তির সামনে কোন বীরের বীরত্ব ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আর পণ্ডিত সমাজ বলে গেলেন! রাজকুমার আমরা আপনার জন্য দুঃখিত। কিন্তু কী আর করা যাবে। আমাদের পাণ্ডিত্য যদি আপনাকে রক্ষা করতে পারত, তাহলে তা প্রয়োগ করতে কিছু কম করতাম না। কিন্তু এক্ষেত্রে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা কিছুই কার্যকর নয়। কোন বিদ্যাই এ অবস্থাকে আটকাতে পারে না।

পরে মহিলারা এসে বলে গেল, যুবরাজ! আপনার বিচ্ছেদ-বেদনা অসহ্য। আপনাকে হারিয়ে আমরা চোখের পানিতে ভাসছি। কিন্তু কিছু করার নেই। আমাদের রূপ-লাবণ্য যদি আপনাকে রক্ষা করার কাজে লাগানো যেত, তাহলে কখনই আমরা পিছপা হতাম না, কিন্তু এ ঘটনা প্রবাহের নিয়ন্তা যিনি, তাঁর কাছে আমাদের কোন মূল্য নেই। আমরা আপনার জন্য কিছু করতে অক্ষম।

সব শেষে সম্রাট। তিনি তাঁর পুত্রের উদ্দেশে বললেন, প্রিয়তম পুত্র! তোমার পিতার শক্তি-সামর্থ্য আর কতটুকু! কত সৈন্য রয়েছে আমার। রয়েছে জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান। তারা সবাই তোমার হিতকামী ছিল। সবাই তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করত। কিন্তু তোমার প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে সবাই অক্ষম। আমি আজ সবাইকে তোমার কাছে হাজির করেছি। আর তারা তাদের অক্ষমতার কথা তোমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল। আমি আর কী বলব! পুত্র স্নেহ যে কী, যার পুত্র রয়েছে সে ছাড়া আর কেউ তা উপলব্ধি করতে পারবে না। আমার সৈন্য-সামন্ত, অর্থ, উপকরণ, বিদ্যা-বুদ্ধি বা যে কোন শক্তি প্রয়োগ করে যদি তোমাকে রক্ষা করা সম্ভব হত, তাহলে আমি কখনও পিছপা হতাম না। সাম্রাজ্য, সম্পদ বিসর্জন দিয়েও যদি তোমাকে রক্ষা করতে পারতাম, তাতেও কোন ত্রুটি হত না। কিন্তু ঘটনার মালিক যিনি, তাঁর কাছে তোমার পিতা, এমনকি পৃথিবীর যে কোন সম্রাট, বীর, যোদ্ধা একান্তই দুর্বল।

অতএব, প্রাণাধিক পুত্র আমার, তোমার রক্ষার ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারলাম না।

মন্ত্রীর মুখে ঘটনার বিবরণ শুনে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর মনে ভাবান্তর দেখা দিল। ফুটে উঠল পার্থিব জীবনের অসারতা। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ রইল না। সবকিছু ছেড়ে সহসা তিনি চলে গেলেন বসরায়। প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কোনদিন সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হবেন না। সেখানে শুরু হল তাঁর একাগ্র আধ্যাত্মিক জীবন। আল্লাহর উপাসনায় নিমগ্ন হলেন তিনি। সে এক কঠিন অকল্পনীয় জীবন-সাধনা। সেকালে

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর মতো তপস্বী আর দেখা যায়নি। কখন যে কী হয়, আলেমুল গায়েব আল্লাহই তা জানেন। মহানবীর কিংবা নবী পত্নীর দোয়া আল্লাহ মঞ্জুর করেন। শিশু হাসান হয়ে ওঠেন মহাসাধক হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ নামে খ্যাত।

প্রায় ৭০ বছর ধরে একটানা তাঁর অযু ছিল। মাঝে মাঝে ওযু নষ্ট হলে তিনি তৎক্ষণাৎ ওযু করে নিতেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সকল লোকই তাঁর জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এই জন্য জ্ঞানী হিসাবে তাঁর নাম সকলের উর্ধ্বে।

হযরত রাবেয়া বসরী রহমাতুল্লাহ-এর উপস্থিতি তাঁর কাছে ছিল খুবই প্রেরণাদায়ক। সাধারণতঃ প্রতি শুক্রবার জুমআর নামাজের পর তিনি ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ অনুপস্থিত থাকলে বক্তৃতা দিতেন না। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, যে শরবত হাতির পানের উপযোগী তা পিঁপড়ার পানপাত্রে কিভাবে ঢেলে দেওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁর ভাষণের মর্ম গ্রহণের যোগ্যতা হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর তুলনায় অন্যদের ছিল না বললেই চলে। অনেক সময় তিনি এই পরম সম্মানিতা তাপসীকে বলতেন, আমার ভেতরে এই যে আন্তরিক প্রেরণা, এ এল কোত্থেকে? এর সৃষ্টি তোমারই অন্তরে।

"বেশী লোক জড়ো না হলে কি আপনি খুশী হন না?" –অনেকে তাঁকে এ প্রশ্ন করতেন। তিনি বলতেন, না, তা নয়। লোক বেশী হলেই আমি খুশী হই না। বরং যদি একটি আল্লাহ প্রেমিক জ্ঞানী মানুষ আসে, আমি তাতেই খুব আনন্দ পাই। হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর জবাবগুলির আলাদা একটা গুরুত্ব ছিল। অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গের মধ্যে ঝলসে উঠতো প্রজ্ঞার আগুন ও আলোক কণা।

ইসলাম কিরূপ এবং মুসলমান কে? –এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইসলাম কিভাবে রয়েছে আর মুসলমান চলে গেছে কবরে।

কী তীক্ষ্ণ, সঙ্কেতা-শ্রয়ী উত্তর!

প্রশ্ন ঃ ধর্মের মূল বস্তু কি?

উত্তর ঃ পরহেজগারী। কিন্তু লোভ-লালসা তাকে ধ্বংস করে।

প্রশ্ন ঃ আদন বেহেশত কিরূপ এবং তাতে প্রবেশ করবে কারা?

উত্তর ঃ সোনার তৈরী জাঁকজমক পূর্ণ এক প্রাসাদ। সেখানে প্রবেশ করবেন রাসূলে কারীম মুহাম্মদ (সঃ) ছাড়া অন্য সব রাসূল, সত্যবাদী, শহীদ এবং ন্যায়নিষ্ঠ সুবিচারক সুলতান-বাদশাহগণ।

প্রশ্ন ঃ কোন মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ চিকিৎসক অপরের রোগ চিকিৎসা করতে পারে কি?

উত্তর ঃ যে নিজেই ব্যাধিগ্রস্থ, সে অন্যের চিকিৎসা কিভাবে করবে? পথভ্রান্ত যে, সে কি অন্যকে পথ দেখাতে পারে?

একবার তিনি সমবেত জনতাকে বললেন, তোমরা আমার কথাগুলো শোন উপকার হবে। কিন্তু যদিও আমার মধ্যে আমল বা চর্চার অভাব থাকে তাতে তোমাদের কি আসে যায়?

তারা বলল, আমাদের অন্তর ঘুমন্ত। এজন্য আপনার কথা মনে যাচ্ছে না।

তিনি বললেন, ঘুমন্ত নয়, একদম মৃত। ঘুমন্তকে ধাক্কা দিলে সে জাগে। কিন্তু মৃতকে ধাক্কা দিলেও সে আর জাগে না। চিরকাল দেখা যায়, কিছু লোক থাকে, যারা কেবল ভুল-ত্রুটি বা ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর যারা ভাষণ শুনত, তাদের মধ্যেও এ ধরনের কিছু লোক থাকত। সে সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বললেন, আমি কেবল আল্লাহর সান্নিধ্য ও জান্নাত চাই। মানুষের নিরাপত্তা নয়। এদের জিহ্বার আক্রমণ থেকে স্বয়ং আল্লাহও রেহাই পাননি। আমি তো কোন্ ছার।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কেউ কেউ ধারণা করে নিজে নিশ্ছিদ্র হওয়ার পর অন্যকে উপদেশ দেওয়া উচিত, তার আগে নয়। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-কে এ কথা বলা হলে তিনি জবাব দেন, শয়তানও আশা করে যে, ন্যায় কাজের আদেশ আর অন্যায় কাজের নিষেধ একেবারে বন্ধ হয়ে যাক।

'বিশ্বাসী মুসলমানের জন্য অন্য লোকের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা কি উচিত?' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, শত্রুতা ও বিদ্বেষ-পোষণে কী ক্ষতি হয়, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতাদের বিদ্বেষমূলক ঘটনা থেকে তা বুঝে নেওয়া যায়।

ঈমানের শক্তি ও সাহসিকতা ঃ

এক জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ। এমন সময় সেদিকে ছুটে আসছেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। সঙ্গে এক সেনাদল। শ্রোতাদের মধ্যে কানাকানি হয়ে গেল, আজ হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর পরীক্ষা। তিনি ভাষণ স্থগিত রেখে হাজ্জাজের সামনে মৌন হয়ে যান কিনা দেখা যাবে। অতঃপর দেখা গেল, একটু পরেই ধাবমান হাজ্জাজ সভায় ঢুকে ঝুপ করে বসে পড়লেন এক পাশে। আর সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ যথারীতি বক্তৃতা দিতে থাকলেন। ভাষণ শেষে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এসে হযরতের হাতে চুমু দিলেন। বললেন, যদি আল্লাহর ওলীকে দেখার কারও সত্যিকারের ইচ্ছা হয়, সে যেন হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-কে দেখে যায়।

একবার হযরত আলী (রাঃ) এক উদ্ভট আদেশ দিলেন। বক্তৃতামঞ্চ ভেঙে ফেলতে হবে। আর এলোমেলো বক্তৃতা বন্ধ করতে হবে। নিশ্চিত কোন কারণ ছিল না। হলে হযরত আলী (রাঃ)-এর এমন আদেশ জারি করতেন না। কিন্তু সে আদেশ হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর ক্ষেত্রে খাটল না। তিনি যেমন বক্তৃতা দেন, তেমনি দিয়ে চলেছেন। একদিন হযরত আলী (রাঃ) তাঁর বক্তৃতা সভায় এসে হাজির। ভাষণরত হাসান রহমাতুল্লাহ-কে তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, আপনি আলেম না শিক্ষক?

হযরত হাসান বললেন, আমি আলেম নই। তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যে হাদীস আমি জেনেছি, তারই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র। একথা শুনে তিনি তাঁকে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করলেন না। বরং তাঁর প্রশংসা করে বললেন, তরুণটির সততা আছে। আর সে সুবক্তাও বটে। একথা বলে তিনি সভা ত্যাগ করলেন। কিছুক্ষণ পরে তরুণ বক্তা জানতে পারলেন, এই মাত্র যিনি কথা বলে চলে গেলেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)। জানামাত্র তিনি বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেমে হযরত আলী (রাঃ)-এর খোঁজে বের হলেন। বেশ কিছু দূরে গিয়ে তাঁকে পেয়ে গেলেন। বীনিত ভাবে বললেন, হুযুর! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে অযুর তারবীব শিক্ষা দিন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে পানি আনতে বললেন। পানি আনা হল এবং বিষয়টি হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-কে তিনি শিখিয়ে দিলেন।

কোরআন তেলাওয়াত শুনলেই এক লোক অজ্ঞান হয়ে যেত। আর মুখ দিয়ে শব্দ হত। হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ তাকে বলেন, এসব ছাড়। কেননা, তোমার এ ভাব-বিহ্বলতা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। তুমি ইচ্ছা করে এমন করছ। এটা ভান। গুনাহর কারণ। তিনি আরও বললেন, কারো কোন কথা শুনে যদি ইচ্ছা করে কেউ কান্নার ভান করে, তাহলে তা শয়তানের কান্না বলে মনে করতে হবে।

তাঁর সম্বন্ধে এ ধরনের আরও বহু কথা শোনা যায়। আর এসবের মধ্যে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে। যেমন তিনি নিজেকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। একবার অনাবৃষ্টির ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন প্রচুর লোক তাঁর কাছে এসে মাঠে গিয়ে এস্তেস্কার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামাজ পড়ার অনুরোধ জানায়। তাদের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল তিনি যদি নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন, তাহলে অবশ্যই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে। কিন্তু তিনি বীনিতভাবে বললেন, তোমরা যদি বৃষ্টি চাও, তাহলে আমাকে এ শহর থেকে দূর করে দাও। আসলে তিনি নিজেকে এক অপরাধী গুনাহগার বান্দাহ বলে মনে করতেন। তাঁকে দেখাতো যেন এক প্রাণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী। কোন হাসির চিহ্ন থাকত না চোখে-মুখে। সব সময়ে যেন ভয়ে ভয়ে আছেন– কখন কী হয়। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে তিনি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে থাকতেন।

এ ভয় পরকালকে ঘিরেও। রোজ কিয়ামতের দিন কী হবে, এই ভেবে তিনি শঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাতেন। ভয়ে কান্নাকাটিও করতেন। লোকে তাঁকে বলত, আপনি আলোকিত জ্ঞানী মানুষ। আপনার অত কান্না কিসের জন্য?

তিনি বলেন, যদি অজ্ঞাতসারে কিছু করে থাকি, আল্লাহ যা পছন্দ করেন না। তখন তিনি যদি আমাকে বলেন, ওহে হাসান! আমার দরবারে তোমার ঠাঁই নেই। তোমার কোন এবাদত বন্দেগী কবুল হবার নয়। তখন আমার কি হবে। আমি এই কথা ভেবে কান্নাকাটি করি।

নিজের সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণার আর একটি নমুনা ঃ

তিনি এক লোককে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বললেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে কাব রহমাতুল্লাহ-এর কাছে শুনেছি, বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেককেই কিছুদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ কথা শোনার পর থেকে আমার এ অবস্থা। তার কথা শুনে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বলে উঠলেন, হায়! আমি যদি তেমন লোকদেরও একজন হতাম, তাহলে দীর্ঘদিন জাহান্নামের দন্ড ভোগ করেও মুক্তি পেতাম। তাহলে কতো ভালই না হত।

একটি হাদীস পড়ে তিনি জানলেন, নেহাদ নামে এক লোক জাহান্নামের আগুন থেকে সর্বশেষে মুক্তি পাবে। তিনি বললেন, হায়! আমি যদি সেই সর্বশেষ লোকটিও হতে পারতাম। অর্থাৎ, পাপের অজানা সম্ভাবনায় তাঁর মন কন্টকিত হত সর্বক্ষণ।

একদিন অজানা ভয়ে তাঁর চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। তিনি বসে আছেন মসজিদের ছাদের কিনারায়। হঠাৎ এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল এক লোকের পরণের কাপড়ে। সে বলল, পানিটা পবিত্র না অপবিত্র? হযরত উত্তর দিলেন, ওটা অপবিত্র। তুমি কাপড়টা ধুয়ে নাও। কেননা, পাপীর চোখের পানি পবিত্র হতে পারে না।

একদিন এক ব্যক্তিকে কবরস্থ করে তিনি মাথার দিকে বসে কান্না শুরু করলেন। চোখের পানিতে ভিজে গেল কবরের মাটি। উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে তাঁর কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, কবর হল পার্থিব জীবনের শেষ ও পরজীবনের প্রথম আবাস। এ দুনিয়া কত অসার, চোখের ওপর এটা দেখেও তোমরা কী করে হাসি-তামাশায় মত্ত হতে পার? উদাসীনতা পরিহার করে এখনও কেন তোমরা কবরবাসের উপকরণ সংগ্রহে লেগে পড়ছো না? তাঁর কথার মর্ম উপলব্ধি করে এবার সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল।

শোনা যায়, ছেলেবেলায় তিনি একটি পাপকর্ম করেন। এটি যাতে ভুলে না যান, তার জন্য যখনই নতুন কাপড় পরতেন, তখনই ঐ কাপড়ে তা লিখে রাখতেন। আর এই পাপটির পরিণামের কথা ভেবেই তিনি অবিরাম কান্নাকাটি করতেন। আল্লাহর প্রেমে, ভয়ে অস্থির-আকুল এ হৃদয়ের কান্না কতো মধুর! কতো পবিত্র!

এ পবিত্র হৃদয়ের উপদেশবাণী শোনার জন্য খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহ-এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিও লোভাতুর ছিলেন। খলীফার অনুরোধে হযরত

www.AmarIslam.com

হাসান রহমাতুল্লাহ তাঁকে উপদেশ দেন যদি স্বয়ং আল্লাহ আপনার সঙ্গে থাকেন, আর তাঁর প্রতি যদি আপনার আস্থা অটুট থাকে, তাহলে অন্যের উপদেশে খুব একটা ফল হবে না। খলীফাকে এসব কথা তিনি চিঠি লিখে জানান। চিঠির শেষে লিখলেন, সে দিনটির কথা খুব বেশী মনে করুন, যেদিন সবকিছু ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে।

একবার মহামান্য বিশ্র হাফী রহমাতুল্লাহ[১] তাঁকে এক চিঠিতে লিখলেন, শুনলাম আপনি নাকি এ বছর হজ্জে যাচ্ছেন। তো আমিও আপনার সহযাত্রী হতে চাই।

পত্রোত্তরে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ জানালেন, দেখুন, আল্লাহর পবিত্র প্রেমময় রাজ্যে একা একা বাস করাই ভালো। আমরা যেই একত্র হবো, অমনি পরস্পরের দোষ-ত্রুটি জেনে ফেলব। আর সেগুলি জেনে পরস্পরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করব। তাই অনুরোধ, হজ্জ যাত্রায় আমার সঙ্গী হওয়ার আশা ছেড়ে দিন।

তিনটি অমূল্য উপদেশ ঃ সাঈদ ইবনে জুবায়েরকে তিনি তিনটি উপদেশ দেন–

১. সুলতান, বাদশাহ ও সভাসদবর্গের দরবারে যাতায়াত করো না।

২. তাপসী রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর মতো পূত-চরিত্রা নারী হলেও কখনই তুমি তার সঙ্গে একাকী নির্জনে বসো না। এমনকি কোরআন তেলাওয়াতও শিক্ষা দিও না।

৩. কোনও গীত-বাদ্যের আসরে যোগদান করো না। কেননা, এগুলো নির্বিঘ্ন নয়।

'একজন আলেমের বিপদ কিভাবে আসতে পারে'– মালেক ইবনে দীনার রহমাতুল্লাহ একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ বললেন, মনের মৃত্যু হলে আলেমগণও বিপন্ন হন।

'মনের মৃত্যু কিভাবে হয়?'

তার উত্তর– দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এলেই হৃদয়-মনের মৃত্যু ঘটে।

জ্বিন সম্প্রদায়েরও গুরু ছিলেন তিনি। অবশ্য জ্বিনদের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শের বিষয়টি খুবই গোপনীয় ছিল। এক রাত্রি শেষে মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে গিয়ে সেটি জেনে ফেললেন হযরত আবদুল্লাহ। মসজিদের দরজায় হাজির হয়ে দেখেন, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তিনি মোনাজাত করছেন, আর অনেকে তাঁকে অনুসরণ করে 'আমীন, আমীন' বলছেন। আবদুল্লাহর মনে হল, হয়তো তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে মোনাজাত করছেন। বাইরে থেকে তিনি আওয়াজ দিলেন। খুট করে খুলে গেল দরজা। কিন্তু ভেতরে ঢুকে আবদুল্লাহ হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ ছাড়া একটি প্রাণীকেও দেখতে পেলেন না। পরে তিনি গোপনে আবদুল্লাহকে জানান, এরা হলেন জ্বিন। প্রতি জুমআর রাত্রে কিছু জ্বিন তাঁর কাছে আসেন দ্বীনী শিক্ষার আগ্রহে। দ্বীনী বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার পর তিনি তাঁদের নিয়ে মোনাজাত করেন। আসলে, যাঁরা অনুচ্চঃস্বরে আমীন বলেছিলেন তাঁরা তাঁর শিষ্য জ্বিন সম্প্রদায়।

কিংবদন্তীর মানুষ ঃ হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-কে ঘিরে কত ঘটনার চুমকি বসানো। হীরক-কণার মতো উজ্জ্বল এক একটি ঘটনা।

একবার চলেছেন হজ্জে, সঙ্গে বেশ কিছু জ্ঞানী মানুষ। রাস্তার ওপর একটি কূপ থেকে পানি তুলতে গিয়ে সবাই দেখেন, পানি রয়েছে কূপের তলায়। কিন্তু দড়ি-বালতি নেই। তাঁরা হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-কে সে কথা বললেন। তিনি বললেন, আমি যখন নামাজ পড়তে দাঁড়াব, তখন তোমরা কুয়ার কাছে যেও।

কিছুক্ষণ পর তিনি নামাজ পড়ার জন্য যেই দাঁড়িয়েছেন, নির্দেশ মতো সবাই কূপের কাছে গিয়ে স্ববিস্ময়ে দেখেন, সেটি কানায় কানায় পূর্ণ। টইটুম্বুর! তাঁরা ইচ্ছে মতো পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন এক পাত্র পানি তুলে রাখলেন। প্রয়োজনে পরে পান করা যাবে, এই তাঁর ইচ্ছা কিন্তু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিনারাস্পর্শী পানি একেবারে নেমে গেল কূপের তলায়– যেমনটি ছিল আগে। তাঁরা একথাও হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-কে জানালেন। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল নও বলেই এমনটি ঘটেছে।

কাবার পথে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। আলোর অভিযাত্রী হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ রাস্তা থেকে কিছু খেজুর সংগ্রহ করে সঙ্গীদের খেতে দিলেন। তাঁরা খেয়েও ফেললেন খেজুরগুলি। কিন্তু বীচিগুলো অমন জ্বল জ্বল করছে কেন? ঠিক যেন স্বর্ণ কণা! তাঁরা সেগুলি ফেললেন না। কাছে রেখে দিলেন। মদীনায় পৌঁছে স্বর্ণকারদের দেখানো হল। তাজ্জব ব্যাপার। বীচিগুলি সত্যিই সোনার। একেবারে খাঁটি সোনা। আর তাঁরা উচিত মূল্য দিয়েই তা কিনে নিলেন। অপ্রত্যাশিত কিছু অর্থ হাতে আসায় হজ্জ যাত্রীরা লাভবান হলেন। নিজেদের জন্য বেশ কিছু কেনাকাটাও হয়ে গেল।

কলুষ কামনা ঃ তিনি একজন আলেম। ছেলেদের কোরআন শিক্ষা দিতেন। কিন্তু একদিন ঘটে গেল এক দুঃখজনক ঘটনা। দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক। ফুটফুটে একটি ছেলে একদিন পড়তে এল আলেমের কাছে ভারী চমৎকার, মিষ্টি চেহারা। ছেলেটিকে দেখামাত্র আলেমের মনে কুচিন্তার উদয় হল। জেগে উঠল এক কলুষ কামনা, কিন্তু কী আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোরআন শরীফও ভুলে গেলেন। আর তাঁর সর্বাঙ্গে দেখা দিল এক অসহনীয় জ্বালা। আলেম এবার ভীত হয়ে পড়লেন। আলেমুল গায়েব তাঁর অন্তরের কলুষ কামনার কথা জেনে নিয়েছেন। আর শুরু হয়েছে পাপের দন্ড। ভয়ে, অনুশোচনায়, যন্ত্রণায় কেঁপে উঠলেন বিদ্বান লোকটি। নাম তাঁর আবু আমর। দিশেহারা হয়ে তিনি ছুটে এলেন হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর কাছে।

সব কথা শুনে তিনি বললেন, এখন হজ্জের মওসুম। আমি প্রচন্ড ব্যস্ত। তুমি হানীফ নামক এক মসজিদে যাও। ওখানে এক সাধককে দেখতে পাবে। তাঁকে সব খুলে বল। তাঁর দোয়া চাও। কথা মতো আবু আমর গিয়ে দেখেন, সত্যিই মসজিদে তিনি আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ভক্তগণ। তিনি ধর্মকথা পরিবেশন করছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত আর একজন দরবেশ সেই সাধকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আবু আমর মসজিদের এক কোণে বসে রইলেন সুযোগের অপেক্ষায়।

আসরের নামাজ শেষ। মসজিদ ক্রমশঃ ফাঁকা হয়ে গেল। এই সুযোগে আমর সাধকের কাছে গিয়ে সব বৃত্তান্ত খুলে বললেন। কথা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন তিনি। তারপর আকাশের দিকে চোখ তুলে বিশ্ব প্রভুর দরবারে দোয়া শুরু করলেন।

তারপর (আবু আমরের বর্ণনা অনুযায়ী) দোয়া শেষ করে আমরের দিকে তাকাতেই ভুলে যাওয়া কোরআন আবার তাঁর স্মরণে চলে এল। আনন্দে আবেগে তিনি লুটিয়ে পড়লেন মহাসাধকের পায়ের তলায়। তিনি আমরকে বললেন, তুমি আমার সন্ধান পেলে কি করে? আমর হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর কথা বললেন।

ওহ! তিনি বলে উঠলেন, তার মানে হাসান আমার রহস্য প্রকাশ করেছেন। ঠিক আছে, আমিও তাঁর রহস্য উন্মোচন করে দেব। আচ্ছা, বল দেখি কিছুক্ষণ আগে সাদা পোশাক পরা এক দরবেশ আমার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন, তিনি কে, চিনতে পেরেছ কি?

আমর বললেন, না হুযুর।

সাধক বললেন, তিনিই হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ। প্রতিদিন দুপুরের পর তিনি বসরা থেকে এখানে আসেন। তারপর কথাবার্তা বলে আবার বসরায় ফিরে গিয়ে আসরের নামাজ আদায় করেন। এমন একটি সুযোগ্য মানুষ বসরায় থাকতে তুমি আমার কাছে এলে কেন?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রতিবেশী শামাউন ঃ এক প্রতিবেশী। নাম শামাউন। অগ্নির উপাসক। দীর্ঘায়ু লোক। বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। আক্রান্ত হলেন এক কঠিন অসুখে। জীবনের আশা অতি ক্ষীর্ণ, ক্ষীণতম। তাঁর আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর কানেও এল কথাটা। তিনি প্রতিবেশীর অন্তিম শয্যার পাশে গিয়ে বসলেন। দেখলেন, শামাউনের সারা শরীরে কালো কালো দাগ। তিনি বললেন, আগুন আর ধোঁয়া নিয়েই তো কাল কাটালে, এখন একবার আল্লাহকে মেনে নাও। ইসলাম কবুল কর। হয়তো আল্লাহর রহমত নেমে আসবে তোমার ওপর। শামাউনের ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের আভাস। বললেন, দু'টি কারণে তোমাদের ধর্মের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আছে। প্রথম কারণটি হল– ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা দিনরাত দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। আর দ্বিতীয় কারণ তারা মুখে মৃত্যুর কথা বলে বটে তবে এমন সব কাজ-কারবার করে, যা মৃত্যু-ভীতদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কেননা, ঐ সকল কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বললেন, শুভাকাঙ্খীর মতোই কথা বলেছ তুমি। কিন্তু, তুমি কী করলে? আজীবন আল্লাহকে ভুলে আগুনের উপাসনা করে কি তাঁর বিরাগভাজন হলে না? শোন, আমি কোনদিন আগুনের উপাসনা করিনি। কিন্তু আমি যাঁর এবাদত-বন্দেগী অর্চনা করি, তাঁর দয়ায় আগুন আমার বশীভূতঃ। আর তুমি সুদীর্ঘ জীবন আগুনের উপাসনা করেছ, কিন্তু এমন দাবী করতে পারবে না যে, আগুন তোমার বশীভূত। সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

শামাউন বললেন, হ্যাঁ, আগুন আমার কোন অনিষ্ট করবে না আমার তা বিশ্বাস হয় না, হাসান রহমাতুল্লাহ বললেন, কিছু আগুন আনাও, পরীক্ষা করে দেখি।

আগুন আনা হল। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ শামাউনকে আগুনের ওপর হাত রাখতে বললেন। কিন্তু তার সাহস হল না। তখন হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ নিজের একখানা হাত আগুনের ওপর চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহর রহমতে তা পুড়ল না। একগুচ্ছ লোমও না।

দৃশ্য দেখে শামাউন অবাক। তার মনে এল গভীর অনুশোচনা। তিনি বললেন, ভাই হাসান! সত্তর-আশি বছর ধরে চরম অন্যায় করে এসেছি। এখন কি তার প্রায়ঃশ্চিত্তের অবকাশ আছে? থাকলে মুক্তির উপায় বলে দাও।

হযরত বললেন, নিশ্চয় উপায় আছে। তুমি ইসলামে দীক্ষা নাও। তারপর পবিত্র হৃদয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। তিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন।

শামাউন বললেন, মৃত্যুর পর শাস্তির পরিবর্তে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দেবেন, এই মর্মে যদি তুমি আমাকে একখানি পত্র লিখে দাও, তাহলে আমি মুসলমান হতে পারি।

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ তাঁর কথামতো একখানি কাগজে লেখে শামাউনের হাতে দিলেন। শামাউন আবার কাগজখানিতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সই করে নিয়ে তা আবার হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-কে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, মৃত্যুর পর দাফন করার সময় পত্রখানা আমার সঙ্গে দিও। আর তুমি নিজের হাতে আমাকে গোসল করিয়ে কবরে শুইয়ে দিও। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর অনতিকাল পরেই মারা গেলেন।

তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ শেষ হল। শামাউনের দাফন কর্ম সম্পন্ন করে হাসান রহমাতুল্লাহ মনে মনে নিজের কথাই ভাবতে লাগলেন। আগেই জেনেছি, তিনি নিজেকে পাপী বলে মনে করতেন। এখন তিনি ভাবতে শুরু করলেন, অন্যের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ করলাম।

এখন আমার মতো পাপীর মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয় কে। সারারাত তিনি আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে রইলেন। সে এক অবিরাম, অন্তহীন প্রার্থনা। শেষ রাতে স্বপ্ন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেখলেন, শামাউন মাথায় ঝকঝকে মুকুট, সুন্দর পোশাক পরে জান্নাতের উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর শামাউন ভাই? তোমার অবস্থা কি?

শামাউনের প্রফুল্ল জবাবঃ যেভাবে আমাকে দেখতে পাচ্ছ, আমি সে রকমই আছি। আল্লাহর রহমতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। আল্লাহর দীদারও লাভ করেছি। তোমার পত্রখানায় খুব কাজ দিয়েছে হাসান ভাই। নাও-বলে পত্রখানা তিনি হাসান রহমাতুল্লাহ-কে ফিরিয়ে দিলেন।

ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, সত্যিই শামাউনকে দেয়া পত্রখানা তাঁর হাতের মুঠোয়। যেন স্বপ্ন নয়, এই মাত্র শামাউন স্বশরীরে এসে পত্রখানা তাঁকে দিয়ে গেল। তখন তিনি তাঁর প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, প্রভু গো! আপনার কাজের গূঢ় রহস্য উদঘাটন করার সাধ্য আমার নেই। সারা জীবন যে আগুন নিয়ে পড়ে থাকল, তাকে মাত্র একবার কলেমা পড়ার কারণে আপনি মুক্তি দিলেন শুধু তাই না, তাকে দেখাও দিলেন। তাহলে আজীবন যারা ঈমান মেনে রয়েছে, তাদের যে আপনি মুক্তি দেবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শামাউনের জান্নাতবাস তাঁর চেতনায় নবদিগন্তের দুয়ার খুলে দিল।

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ একবার বেড়াতে বেড়াতে দজলা নদীর তীরে হাজির হলেন। দেখলেন, এক কাফ্রী নির্জনে বসে এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন। আর পানপাত্র থেকে পানীয় পান করছেন। দেখামাত্র কাফ্রী সম্বন্ধে তাঁর মনে এক খারাপ ধারণার সৃষ্টি হল। অর্থাৎ লোকটিকে মদ্যপ ও লম্পট বলে তাঁর মনে হল। এও ভাবলেন যে, তিনি অন্তত এই লোকটির মতো নিকৃষ্ট নন।

ঠিক তখন নদীর বুকে একখানি ভাসমান নৌকা ডুবে গেল। বাঁচাও বাঁচাও বলে চীৎকার করে উঠল নৌকার আরোহীরা। সঙ্গে সঙ্গে কাফ্রী ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে। আর সাতজন আরোহীর অন্ততঃ দু'জনকে তুলে আনলেন ডাঙায়। হাসান রহমাতুল্লাহ-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি দু'জনকে বাঁচালাম। আপনি অন্যদের উদ্ধার করুন। হাসান রহমাতুল্লাহ কিন্তু সে উদ্যোগ গ্রহণ না করে বরং কাফ্রীকেই তাদের প্রাণরক্ষা করার অনুরোধ জানালেন। কাফ্রী তাদেরও উদ্ধার করলেন।

এবার হাসন রহমাতুল্লাহ মনে মনে নিজেকেই ধিক্কার দিলেন। আর ঘৃণা নয়, এবার তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, আপনি আজ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিন।

কাফ্রী বললেন, এই যে মহিলাকে দেখছেন, ইনি আমার জননী। আর ঐ পানপাত্রে রয়েছে পবিত্র পানীয়। আমি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম, আপনি অন্ধ না চক্ষুমন। দেখলাম, আপনি অন্ধই বটে।

কাফ্রীর কথায় হযরত হাসান (রঃ) খুবই লজ্জিত হলেন। তাঁর প্রতি তিনি যে অন্যায় ধারণা পোষণ করেছিলেন, তার জন্য ক্ষমা চাইলেন। বললেন, আপনি এতগুলি মানুষকে যেভাবে উদ্ধার করেছেন, আমাকেও তেমন করুন। আত্ম-অহমিকার অতলে আমিও নিমজ্জমান। দয়া করে আমকে উদ্ধার করুন।

কাফ্রী আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেন। দয়াময়! আপনি হাসানের বাতেনী চোখ খুলে দিন।

সেই দিন থেকে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ সামান্য চতুষ্পদ প্রাণীকেও নিজের চেয়ে উৎকৃষ্ট বলে ভাবতেন। আর নিজেকে মনে করতেন এক দীনাতিদীন দাস।

একদিন এক কুকুর দেখে বললেন, ইয়া আল্লাহ্! পরকালে আমি কি এই কুকুরটির সাথে হাশর করতে পারব? তাঁর কথা শুনে এক লোক জিজ্ঞেস করল, হুযুর, কুকুরটি আপনার চেয়ে উত্তম না অধম?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি বললেন, রোজ কিয়ামতে যদি মুক্তি পাই, তাহলে নিজেকে কুকুরটির তুলনায় উত্তম বলতে পারি। আর যদি না পাই, তাহলে জানবো, সেটি আমার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম।

এক নিন্দুক হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছিল। তিনি যখন তা জানতে পারলেন, তখন এক ঝুড়ি ভালো জাতের খেজুরসহ নিন্দাকারীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। তারপর তাকে বিনীতভাবে বললেন, শুনতে পেলাম, আপনি নাকি আপনার নিজের আমলনামার নেকীগুলো আমার আমলনামায় স্থানান্তরিত করছেন। এর বিনিময়ে আপনাকেও কিছু মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া দরকার। কিন্তু আমি অক্ষম বলে এই সামান্য সওগাত আপনার জন্য এনেছি। গ্রহণ করে বাধিত করুন।

তাঁর এই উক্তি বা ব্যবহারের মধ্যে পরচর্চার মতো নিন্দনীয় বিষয়টির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে।

তিনি বললেন, চার জন লোকের কাছে আমি যেমন অপ্রস্তুত হয়েছি, তেমনি কিছু শিক্ষাও পেয়েছি। এদের মধ্যে একজন এক নপুংসক। একজন মাতাল। তৃতীয় জন একটি বালক। আর চতুর্থ জন এক মহিলা।

কিভাবে কী হয়েছে, তিনি তাও খুলে বলেন। প্রথমত, নপুংসকের কথা।

(ক) একদিন তিনি এক নপুংসকের কাপড় ধরে টানদেন। লোকটি বলল, আমার গোপন রহস্য এখনও বাইরে প্রকাশ পায়নি। আপনি কি তা প্রকাশ করতে চান?

(খ) এক মাতাল চলেছে টলতে টলতে। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বললেন, পথ বড় পিচ্ছল। সাবধানে পা ফেল। নইলে আছাড় খাবে। লোকটা বলল, আমি মাতাল। আমার কিছু ক্ষতি হবে না। কাপড়ে কাদা লাগলে ধুয়ে নেব। কিন্তু আপনি এক মহাসাধক। প্রচুর আপনার শিষ্য। তারা আপনার ওপরেই নির্ভর করে। আপনার যদি পদস্খল হয়, তবে তাদেরও ঐ দশ হবে। কাজেই আপনি সাবধানে চলুন। আমার চেয়ে আপনার দায়িত্বই বেশী।

(গ) প্রদীপ হাতে নিয়ে পথ চলেছে এক বালক। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ আলো কোথা থেকে আনলে? ছেলেটি হঠাৎ আলো নিভিয়ে বলল, আগে আপনি বলুন, এখন আলো কোথায় গেল? তারপর আমি বলব কোথা থেকে আমি আলো এনেছি। বালকের এ কথা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ।

(ঘ) এক সুন্দরী মহিলা চলেছে কোন গন্তব্যস্থলের দিকে। খোলা মাথা কোন আবরণ নেই। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ তাকে বললেন, তুমি এভাবে চলছ কেন? মাথা ঢেকে নাও। মহিলা দাঁড়িয়ে গেল কথা শুনে। বললেন, জনাব, আমি আমার স্বামীর বিচ্ছেদের কারণে দিশেহারা হয়ে আছি। আমার অন্য দিকে এতটুকু মনোযোগ নেই। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়েছি আপনার কথা ভেবে। আপনি আল্লাহর ওলী। আল্লাহর প্রতি আপনার অঢেল, অগাধ ভালোবাসা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কে কিভাবে পথ চলছে আপনি তা লক্ষ্য রাখেন। আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন মানুষের পক্ষে এও কি সম্ভব?

মহিলার বক্তেব্যের গূঢ়ার্থ বুঝতে কোন অসুবিধা হল না হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর।

সাহাবী ও সাধারণ মানুষ ঃ হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ তাঁর ভক্তদের বললেন, তোমরা সবাই রাসূলুল্লাহর সাহাবীদের মতো। স্বভাবতই তারা খুশী। অবশ্যই এটি মর্যাদার ব্যাপার। কিন্তু পরে তিনি বিশ্লেষণ করে বললেন, সে সামঞ্জস্য শুধু বহিরাঙ্গের। অন্তরঙ্গের নয়। তোমরা যদি তাঁদের দেখতে, তাহলে তাঁদের পাগল বলে মনে করতে। আবার তাঁরাও যদি তোমাদের দেখতেন, জানতেন, তাহলে তাঁরা তোমাদের মুসলীম বলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনে করতেন না। তাঁরা ছিলেন সুদক্ষ অশ্বারোহী, বাতাসের বেগে, পাখীর বেগে তাঁরা ছুটে চলেছেন জান্নাতের দিকে। আর আমরা? আমরা চলেছি দুর্বল ও আহত গাধার পিঠে চড়ে। ধীর গতিতে।

এক আরব বেদুঈনকে তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে শোনান। তিনি বলেন, ধৈর্য দু'রকম। ১. দুঃখে-কষ্টে পতিত হয়ে ধৈর্য ধারণ করা। ২. আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু বা বিষয় থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। বেদুঈন বলল, আপনার মতো দরবেশ আমি আর কখনও দেখিনি। কেউ এমন আছে বলে শুনিওনি।

তুমি আমাকে অনেক ওপরে তুলে দিলে, হাসান রহমাতুল্লাহ বললেন। আমার ধৈর্য্য ধারণ অধৈর্য্যেরই নামান্তর। আর সাধকত্বও আমার লালসার ফল।

কথাটা বুঝিয়ে বলুন হুযুর, হাসান রহমাতুল্লাহ বললেন, বিপদের সময় আমি যে ধৈর্য্যধারণ করি, তার কারণ আমি জাহান্নামের ভয়ে সব সময় অস্থির অধৈর্য্য হয়ে থাকি। তাহলে বুঝতে পারছ, আমার ধৈর্য আসলে অধৈর্যেরই অন্য রূপ।

আর, আমি যে দরবেশী জীবন যাপন করছি, তার কারণ আমি জান্নাতলোভী জান্নাতের জন্য লালায়িত। কিন্তু আল্লহ্‌র প্রেমে যে ধৈর্যধারণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই ধৈর্যশীল। শুধু আল্লাহর জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করে সে-ই প্রকৃত ত্যাগী। আর জান্নাতে যাবার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার বা সংযম রক্ষা করে, তাকে প্রকৃত ত্যাগী বা সহনশীল বলা যাবে না।

অন্য যেকোন কামনা-বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির আকাঙ্খা মনে রাখাকেই ইখলাস বলে। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বলেন, মানুষের জন্য পরিপূর্ণ ইখলাস, বিশুদ্ধ নিবিষ্টতা, স্বল্পে তুষ্টি ও সংযম এই চারটি বস্তু একান্ত প্রয়োজন। যার মধ্যে এই চার বস্তুর অস্তিত্ব বর্তমান, পরকালের সাফল্য সম্বন্ধে তার কোন চিন্তা বা সন্দেহ নেই।

এক লোক নামাজ পড়ত ঠিকই, কিন্তু এক একা। তাকে কখনও জামাতে নামাজ পড়তে দেখা যেত না। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ একদিন তাকে জামাতে নামাজ না পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কোন লোকের সঙ্গে মেলামেশা না করার কথা বলল। হযরত তারও কারণ জানতে চাইলেন।

সে বলল, মাফ করবেন জনাব। আমি কঠিন এবাদতে মগ্ন।

কেমন সে এবাদত?

আমার এমন কোন নিঃশ্বাস সঞ্চালিত হয় না, যা সঙ্গে আল্লাহর রহমত নেই। আর আমি আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করি না। আমি আল্লাহর সেই রহমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনার কাজে প্রতি মুহূর্তে মশগুল থাকি। কাজেই আর কিছু করার সময় পাইনা। হযরত বললেন, দেখা যাচ্ছে তুমি আমার চেয়ে উত্তম কাজে লিপ্ত।

একজনের একটি প্রশ্ন ঃ

আপনার মনে কি কখনও খুশীর উদয় হয়েছে?

হযরতের উত্তর ঃ হ্যাঁ। একদিন আমি আমার ঘরে বসে রয়েছি। বাইরে এক মহিলার গলার আওয়াজ শোনা গেল। সে তার স্বামীকে বলছে, পঞ্চাশ বছর ধরে আমি আপনার সঙ্গে রয়েছি। যখন যা দিয়েছেন তাতেই আমি সবর করেছি। শীতে কিংবা গরমে আলাদা আলাদা পোশাক চাইনি। আপনার অভাব ও অক্ষমতার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেছি। কখনও কোন অভিযোগ করিনি। কোন অপবাদ দিইনি। তবে আমার শুধু একটিই বলার কথা– দ্বিতীয়বার বিবাহ করার জন্য আমি আপনাকে অনুমতি দিতে প্রস্তুত নই। আমি দীর্ঘ দিন ধরে বহু কষ্ট সহ্য করেছি শুধু এই জন্য যে, আমি আপনার সব দিক দেখব। আপনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর কারোর দিকে নজর দেবেন না। অন্য কোনদিকে আপনার মন যাবে না। এরপরও যদি আপনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন, তাহলে আমীরুল মুমেনীনের কাছে আমি আপনার বিরুদ্ধে নালিশ জানাব।

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বললেন, মহিলার এ কথা শুনে আমার চোখে পানি গড়াল। আমি এর দৃষ্টান্ত খুঁজতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়ে গেল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। কিন্তু যারা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে, তাদের তিনি ক্ষমা করবেন না।

অর্থাৎ কুরআনের আয়াতটির সঙ্গে স্ত্রীলোকটির বক্তব্যের রয়েছে গভীর সামঞ্জস্য।

আর একটি প্রশ্ন ঃ আপনার অবস্থা কি?

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ উত্তর দিলেন, সমুদ্রে যাদের জাহাজ ভেঙে পড়ে ডুবে যাচ্ছে, আর যারা সামান্য এক খন্ড কাঠ ধরে ভেসে আছে, তাদের আবার অবস্থা! তাদের অবস্থা তো দুঃখজনক। আমারও অবস্থা তাই।

এক ঈদের দিনে তিনি কোথায়ও যাচ্ছেন। দেখলেন, রাস্তার পাশে একদল তরুণ বেশ আমোদ-আহলাদ করছে। তাঁর মন্তব্য ঃ এরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে সম্পর্কে না কিছু জেনে এরা কিভাবে আমোদ-ফুর্তি করতে পারে?

এক লোক কবর স্থানে বসে রুটি খাচ্ছে। তাঁর মন্তব্য ঃ লোকটি হয়তো কপট। তাঁর এরূপ মন্তব্যের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, মৃত লোকের পাশে বসেও যার আহার স্পৃহা থাকে, সে মৃত্যু ও পরকালের প্রতি আস্থাশীল নয়। আর সেটি হল কপটতার লক্ষণ।

তাঁর অমূল্য বাণী ঃ

১. মানুষ ছাগল–ভেড়ার চেয়েও অসাবধান। রাখালের ডাক শুনে পশুরা ঘাস খাওয়া বন্ধ করে তার কাছে ছুটে যায়। কিন্তু মানুষ তার প্রতিপালকের আহ্বান শুনে ভ্রুক্ষেপ করে না। অসৎ কর্মেই লিপ্ত থাকে।

২. মন্দ লোকের সংসর্গ ভালো লোকের সঙ্গে সদ্ভাব প্রদর্শনে বাধা সৃষ্টি করে।

৩. হৃদয়ে যখন আল্লহ্‌ বিরোধিতার লেশমাত্র থাকে না, তখন জানতে হবে, মারেফাত অর্জিত হয়েছে।

৪. বহিরঙ্গের আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায় না। প্রয়োজন মনে একাগ্রতা ও কঠোর সাধনা।

৫. মনের আয়নায় যখন শুধু সৎ ভাবনা প্রতিফলিত হয়, তখন জানতে হবে, সঠিক পথেই রয়েছি। যদি উঠে আসে অসৎ চিন্তা, তাহলে ধরে নিতে হবে, অসৎ পথেই আছি।

৬. যার কথায় না আছে যুক্তি, না আছে বুদ্ধি, তার কথায় কোন উপকার নেই। তার কথা শুনলে সময়ের অপচয়ই শুধু হয়।

৭. নিবিড় নির্জন চিন্তায় যার মন আল্লাহকে জানতে না পারে, সে নিশ্চয় পার্থিব জীবনের প্রতি মোহাচ্ছন্ন অথবা অলস। আর যার দৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর রহস্যময়তার আভাস নেই, তারও দৃষ্টি জাগতিক ধুলাবালি দ্বারা আচ্ছন্ন।

৮. তওরাতে আছে, যেব্যক্তি অল্পে তুষ্ট হওয়ার অভ্যাস করেছে, সে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে গিয়েছে। মানুষের সংস্রব যে এড়াতে পেরেছে, সে প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়েছে। যে প্রবৃত্তিকে বশীভূতঃ। করেছে, সে স্বাধীনতা লাভ করেছে। যে হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ করেছে সে বন্ধুত্ব অর্জনের উপযুক্ত হয়েছে।

৯. আল্লাহ্‌-ভীতির লক্ষণ তিনটি ঃ (ক) যার মনে আল্লাহর ভয় আছে, সে রেগে গেলেও বা স্বাভাবিক অবস্থায় সবসময় সত্য কথা বলে। (খ) যে বিষয়ে আল্লাহ্‌ খুশী নন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে বিষয়ে মন্দ রিপুগুলিকে তিনি দমন করে রাখেন। (গ) যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, সে কাজেই শুধু ব্যস্ত থাকেন।

১০. এক পলকের পার্থিব অনাসক্তি হাজার বছরের এবাদত অপেক্ষা মূল্যবান।

১১. অন্তরে বাইরে অমিলই হল প্রবঞ্চনার লক্ষণ।

১২. তিনিই প্রকৃত বিশ্বাসী, যিনি আল্লাহর শপথ নিয়ে বলতে পারেন যে, তিনি বিশ্বাসী।

১৩. বিশ্বাসীর সংজ্ঞা হল ঃ ধীর-স্থির লোক। গোপন গভীর সাধনায় দিন যাপন করেন। চাঞ্চল্যহীন। মুখে যা আসে তাই বলেন না।

১৪. তিন শ্রেণীর লোকের নিন্দাবাদ করা সিদ্ধ অথবা তাকে পরচর্চা বলে না। যেমনঃ (ক) ইন্দ্রিয়াসক্ত লোভী (খ) প্রকাশ্য ও প্রতিনিয়ত অসদাচার (গ) নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসক ও নেতা।

১৫. পরচর্চার প্রায়ঃশ্চিত্ত হল আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাওয়া। যা নিন্দা করা হয় তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

১৬. পার্থিব বিষয়াসক্ত মানুষ তিনটি আক্ষেপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। যেমন- (ক) ধনের উর্পাজন ও সঞ্চয়ের অতৃপ্তি (খ) আশা-আকাঙ্খা পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ (গ) পরকালের পাথেয় অর্জন না করার ব্যথা।

১৭. যে হাল্কা বোঝা বয়, তার কষ্ট ক্লেশ কম। সে বড় একটা বিপদে পড়ে না। কিন্তু ভারী বোঝা যাকে বইতে হয়, তার বড় কষ্ট। এমনকি সে ধ্বংসেরও সম্মুখীন হতে পারে।

১৮. পার্থিব জীবন যেন গচ্ছিত সম্পত্তি এরূপ যারা মনে করেন, তারা প্রয়োজনে এর মালিকের হাতে জীবন সঁপে দিয়ে দিব্যি চলে যেতে পারেন। তাদের মনে দুঃখ-অশান্তির সৃষ্টি হয় না।

১৯. তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান, যিনি পার্থিব সৌধ ভেঙে তার ওপর গড়ে তোলেন পারলৌকিক ইমারত। পারলৌকিক ইমারত ভেঙে তিনি পার্থিব প্রাসাদ নির্মাণ করেন না।

২০. যিনি আল্লাহকে চিনেছেন তিনি আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন। আর যিনি দুনিয়া চিনেছেন, তিনি আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছেন।

২১. মানুষের রিপুগুলিকে খুব শক্ত শেকলে বেঁধে রাখতে হয়। পশুদের ক্ষেত্রে তেমনটি দরকার হয় না।

২৩. তোমাদের পূর্বপুরুষগণ কোরআন পাকের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করেছেন। কোরআনের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে রাত ভর চিন্তা করেছেন আর দিনে তার চর্চা করেছেন। কিন্তু তোমরা বিশুদ্ধরূপে কোরআন পাঠ কর, তার জের, জবর ঠিক করে দাও। কিন্তু কোরআন পাকের মূল লক্ষ্য তোমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। কেবল অধ্যয়নই চলছে। কিন্তু তার বিধি-বিধান জীবন যাত্রার পাথেয় হিসাবে গৃহীত হচ্ছে না।

২৪. আল্লাহ্ যাকে ঘৃণিত করে দিয়েছেন, সে ব্যক্তিই দুনিয়ার প্রতি আসক্ত।

২৫. যে মানুষ অন্য মানুষকে শুধু বশীভূত করতে চায়, সে প্রকৃত জ্ঞানী নয়। তাছাড়া তার অন্তরে রয়েছে অসৎ উদ্দেশ্য।

২৬. অপরকে কোন কঠোর আদেশদানের পূর্বে নিজে তার চর্চা করা চাই।

২৭. যে অন্যের দোষ তোমাকে বলে, সে নিশ্চয় তোমার দোষও অপরকে বলে।

২৮. আমার স্ব-ধর্মাবলম্বী ভাই সহোদর ভাইয়ের চেয়েও প্রিয়- যদি তার মধ্যে প্রকৃত দ্বীন থাকে। তার দ্বারা যে উপকার পাওয়া যাবে, স-ধর্মচ্যুত সহোদর ভাইয়ের দ্বারা তা কখনই সম্ভব নয়। তার দ্বারা পার্থিব কিছু কাজ হতে পারে, কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ ধর্ম ভাইয়ের দ্বারা পারলৌকিক উপকার লাভ হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৯. বন্ধু-বান্ধবের জন্য কে কতটা খরচ করল, আল্লাহর কাছে তার তেমন গুরুত্ব নেই। গুরুত্ব রয়েছে পিতা-মাতার প্রতি কে কেমন খরচ করল তার ওপর। আল্লাহ্ খুব ভালোভাবেই তার হিসাব রাখেন।

৩০. যে নামাজ মনকে সংযত করে, সে নামাজই আল্লাহর ক্ষমা আশা করতে পারে।

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর মোনাজাতও মনকে বিপুলভাবে টানে। তিনি বলতেন, প্রভু আমার!! আপনি আমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, আমি তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনি ; আপনি আমাকে বিপন্ন করেছেন, কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারিনি। কিন্তু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিনি বলে আপনি আপনার নিয়ামত তুলে নেননি। আর ধৈর্য্য ধরিনি বলে আমার বিপদও স্থায়ী করেননি। প্রভু গো! আপনার মধ্যে বদান্যতা ও রহমত ছাড়া আর কিছুই নেই।

শেষ মুহূর্ত ঃ সারাজীবন যাকে কোনদিন হাসতে দেখা যায়নি, মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি কিন্তু হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন যে কোন্ পাপ কর্মটি, কোন্ পাপটি? আর এ কথা বলতে বলতেই তাঁর বুকের বাতাস শেষবারের মতো বেরিয়ে আসে। বড় আশ্চর্য এ ঘটনা।

মৃত্যুর পর তাঁকে একজন স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাঁকে মৃত্যুকালীন সেই হাসি আর সংলাপের রহস্য জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুকালে আমি শুনতে পেলাম, কে যেন মৃত্যু-দূতকে বলেছেন, একটু কষ্ট দিয়ে ওর প্রাণটা নাও। কেননা, ওর একটি গুনাহ রয়েছে। এ কথা শুনে আমি খুব খুশী হলাম এই ভেবে যে, তাহলে আমার আর সব পাপ মাফ হয়ে গেছে। একটি মাত্র বাকী আছে। মৃত্যু কষ্টের দ্বারা তারও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। এইজন্য আমি অমন করে হেসেছিলাম, আর কোন্ পাপটি বাকী রয়েছে তা জানতে চেয়েছিলাম।

যে রাত্রে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর মৃত্যু হয়, সে রাত্রে আর একজন দরবেশ তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। সে স্বপ্ন দৃশ্যটি এরূপ- আকাশের সব দরজা খোলা, আর একটি আকাশবাণী ভেসে আসছে, হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ এখন আল্লাহর দরবারে হাজির হলেন। আর আল্লাহ হৃষ্ট-চিত্তে তাঁকে স্বাগত জানালেন।

হযরত রাবেয়া বসরী রহমাতুল্লাহ

অভাবের সংসার। শুধু অভাব আর অভাব। কিন্তু সেখানেও সংসার থেমে থাকে না। সেখানেও জীবন আপন ছন্দে বয়ে যায়। নতুন প্রাণ অঙ্কুরিত হয়।

সন্তান সম্ভবা এক জননী বুঝতে পারেন, তাঁর জঠর থেকে আরও একটি প্রাণ পৃথিবীর আলো-বাতাসে অচিরেই মুক্তি পাবে। সময় আসন্ন। আর কিছুক্ষণ পরে হয়তো একটি নবীন প্রাণ তার অস্তিত্ব ঘোষণা করবে।

রাত্রিবেলা। আলো জ্বালাতে হবে। কিন্তু ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই। আলো জ্বলবে কি করে? তিনি স্বামীকে এক পড়শীর ঘর থেকে খানিকটা তেল ধার করে আনতে বললেন। কিন্তু এর আগে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, কোন লোকের কাছে ধার করবেন না। কিন্তু আজ? স্ত্রীর অবস্থা উপলব্ধি করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ প্রতিবেশীর বাড়ীতে গেলেন তেল ধার করতে। স্ত্রীর জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন, কিন্তু কাজ হল না। ধার দেওয়া তো দূরের কথা, প্রতিবেশী বাড়ীর দরজা পর্যন্ত খুলল না। নিরাশ হয়ে তিনি ফিরে এলেন। দুঃখে, ক্ষোভে তাঁর কান্না এল। চুপ করে বসে রইলেন ঘরের কোণে। তারপর একসময়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে চোখ দু'টি পানিতে ভাসছিল, তা বুজে এল তন্দ্রায়। তিনি স্বপ্ন দেখলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কেঁদো না, দুঃখ করো না। আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি এক অসাধারণ কন্যার পিতা হতে চলেছ। ভবিষ্যতে সে এক অন্যতমা মহীয়সী নারী হবে। জান্নাতের অগ্রবর্তিনীদের অন্যতমা হবে। তার সুপারিশে আমার সত্তর হাজার পাপী উম্মত মুক্তি পাবে।

স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম (সাঃ) তাঁকে বসরায় আমীর ঈসার নিকট যেতে বললেন। এক টুকরো কাগজে কয়েকটি কথা লেখে নিতেও বললেন। কথাগুলি হল হে আমীর!! তুমি প্রতি রাতে শোবার সময় একশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে থাক, আর জুমআর রাতে পড় চারশ বার। আর যেহেতু গত জুমআয় দরূদ পাঠ করনি, অতএব ক্ষতিপূরণস্বরূপ চারশ দিরহাম দান করে দাও।

ঘুম ভেঙে গেল। এই আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে তিনি জেগে উঠলেন। আর স্বপ্নের নির্দেশমত একখানি কাগজে নবীজীর কথাগুলি লেখে নিলেন। পরদিন ভোরে এক লোক মারফত সেই বাণীলিপি পাঠিয়েছিলেন বসরায় আমীরের কাছে। লিপি পড়ে ঈসা অবাক। মহানবীর মূল্যবান উপদেশের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি দশ হাজার দেরহাম দীন দুঃখীদের দান করলেন। আর যাঁর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই অমূল্য বাণী লাভ করেছেন, তাঁর জন্য চারশ দীনার আলাদা করে রাখলেন। পরে একদিন নিজেই দিনারগুলি নিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হল ঈসার। দীনারগুলি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আপনার যখন যা দরকার হবে, দয়া করে আমাকে জানাবেন। কোন সঙ্কোচ করবেন না। আমি তার ব্যবস্থা করব।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বপ্ন প্রদত্ত বাণী বৃথা যায়নি। অভাব-পীড়িত, অতিদরিদ্র মানুষটি সত্যিই এক মহিমান্বিত কন্যা-রত্ন লাভ করলেন। এ কন্যাই রমণীকুল শিরোমণি মহাতপসী রাবেয়া রহমাতুল্লাহ। এক দরিদ্র-জীর্ণ পরিবারে নিষ্প্রদীপ কুটিরে আলোর ফুল হয়ে তিনি ফুটলেন। তাঁর আলোক প্রভায়, সুবাসে শুধু সেই কুটিরই নয়, তমাসাচ্ছান্ন পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ ক্রমশঃ বড় হলেন। কিন্তু সহসা তাঁর জন্য পৃথিবী হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল। প্রথমে চির-বিদায় নিলেন রত্ন প্রসবিনী জননী। পরে পিতা। রয়ে গেল চারটি অনাথা কন্যা।

শুরু হল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। মা নেই, বাপ নেই, অথচ ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, আছে জীবন। চার বোনে এর ওর বাড়ীতে কাজ করতে লাগল। ঝিয়ের কাজ। কখনও খাওয়া জোটে, কখনও জোটে না। এক আধাবেলা খেয়ে বা না খেয়ে তাঁদের দিন যায় রাত যায়। তার ওপর বসরায় দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। কে কাকে খেতে দেয়, কে-ই বা কাকে দেখে। বাপ-মা তাদের আদরের সন্তানদেরও বেঁচে খেতে শুরু করে। তখন কে বা কার! তখন নিজের পেট বড় হয়ে দেখা দেয় আর কারো কথা মনে আসে না। রাবয়ো রহমাতুল্লাহ-এর তিন বোন এ দুঃসময় কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তাদের আর হদিস পাওয়া গেল না। এখন রাবেয়া রহমাতুল্লাহ একা বিশাল পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা।

অবশ্য আরও একজন আছেন। তিনি অনন্ত করুণাময় আল্লাহ্ মানুষের মহান প্রতিপালক। মানুষের জীবনে তিনি জেগে আছেন প্রতি পল, অনুপল পর্যন্ত।

নিঃসঙ্গ অবস্থায় কান্নাকাটি করে কিছুদিন কাটল রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর। পরে একদিন অনাথিনীকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গেল এক পাষাণ-হৃদয়। আর তাঁকে বিক্রি করে দিল ততোধিক কঠোর হৃদয় এক গেরস্তের কাছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাবেয়া এখন ক্রীতদাসী। নীরবে বাড়ীতে দিন-রাত কাজ করেন। এতটুকু এদিক-ওদিক হলে কপালে জোটে প্রহার আর নির্যাতন, নিষ্ঠুর গঞ্জনা। এক ফোঁটা আদর নেই কোথাও, নেই ভালোবাসা। শুধু কাজ আর কাজ। আর পীড়ন আর যন্ত্রণা। কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আর পারেন না রাবেয়া রহমাতুল্লাহ। একদিন মনিবের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন গোপনে।

মুক্তি। অবাধ মুক্তি। মুক্তির নেশায় তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন। দৌড়াতে গিয়েই আচমকা মুখ থুবড়ে পড়লেন মাটিতে। একখানা হাত সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেল। আল্লাহ্ তাঁকে কোন্ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন, হয়তো তখন তিনি তা বুঝলেন না।

হাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি হাত ওঠালেন মহান প্রতিপালকের দরবারে। আল্লাহ্ গো! আমি এক অসহায় দাসী। আমার একখানি হাত গেল, যাক। তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। কেবল আপনি আমার ওপর প্রসন্ন থাকুন, তাহলেই আমি খুশী। প্রভু আমার! আপনি আমার ওপর প্রসন্ন কিনা, দয়া করে আমাকে জানান।

তাঁর আপ্লুত প্রার্থনায় সাড়া পাওয়া গেল। আকাশ থেকে উত্তর আসে-- দুঃখ করো না, হতাশ হয়ো না। দুঃখ-কষ্টে ভেঙে পড়ো না। মনে রাখবে, রোজ কিয়ামতে তোমার যে মর্যাদা হবে, তা দেখে ফেরেশতারাও ঈর্ষা পোষণ করবে। সবাই তোমাকে সাধুবাদ দেবে। অভিনন্দন জানাবে।

এই অদৃশ্যবাণী রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর মনে অঢেল শান্তি এনে দেয়। এখন বড় স্বস্তি তাঁর মনে। এই ভাঙা হাত নিয়ে তিনি আর কোথায় যাবেন। মালিক নিষ্ঠুর হোক, তবুও তো মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই আছে ওখানে। সাত-পাঁচ ভেবে তিনি আবার মনিবের বাড়ীতেই ফিরলেন। এবার নিজের জন্য তিনি একটা নিয়ম করে নিলেন। দিনে কাজ। রাতে ইবাদত আগে রাতের বেলায় কিছু সময় বিশ্রাম নিতেন। এখন থেকে পুরো রাত বরাদ্দ হয়ে গেল আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীর জন্য।

এক গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় মনিবের। তার কানে এল কিছু অস্পষ্ট কথার গুঞ্জন। চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে সে উঠে এল। চারপাশে গভীর অন্ধকার। অথচ সে দেখল, রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর ঘরে এক আশ্চর্য আলোর রোশনাই। দেখল, রাবেয়া রহমাতুল্লাহ তন্ময় চিত্তে অস্ফুট উচ্চারণে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছে, প্রভু আমার! আপনি জানেন, আমি সারাক্ষণ আপনার বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করতে চাই। কেননা, আপনার স্তব-স্তুতি প্রশংসাই আমার চোখের জ্যোতি। আমার যদি সুযোগ ও শক্তি থাকত, তাহলে আপনার এবাদত ছাড়া এক পলও আমি অন্য কাজে নষ্ট করতাম না। কিন্তু কী করব প্রভু, আমি পরাধীনা। ইচ্ছা থাকলেও আমি আপনার এবাদতে সব সময় উপস্থিত হতে পারি না। আপনার এবাদতে লাগতে আমার অনেক দেরী হয়ে যায়।

দাসীর এই আকুল প্রার্থনা মনিবের নিষ্ঠুর হৃদয় স্পর্শ করে। তার মনে হয়, এ সাধারণ কোন দাসী-বাঁদী নয়। আল্লাহর প্রকৃত সেবিকা সে। তাঁকে বন্দিনী অবস্থায় রেখে তার সেবা শ্রম গ্রহণ করা ঠিক নয়। বরং এই অশ্রুমতী অপাপবিদ্ধা বালিকার সেবা করা তার কর্তব্য। মনে মনে সে স্থির করে, দাসীকে সে মুক্তি দেবে। ইচ্ছা হলে সে এখানে থাকতে পারে, অথবা অন্য কোথাও যেতে পারে। আল্লাহ তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটালেন। পরদিন ভোরে রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-কে সে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল।

আল্লাহর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লেন রাবেয়া রহমাতুল্লাহ। তিনি এখন এক স্বাধীনা রমণী। স্বাধীনভাবে আল্লহার ধ্যানে মগ্ন হলেন। সারাদিন সারারাত। অন্ততঃ হাজার রাকআত নফল নামায আদায় শুরু করলেন। মাঝে মাঝে যেতে লাগলেন মহাতাপস হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর আলোচনা সভায়। হযরত হাসান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রহমাতুল্লাহ-ও তাঁর আলোকময়ী শিষ্যাকে খুবই স্নেহের চোখে দেখতে শুরু করলেন। তাপসী রাবেয়া রহমাতুল্লাহ ডুবে গেলেন জ্যোতির সমুদ্রে।

কেউ কেউ বলেন, হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ প্রথম জীবনে ভক্তি-গীতি গাইতেন। পরে সব ছেড়ে শুধু এবাদতে মগ্ন হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছুদিন নির্জন বনেও বাস করতেন। পরে এক নিরিবিলি স্থানে এক এবাদতগাহ নির্মাণ করে সেখানেই ধ্যানরত থাকতেন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি চলে যান পবিত্র মক্কা শরীফে। সেখানেই তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই মহিমান্বিত মহাতাপসীর আলোকোজ্জ্বল জীবনের বিচিত্র পরিচয় ছড়িয়ে আছে মানুষের মনোলোকে। তার কিছু আলোকরশ্মি এখানে বিবৃত হল ঃ

১. এক দুর্বল গাধার পিঠে মালপত্র তুলে দিয়ে তিনি চলেছেন চিরবাঞ্ছিত মক্কা মোয়াজ্জামায়। রাস্তায় গাধাটি মারা গেল। সঙ্গের লোকেরা তাঁর মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে চাইল। তিনি রাজি হলেন না। অগত্যা তাঁকে ছেড়ে সবাই চলে গেল। আর তিনি হাত ওঠালেন আল্লাহর দরবারে। প্রভু গো! আপনি আপনার দাসীকে পবিত্র কাবার দিকে ডাক দিলেন। অথচ, গাধাটিকে মেরে ফেলে তাকে এমন বিপাকে ফেললেন? কাজটি কি ঠিক হল? আল্লাহ তাঁর অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে মৃত গাধার প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর হজ্জ যাত্রায় আর বিঘ্ন ঘটল না।

২. মক্কা শরীফের উপকণ্ঠে নির্জনে তিনি তাঁর প্রভুর কাছে আবেদন জানালেন, তিনি তাঁকে দেখতে চান। আল্লাহ তাঁকে খবর দিলেন, তুমি কি চাও দুনিয়া ধ্বংস হোক, আর তার দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর পড় ক? তুমি কি জান না, আমাকে দেখতে চেয়ে মূসার কী অবস্থা হয়েছিল? আমি তাঁকে বার বার বাধা দিয়েছিলাম, সে শোনেনি। ফলে আমার নূরের কণামাত্র প্রকাশ করায় তূর পর্বত জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

৩. তিনি দ্বিতীয়বার যখন হজ্জযাত্রায় যান, তখন কাবার অদূরে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হন। হঠাৎ তিনি দেখেন, খোদ কাবা তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে আসছে। তখন তিনি বলেন, এ ঘর নিয়ে আমি কী করব? আমি ঘরের মালিককে চাই। কেননা, ঘরের মালিক নিজেই বলেছেন, যে আমার দিকে আধ হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। অতএব, কেবল কাবা নিয়ে আমি খুশী হতে পারি না।

৪. ঠিক এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য একটি কাহিনী শোনা যায়– যা তাপসী রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর মর্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি করে। মহাসাধক হযরত ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ চলেছেন মক্কা শরীফে। এক পা করে যান আর দু'রাকাআত করে নফল নামাজ পড়েন। পায়ে হাঁটার বদলে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে থাকেন। দারুণ কষ্টকর সেই হজ্জ যাত্রা। মক্কায় পৌঁছতে তাঁর সময় লেগে গেল চৌদ্দ বছর। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখলেন, কাবা শরীফ তার জায়গায় নেই, নাকি তাঁর চোখ খারাপ? তাই দেখতে পাচ্ছেন না? তাঁর সংশয়-সন্দেহ-হতাশার উত্তরে একজন ফেরেশতা বললেন, না, চোখের দোষ নয়। আসলে এক বৃদ্ধাকে স্বাগত জানাবার জন্য কাবা ঘর সাময়িকভাবে স্থান ত্যাগ করেছে।

কে, কে সে? চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন আদহাম রহমাতুল্লাহ।

আর তখন লাঠিতে ভর দিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন হযরত রাবেয়া বসরী। পবিত্র কাবা ঘরও ফিরে এসেছে আপন জায়গায়। হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ বললেন, পৃথিবীতে আপনি এক নজির স্থাপন করলেন। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি তো পথে নামাজ পড়তে পড়তে চৌদ্দ বছর লাগিয়ে দিলেন। আর আমি দিব্যি হেসে-খেলে এখানে এসে হাজির হয়েছি। নজির স্থাপন করল কে, আমি না আপনি?

www.AmarIslam.com

আল্লাহর প্রিয়জনদের এ রহস্যময় সংলাপের অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাপসী রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর প্রার্থনা, কোন ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে আল্লাহ্ যদি তাঁর হজ্জ কবুল না করেন, তাহলে সেটি তাঁর পক্ষে চরম বিপদ স্বরূপ। সেই বিপদের পূণ্য অর্জনের সৌভাগ্য যেন তাঁর হয়।

অতঃপর হজ্জ সম্পন্ন করে তিনি বসরায় ফিরে আসেন। পরবর্তী এক বছর গভীর সাধনায় মগ্ন থেকে আবার হজ্জের ইচ্ছা করেন। মনে মনে ঠিক করেন, গতবার কাবা তাকে সম্মান জানিয়েছে, এবার তিনি তাকে সম্মান জানাবেন।

৫. পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করেছেন হযরত ফারমাদী রহমাতুল্লাহ। তিনি বলেন, এবার বসরার এক বনাঞ্চল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। আর দীর্ঘ সাত বছর কৃচ্ছ্রতা সাধনার পর আরাফাত ময়দানে পৌঁছেন। তখন এক দৈববাণী হয়– তুমি যদি চাও, তবে তোমার কৃচ্ছ্রতা সাধনের পুরস্কারস্বরূপ আমি এখনই আমার নূরের এক ঝলক দেখাই। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ বলেন, না প্রভু, আমি নূরের তাজাল্লী দেখার যোগ্য নই। আমি দারিদ্র্যতা চাই। আসমানী স্বর তরঙ্গায়িত হয়, অবশ্য যদি ঐ প্রেমিক ও আমার মধ্যে এক চুলও ব্যবধান না থাকে, তবে সে কথা আলাদা।

আল্লাহর প্রতি তাঁর কী অবিচল আস্থা ছিল, একটি ঘটনার বিবরণ থেকে তা স্পষ্ট হয়।

একদিন দু'জন দরবেশ এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দু'জনেই ক্ষুধার্ত। কিন্তু ঘরে মাত্র দু'খানা রুটি। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ- তাই এনে দিলেন অতিথিদের সামনে। ঠিক তখনই দরজায় এক ভিক্ষুক। সেও কিছু খেতে চায়। তাপসী রুটি দু'খানা তুলে এনে তাকেই দিলেন। বলা বাহুল্য, এতে অতিথিরা অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অন্য কুড়ির এক দাসী এক গোছা রুটি ও মাংস এনে রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-কে দিলেন। তিনি গুণে দেখলেন, রুটি রয়েছে আঠারখানা। দাসীকে বললেন, তোমার ভুল হয়েছে। উনি অন্য কারোর জন্য রুটি পাঠিয়েছেন, আমার জন্য নয়।

দাসী বলল, না, আমার ভুল হয়নি। এগুলো আপনার জন্যই। কিন্তু রাবেয়া রহমাতুল্লাহ তা মানলেন না। রুটি ফিরিয়ে দিলেন। যে গৃহকর্ত্রী রুটি দিয়েছিলেন তিনি দাসীর মুখে বিবরণ শুনে আরও দু'খানি রুটি দিয়ে আবারও তাকে পাঠালেন। এবারে রুটির সংখ্যা বিশ। আর আপত্তি উঠল না। প্রসন্ন চিত্তে হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ অতিথিদের আপ্যায়িত করলেন।

তাঁর এই আচরণের রহস্য কোথায়?

অতিথিরা কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

রহস্য উদঘাটন করে তিনি জানালেন, মাত্র দুখানা রুটিতে দুজন দরবেশের হত না। এ জন্য তিনি বড় অস্বস্তিতে ছিলেন। হয়ত আল্লাহ তাঁর অন্তরের অস্বস্তি উপলব্ধি করে ঐ ভিক্ষুককে পাঠান। আর তিনি রুটি দুখানা তাকেই দান করেন। একটি দানের বদলে, আল্লাহ দশ গুণ দেন। আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতির ওপর অবিচল আস্থা রেখে অতিথি আপ্যায়নের পুরো দায়িত্ব তিনি আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত করেন। দাসী যখন প্রথমে আঠারখানা রুটি এনে দিল, তখন তিনি বুঝলেন– এ তাঁর জন্য নয়। কেননা, তিনি যখন দুখানা রুটি দিয়েছেন, তখন তিনি পাবেন তার দশ গুণ, অর্থাৎ দুশ দু'গুনে কুড়িখানা। তাই তখন তা গ্রহণ করলেন নিশ্চিন্তে।

বিস্ময়-বিমূঢ় দরবেশ-অতিথিরা নির্বাক হয়ে গেলেন।

৬. প্রিয়জনের রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহ্ অতন্দ্র প্রহরী।

একদিন এক চোর এল তাপসী রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর ঘরে। আল্লাহর ধ্যান করতে করতে তিনি তখন তন্দ্রাতুর। চোর তাঁর চাদরখানা তুলে নিয়ে চম্পট দেয় আর কি! কিন্তু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আশ্চর্য, বহু চেষ্টা করেও সে ঘরের দরজা খুঁজে পায় না। তখন ঘরের কোণ থেকে এক অদৃশ্য কণ্ঠ বেজে ওঠেঃ কার ঘরে তুই ঢুকেছিস হতভাগা। গৃহকর্ত্রী আমাকে গত একবছর ধরে তাঁর ঘরের পাহারায় নিযুক্ত রেখেছেন। তিনি যদিও নিদ্রাচ্ছন্ন, তাঁর প্রহরী কিন্তু জাগ্রত। এখানে কোন কিছু চুরি করা সম্ভব নয়। আওয়াজ শুনে চোর চমকে ওঠে। হাত থেকে চাদর ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাও খুঁজে পায়। তারপর চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

৭. রান্নার সময় দেখা গেল পেঁয়াজ নেই। পরিচারিকার ইচ্ছা, কোন প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে আনে। কিন্তু বিগত চল্লিশ বছর ধরে সাধ্বী রাবেয়া রহমাতুল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে তিনি কিছু প্রত্যাশা করবেন না। অতএব তাঁর নির্দেশ, পেঁয়াজ ছাড়াই রান্না হোক। কিন্তু তা আর করতে হল না। একটা কাক কোথা থেকে কয়েকটা পেঁয়াজ এনে ফেলে দিল। পরিচারিকা খুশী। কিন্তু হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ তরকারি ছাড়াই রুটি খেলেন। কারণ পেঁয়াজ সম্বন্ধে তিনি সন্দেহমুক্ত হতে পারেননি।

৮. হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ গভীর অরণ্যে ধ্যানমগ্না। বনের পশুরা এসে তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়। আজও তারা ঘিরে রয়েছে তাঁকে। হঠাৎ দেখা গেল, পশুরা যে যেদিকে পারল, দৌড়ে পালিয়ে গেল। কারণ, ওখানে তখন এসে পড়েছেন সাধককুল তিলক হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ। তাঁকে দেখেই বুনো প্রাণীরা লুকিয়ে গেল। তিনি তাপসীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ তাঁকেই পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনি আজ কি খেয়েছেন? হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ জবাব দেন, গোশত রুটি।

তাপসী বললেন, তবে আর কী! আপনি যাদের গোশত খেয়েছেন, তারা আপনার ভয়ে ছুটে পালাবে বৈ কি?

অন্য একদিন হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ এসেছেন হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর বাড়ীতে। তিনি তখন কাঁদছেন; প্রবল কান্না। রাবেয়া রহমাতুল্লাহ বললেন, এ কান্না যদি অকৃত্রিম হয়, খুব ভালো কথা। কিন্তু যদি কৃত্রিমতা থাকে, তাহলে কান্নার অতলে আপনি হারিয়ে যাবেন। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাপসীর কথায় হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ আহত হলেন। কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

আর একদিন হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ ফোরাত নদীকূলে ধ্যানরতা। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাপসীর ধ্যান ভাঙলে দু'জনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হল। এক সময় হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ নদীর পানির ওপর তাঁর জায়নামাজ বিছিয়ে বললেন, এসো, নামাজ পড়ি।

তাপসী বললেন, হযরত! এটা যদি আপনার লোক দেখানো হয় তো খুব ভালো কথা। আর তা যদি না হয়, তাহলে আসুন, আমরা শূন্যে নামাজ পড়ি। এই বলে তিনি শূন্যে তাঁর জায়নামাজ পেতে দিলেন।

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ মনে মনে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করলেন। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ তাঁর অবস্থা অনুধাবন করে বললেন, হযরত, আপনি যা দেখালেন, তা এমন কিছু নয়। অসামান্য মাছও তা পারে। আর আমি যা দেখালাম, তা তুচ্ছ মাছিও পারে। আসল কাজ কিন্তু এর অনেক ওপরে।

তাঁর সম্বন্ধে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বলেন, একবার অধ্যাত্ম সাধনায় নানা জটিল তত্ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অহোরাত্র আলোচনা হয়। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও আমার মনে হয়নি, আমি একজন পুরুষ, তেমনি তারও মনে হয়নি, সে একজন যেমন মনে হয়নি যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মহিলা। বিদায় নেবার সময় মনে হল, আমি অতি তুচ্ছ একটি লোক আর সে বিশুদ্ধ এক তাপসী।

তাঁর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর মনে কোন সংশয় ছিল না। এক রাতে তিনি একদল অনুগামীসহ হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর বাসভবনে যান। তাঁর বাড়ীতে আলোর ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু রাবেয়া রহমাতুল্লাহ জানতেন, হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর আলোর দরকার। তাই তিনি তাঁর একটি আঙ্গুল দম দিলেন। আর আঙ্গুলটি আলো দিতে লাগল। হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর শিষ্যগণ স্ববিস্ময়ে বলে উঠলেন, এটা কি করে সম্ভব হল? তাপসী তার উত্তর দিতে গেলেন। কিন্তু তার আগেই হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বললেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একান্ত অনুগত, তাঁর পক্ষে এসব কাজ কিছুই নয়। আল্লাহর নবীগণের দ্বারা যদি মোজেযা প্রকাশ পায়, তাহলে আল্লাহর আওলিয়াগণের দ্বারা অলৌকিক কাণ্ড হতে পারে। তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?

একবার হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর কাছে তিনটি উপহার পাঠিয়ে সেগুলোর প্রতীকী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। উপহার তিনটি হল– মোম, সূচ ও একগাছি চুল। তাঁর কথা ছিল, মোমের মত আলো দিয়ে বিগলিত হতে হবে। সূচের মত সব সময় মানুষের কাজে লাগতে হবে আর এসব করতে করতে নিজেকে চুলের চেয়েও ক্ষীনতর করে তুলতে হবে। তবেই উদ্দেশ্য সফল হবে।

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ তাঁর কাছে মারেফাতের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, কয়েকটি টুপি সেলাই করে আমি বিক্রি করি। আর দু'টি মুদ্রা পাই। একটি নিই ডান হাতে, অন্যটি বাম হাতে। দু'টিকে একই হাতে ধারণ করি না। তা করলে হয়ত মুদ্রা সঞ্চয়ের দিকে মনটা ঝুঁকে যেতে পারে। আর তা হতে পারে আমার পথভ্রষ্ঠতার কারণ। এভাবে আমি আমার প্রবৃত্তির ওপর জয়ী হয়েছি।

অর্থাৎ তিনি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে মারেফাতের শিক্ষালাভ করেন, কোন মানুষের মাধ্যমে নয়।

৯. হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বলেন, শেষ বিচারের দিনে যদি আল্লাহর দীদার লাভে বঞ্চিত হই, তাহলে আমি এত বেশী কান্নাকাটি করব যে, তা দেখে জান্নাতীরা আমার প্রতি মমতায় অভিভূত হয়ে পড়বে।

তাঁর কথা শুনে হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ বললেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু যে লোক আল্লাহর দেখা পাওয়ার জন্য এই দুনিয়াতে কাঁদে না, সে পরকালেও কাঁদবে না।

১০. স্বামী গ্রহণে তাঁর অনীহা ও আপত্তির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনটি বিষয় নিয়ে আমি অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছি। কেউ যদি এগুলি দূর করতে পারত, তাহলে আমি অবশ্যই স্বামী গ্রহণ করতাম। সে তিনটি বিষয় হল–

(১) কেউ কি বলতে পারেন, ঈমানের সঙ্গে আমার মৃত্যু হবে?

(২) রোজ কিয়ামতে আমি কি ডান হাতে আমার আমলনামা পাব?

(৩) ঐ দিন একটি দল যাবে জান্নাতে অন্যটি জাহান্নামে। আমি কোন দলে থাকব বলতে পারে না?

তাঁকে যাঁরা প্রশ্ন করেন তাঁরা স্বীকার করেন, এগুলোর উত্তর দেওয়া এ মূহূর্তে কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তখন হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর উত্তর ঃ এসব চিন্তা যার মাথায় দিনরাত ঘুরপাক খায়, সে কিভাবে বাড়তি একটা চিন্তা (স্বামী-চিন্তা) মাথায় নিতে পারে?

প্রশ্ন ঃ আপনি কোথা থেকে এসেছেন, কোথায় যাবেন?

উত্তর ঃ এই মাটি থেকে এসেছি। মাটির নিচেই যাব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ঃ আপনি এখন কি করছেন?

উত্তর ঃ অনুতাপ করছি।

প্রশ্ন ঃ সেটা কি রকম?

উত্তর ঃ আমি ঐ জগতের খাবার খাই আর কাজ করি এই জগতের।

প্রশ্ন ঃ আপনি যেমন মধুর ভাষায় কথা বলেন, তাতে সরাইখানার কর্মাধ্যক্ষা হলে আপনাকে বেশ মানাত।

উত্তর ঃ আমি নিজেই তো এক সরাইখানা। আমার ভেতরে যা আছে আমি তা বাইরে যেতে দিই। কিন্তু বাইরের কোন কিছু ভেতরে ঢুকতে দিই না। কে এল, কে গেল, আমার তা জানার দরকার নেই। আমি শুধু আমার ভেতরটা বা অন্তর নিয়ে ব্যস্ত, বাইরেরটা নিয়ে নয়।

রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন?

রাবেয়া রহমাতুল্লাহ উত্তর দেন, আপনাকে ভালোবাসে না কে? তবে আমি ডুবে আছি আল্লাহ প্রেমে। সেখানে আর কাউকে ভালোবাসি কিনা ভেবে দেখতেও পারছি না, এ রকম আমার অবস্থা।

ভালোবাসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রকৃত ভালোবাসা সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর এক ফোঁটা যে পান করেছে সে প্রেমাস্পদ আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়। আর এ নির্দেশ লাভ করে যে আল্লাহকে ভালোবাসে, স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে ভালোবাসেন।

হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ সব সময় কান্নাকাটি করতেন।

এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ থেকে পাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, এ ভয়ে আমি কাঁদি। তাঁর প্রতি আমার যে আসক্তি, তাতে যদি মৃত্যুর মুহূর্তে আমি শুনে ফেলি, আল্লাহ ঘোষণা করছেন যে, তুমি আমার যোগ্য ব্যক্তি নও, তাহলে আমার কী উপায় হবে?

পাপীরা তওবা করলে কি তা কবুল হয়? তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বললেন, তওবা করার তওফীক দেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং সেই তওফীক অনুযায়ী কেউ তওবা করলে তা কবুল না হওয়ার কোন কারণই নেই।

তিনি বলেন, আল্লাহর কোন নেয়ামত লাভ করে মানুষ যেন সন্তুষ্ট হয়, তাঁকে লাভ করার পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা যদি সে অনুরূপ সন্তুষ্টি অর্জন করে, আল্লাহ্ কেবল তখনই সন্তুষ্ট হন।

তাঁর কথা হল ঃ শুধুমাত্র বহিরেন্দ্রিয়ের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। হাত, পা, চোখ, কান, জিভ দ্বারাও তা সম্ভব নয়। কেননা, কান শুধু শোনে আর পা চালায়। কিন্তু আল্লাহর সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে। অতএব হৃদয়ের জাগরণ খুব জরুরী। যার অন্তর জেগে থাকে, তার কোন বন্ধুর প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহতে যিনি সব সমর্পণ করেছেন, একমাত্র তিনিই চির জাগরুক।

তাঁর বক্তব্যঃ শুধু মুখে ক্ষমা চাওয়া মিথ্যুকের কাজ। আর প্রকৃত তওবা নিজে করলেই যথেষ্ট। অন্যের মাধ্যমে তওবা করার দরকার নেই। যে প্রকৃত তওবা করে, তার দ্বিতীয়বার তওবার দরকার পড়ে না।

যিনি তত্ত্ব-জ্ঞানী, তিনি আল্লাহর কাছে পবিত্র অন্তর কামনা করেন। যখন তাঁকে তা দান করা হয়, তখন তা আবার তিনি আল্লহার কাছে ফিরিয়ে দেন– যেন সেটি লোকচক্ষুর আড়ালে সুরক্ষিত থাকে।

১১. হযরত সালেহ আমেরী রহমাতুল্লাহ ছিলেন এক তত্ত্ব-জ্ঞানী সাধক। তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলতেন, দরজায় অবিরাম শব্দ করতে থাকলে এক সময় তা খুলে দেওয়া হবেই। তাঁর কথা শুনে হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ বলেন, যে দরজা কখনও বন্ধই থাকে না, তা আবার খোলার প্রশ্ন ওঠে কেন? তত্ত্বের দিক দিয়ে এ যে কত সূক্ষ্ম, তা সালেহ আমেরী রহমাতুল্লাহ-এর বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এক লোক 'হায় দুঃখ হায়' বলে বিলাপ করছিল। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ তাঁকে বললেন, ওসব না বলে তুমি বরং 'হায় নিশ্চিন্ততা' বল। কেননা, তোমার যদি সত্যিই দুঃখ থাকত, তাহলে তোমার মুখে কথাই ফুটত না।

এক লোক মাথায় পট্টি বেঁধে হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে এসে হাজির। মাথায় পট্টি কেন জিজ্ঞেস করলে সে জানাল, মাথায় দারুণ যন্ত্রণা। তিনি বললেন, তোমার বয়স কত? সে বললে, ত্রিশ। তখন আবার প্রশ্ন, এতকাল কি সুস্থ ছিলে না অসুস্থ? উত্তরে সে জানাল, এতদিন সুস্থই ছিল। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ বললেন, তবে এতদিন ঐ সুস্থতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কোন চিহ্ন মাথায় রাখলে না কেন? আর যেই একটু কষ্ট পেলে অমনি কষ্টের চিহ্ন মাথায় ধারণ করলে?

একদিন তিনি এক লোককে চার দেরহাম দিয়ে একখানি কম্বল কিনে আনতে বললেন। কম্বলখানা কেমন হবে– সাদা না কালো, তা সে জানতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার কাছ থেকে দেরহাম ফিরিয়ে দিলেন। কম্বল কেনার কাজ নেই। কেনার আগেই যে জিনিসের সাদা-কালোর প্রশ্ন ওঠে, কেনার পর না জানি আরও কত সমস্যা দেখা দেবে। ওসব পার্থিব ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়াই ভালো।

কোন এক বাসন্তী বেলায় হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর পরিচারিকা ঘরে ধ্যানমগ্না তাপসীকে বলল, বাইরে বেরিয়ে এসে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করুন। তিনি বললেন, তার চেয়ে ঘরে এসে স্রষ্টার নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর। জেনে রাখো, স্রষ্টার স্বরূপ দর্শন আমার লক্ষ্য। সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে কি হবে?

১২. একবার ইফতার ছাড়াই একটানা সাতদিন রোজা রাখলেন তিনি। আর বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন আল্লাহর এবাদতে ডুবে গিয়ে। অষ্টম দিনে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রবৃত্তি তাড়া দেয়, আপনি এভাবে আর কত আমাদের কষ্ট দেবেন? ইত্যবসরে এক পেয়ালা ভর্তি খাবার নিয়ে এক লোক এসে হাজির। ঘরে তখন আলো জ্বালা হয়নি। আঁধারে একটা বিড়াল এসে খাবারটা খেয়ে ফেলল। তখন হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ লোকটিকে বললেন, তুমি এক পেয়ালা পানি নিয়ে এস। পানি আনা হলে, যেই তিনি পানি পান করতে যাবেন, হাত ফসকে পেয়ালাটা পড়ে ভেঙে গেল। আর তখন হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ 'আহা' বলে এমন এক চীৎকার করে উঠলেন যে, সারা ঘর কেঁপে উঠল। তাঁর মর্মস্পর্শী আবেদন উচ্চারিত হল আল্লাহর উদ্দেশ্যে। প্রভু গো! আপনি অবলা দাসীর প্রতি এ কোন্ আচরণ শুরু করলেন? সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হয় আকাশবাণীঃ তুমি চাইলে তোমাকে অঢেল পার্থিব প্রাচুর্য দান করতে পারি। কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার হৃদয় থেকে আমার প্রেম-বেদনা তুলে নেব। কেননা, পার্থিব প্রাচুর্য ও আমার প্রেম-যাতনা একই হৃদয়ে সমবেত হতে পারে না। আকাশবাণী শোনামাত্র তাঁর মন থেকে পার্থিব মোহ মুছে গেল। দূর হয়ে গেল ক্ষুৎপিপাসা। এরপর থেকে অবস্থা এমন হল যে, প্রতি ওয়াক্তের নামাজকে তিনি জীবনের শেষ নামাজ বলে মনে করতে থাকলেন। পাছে আল্লাহর সঙ্গে আত্মিক বন্ধন ছিন্ন হয়, এজন্য তিনি মনে মনে প্রতি মুহূর্তে প্রার্থনা করতেন, প্রভু আমার! পৃথিবীর কোন সম্পদ বা প্রাচুর্য যেন আপনার নিকট থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন না করে।

আল্লাহর প্রতি তাঁর স্বকাতর প্রার্থনার ভঙ্গি ও কান্না এমন ছিল যে, মনে হত তিনি প্রচণ্ড অসুখে ভুগছেন। এজন্য কেউ কেউ কখনও কখনও তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপাতদৃষ্টিতে আপনাকে রোগী বলে মনে হয় না। তবুও আপনি অমন করে কাঁদেন কেন?

তিনি উত্তর দিতেন, বাইরে আমার কোন অসুখ নেই ঠিকই। কিন্তু অন্তরে রয়েছে গভীরতর অসুখ। যার কোন ওষুধ নেই। কোন চিকিৎসক আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারেন না। এ রোগের একমাত্র ওষুধ প্রভুর সঙ্গে মিলন। যতদিন সে মিলন না হয়, ততদিন এই কাকুতি-মিনতি, কান্নাকাটি বন্ধ হবে না।

কয়েকজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে কোন্ উদ্দেশ্যে আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করেন। কেউ বললেন, জাহান্নামে যাতে যেতে না হয়, তার জন্যই এই এবাদত। কেউ বললেন, জান্নাতের সুখ উপভোগ করার জন্যই আল্লাহর এই উপাসনা। তাঁরা এবার তাঁর উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন্। তিনি বললেন, জান্নাত লাভ কিংবা জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তির জন্য তাঁর এবাদত করতে হত। তাঁর নির্দেশ পালন ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তিনি এবাদত করেন জান্নাতের লোভে কিংবা জাহান্নামের ভয়ে নয়। বলাবাহুল্য, তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথায় ধর্মভীরু লোকগুলো লজ্জিত হলেন।

হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর পরনের জীর্ণ পোশাক দেখে এক ধার্মিক ব্যক্তি অনুতাপ করে বললেন, আপনার দুর্দশা দেখে দুঃখ হয়। সামান্য ইশারা পেলে সবাই আপনার অভাব মোচনে এগিয়ে আসবে।

তিনি বললেন, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজে কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা লজ্জাকর। এ হল আল্লাহর রাজ্য। যার যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত। এ কথা জানার পর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর কাছে কি সাহায্য চাওয়া যায়? তিনি তো আমার অবস্থা দেখছেন। ইচ্ছা হলে তিনি নিজেই সাহায্য করবেন। আর একান্তই যদি আমার কিছু দরকার হয়, তাহলে আমি তাঁর কাছেই চাইব।

তাঁর এই সুললিত জবাব শুনে সেই ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট মন্তব্য করলেন; তাঁকে আমি যতটুকু উচ্চস্তরের সাধিকা বলে ভেবেছিলাম, তিনি তার চেয়েও উচ্চতর।

১৩. তাঁর অসুস্থতার সময়ে স্বনামধন্য সাধক হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ তাঁকে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, বসরার এক ধনী ব্যক্তি রূপার টাকা ভর্তি একটা থলে নিয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছেন হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর দরজায়। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ তার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ অভাব-অনটনের খবর পেয়ে তাঁকে কিছু টাকা দিতে এসেছি। কিন্তু তিনি তো কারো কিছু গ্রহণ করেন না। তাই ভাবছি, আমাকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে। তাঁকে যে আমার ইচ্ছার কথা বলব তারও সাহস হচ্ছে না। হযরত! আপনি কি আমার জন্য একটু সুপারিশ করবেন?

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ সত্যিই ভেতরে গিয়ে তাঁর কথা বললেন। তখন হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ বললেন, যে লোক আল্লাহর নিন্দা করে, তিনি তারও জীবিকা বন্ধ করেন না। আর যে লোক আল্লাহ্ প্রেমে বিভোর, জীবিকা ছাড়াই আল্লাহ তাঁকে জীবিত রাখেন। যেদিন থেকে আমি আমার প্রভুকে জেনেছি, সেদিন থেকেই মানুষের মুখাপেক্ষি থেকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তাছাড়া মানুষের অর্থ হালাল না হারাম, তাও তো আমার জানা নেই। সুতরাং দয়া করে এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন না!

অসুস্থ তাপসীকে দেখার জন্য এসেছিলেন হযরত আবদুল ওয়াহেদ আমেরী ও হযরত সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহ। কিন্তু তাঁর অসাধারণ আল্লাহ প্রদত্ত কথা ভেবে তাঁরা চুপচাপ বসে রইলেন। একটি কথাও বলতে পারলেন না।

www.AmarIslam.com

অবশেষে হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ নীরবতা ভেঙে হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-এর কোন বক্তব্য আছে কিনা জানতে চাইলেন।

সাহস পেয়ে সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করে তুলুন, এই প্রার্থনা জানাই।

হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ তাঁর ওপর চোখ রেখে বললেন, আপনি কি জানেন যে, কার ইচ্ছায় আমি রোগাক্রান্ত?

হ্যাঁ, আল্লাহর ইচ্ছায়।

তা যদি জানেনই, তাহলে তাঁর কাছেই আরোগ্যলাভের প্রার্থনা করছেন? এটা কি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাচ্ছে না?

আপনার কি খেতে ইচ্ছা হয়?

সুফিয়ান, আপনি পণ্ডিত লোক। আপনি যা বললেন, তা আপনার পক্ষে শোভা পায় না। বারো বছর ধরে আমার খুর্মা খাওয়ার বড় ইচ্ছা ছিল। আর বসরায় খুর্মা খুব সস্তাও। তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমি খুর্মা খাইনি। আমার যা ইচ্ছা, তাই যদি করি, আর সেটা যদি আমার প্রভুর ইচ্ছার বিপরীত হয়, তাহলে তা হবে অধর্মের মত।

আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর অনধিকার চর্চা করতে চাই না। আপনি এখন আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

আপনি যদি সংসারকে ভালো না বাসতেন, তাহলে সত্যিই একজন পুন্যবান ব্যক্তি হতেন।

আশ্চর্য! আমার মধ্যে আপনি সংসার প্রীতির কী দেখলেন?

তা যদি না হত, তাহলে আপনি অবুঝের মত জিজ্ঞেস করতেন না যে, আমার কী খেতে ইচ্ছা হয়। অথচ আপনি জানেন, এ জগত-সংসার অস্থায়ী, ধ্বংসশীল। এসব কিছুই মূল্যহীন।

তাপসীর কথা শুনে হযরত সুফিয়ানের রহমাতুল্লাহ চৈতন্যোদয় হয়। তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর! হে আল্লাহ! আপনি আমার ওপরে খুশী থাকুন। তাঁর প্রার্থনা হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর কানে গেলে বললেন, আপনি যাঁর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট নন, আপনার ওপর তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করতে আপনার লজ্জা হয় না?

মহাসাধিকা হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর এ আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনির্বচনীয়। সমকালের অসাধারণ পুরুষরাও তাঁর মূল্যায়নে হিমশিম খেয়েছেন।

১৪. একদিন এলেন প্রখ্যাত সাধক হযরত মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ। দেখলেন হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ একটি ভাঙা ঘটিতে ওযু করেন ও পানি পান করেন। শোবার জন্যে রয়েছে পুরানো ছেঁড়া এক চাটাই আর ইটের বালিশ। এসব দেখে বড় ব্যথা পেলেন তিনি। বললেন, কত কষ্ট আপনার মাননীয়া। আমার প্রচুর ধনী শিষ্য ও বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। যদি অনুমতি দেন তাহলে কিছু দরকারী জিনিসপত্র এনে দিই।

তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ উত্তর দিলেন। হযরত! আপনি ভুল করলেন? আপানর বিত্তশালী বন্ধুবান্ধবের প্রভু এবং আমার প্রভু কি এক নয়?

হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ বললেন, তা তো বটেই।

দারিদ্র্যের কারণে তিনি কি দরিদ্র দাসদের ভুলে থাকেন? নাকি স্বচ্ছলতার কারণে স্মরণে রাখেন সম্পদশালী দাসদের?

না, তা নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাহলে তিনি যখন ধনী-দরিদ্র সকলের অবস্থাই জানেন, তখন তাঁকে আর স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার কি?

১৫. আলোচনাসভা বসেছে মহাতাপসীর বাসভবেন। আলোচনা করছেন একদল আলোকময় পুরুষ। হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ, হযরত মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ, হযরত শাকীক বলখী রহমাতুল্লাহ প্রমুখ। আলোচ্য বিষয়– আল্লাহ্ প্রেমের বিশুদ্ধ সত্য-স্বরূপ।

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বললেন, প্রভুর আঘাতে যিনি ধৈর্য হারান তাঁর আল্লাহ্ প্রেমের দাবী সত্য নয়। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ বললেন, এতে আত্মপরতা ও অহমিকা প্রকাশ পায়।

হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ বললেন, প্রভুর আঘাতে যিনি শোকর প্রকাশ করেন না, তাঁরও প্রভু প্রেমের দাবী খাঁটি নয়।

হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ বললেন, এর সংজ্ঞা আরও উন্নত হওয়া দরকার। তখন সবাই তাঁকেই ধরলেন। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলুন। তিনি বললেন, যিনি প্রভুর দেওয়া আঘাত প্রভুর দর্শনে ভুলে যান, তিনিই তাঁর বন্ধুত্বের প্রকৃত দাবীদার। যেমন মিসরের নারীরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দর্শনে নিজেদের আঙ্গুল কর্তন জনিত যন্ত্রণার কথা টেরই পেলেন না।

আল্লাহ্ প্রেমের সত্য-স্বরূপ তিনিই উপলব্দি করেন।

একদিন ধর্ম নিয়ে আলোচনা চলছে। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ উনুনে গোশতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন। রান্নার চেয়ে আলোচনা তাঁর কাছে অনেক বেশী মূল্যবান। আলোচনা চলল সারা বিকেল ধরে। মাগরিবের নামাজের পর ভোজন। হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর মনে সন্দেহ, ঐ গোশত কি মুখে দেওয়া যাবে? কিন্তু এক টুকরো মুখে দিয়েই তিনি বুঝলেন, এমন উত্তম জিনিস তিনি আর কখনও খাননি। অথচ রাবেয়া রহমাতুল্লাহ গোশতের হাঁড়িতে শুধু পানি ঢেলে দেন, অন্য কিছু নয়।

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ। আর একদিনের বর্ণনা দিয়েছেন হযরত সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহ। তিনি তাপসীর বাড়ীতে একটি রাত অতিবাহিত করেন। পরদিন সকালে বললেন, আল্লাহ্ তাঁকে যে রাতভর নামাজ পড়ার তওফীক দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য তিনি আগামীকাল রোজা রাখবেন। এমন আল্লাহ্প্রাণ সাধ্বী আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

১৬. হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর প্রার্থনা ছিল খুবই নিগূঢ়, ব্যঞ্জনাধর্মী। যেমন– তিনি বললেন, প্রভু গো! বিচার দিবসে আপনি যদি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন, তাহলে আমি আপনার এমন এক গোপন রহস্য ফাঁস করব, যাতে জাহান্নাম আমার থেকে হাজার বছরের পথ দূরে পালিয়ে যাবে।

তাঁর প্রার্থনা সরল, কিন্তু সঙ্কেতময়। তিনি বললেন, প্রভু আমার! এ জগতে আমার জন্য যা রেখেছেন তা আপনার শত্রুদের দিয়ে দিন। আর ঐ জগতে আমার জন্য যা নির্দিষ্ট, তা আপনার মিত্রদের দান করুন। আমি ওসবের প্রত্যাশী নই। আমার জন্য আপনিই যথেষ্ট। জাহান্নামের ভয়ে আমি যদি আপনার এবাদত বন্দেগী করি, তাহলে আপনি আমাকে জাহান্নামে ছুঁড়ে দিন।

আর জান্নাতের আশায় যদি আপনার এবাদত করে থাকি, তাহলে আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করুন। আর যদি শুধু আপনার উদ্দেশ্যেই এবাদত করে থাকি, তাহলে দয়া করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমাকে আপনার চির সন্তুষ্টি দান করুন। আপনার দীদার থেকে আমি যেন বঞ্চিত না হই।

তাঁর প্রার্থনার অতলস্পর্শী আবেদন মানুষের মর্মমূল কাঁপিয়ে দেয়। আপনি যদি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন, তাহলে আমি আর্ত-চীৎকারে বলব, প্রভু গো! আমি তো আপনাকে ভালোবাসতাম। তারপরেও কি সেই প্রিয় বন্ধু তার বন্ধুর সাথে এরূপ ব্যবহার করে? এই প্রার্থনার উত্তরে তিনি শুনতে পান, তুমি আমার ওপর এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করো না। তুমি আমার সেই বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা রোজ কিয়ামতে আমার সঙ্গে কথা বলবে।

কি আপ্লুত উচ্চারণ তাঁর প্রভু গো! এ জগতে আমার একমাত্র ইচ্ছা ও কাজ আপনাকে স্মরণ করা ও স্মরণে রাখা। আর পরকালে আপনার দীদারের প্রত্যাশা। প্রভু আমার! একমাত্র আপনিই আমার কামনা ও লক্ষ্য। আমার হৃদয়কে আপনি আমার সংস্পর্শেই রাখুন আর আমার দুর্বল নামাজকে কবুল করুন।

বিদায় ক্ষণে ঃ অবশেষে একদিন তাঁর প্রভুর ডাক এল, আসন্ন হয়ে উঠল জগত ও জীবন থেকে বিদায় নেবার পালা। তাঁর অন্তিম শয্যার পাশে ছুটে এলেন কত বিশুদ্ধ-হৃদয় মানুষ। হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ তাঁদের বললেন, আপনারা দয়া করে আল্লাহর দূতগণের জন্য জায়গা করে দিন। তাঁরা আসছেন। তাঁর কথায় সবাই বাইরে চলে গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করা হল। বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁরা শুনতে পেলেনঃ হে পবিত্রআত্মা! তোমার প্রভুর দিকে সানন্দে প্রত্যাবর্তন কর।

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। পরে সবাই যখন তাঁর ঘরে এলেন, তখন দেখা গেল হযরত রাবেয়া রহমাতুল্লাহ-এর প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। জীবনের অন্তিম এবাদত শেষ করে তিনি যেন চিরনিদ্রায় অভিভূতা। এক নিষ্প্রদীপ আলয়ে, রাতের অন্ধকারে তিনি এসেছিলেন। আর আজ মানুষের জন্য এক আলোর ভুবন রচনা করে চলে গেলেন তাঁর মহিমায় প্রভু ও প্রেমাস্পদের কাছে।

আল্লাহর বিধিবিধানে একটুকু ব্যতিক্রম ঘটেনি তাঁর জীবনে। আল্লাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সংস্পর্শ ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছার অনুবর্তী হননি কোনদিন।

মৃত্যুর পর তাঁকে এক শুভ্র হৃদয় ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কবরে মুনকার-নকীর আপনাকে কি প্রশ্ন করেন আর আপনিই বা তার কি উত্তর দেন? তিনি বললেন, তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, বলুন, আপনার প্রভু কে? আমি বলেছিলাম, দয়া করে আপনারা আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে আমার এ কথাগুলো তাঁকে বলুন যে, জগতে এত লোক থাকা সত্ত্বেও আপনি এই অবলা দাসীকে ভুলবেন না। আমি তো আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বন্ধু বলে জানি না, তা সত্ত্বেও আপনি কিভাবে অন্যকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বল, তোমার প্রতিপালক কে?

কত আলোকোজ্জ্বল মানুষ তাঁর পবিত্র কবর জিয়ারতে গেছেন। আর উজ্জ্বলতর হয়েছেন আরও। একদিন তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে হযরত আসলাম রহমাতুল্লাহ ও হযরত নিজাম তুসী রহমাতুল্লাহ জিজ্ঞেস করেছেন, আয় তাপসী! আপনি তো গর্ব করতেন, ইহকাল ও পরকাল থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। এখন বলুন, আপনি কী অবস্থায় রয়েছেন?

তৎক্ষণাৎ উত্তর এল, আমি ইহকালে যা দেখেছি এখনও যা দেখছি, আপনাদেরও ভাগ্যেও যেন তাই হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ

এই আলোকিত পুরুষ হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর সমসাময়িক। তিনিও একজন প্রথম সারির সাধক। তাঁর পিতা একজন দাস ছিলেন। তাঁর নামের শেসে 'দীনার' কথাটি কিভাবে যুক্ত হয়, তার একটি ইতিহাস আছে।

একবার হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ একখানি খেয়া নৌকায় নদী পার হচ্ছিলেন। মাঝ নদী পেরিয়ে আসার পর মাঝি পারের পয়সা চাইল। কিন্তু হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ-এর কাছে কোন পয়সা ছিল না। কাজেই খুব বিনীতভাবে তিনি তাঁর অক্ষমতা জানালেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মাঝি বেশ নাছোড়বান্দা। পয়সার জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। মালেক রহমাতুল্লাহ নিরুপায়। আরও বিনীত কণ্ঠে তিনি বললেন, ভাই, আমার কাছে এক কানাকড়িও নেই। দয়া করে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

আর যায় কোথায়! মাঝি উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অশ্লীল ভাষায় বলল, ব্যাটা, তোর যদি পয়সা নেই তো নৌকায় উঠতে কে বলল? বলতে বলতে মাঝি তাঁকে মারধর শুরু করল। মারের চোটে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল। কিন্তু আবার সেই পয়সা চাওয়া। আবার সেই পয়সা না থাকার করুণ স্বীকৃতি। সেই কাকুতি-মিনতি, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। কিন্তু মাঝির তখন জেদ চেপেছে। পয়সা না নিয়ে কিছুতেই সে লোকটাকে পার করে দেবে না। সে আরও নির্মম হয়ে উঠল। ঠিক করল, ব্যাটার হাত-পা বেঁধে নদীতে ছুঁড়ে ফেলা হবে। এ উদ্দেশ্যে সে একগাছি দড়ি হাতে নিয়ে তাঁকে বেঁধে নদীতে ফেলার উদ্যোগ নিচ্ছে, এমন সময় দেখা গেল, নদীর সব মাছ মুখে করে এক একটি দীনার নিয়ে নৌকার চারপাশে ভেসে উঠল। তখন হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ একটি মাছের মুখে থেকে এক দীনার নিয়ে মাঝির হাতে দিল। মাঝি ও অন্যান্য যাত্রীরা এই অদ্ভুত ঘটনায় তাজ্জব বনে গেল। বিশেষ করে মাঝির মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার হল। লোকটির প্রতি সে যা ব্যবহার করেছে, তা এখন অতিমাত্রায় উৎকট হয়ে তার কাছে ধরা পড়ল। আর সে লুটিয়ে পড়ল হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ-এর পায়ে। হযরত তাকে ক্ষমা করে তখন নৌকা থেকে নেমে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে তীরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই থেকে তাঁর নামের সঙ্গে দীনার কথাটি জুড়ে গেল চিরদিনের মতো।

তাঁর চেহারা ছিল খুবই চমৎকার। তিনি অনেক ধন-সম্পত্তিরও অধিকারী ছিলেন। তিনি দামেশক শহরে বাস করতেন। এ শহরে হযরত মুয়াবিয়ার তৈরী খুব বড় একটি মসজিদ ছিল। হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ মনে মনে এক ফন্দি আঁটলেন। ঠিক করলেন, ঐ মসজিদে তিনি পুরো বছর ধরে এতেকাফ করবেন আর এবাদতে মশগুল থাকবেন। তাঁর ওপর মানুষের নজর পড়বে। সকলের আস্থাভাজন হবেন তিনি। তাহলে মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন ভূমির মুতাওয়াল্লী পদ পেয়ে যাবেন।

যেমনি ভাবনা তেমনি কাজ। তিনি মসজিদে ঢুকে পড়লেন। সব সময় নফল নামাজ পড়তে থাকলেন আর মোরাকাবায় মগ্ন রইলেন। অবশ্য মনে মনে জানতেন তিনি কপট। এক রাত্রে মসজিদের বাইরে যেতে তিনি এক আকাশবাণী শুনলেন, মালেক! আল্লাহর দরবারে তুমি এখনও তওবা করছ না কেন? একথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। নিজের ভুল বুঝতে দেরী হল না। তিনি তো পবিত্র হৃদয়ে আল্লাহর এবাদত করেননি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধুতার ভান করেছেন মাত্র। লোককে প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ছিল

www.AmarIslam.com

তাঁর, আল্লাহকে খুশী করা নয়। একথা মনে হওয়া মাত্র সত্যিই তিনি আল্লাহর দরবারে তওবা করে পবিত্র সরল মনে আল্লাহর এবাদতে রত হলেন।

পরদিন সকালে মসজিদের মুসল্লিগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, বিভিন্ন কাজের শৃঙ্খলার জন্য মসজিদে একজন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা দরকার। এ বিষয়ে সকলেই একমত হলেন। অতএব কাকে এ কাজে লাগানো যায়, তা নিয়েও কথা উঠল। আলোচনার পর হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ-কেই তাঁরা উপযুক্ত বিবেচনা করলেন আর তাঁকে এ পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। মালেক রহমাতুল্লাহ মনে মনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন, প্রভু গো! আমি এক বছর ধরে এতেকাফে রইলাম, নামাজ ও তসবীহ পাঠ করলাম, তাতে কিছু হল না। আর মনের গোপন উদ্দেশ্য বর্জন করে শুদ্ধ অন্তকরণে একটি রাত মাত্র এবাদত করলাম, আর এতেই মুতাওয়াল্লী পদটি চলে এল আপনা থেকে। কিন্তু এ পদ আমি আর গ্রহণ করতে পারি না। আমি আপনার এবাদত আর মসজিদ ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না।

তাই হল। যে মুতাওয়াল্লা পদের জন্য তিনি কপটতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, করায়ত্ত হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় সে পদ গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে তিনি গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন। আল্লাহ্ কখন কাকে কী করেন, একমাত্র তিনিই তা ভালো জানেন।

এক বিত্তশালিনী ধর্মপরায়ণা, বিদূষী, রূপসী তরুণীর বিবাহের প্রস্তাবও তিনি নাকচ করেন এই বলে যে, আমি দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়েছি। অতএব তালাক-প্রাপ্তা পৃথিবীর সঙ্গে আর সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। তাই বিবাহের মাধ্যমে হলেও কোন নারীকে জীবন সঙ্গিনী করা সম্ভব নয়। কেননা, তাও দুনিয়াদারীর আওতায় পড়ে। বিবাহের প্রস্তাবটি আনেন মহামান্য হযরত সাবেত বানানী রহমাতুল্লাহ। তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন।

পার্থিব জীবনের উর্ধ্বে উঠে তিনি যে গভীর অধ্যাত্ম-জীবনের শরীক হন, তার পরিচয় জড়িয়ে আছে বিচিত্র ঘটনামালায়। আর তা অলৌকিকও বটে। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। দেখা গেল, এক বিষধর সাপ নারগিস ফুলের পত্রযুক্ত শাখা নিয়ে তাঁকে বাতাস দিচ্ছে। অন্য নিগূঢ় ঘটনাও আছে।

তাঁর বহু দিনের ইচ্ছা, জেহাদে অংশ নেবেন। সুযোগও এসে গেল এক সময়। ইসলাম বিরোধীদের সঙ্গে জেহাদ আসন্ন হয়ে উঠল। হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ জেহাদের খবর পেয়ে খুব খুশী। আল্লাহ এতদিনে হয়ত তাঁর ইচ্ছা পূরণের সুযোগ এনে দিয়েছেন। কিন্তু না, সুযোগ হয়েও হল না। ঠিক এ সময়েই তিনি কঠিন অসুখে পড়লেন। যুদ্ধে যোগদান করতে পারলেন না। দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হল তাঁর। তিনি তাঁর শরীরকেই এর জন্য দায়ী করলেন। হতভাগা আল্লাহর দরবারে তোমার যদি এতটুকু দাম থাকত, তাহলে যুদ্ধের মুহূর্তে তুমি এভাবে রোগাক্রান্ত হতে না। তিনি তাঁর শরীরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। আর হঠাৎ আকাশবাণী এল কানে, ওহে মালেক! বৃথা অস্থির হয়ো না। তুমি এর গোপন রহস্য বুঝতে পারনি। জেনে রেখো, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে, তুমি শত্রুর হাতে বন্দী হতে। বন্দী অবস্থায় তারা তোমাকে শূকরের মাংস ভক্ষণ করাতো আর তা হত ধর্ম নাশের কারণ। সেই চরম বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তোমাকে যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে অসুস্থ করে তোলেন।

হযরত মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ এই অপূর্ব সৌভাগ্যে পুলকিত হলেন।

একদা এক নাস্তিকের সঙ্গে তুমুল তর্ক। তর্ক ধর্ম নিয়ে। নাস্তিক বলে, তার পথই উত্তম। মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ বলেন, তাঁর পথই শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম।

তর্কের ফয়সালা হবে কিভাবে? ঠিক হল, দু'জনেই এক সঙ্গে নিজ নিজ হাত আগুনে স্থাপন করবেন। যার হাত অক্ষত থাকবে তার পথই ঠিক। আর যার হাত আগুনে পুড়বে তিনি ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত হবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কথামতো তাই হল। কিন্তু আশ্চর্য, দু'জনের কারো হাতই পুড়ল না। তখন সিদ্ধান্ত হল, দুজনেই খাঁটি পথে আছেন। কেউ ভ্রান্ত নন। আর এ ঘটনায় খুবই ভেঙে পড়লেন হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ। তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। প্রভু গো! দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে আপনার বন্দেগীতে নিমগ্ন রইলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক নাস্তিকের সমপর্যায়-ভুক্ত হলাম। এ আপনার কেমন বিচার প্রভু! তখন আকাশবাণী হলঃ তুমি বিচলিত হয়ো না মালেক! তোমার হাতের সঙ্গে সেও হাত রেখেছে। তোমার পুণ্য হাতের গুণেই তার হাত অক্ষত থেকেছে। যদি সে আলাদা ভাবে আগুনে হাত রাখত, তাহলে নিশ্চয় তা পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

আল্লাহর বিচারে কখনও কোন ভুল হতে পারে না।

হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ আর একবার কঠিন অসুখে পড়েন। সামান্য সুস্থ হওয়ার পর বিশেষ কাজে তাঁকে যেতে হল বাজারে। শারীরিক ভাবে তিনি তখনও দুর্বল। ঘটনাক্রমে ঐদিনই বাজার কমিটির প্রধান পরিচালক বাজারে আসছেন। পরিচালক বলে কথা! তাঁর নিরাপত্তার জন্য অনুচর বাহিনী একে-ওকে-তাকে সরিয়ে দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে লাগল। হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ-কেও সরে যেতে হল। কিন্তু শরীর দুর্বল ছিল বলে পাশে সরে যেতে একটু দেরী হল। আর এই অপরাধে তাঁর পিঠে এসে পড়ল এক চাবুক। তিনি আর্তস্বরে বলে উঠলেন, ইয়া আল্লাহ! এই অত্যাচারীর নিষ্ঠুর হাত যেন দ্বি-খণ্ডিত হয়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুর আঘাত-জর্জর আবেদনে সাড়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাবুকধারীর ডান হাতখানা দ্বি-খন্ডিত হয়ে বাজারের রাস্তায় পড়ে গেল।

হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ-এর এক অত্যাচারী প্রতিবেশী ছিল। তার অত্যাচারে আর নিষ্ঠুরতায় অতিষ্ট হয়ে পাড়ার লোক এসে হযরতের কাছে আবেদন জানাল, লোকটিকে উপদেশ দিয়ে সৎপথে আনুন। তার অত্যাচার আর সহ্য হয় না।

লোকজনের অনুরোধে তিনি নির্দয় প্রতিবেশীকে কিছু সদুপদেশ দিলেন। কিন্তু সে কথা কানে না দিয়ে সে রূঢ় ভাষায় বলল, আমি স্বয়ং সরকারের লোক। আমার ওপর কর্তৃত্ব করার সাধ্য বা অধিকার কারোর নেই। মালেক রহমাতুল্লাহ বললেন, তাহলে কথাটা বাদশাহকে জানাতে হয়। সে বলল, তা জানাতে পারেন। মনে রাখবেন, বাদশাহ আমার মন জুগিয়ে চলেন। তিনি আমার ওপর বিরূপ হবেন না।

দেখি, বাদশাহ কী করেন। মালেক রহমাতুল্লাহ বললেন, যদি বাদশাহর তরফ থেকে কোন প্রতিকার পাওয়া না যায়, তাহলে আল্লাহর দরবারে যেতে হবে।

লোকটি মুখ টিপে হাসে। বলে, তিনি আবার বাদশাহর চেয়েও আমার প্রতি কোমল হৃদয়। প্রচুর ভালোবাসেন আমাকে। আমি তাঁর অনুগ্রহ-ভাজনও বটে।

মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ-এর মন খারাপ হয়ে গেল। বস্তুত বিষণ্ন হয়েই তিনি বাড়ী ফিরলেন।

কঠোর-হৃদয় প্রতিবেশীর অত্যাচারের মাত্রা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পেল। অত্যাচারিত মানুষ আবারও দল বেঁধে মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ -এর কাছে এসে বলল, আমরা এর আগেও আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। আর তো পারা যায় না। লোকটার জুলুম সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছে। আমাদের অনুরোধ, আপনি আর একবার চেষ্টা করুন। আপনার কথায় যদি সে পথে আসে ভাল। না হয়, আমরাই ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।

অগত্যা তিনি আবারও লোকটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর আকাশবাণী শুনলেনঃ মালেক তুমি আমার বন্ধুর ওপর রাগ করো না, বিরক্তও হয়ো না। হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ আকাশবানী শুনে হতভম্ব। এমন একটি কঠোর হৃদয়

অত্যাচারী লোক কী করে আল্লাহর বন্ধু হয়! তিনি এর রহস্য উদঘাটন করতে পারলেন না। অবশ্য রাস্তা থেকে বাড়ী না ফিরে তিনি লোকটির কাছেই গেলেন।

সে মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ-কে প্রশ্ন করে, আপনি আবার এসেছেন কি কারণে জানতে পারি কি?

উত্তরে তিনি বললেন, আমি এসেছি আপনাকে সুসংবাদ দিতে। তিনি আকাশবাণীর বিবরণটি শোনালেন।

লোকটি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেল। আল্লাহর বন্ধু সে? আশ্চর্য! সে ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে স্থীর করে, তাই যদি হয় তাহলে আজ থেকে আমিও আমার মনের গতি প্রকৃতি বদলে দিলাম। আর যা কেউ আশা করেনি তাই হল। যাবতীয় সম্পত্তি, ধন-দৌলত আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়ে একদিন সে লোকালয় ছেড়ে চলে গেল। অত্যাচারিত মানুষের দল দেখল, মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ-দৌলতে একটি অন্ধকার হৃদয় হতে সূর্য উঠে বিশ্ব চরাচরে তার কিরণমালা ছড়িয়ে দিল।

এ ঘটনার বহুদিন পরে লোকটির সঙ্গে মক্কা মোয়াজ্জামায় হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ-এর দেখা হয়। তখন তিনি ক্ষীণ, কৃশকায়। কিন্তু দেহাবয়বে এক অপার্থিব আলোক-প্রভা। তখন তিনি পৌঁছে গেছেন জীবনের শেষ দিগন্তে। হযরত দীনার রহমাতুল্লাহ-কে দেখে তিনি বললেন, শুনুন, আল্লাহ্ সত্যিই বলেছেন যে, তিনি আমার বন্ধু। আর আমি এখন আমার বন্ধুর কাছেই চলেছি। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। গ্রামবাসীর কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা রইল। বলতে বলতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ-এর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন এতদিন। শেষ কথা বলে দিয়ে তিনি সত্যি তার প্রিয় বন্ধুর কাছে ফিরে গেলেন।

হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ ছিলেন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। পাক কোরআনে আল্লাহ্ এই ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সংযমের কথা বার বার বলেছেন। তাঁর পথের যাঁরা পথিক, সহিষ্ণুতা ও সংযম তাঁদের পথ চলার পাথেয়।

এক সময় হযরত মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ একটি ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করতেন। বাড়ীর সামনেই ছিল এক ইহুদী পরিবার। সাধারণভাবে ইহুদীরা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়। তার ওপর লোকটি ব্যক্তিগতভাবে হযরত দীনার রহমাতুল্লাহ-এর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। সে করল কী, মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ-এর বাড়ীর দরজার কাছেই শৌচাগার বানাল। আর এর মল-মূত্র গড়িয়ে যেত তাঁর বাড়ী বরাবর। এমনকি দূর্গন্ধে সেখানে টেকা দায় হত। অথচ মালেক রহমাতুল্লাহ এই অপ্রতিবেশী সুলভ অসামাজিক ব্যবহারের বিনিময়ে ইহুদীকে একটি কটু কথা বলেননি। কোনদিন কলহ-ঝগড়াও করেননি। শুধু আল্লাহর দরবারে নিবেদন করেন, তিনি যেন ঐ হৃদয়হীন ইহুদীকে হেদায়েত করেন। চোখের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলেন আঁধারের পর্দা।

বেশ কিছুদিন চলে গেল।

একদিন ইহুদী জিজ্ঞেস করে, আমার পায়খানাটার জন্য আপনার কোন অসুবিধা হয় না তো?

হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ উত্তর দেন, তা তো নিশ্চয় হয়। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। একটা গামলা আর ঝাড় আছে। প্রত্যেকদিন ধুয়ে সাফ করে দিই।

ইহুদী বলে, এতদিন ধরে আপনি অসুবিধা ভোগ করছেন, অথচ কোনদিন বিরক্তি বা রাগও প্রকাশ করেননি।

তা কেন করব? হযরত বলেন, আল্লাহ আমাদের বলেছেন, ক্রোধ দমনকারীকে তিনি ভালবাসেন।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সত্যিই এতদিনে উহুদীর চোখের ওপর থেকে কালো পর্দা সরে গেল। শত্রুর অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করা ও তার প্রতি এতটুকু রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ না করা যদি ইসলামের রীতি হয়, তাহলে মানুষের মুক্তি সাধনে একমাত্র ইসলামই সক্ষম। সে হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেবার অনুরোধ জানাল।

অপরিসীম ধৈর্য, অভাবনীয় সাফল্যে উত্তীর্ণ হলেন তিনি।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ঃ

হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ পার্থিব জীবনে কঠোর সংযম পালন করতেন। বিশেষ করে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপারে। বহুদিন অম্ল ও মিষ্টি দ্রব্য গ্রহণ করেননি। রোজা রাখতেন সারা বছর। দু'এক টুকরো শুকনা রুটি দিয়ে ইফতার করতেন। সেহরীও সারতেন একই ভাবে। হয়ত শুকনা রুটি বা এক গ্লাস পানি দিয়ে। আর এ ধরনের ব্যবস্থায় তার কোনও ক্ষোভ তো ছিলই না, বরং তিনি খুশী ছিলেন।

অবশেষে একদিন প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করলেন। গোশত খেতে ইচ্ছা হল তাঁর। দীর্ঘদিন খাননি। আজ যখন খাবার ইচ্ছা জাগল, তখন তা আর দমন করতে পারলেন না। গোশত কিনে নিয়েই বাড়ী ফিরলেন। দোকানী জানত, মালেক দীনার গোশত খান না। তাই গোশত কিনে নিয়ে গিয়ে তিনি কী করেন, তা জানার জন্য তার এক চাকরকে গোপনে পাঠাল।

চাকর দেখল, গোশত নিয়ে তিনি বাড়িতে গেলেন না। চলে এলেন এক নির্জন স্থানে। পাত্র থেকে গোশত বের করে নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে শুঁকলেন। আর আপন মনে বলতে লাগলেন, রে প্রবৃত্তি! আজ তোমার জন্য এতটুকুই ব্যবস্থা করা গেল। এর বেশী আর পারা গেল না। তারপর বাইরে এসে গোশতটুকু এক ভিখারীকে দিয়ে দিলেন।

আবার তিনি সান্ত্বনা দিলেন তাঁর আত্মাকে। হে দুর্বল আত্মা! তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই, সুতরাং ইচ্ছা করে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি তা নয়। তুমি একটু সবর কর। খুব বেশী দিন তোমাকে কষ্ট সহ্য করতে হবে না। অবশ্যই এর শেষ আছে একদিন। সেদিন দেখবে, রাশি রাশি সু-স্বাদু খাবার তোমার সম্মুখে উপস্থিত। চল্লিশ দিনের মাথায় গোশত না খেলে নাকি বুদ্ধি লোপ পায়। আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। কারণ, আমি একটানা কুড়ি বছর গোশত খাইনি। তাতে আল্লাহর রহমতে আমার বুদ্ধি লোপ পায়নি তাই শুধু নয়, বরং আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চাকরটি গিয়ে দোকান মালিককে সবিস্তারে সব বলল। হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ-এর এই ত্যাগ ও সংযমের কথা শুনে সে হতবাক হয়ে গেল।

তিনি বসরায় বাস করেছেন চল্লিশ বছর। কিন্তু বেশী দিন খেজুর খাননি। খেজুরের সময় কেউ খেতে অনুরোধ করলে তিনি বলতেন, খেজুর খেয়ে তোমাদের পেটের কতটুকুই বা উন্নতি হয়েছে আর আমি যে খাই না, তাতে আমারই বা এমনকি অবনতি হয়েছে?

কিন্ত চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হলে তাঁর খেজুর খাওয়ার ইচ্ছা হয়। মন বলল, খেজুরের স্বাদটা একবার নেওয়া যাক। কিন্তু তিনি এর বিরোধিতা করে বললেন, না, তোমার এ ইচ্ছা আমি পূর্ণ হতে দেব না।

হঠাৎ এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন কে যেন বলছেন, মালেক! তুমি এভাবে আত্মাকে আর কষ্ট দিও না। খেজুর খাও। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি খেজুর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন বটে। তবে আপন আত্মার উদ্দেশ্যে বললেন, হে আত্মা! প্রথমতঃ তোমাকে রোজা রাখতে হবে পুরো এক সপ্তাহ। আর প্রতি রাতে ভোর পর্যন্ত আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকতে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারপর তোমার বাসনা পূর্ণ করব, তার আগে না। তখন তিনি রোজা রাখতে লাগলেন। সপ্তাহখানেক রোজা রাখার পর কিছু খেজুর কিনে এক মসজিদে গেলেন। খেজুরগুলো খাবেন বলে সামনে নিয়ে বসলেন।

একটি ছেলে এই দৃশ্য দেখে তার পিতাকে ডেকে উঠল জোরে জোরে। আব্বা দেখুন, মসজিদে এক ইহুদী এসেছে। সে এখানে বসে খেজুর খাওয়ার তোড়জোড় করছে।

মসজিদে ইহুদী ঢুকেছে বলে লোকটি লাঠি হাতে ছুটে এল। কিন্তু এসে দেখে, বসে আছেন হযরত মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ স্বয়ং। লজ্জা পেয়ে সে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল। মাফ করুন হুযুর! আমাদের এলাকায় ইহুদীরা ছাড়া দিনের বেলায় কেউ খেজুর খায় না। সব মুসলমানই রোজা রাখে। আমার নাবালক ছেলে কিছু না বুঝে আপনাকে ইহুদী বলে মনে করেছে।

লোকটির কথা শুনে হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ আত্মমুখী হলেন। তাঁর মনে হল, ছেলেটির ইহুদী সম্বোধনের মধ্যে অবশ্যই কোনও ইঙ্গিত আছে। তিনি বলে উঠলেন, ইয়া আল্লাহ! খেজুর খাওয়ার আগেই এক মাসুম শিশুর মুখ থেকে ইহুদী আখ্যায় ভূষিত হলাম। সেগুলি যদি খেয়েই ফেলতাম, তাহলে অধম কাফের রূপেই গণ্য হতাম। আমি আর এই খেজুর খাচ্ছি না। আর মুহূর্তেই শপথ করলেন, আজীবন খেজুর খাবেন না।

মানুষের পাপের কি পরিণতি হয়, হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ তাঁর নিজ নয়নে দেখে গেছেন।

একদিন এক মুমূর্ষু রোগীর পাশে বসে তাঁকে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করানোর বৃথা চেষ্টা করলেন। যতবারই তিনি তাকে কালেমা পড়ে শোনাতে যান, ততবারই সে কালেমার বদলে শুধু দশ, এগারো ইত্যাদি সংখ্যা উচ্চারণ করতে থাকে। হযরত তাকে শুধালেন, তুমি কি কাজ করতে?

সে বলল, অর্থলগ্নি কারবার করতাম।

তুমি কালেমা পড়ছ না কেন?

পড়তে তো চাই, কিন্তু লকলকে আগুনের শিখা আমর দিকে ধেয়ে আসে যে। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মুখ দিয়ে সংখ্যা বেরিয়ে আসে। হযরত তার কথা শুনে বুঝলেন, লোকটি মালের ওজনে কম দিত আর সুদ নিত। তাই তার এ অবস্থা।

বসরা শহরে একবার আগুন লাগে। বিরাট অগ্নিকান্ড। আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। হযরত মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ নিজের জুতা আর লাঠি নিয়ে এক ছাদের ওপর উঠে সেখান থেকে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখছিলেন। যাদের মালপত্র কম ও হালকা, তারা কোন রকমে আগুন থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু যাদের মাল ভারী আর বেশী, তারা আটকা পড়ল আগুনে। জানমাল সব পুড়ে গেল। তিনি বললেন, এর মধ্যে বিচার দিনের নিদর্শন আছে। সেদিনও একই ভাবে নিষ্পাপ ও স্বল্প পাপী মানুষ মুক্তি পাবে। কিন্তু আগুনে পুড়বে তারা, যাদের পাপের পরিমাণ ও ওজন দুইই বেশী।

তাঁর সম্বন্ধে অন্য এক সাধক হযরত জাফর ইবনে সোলায়মান রহমাতুল্লাহ একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি একবার হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ-এর হজ্জের সহযাত্রী ছিলেন। দু'জনে এহরাম বেঁধে গিয়ে দাঁড়ালেন কাবার সামনে। পাঠ করতে লাগলেন তালবিয়া আল্লাহুম্মা 'লাব্বাইকা'। প্রভু গো! আমি আপনার দরবারে হাজির। কিন্তু হঠাৎ তালবিয়া পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে গেলেন। পরে চেতনা ফিরে এলে হযরত জাফর রহমাতুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি হঠাৎ এমন জ্ঞান হারালেন কেন?

মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ বললেন, প্রভু গো! আপনার দরবারে আমি হাজির। একথা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় হল, যদি আমার কথা শুনে আল্লাহ্ বলে বসেন, না, এবাদতের ইচ্ছা নিয়ে তুমি আমার দরবারে হাজির হওনি, তাহলে আমার অবস্থা কেমন হবে? একথা মনে আসা মাত্রই আমি মূর্ছা যাই। এ থেকে বোঝা যায়, পূত চরিত্রের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আল্লহার ভয়ে তিনি কতখানি ভীত ছিলেন। তাঁর আল্লাহ-ভীতির আরও প্রমাণ এই যে, তিনি যখন নামাজে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতেহার 'ইয়্যাকা নাবুদ ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন' (আমি কেবল তোমারই এবাদত করি ও তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি) অংশটি উচ্চরণ করতেন তখন বিপুল কান্নায় ভেঙে পড়তেন। তার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এটি যদি কোরআনের আয়াত না হত, আর পাঠ করার নির্দেশ না থাকত, তাহলে আমি কিছুতেই এটি উচ্চারণ করতাম না। কেননা, এ এক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। আমি মুখে বলি, হে আল্লাহ! আমি আপনারই এবাদত করি। কিন্তু কাজে আমার প্রবৃত্তিরই দাসত্ব করি। মুখে উচ্চারণ করছি, আল্লাহ গো! আমি তোমারই সাহয্য-প্রার্থী। কিন্তু আসলে আমি মানুষের সাহায্যের প্রত্যাশা রাখি। আল্লাহ যদি মুখের ওপর বলে দেন, তুমি আর মিথ্যা শপথ করো না, তাহলে আমার অবস্থা কেমন হবে– এ ভয়ে কাঁদছি।

তিনি যেমন ছিলেন ধর্ম-ভীরু তেমনি কঠোর তাপস্বী। কঠিন অভ্যাস গড়ে উঠেছিল তাঁর। কোন রাতেই ঘুমাতে যেতেন না। সারারাত জেগে এবাদত বন্দেগী করতেন। এক রাতে তাঁর মেয়ে বললেন, আব্বা আজ একটু শুয়ে বিশ্রাম নিন। তিনি বললেন, মা গো! কিভাবে বিশ্রাম নেব বল। আমার মন সব সময় আল্লাহর ভয়ে-ভীত। তাছাড়া আমার আরও চিন্তা, আল্লাহর রহমত হয়ত নেমে আসছে আমার ওপর।' কিন্তু আমাকে ঘুমাতে দেখে তা আবার ফিরে যাচ্ছে তাঁর কাছে। পাছে আমি বঞ্চিত হই, তাই আমি ঘুমাতে পারি না মা।

এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনার দিনগুলো কিভাবে কাটছে? তিনি বললেনব, আর কেমন! আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করছি আর শয়তানের দাসত্ব করছি। যদি কেউ মসজিদের দরজায় বসে ডেকে বলে, যারা মসজিদের ভেতরে আছে, তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বের হয়ে এস দেখি, তাহলে সে অধম লোকটি বেরিয়ে আসবে, সে হল এই মালেক। আর কেউ নন।

মানুষের মহত্তম গুণ হল বিনয়। এ গুণে তিনি কিরূপ ভূষিত ছিলেন, এটি তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

এক মহিলা কোন কারণ বশতঃ তাঁকে কপট বা মোনাফেক বলে সম্বোধন করে। তিনি বললেন, মা গো অন্ততঃ বিশ বছরের মধ্যে কোন লোক আমাকে আমার আসল নাম ধরে সম্বোধন করেনি। এতদিন পরে আপনিই আমাকে ঐ নাম ধরে ডাকলেন। মনে হয়, আমি কি ধরনের লোক একমাত্র আপনিই তা জানতে পেরেছেন। আমার এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝতে পেরেছি যে, লোকজন নিন্দা আর স্তুতি দুটোই করবে। নিন্দুকরা অতিরিক্ত কুৎসা রটনা করে আর প্রশংসাকারীরা অতিমাত্রায় প্রশংসা করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করে। তিনি আরও বলেন, যে বন্ধুর দ্বারা কোন উপকার হয় না, তার বন্ধুত্ব ত্যাগ করা উত্তম।

তাঁর মূল্যবান উপদেশসমূহ ঃ

১. এ যুগের বন্ধুত্বে রয়েছে কপটতা। প্রত্যেকের বাইরের দিকটি সুন্দর। কিন্তু ভেতরটা বড় বিশ্রী। এমনকি আলেমগণের অন্তরও কলুষিত।

২. দুনিয়ার মোহ ত্যাগ কর। নিজেকে বাঁচাও, অন্যকেও বাঁচার পথ দেখাও।

৩. আল্লাহর ধ্যান-জ্ঞান, সাধনা ও তাঁর কাছে প্রার্থনার চেয়ে পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে যে পছন্দ করে, তার মতো নির্বোধ আর নেই। তার জ্ঞান খুবই অল্প, হৃদয় অন্ধ। তাই তার জীবনই বৃথা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪. আল্লাহ পাক হযরত মূসাকে জুতা আর লাঠি দিয়ে বললেন, যান, সারা দুনিয়া ভ্রমণ করুন আর সৃষ্টিজগত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। যে পর্যন্ত জুতা ক্ষয় না হয় এবং লাঠি ভেঙে না যায়, ততদিন পর্যন্ত আপনি কেবল আমার অবদান ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকুন। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে ধৈর্য্যের সঙ্গে তাঁর পথে অগ্রসর হোন।

৫. কোন এক ঐশী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুগামীদের আমি দু'টি জিনিস দান করেছি– যা ফেরেশতা জিবরাঈল এবং মিকাঈলকেও দিই নাই। একটি হল আমার প্রতিশ্রুতি– তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর একটি হল, আমি ওয়াদা করেছি, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।

তাওরাতে উল্লেখ রয়েছে, হে সত্যানুসারীগণ! তোমরা পার্থিব জীবনে আমার গুণগান করে সুখী হও। জেনে রেখো, আমার প্রশংসা ও গুণগান করা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ এবং পরকালের জন্য সেরা নিয়ামত। অন্য এক খোদায়ী গ্রন্থে আছে– আল্লাহ বলেন, যে দুনিয়াকে ভালেবাসে সে দুনিয়াতে আমার ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট বস্তু লাভ করবে। আর যে মোনাজাত, এবাদত, মোরাকাবা, মোশাহাদার স্বাদ উপভোগ করবে না, আমি তার অন্তর থেকে এবাদতের স্বাদ উঠিয়ে নিয়ে যাই।

৬. যে সব সময় প্রবৃত্তির অনুগত, শয়তান তার কাছে বেশী যাতায়াত করে না। কেননা, সে মনে করে, প্রবৃত্তির আনুগত্যের মাধ্যমেই তার কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে।

৭. যে তোমার সেবা করছে তার সেবায় সন্তুষ্ট থাক। তাহলেই আখেরাতে মুক্তি পাবে।

অনন্ত জীবনে ঃ হযরত মালেক রহমাতুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর তাঁকে এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহর দরবারে কেমন ব্যবহার পাচ্ছেন? তিনি বলেন, আমি পাপী। কিন্তু আমার মধ্যে ঈমান ছিল বলে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

আর একজন স্বপ্নে দেখলেন, মালেক রহমাতুল্লাহ এবং ওয়াসে রহমাতুল্লাহ এক সঙ্গে জান্নাতের দিকে এগুচ্ছেন। দরজায় হাজির হয়ে প্রথমে মালেক রহমাতুল্লাহ ও পরে ওয়াসে রহমাতুল্লাহ ভেতরে গেলেন। এই দৃশ্য দেখে স্বপ্ন-দর্শনকারী চিন্তা করলেন, ওয়াসে রহমাতুল্লাহ-এর চেয়ে মালেক রহমাতুল্লাহ-এর মর্যাদা কী কারণে এত বেশী যে তিনি প্রথমেই জান্নাতে দাখিল হলেন। তখন আকাশ-বাণী শোনা গেল– ওয়াসে সব সময় দু'টি জামা ব্যবহার করতেন। আর মালেকের ছিল একটি জামা। দু'জনের মধ্যে ব্যবধানের মাহাত্ম্য এখানেই।

হযরত
ওয়ায়েস কারনী
রহমাতুল্লাহ

পরিচিতিঃ রাসুলুল্লাহ বলতেন, ইয়েমেনের দিক থেকে আল্লাহর রহমতের সুগন্ধি বাতাস ভেসে আসছে বলে আমি অনুভব করছি।

আল্লাহর রহমতের এই সুগন্ধি বাতাস হল একটি পবিত্র, পুষ্পিত হৃদয় মাত্র। যাঁর নাম হযরত ওয়ায়েস কারনী রহমাতুল্লাহ স্বনাম ধন্য এক তাবেয়ী। রাসূলে করীমের যুগে তিনি জীবিত ছিলেন করন দেশে তথা ইয়েমেনে। অথচ নবীমুস্তাফার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি জীবনে কোন দিন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ এক আশ্চর্য ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঘিরে প্রথমতঃ একগুচ্ছ সোনালি মানুষ তাঁর জীবন ও ধর্মকে বর্মের মতো রক্ষা করেছেন। জীবনে জীবন যোগ করেছেন। ক্রমশঃ আত্ম-নিবেদিত প্রাণের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যায়। তাঁর নৈতিক বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিয়ে অসংখ্য মানব সন্তান হৃদয়-স্পন্দিত আবেগে ইসলামের পতাকাতলে এসে দাঁড়ায়। ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা চার। অথচ মক্কায় তেরো বছরের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বাস করেও তিনি প্রায় সাড়ে সাতশ লোককে এ আন্দোলনে শরীক করতে সক্ষম হন। এক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা চার হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। অনুগামীদের সংখ্যা কী দ্রুত-হারে বৃদ্ধি পায়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বিদায় হজ্জ। আমরা দেখেছি, এই হজ্জে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের সংখ্যা একলাখ চব্বিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার পর্যন্ত ছিল।

বাইরে যখন জন-জাগরণের বিপুল কলোচ্ছ্বাস, তখন নীরবে, নিবিড় গোপনে একটি মানুষ তাঁর হৃদয়-মন সর্বস্ব মহানবী (সঃ)-এর আদর্শে সঁপে দিয়ে গভীর দৃঢ়-সাধনায় নিমগ্ন। আরব মরুর আকাশে দেদীপ্যমান সূর্যের আলোকরশ্মি আত্মস্থ করে দিনে দিনে তিনি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। মানুষ তাঁর খোঁজ রাখেনি, বনান্তরালে সুবাসিত ফুলের মতো তিনি ফুটে উঠেছেন। আর সে সুরভি যেখানে পৌঁছানোর কথা সেখানে ঠিকই পৌঁছেছে। মহানবীর অপাপবিদ্ধ হৃদয়ে সে সুগন্ধি বাতাস পুলক-চঞ্চল আবেগে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহর সে রহমত উপলব্ধি করতে রাসূলুল্লাহর দেরী হয়নি। আর অন্তচক্ষু দিয়ে তিনি তাঁর পরম-প্রিয় আত্মীয়কে খুব স্পষ্ট করে দেখে নিয়েছেন। হযরত ওয়ায়েস কারনী রহমাতুল্লাহ-এর প্রতি ইঙ্গিত করে অবশেষে রাসূলে কারীম (সঃ)। একদিন তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা জেনে রেখো, আমার এমন একজন ভক্ত আছেন, যিনি শেষ বিচারের দিনে রাবী ও মোজার গোত্রে ছাগপালের পশম সংখ্যাতুল্য আমার পাপী উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন।

সবাই অবাক! কে, কে তিনি, এমন সৌভাগ্যবান পুরুষ? নবী কারীম (সঃ) বললেন, তিনি আল্লাহর এক প্রিয়জন-ওয়ায়েস কারনী।

তিনি কি আপনাকে দেখেছেন-এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্ন?

না। চর্মচক্ষু দিয়ে দেখেননি। তবে দেখেছেন নয়ন দিয়ে। তিনি যদি আপনার এতই গুণ মুগ্ধ, তাহলে আপনার সমীপে উপস্থিত হন না কেন?

আল্লাহর নবী বললেন, তার দু'টো কারণ আছে। প্রথম, আল্লাহ্ ও আল্লাহর নবীর প্রেমে তিনি এমনই বিভোর যে, তাঁর কোথাও যাওয়ার অবস্থা নেই। আর দ্বিতীয় কারণটি হল, তিনি শরীয়তের নির্দেশ পালনে নিয়ত নিরত। বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা মা আছেন। তিনি অন্ধ। ওয়ায়েস ছাড়া তাঁকে দেখার আর কোন লোক নেই। মায়ের ভরন-পোষণ, দেখা-শোনা, সেবা-পরিচর্যা ইত্যাদি যাবতীয় দায়দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। আবার রুজি-রোজগারের জন্য তাঁকে উটও চরাতে হয়।

একান্ত অনুচরবর্গ অবাক হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা শুনতে থাকেন। এমন একটি মহিমাময় মানুষকে দেখার ইচ্ছা পুষ্পিত লতার মতো বেড়ে ওঠে সবার মনে। তাঁরা বলেন, তাঁর সাথে কি আমাদের দেখা হবে না? না, পার্থিবজীবনে তোমাদের সাথে তাঁর দেখা হবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে তিনি বলরেন, আপনিও আপনার জীবনে তাঁকে দেখতে পাবেন না। তবে উমর ও আলীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে। অতঃপর তিনি ওয়ায়েস কারনীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করলেন। তাঁর সমস্ত শরীর অপেক্ষাকৃত বড় বড় লোমে ঢাকা। আর দু'হাতের বাম দিকে একটা করে সাদা দাগ আছে। অবশ্য তা শ্বেতী নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আসন্ন মৃত্যুর প্রাক্কালে মহানবী (সাঃ) তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমার খেরকা ওয়ায়েস কারনীকে দেবে। তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, তিনি যেন আমার গুনাহ্গার উম্মতের জন্য দোয়া করেন।

নবীজীর এ আদেশও যথাসময়ে পালিত হয়।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনকাল। মহানবীর নির্দেশ ভুলে যাননি তিনি। হযরত আলী (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে একদিন বে'রিয়ে পড়লেন মহাতাপসের সন্ধানে কুফার পথে। কুফার মসজিদে খোতবা পাঠকালে হযরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত লোকজনদের ওয়ায়েস কারনী রহমাতুল্লাহ-এর কথা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তেমন সুবিধা হল না। মানুষ তাঁকে দেখেছে। কিন্তু তাঁর ভেতরের জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্ব সনাক্ত করতে পারেনি। যেটুকু সংবাদ পাওয়া গেল তা হল সে একটা পাগল। লোকালয় ছেড়ে জনবিরল এলাকায় বাস করে। মাঠে উট চরায়। দিনের শেষে শুকনো রুটি খায়। লোকে যখন হাসে, সে তখন কাঁদে। আর লোকে যখন কাঁদে, সে তখন হাসে। খাপছাড়া আস্ত এক পাগল।

এই সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা দু'জন কারন এলাকায় গেলেন। ওয়ায়েস তখন এক মনে নামাজ পড়ছেন। পাশেই তাঁর উট চরছিল। আল্লাহর ফেরেশ্তাগণ উটের পাল দেখাশোনা করছিলেন। নামাজ শেষ করে তিনি অতিথিদের কাছে এসে সালাম জানালেন। তাঁরা বললেন, আপনার নামটা জানতে পারি কি?

তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আপনার আসল নামটি বলুন।

– ওয়ায়েস।

দয়া করে আপনার হাতখানা দেখাবেন?

তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

নবীজীর কথার সঙ্গে হুবহু মিল। সেই সাদা দাগ। অথচ শ্বেতী নয়। হযরত ওমর (রাঃ) হাতে চুমু দিলেন। তারপর তাঁর হাতে তুলে দিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র খেরকা। আর তিনি যেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উম্মতদের জন্য দোয়া করেন, সে কথাও তাঁর কাছে নিবেদন করা হল।

কিন্তু ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনারা ভাল করে খোঁজ নিন। সম্ভবতঃ তিনি অন্য লোক হবেন। খুব ভালভাবেই খোঁজ নিয়েছি, ওমর (রাঃ) বললেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যেসব চিহ্নের কথা বলেছেন, তা মিলে গেছে। আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আপনিই তাঁর পরম-প্রিয় ওয়ায়েস।

এতক্ষণে ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ আগন্তুকদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। পরিচয় পাওয়ার পর পুলকিত চিত্তে তিনি তাঁদের সালাম জানালেন। হাতে চুমু দিলেন। বললেন, আপনাদের মতো মহা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এ গরীবের কাছে তশরীফ এনেছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আরও বললেন, নবীজীর গুনাহ্গার উম্মতের মুক্তির জন্য দোয়া করার যোগ্যতা আপনাদেরই বেশী রয়েছে।

ওমর (রাঃ) বললেন, আমরা তা করছি। কিন্তু আপনিও রাসূলুল্লাহর নির্দেশ পালন করুন।

হযরতের পবিত্র খেরকাটি হাতে নিয়ে ওয়ায়েস কারনী সামান্য তফাতে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেন, প্রভু গো! রাসূলুল্লাহর উম্মতদের গুনাহ্ মাফ না করলে আমি এ খেরকা পরব না। নবী মুস্তফা (সঃ) হযরত ওমর ও হযরত আলীর প্রতি যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, তাঁরা তা পালন করেছেন। এখন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনার কাজ বাকী। আপনি আপনার প্রিয় বন্ধুর উম্মতের পাপ মাফ করে দিন।

দৈববাণী হল, হে ওয়ায়েস! তোমার দোয়ার কারণে কিছু সংখ্যক উম্মতকে মাফ করা হল। কিন্তু তিনি শুনলেন না। বললেন, যতক্ষণ না সমস্ত উম্মতকে মার্জনা করা হয়, ততক্ষণ আমি নবীজীর দেওয়া খেরকা পরব না।

ইল্‌হাম এল-তোমার দোয়ার জন্য কয়েক হাজার মানুষকে মার্জনা করা হবে।

হযরত ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ যখন এভাবে সেজদাবনত অবস্থায় প্রতিপালকের দরবারে তাঁর আবেদন রাখছেন, তখন সেখানে ওমর (রাঃ) এসে হাজির হলেন। তাঁদের দেখে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, আপনারা কেন আমার কাছেন এলেন? আমি যে রাসূলের উম্মতদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করছিলাম। যে পর্যন্ত না তাদের সবাইকে মাফ করাতে পারছি, সে পর্যন্ত আমি প্রিয় নবীর খেরকা গায়ে তুলব না।

খেলাফত তুচ্ছ হয়ে যায় ঃ ছিন্ন-বস্ত্র পরিহিত এই মানুষটির অন্তর্জোতি উপলব্ধি করে হযরত ওমর (রাঃ) অভিভূতঃ ও ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। সামান্য একটি লোক-অথচ কী অসামান্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। সাধারণ একটি মানুষ-অথচ অসাধারন। এর তুলনায় তুচ্ছ তাঁর খিলাফত, তাঁর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য। বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল তাঁর। বললেন, এমন কি কেউ আছ যে, একখানি রুটির বিনিময়ে খেলাফতের দায়িত্ব নিতে পার?

তাঁর এই স্বগতোক্তি শুনে ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ বললেন, যে বোকা, শুধু সে-ই তা নেবে। শুনুন, সত্যিই যদি মন না চায়, তাহলে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেই তো হয়। যার মন চায় সে কুড়িয়ে নেবে। ওসব বিনিময়ের কথা কি বলছেন?

এই কথা বলে তিনি এবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রদত্ত পোশাক পরম ভক্তিভরে পরলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্ এ অধমের প্রার্থনায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, রাবী' ও মোজার কবিলার ছাগ লোমের তুল্য নবীজীর উম্মতকে মার্জনা করবেন।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই মহাতাপসের আত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁরা বিস্ময়-বিহ্বল হলেন উভয়ে নির্বাক।

কিছুক্ষণ পরে ওমর (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি আপনার এমন গভীর ভালোবাসা, অথচ আপনি একবার গিয়ে তাঁকে দর্শন করেননি কেন?

ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, আচ্ছা, আপনারা তো তাঁকে দেখেছেন, তাই না?

হ্যাঁ। দেখেছিই তো।

মনে হয় আপনারা কেবল তাঁর জোব্বাই দেখেছেন। তাঁকে ঠিক দেখেননি। বলুন তো, তাঁর পবিত্র ভুরু দু'টি জোড়া ছিল, না আলাদা?

প্রশ্ন শুনে তাঁরা অপ্রস্তুত। আশ্চর্যের কথা, দু'জনের কেউই ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ-এর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি আরও একটি প্রশ্ন করলেন। আচ্ছা, মনে হয় প্রিয় নবীর ওপর আপনাদের গভীর ভালোবাসা ছিল, তাই না? নিশ্চয়ই। আর সে ভালোবাসা এখনও অটুট। তাই যদি হয়, ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ বললেন, তাহলে আপনাদের দু'জনের মুখে এখনও দাঁতগুলো রয়েছে কিভাবে? ওহোদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর দাঁতগুলি ভেঙে গেল, অথচ সমব্যথী হয়ে আপনাদের দাঁতগুলি ভেঙে ফেলতে পারলেন না। অথচ এখনও দাবী করেন, তাঁর প্রতি আপনাদের ভালোবাসা এখনও অটুট। আর শুনুন। আমি তাঁকে চোখে কোন দিন দেখিনি। ওহোদের যুদ্ধে তাঁর কোন্ দাঁতটি ভেঙে পড়ে, তাও দেখিনি। কিন্তু যখন শুনলাম যুদ্ধে নবীজীর দাঁত ভেঙ্গে গেছে, তখন ভাবলাম তাঁর মুখে তো এখন দাঁত নেই, তাহলে আমি আমার দাঁত রাখি কোন্ মুখে? মনে হওয়া মাত্র একটি দাঁত উপড়ে ফেলাম। পরক্ষণে মনে হল, তাঁর ঠিক কোন্ দাঁতটি ভেঙে গেছে তা তো জানি না। হয়তো

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে দাঁতটি এখনও রয়েছে আমার মুখে। এই সংশয় দূর করার জন্য আমি তাই সব দাঁতই তুলে ফেলেছি।

রাসূলুল্লাহর প্রিয় দুই সহচর ওয়ায়েস কারনী রহমাতুল্লাহ-এর এ বিবরণ শুনে শিউরে উঠলেন। এও কি সম্ভব? অথচ শুধু সম্ভব নয়, সত্য। ভালোবাসা, ভক্তি কাকে বলে, ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ তার এক প্রদীপ্ত প্রমাণ। আন্তরিক, অকপট, নির্মল ভালোবাসার এ নমুনা দেখে তাঁরা স্তম্ভিত। চোখের আড়ালে যিনি ছিলেন, তিনি কেমন করে সমগ্র চেত্‌না জুড়ে চৈতন্যময় হয়ে উঠেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এই মহান প্রেমিকের কাছে কিছু শিক্ষা নিতে চাইলেন। বিনীত কণ্ঠে বললেন, জনাব, আমাদের জন্য দোয়া করুন।

ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ বললেন, আমার ঈমান অনুরাগহীন। তবুও দোয়া করছি। প্রতি ওয়াক্ত নামাজে এই দোয়াই করে থাকি-প্রভু গো! বিশ্বাসী নর ও নারীকে আপনি ক্ষমা করুন। হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন, যদি ঈমানসহ কবরে যেতে পারেন, তাহলে দোয়া নিজেই আপনাকে খুঁজে নেবে।

ওমর (রাঃ) বললেন, আরও কিছু বলুন।

খলীফা! ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি কি আল্লাহকে চিনেছেন?

হ্যাঁ, চিনেছি।

যদি চিনে থাকেন, তাহলে অন্য কাউকে যেন না চেনেন, না জানেন। তবে তাই হবে আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। আরও কিছু বলুন।

আল্লাহ্ কি আপনাকে চেনে, জানেন?

তা তো অবশ্যই।

একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কেউ যদি আপনাকে না জানেন, তো খুব ভালো কথা।

এসব কথাবার্তার পর হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, দাঁড়ান, আপনার জন্য আমি কিছু নিয়ে আসি।

আল্লাহ্ ও রাসূল-প্রেমী এ লোকটি তখন জামার পকেট থেকে দু'টি পয়সা বের করে বললেন, উট চরিয়ে আমি এ পয়সা রোজগার করেছি। যদি আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন যে, এ পয়সা খরচ করার পরও আমি বেঁচে থাকব, তাহলে আমার আরও কিছু জিনিষপত্রের প্রয়োজন হবে। তার মানে, জীবন কখন ফুরায় কেউ জানে না। সুতরাং কোন কিছু সঞ্চয়েরও প্রশ্ন আসে না। অর্থাৎ খলীফার কাছ থেকে ওয়ায়েস কারনী রহমাতুল্লাহ কিছু নিতে অস্বীকার করলেন। পরে দুই মহান অতিথির উদ্দেশে বললেন, এখানে আসার জন্যে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন। আমি আপনাদের কম দুঃখ দিইনি। আশা করি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। এখন আপনারা বিদায় গ্রহণ করুন। রোজ কিয়ামত খুব কাছে। আল্লাহর রহমতে সেদিন আবার দেখা হবে। আর তখন আমাদের সান্নিধ্য-সংস্পর্শ দীর্ঘস্থায়ী হবে। আমি এখন আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহে খুবই ব্যস্ত। এ কথা বলে হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-কে তিনি বিদায় জানালেন। তারপর নিজেও সেখান থেকে চলে গেলেন।

বস্তুতঃ এই সাক্ষাতের পর থেকেই খলীফা ও তাঁর সঙ্গী আলী (রাঃ)-এর মাধ্যমে ওয়ায়েস কারনী রহমাতুল্লাহ-এর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই জন্য আত্ম-নিবেদিত দরবেশের গোপন-গভীর নীরব সাধনায় বিঘ্ন দেখা দিল। তখন তিনি ঐ এলাকা ত্যাগ করে কুফায় চলে যান। শোনা যায়, এর পরে হারম ইবনে জামান ছাড়া আর কারও সাথে তাঁর দেখা হয়নি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক
রহমাতুল্লাহ

প্রচণ্ড শীত। চারপাশে জমে ওঠেছে বরফের পাহাড়। এক তরুণ প্রেমিক দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের এক দেওয়ালের পাশে। এক সুন্দরী যুবতীকে একনজর দেখবেন তিনি। তাঁর রূপের ফাঁদে তিনি আটকা পড়েছেন। দাঁড়িয়ে আছেন সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত। ঠান্ডায়, বরফে তাঁর শরীর জমে গিয়েছে। তিনি অবশ। হুঁশও নেই। ফজরের আযান শুনে তাঁর মনে হল, বুঝি এশার আযান হচ্ছে।

ক্রমশঃ রাতের আঁধার সরে যায়। পূবালী সূর্যের আলো এসে পড়ল তাঁর চোখে-মুখে। এ আলো যেন পৌঁছে যায় তাঁর চেতনার ভেতরে। চমকে ওঠেন তিনি। এক যুবতীর আশায় তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন বরফের রাজত্বে, অতিবাহিত হয়েছে একটি সুদীর্ঘ শীতার্থ রাত!

আত্মধিক্কারে তিনি ক্লিষ্ট হলেন। ছিঃ ছিঃ! প্রবৃত্তির তাড়নায় একটি পুণ্যময় রজনী এইভাবে কেটে গেল? এর বদলে যদি এবাদতে নিমগ্ন হতাম!

তীব্র অনুশোচনায় তরুণ যেন নতুন হয়ে গেছেন। তাঁর নারীপ্রেম রূপান্তরিত হল আল্লাহ প্রেমে। গভীর সাধনায় তিনি মগ্ন হলেন। আর আল্লাহর অশেষ করুণায় তিনি সিদ্ধিলাভও করলেন।

এই রূপান্তরিত আলোকিত মানুষটি হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহ। সাধনাবলে তিনি জাহেরী ও বাতেনী, শরীয়ত ও তরীকতের গভীর প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানলাভ করেন। বহু অমূল্য দ্বীনী গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। তাঁর সাধনা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন হযরত সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহ ও হযরত ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ প্রমুখ বিদগ্ধ-জন। তাঁর জীবনেও প্রচুর অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। এই গ্রন্থ রচয়িতা শেখ ফরীদউদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ বলেন, হযরত ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ-এর ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি যখন তাঁর গুণকীর্তন করেছেন, তখন আমার দ্বারা তাঁর আর কতটুকু প্রশংসা করা সম্ভব?

যাই হোক, সাধনায় তিনি যে সিদ্ধিলাভ করেন, তা একটি ঘটনায় প্রমাণিত হয়ে যায়। একদিন তাঁকে খুঁজতে গিয়ে তাঁর মা দেখেন, তিনি একটি গোলাপ গাছের তলায় ঘুমাচ্ছেন। আর একটি সাপ নার্গিস গাছের ডাল দিয়ে মশা, মাছি তাড়াচ্ছে।

হযরত আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ-এর জন্ম বাগদাদের কাছাকাছি মেরু নামক স্থানে। বাগদাদে বেশ কিছুদিন জ্ঞানী-গুণীর সান্নিধ্যে থেকে তিনি মক্কায় যান। মক্কা থেকে ফিরে আসেন মেরুতে। এখানে তখন ধর্মবেত্তাদের দু'টি দল ছিল। তাঁদের সঙ্গে আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ-এর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁরা তাঁকে ভালোবাসতেন। কোন মত-দ্বন্দ্ব ঘটলে তিনি তার মীমাংসাও করে দিতেন। পরে তিনি আবার মক্কায় যান ও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর জীবন-পঞ্জী বড় বিচিত্র। তিনি এক বছর হজ্জ আদায় করতেন, পরের বছর যোগ দিতেন ধর্মযুদ্ধে এবং তারও পরবর্তী বছরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। আর তাতে যে লাভ হত, তা দান করতেন শিষ্যদের। কিছু অংশ দিয়ে গরীব-দুঃখীকে খেজুর কিনে দিতেন। খেজুর খেতে হত তাঁর সামনেই। কেননা, পরে তিনি আঁটিগুলো গুণে দেখে সংখ্যানুসারে তাদের অর্থ দান করতেন। অর্থাৎ, যে যত বেশী খেজুর খেত, সে তত বেশী টাকা পেত।

কিছু দিন তাঁর সঙ্গে ছিল একটা বাজে লোক। প্রচুর বদভ্যাস ছিল তার। সে যখন সঙ্গ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছাড়ল, তখন তিনি এই বলে কাঁদতে থাকেন লোকটি তো বিদায় হয়ে গেল, কিন্তু তার বদভ্যাস তার থেকে বিদায় হল না।

আল্লাহ্ তাঁকে অলৌকিক শক্তিও দান করেন। তাঁর প্রার্থনায় একটি অন্ধ লোক দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পায়।

একবার তিনি হজ্জে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘটনা-চক্রে তাঁর বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়ে যায়। হজ্জের আর মাত্র চারদিন বাকী। তিনি ধরে নিলেন, এবার তাঁর আর হজ্জ করা হবে না। হঠাৎ এক বৃদ্ধা এসে তাঁকে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনাকে আরাফাত পর্যন্ত পৌঁছে দেব। তিনি তাঁর সহযাত্রী হলেন। পথে কোন নদী পড়লে বৃদ্ধা তাঁকে চোখ বন্ধ করতে বলতেন। তিনি তা করতেনও। তখন মনে হত, এক হাঁটু বা এক কোমর পানির মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছেন। বৃদ্ধা তাঁকে সত্যিই আরাফাতে পৌঁছে দেন। যথারীতি হজ্জও আদায় হয়। হজ-সম্পন্ন করে বৃদ্ধা তাঁকে নিয়ে যান তাঁর এক পুত্রের কাছে। অতি ক্ষীণ, দুর্বল এই যুবকটি বসেছিলেন এক পর্বত গুহায়। অবশ্য তাঁর দেহে ছিল এক উজ্জ্বল ক্লান্তি। জননীকে দেখামাত্র তিনি ওঠে এসে পরম ভক্তি-ভরে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। আর বললেন, আমি জেনেছি, আল্লাহ্ আপনাদের এখানে পাঠিয়েছেন আমার কাফন-দাফনের জন্য। কেননা আমার মৃত্যু আসন্ন। এই কথা বলেই যুবক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ স্ব-হস্তে তাঁর দাফনকার্য শেষ করলেন আর বৃদ্ধা তাঁকে ওখানেই বিদায় দিলেন। বললেন, বাকী জীবন তিনি তাঁর পুত্রের কবরের কাছেই কাটিয়ে দিবেন। আরও বললেন, আগামীবার হজ্জ মওসুমে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না। তিনি তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানালেন হযরত আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ-কে।

একবার হজ্জে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ কিছুক্ষণের জন্য শুয়ে পড়েন হরম শরীফে। আর একটি স্বপ্ন দেখেন। একজন ফেরেশ্তা আরেকজন ফেরেশ্তাকে জিজ্ঞেস করছেন, এবার হজ্জযাত্রীর সংখ্যা কত– বলতে পার কি? তিনি বললেন, ছয় লক্ষ। কতজনের হজ্জ কবুল হয়েছে? আবারও প্রশ্ন। উত্তর হল, একজনেরও না। হযরত আবদুল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে একথা শুনে হতবাক। বললেন, কত মরু-প্রান্তর পার হয়ে কত কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে লোক হজ্জ করতে এল, আর তা সবই ব্যর্থ হল? প্রশ্নকারী ফেরেশতা বললেন, না, তা নয়। তবে ঘটনাটি শুনে নিন। দামেশক শহরে এক মুচি আলী ইবনে মোআফফকে এবার হজ্জে আসেননি বটে, কিন্তু তাঁর হজ্জ কবুল হয়েছে। আর তাঁর উসিলায় আল্লাহ্ প্রত্যেকের হজ্জ কবুল করেছেন।

এই আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে উক্ত মুচিকে দেখার জন্য হযরত আবদুল্লাহ দামেশকে গেলেন। তাঁর বাড়ীরও খোঁজ পেলেন। দরজায় ডাকাডাকি করতেই এক লোক বেরিয়ে এলেন। হযরত আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম জেনে নিয়ে বুঝলেন, ইনিই সেই লোক। তবুও জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী করেন? তিনি বললেন, আমি জুতা সেলাই করি। অতএব আর কোন সন্দেহ রইল না। তাঁর কাছে স্বপ্নের বিবরণ প্রকাশ করলেন। মুচি এবার তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম শোনামাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন। আলী ইবনে মোআফফকে বললেন, ত্রিশ বছর ধরে আমার মনে হজ্জ করার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্যই তা আর হয়ে ওঠেনি। বহু কষ্ট করে এবার তিন হাজার টাকা জোগাড় হল। হজ্জের জন্য প্রস্তুতি চলছে। হঠাৎ এক রাতে আমার গর্ভবতী স্ত্রী পাশের বাড়ি থেকে রান্না করা গোশতের গন্ধ পেয়ে তা খাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। আর ওবাড়ী থেকে কিছু গোশত আনার জন্য আমাকে সে অনুরোধ করল। স্ত্রীর অনুরোধে লজ্জা ত্যাগ করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি পাশের বাড়ীতে গিয়ে একটু গোশ্ত চাইলাম। কিন্তু গৃহকর্ত্রী বিনীত-ভাবে বললেন, এ গোশ্ত আপনাদের দেওয়া যাচ্ছে না। কেননা আপনাদের পক্ষে তা নাজায়েয। অবশ্য আমাদের কাছে বৈধ। কারণ শুনলেই বুঝতে পারবেন। গত সাত দিন ধরে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কোন খাবার জোগাড় করতে পারিনি ক্ষুধার জ্বালায় তারা মরে আর কি। শেষ পর্যন্ত একটা মৃত গাধার খোঁজ পেয়ে কিছুটা এনে তা রান্না করেছি। ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে তাই খেতে দেব।

আলী ইবনে মোআফকে বলতে থাকেন, এ কথা শুনে আমি ভীষণ ব্যথিত হলাম। পরিবারটির প্রতি সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরে গেল। আমি তখনই বাড়ীতে এসে আমার সংগৃহীত অর্থ গৃহকর্ত্রীর হাতে দিয়ে তাঁর অনাথ সন্তানদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে বললাম। আর আমার মনে হল, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই হল আমার আসল হজ্জ।

স্বপ্নে ফেরেশতাগণ যা বলাবলি করছিলেন, তার মর্ম হযরত আবদুল্লাহর কাছে এখন স্পষ্ট হয়ে গেল।

হযরত আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ-এর এক ক্রীতদাস ছিল। তার সঙ্গে চুক্তি ছিল, কাজকর্ম করার পর সে যদি তাঁকে কিছু কিছু অর্থ দিতে পারে, তাহলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। বেচারা চুক্তি পালনের চেষ্টা করত। কিন্তু একদিন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এল, সে নাকি মৃতের কাফন চুরি করে আর তা বিক্রি করে যে পয়সা পায় তা মনিবকে দেয়। এ অভিযোগে হযরত খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। আর এক রাতে ক্রীতদাস যখন বাড়ী থেকে বের হচ্ছে, তখন তিনিও খুব গোপনে তাকে অনুসরণ করলেন। সত্যিই, কবরস্থানে গিয়ে সে একটা কবর খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু কোথায় কাফন চুরি! একখানি চটের কম্বল পরে ও গলায় একটি লোহার শেকল ঝুলিয়ে সে নামাজ পড়তে শুরু করল। এ দৃশ্য দেখে আবদুল্লাহ অশ্রু-সিক্ত হলেন। আর বাড়ী না ফিরে তিনিও কবরের অদূরে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হলেন। প্রভু রইলেন বাইরে আর ভৃত্য কবরের ভেতরে। দু'টি মগ্ন হৃদয়ের উপাসনায় কেটে গেল একটি রাত।

ভোরের দিকে কবর থেকে বেরিয়ে সেটিকে ঢেকে রেখে ক্রীতদাস চলে গেল মসজিদে– ফজরের নামাজ আদায় করতে। নামাজ শেষে নিবেদিত হল তাঁর আকুল প্রার্থনা। প্রভু গো! মনিবের সঙ্গে আমি যে চুক্তি-বদ্ধ, তা আপনার অবগত। অতএব, হে করুণাময়! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে আবির্ভূত হল এক অত্যুজ্জ্বল অপার্থিব আলো। সে আলো মুহূর্তের মধ্যে মুদ্রায় রূপান্তরিত হল। ক্রীতদাস হাত পেতে তা গ্রহণ করল।

আড়াল থেকে সবই দেখছিলেন হযরত আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ। কিন্তু শেষ দৃশ্যটি দেখে সম্বিত হারালেন। পরে অবস্থা যখন স্বাভাবিক হয়ে এল, তখন দৌড়ে গিয়ে বুকে চেপে ধরলেন ক্রীতদাসকে। তার গালে-কপালে অজস্র চুম্বন এঁকে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, আমার মতো ইবনে মোবারকের সহস্র প্রাণ তোমার মতো ভৃত্যের সেবায় উৎসর্গিত হোক। আহা! তুমি যদি আমার মনিব হতে আর আমি হতাম তোমার ভৃত্য, তাহলে তাই হত উত্তম।

গুপ্ত রহস্য ফাঁস হয়ে গেল দেখে ভৃত্য বড় সংকুচিত হয়ে পড়ল। আল্লাহর দরবারে সে মোনাজাত করল, আমার যা গোপন, আপনি তা প্রকাশ করে দিলেন প্রভু। এখন আর এ পার্থিব জগতে থাকার আমার কোন ইচ্ছা নেই। আপনি তাড়াতাড়ি আপনার এ অধম বান্দাকে এখান থেকে তুলে নিন। আশ্চর্য! প্রভুর বুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ভৃত্যের শেষ নিঃশ্বাসটি শেষবারের মতো বেরিয়ে গেল। আর আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ এ ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়লেন। পরে অবশ্য ভৃত্যের পরনে যে চটের কম্বল ছিল সেটাকেই কাফন করে,

জানাযা আদায় করে তাকে কবর দিলেন। আর ঐ রাতেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন, রাসূলে কারীম (সঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সঙ্গে করে তাঁর কাছে এসে বললেন, আমার একান্ত বন্ধু ও আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিকে চটের কাফন পরিয়ে দাফন করলেন কেন?

একবার হযরত আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ সাড়ম্বরে চলেছেন কোথাও। সঙ্গে বহু সঙ্গী-সাথী। তারা তাঁকে সসম্মানে ঘিরে নিয়ে চলেছেন। যেন এক আমীর বা বাদশাহ। এ দৃশ্য দেখে মহানবীর এক বংশধর ঈর্ষান্বিত হয়ে বললেন, হে কাফেরের সন্তান! রাসূলুল্লাহর বংশধর হওয়া সত্ত্বেও আমার কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। আমার কাছে কারোর যাতায়াত নেই। আপনি কী করে মানুষের এত ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র হলেন? উত্তরে আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনার পিতার পরিত্যক্ত বিদ্যা গ্রহণ করে আমি এ সাফল্য অর্জন করেছি। আর আমার পিতার পরিত্যক্ত বস্তু অবলম্বন করে আপনি হয়েছেন অবজ্ঞায় ও ঘৃণার পাত্র।

ঐ রাতেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন, মহানবী (সাঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আপনি আমার বংশধরের প্রতি অমন মন্তব্য করলেন কেন?

আবার উক্ত বংশধরও স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর দাদাজী মহানবী বলছেন, তুমি আমার বংশধর হয়েও যথোচিত কাজ করনি। আমার রীতিনীতি যথাযথভাবে পালন করে আমার সঙ্গে যে সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তার প্রতি তোমার ঈর্ষা কেন?

দুজনেই স্বপ্ন দেখে পরস্পরের কাছে ছুটলেন ক্ষমা চেয়ে নিতে। রাস্তায় তাঁদের দেখা হয়ে গেল। বলাবাহুল্য পরস্পর পরস্পরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে ভার-মুক্ত হলেন।

আগেই বলা হয়েছে, তিনি ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। একবার দ্বৈরথ যুদ্ধ করার সময় নামাজের ওয়াক্ত এসে গেল। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বললেন। তিনি তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়ে তরবারি কোষবদ্ধ করলেন। পরে আবার যুদ্ধ শুরু হলে তাঁর মুশরিক প্রতিদ্বন্দ্বীর উপাসনার সময় হল। তিনিও পূর্ববৎ সাময়িকভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে উপাসনা শুরু করলেন। যখন তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণামে রত হলেন, তখন সেই সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর অবনমিত মস্তক দ্বিখন্ডিত করার জন্য আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ তরবারি উত্তোলন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল দৈববানী– সাবধান! এ তুমি কী করতে চলেছ? হোক সে মুশরিক। কিন্তু তুমি তার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দন্ড কি ভয়ঙ্কর তুমি জান?

আকাশবাণী শুনে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল আবদুল্লাহর। তরবারি নামিয়ে তিনি আল্লাহর ভয়ে আকুলভাবে কেঁদে ওঠলেন। এদিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধার উপাসনা শেষ। তিনি কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ ঘটনাটি তাকে খুলে বললেন। ঘটনার বিবরণ শুনে তিনিও ভীষণ জোরে চীৎকার করে থর থর করে কেঁদে ওঠলেন। বললেন, যে আল্লাহ শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে মিত্রকে বিশ্বাসভঙ্গের দন্ড দানের ধমক দেন সে আল্লাহর আনুগত্য না করে যারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে, তাদের মতো হতভাগ্য আর কেউ নেই। হে আবদুল্লাহ! আপনি আমাকে এখনই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিন।

মুহূর্তের মধ্যে রক্তপিপাসু শত্রু পরম মিত্রে পরিণত হল।

হযরত সোহায়েল রহমাতুল্লাহ নামে এক সাধক প্রায়ই হযরত আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে আসেন। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। একদিন আসর শেষে ফিরছেন। হঠাৎ আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, আমি আর কোনদিনই এখানে আসছি না। কারণ, আজ আমি আপনার বাড়ীর নিকটবর্তী হলে ছাদের ওপর থেকে আপনার দাসীরা 'সোহায়েল ওপরে আসুন' বলে আমাকে ডাকাডাকি করছিল। আমার খুব খারাপ লেগেছে।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একথা শোনামাত্র হযরত আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ উপস্থিত লোকজনকে বললেন, তোমরা এসো। সোহায়েলের জানাযা আদায় করতে হবে। হলও ঠিক তাই। কিছুক্ষণ পরেই সোহায়েল রহমাতুল্লাহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কাফন-দাফন-জানাযা যথারীতি সম্পন্ন করে কৌতুহলী লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, সোহায়েল রহমাতুল্লাহ জীবিত থাকতেই আপনি আগাম তাঁর জানাযার কথা কিভাবে ঘোষণা করলেন? তিনি বললেন, যখন তিনি ছাদের দাসীদের আহ্বানের কথা বললেন, তখনই আমি বুঝে নিয়েছিলাম, সে ডাক দাসীদের নয়, জান্নাতের হুরগণ তাঁকে ডাক দিয়েছে। কেননা আমার এখানে কোন দাসী-বাঁদী নেই।

এক পাদ্রী আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে প্রচুর এবাদত-উপাসনা করে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর পথ কেমন?

পাদ্রী বললেন, আপনি যখন বিজ্ঞ ব্যক্তি, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর পথের পরিচয় নিশ্চয় আপনার অজ্ঞাত নয়। সত্যি বলতে কী, আমি আজ অবধি আল্লাহকে চিনতে পারিনি। আর তাঁর পরিচয় না জেনেই উপাসনা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমি জানি, আপনি কেমন আরেফ! আপনার অন্তরে এখনও আল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি হয়নি। পাদ্রীর কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহ-এর মনে সেদিন থেকে আল্লাহর ভয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এক অগ্নিপূজক কাবাঘরে ঢুকতে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেল। জানা গেল, সে ছদ্মবেশে কাবা শরীফে আসে। কিন্তু সেখানে ঢুকতে গিয়েই সে অদৃশ্য শব্দ শুনতে পায়– বন্ধুর শত্রু হয়ে বন্ধুর গৃহে প্রবেশ কর কিভাবে? দৈববাণী শুনেই সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কাবা শরীফের ঘটনাটি যখন ঘটে তখন হযরত আবদুল্লাহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর তিনিই পরে পুরো ব্যাপারটি খুলে বলেন।

নিশাপুর শহর। শীতের মওসুম। হযরত আবদুল্লাহ দেখলেন, এক ভৃত্য শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে। তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার মনিবের কাছে একখানি কম্বলের কথা বল না কেন? সে অভিযোগের ভঙ্গিতে বলল, আমাকে বলতে হবে কেন? তিনি আমার অবস্থা দেখতে পান না? তার এ কথায় গভীরভাবে আলোড়িত হয় আবদুল্লাহর মন। তিনি বলতেন, কেউ তরীকত হাসিল করতে চাইলে সে যেন এই ভৃত্যের কাছে তা শিখে নেয়।

এক অগ্নি উপাসক কথা প্রসঙ্গে বললেন, জ্ঞানীগণ সেই কাজটি প্রথম দিনই করে, নির্বোধরা যা তিন দিন পরে করে। কথা খুব মূল্যবান মনে হয় হযরত আবদুল্লাহর। তিনি লোকদের বললেন, তোমরা এ কথাটি মনে রাখবে। এটি বড় উপদেশ।

হযরতের নিজস্ব উপদেশগুলোও জ্ঞান-গর্ভ ছিল। যেমন–

১. মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম কি?

তাঁর উত্তর ঃ অধিক জ্ঞান ও বুদ্ধি।

প্রশ্ন ঃ তা যদি না থাকে?

উত্তর ঃ তাহলে সৎ স্বভাববিশিষ্ট হওয়া।

প্রশ্ন ঃ যদি তাও না থাকে?

উত্তর ঃ তাহলে সৎ লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে কাজ করা।

প্রশ্ন ঃ যদি তাও না হয়?

উত্তর ঃ তাহলে চুপ করে থাকা।

প্রশ্ন ঃ যদি তাও না হয়?

উত্তর ঃ তাহলে তাড়াতাড়ি সরে যাওয়া ভালো।

২. যে ব্যক্তি আদবের গুরুত্ব বোঝে না, তার দৃষ্টান্ত হল, যারা সুন্নত আদায় করে না

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাদের থেকে ফরজ তরক হওয়ারও সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর এ ধরনের লোক কখনও মারেফত লাভ করতে সক্ষম হয় না।

৩. আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু এক পলকও তাঁর স্মরণ থেকে বিরত থাকে না।

৪. বেশী বিদ্যার্জন অপেক্ষা কম আদব শিক্ষা করা অনেক ভালো।

৫. মানুষকে এক দেরহাম কর্জে হাসানা প্রদান করা হাজার দেরহাম দান করা অপেক্ষা বেশী পুণ্যের কাজ।

৬. সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের সঙ্গে সঙ্গে কেউ যদি তাদের ধর্মীয় শিক্ষা দান করে তবে সে জিহাদের পুণ্য-প্রাপ্ত হয়।

৭. অন্তরের ব্যাধি নিরাময়ের উপায় কি?

তাঁর উত্তর ঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা ও মানুষের সাহচর্য ত্যাগ করা।

৮. ধ্যানের মাধ্যমে অন্তরের ভয় দূর-ভূতঃ হয়। মনে সান্ত্বনা আসে।

৯. পরনিন্দা-পরচর্চা যদি করতেই হয়, তাহলে সে যেন পিতামাতার নিন্দা করে। কেননা, তাহলে সন্তানের অর্জিত পুণ্যগুলো পিতামাতার আমলনামায় গণ্য হবে।

১০. এক যুবক হযরতের দরবারে এসে অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে বলল, হুযুর, আমি এমন পাপ করেছি যা লজ্জাবশতঃ খুলে বলতে পারছি না। আপনি আমাকে মুক্তির উপায় বলে দিন। হযরত বললেন, আগে কাজটা কী তা বলবে তো। তবে তো মুক্তির পথ বলে দেব। সে বলল ব্যভিচার করেছি। তিনি বললেন, আমার আশঙ্কা ছিল তুমি বুঝি কারো গীবত করেছ। কেননা গীবত হল মানুষের হক। সুতরাং যদি গীবত করা হয় এবং সে যদি তা মাফ না করে, তাহলে তা মার্জিত হবে না। আর ব্যভিচার হল আল্লাহর হক। অতএব ব্যভিচার করে যদি পরিষ্কার মনে তওবা করা হয়, তবে আল্লাহ্ তা মাফ করতে পারেন।

১১. আল্লাহর প্রতি লক্ষ্য রাখ। অর্থাৎ সর্বদা এভাবে চলবে যেন আল্লাহকে সামনে দেখছ।

১২. একদিন অতিথি এল ঘরে। কিন্তু আপ্যায়ন করার মতো কিছুই ছিল না তবুও তিনি স্ত্রীকে বললেন, আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। স্ত্রী তাঁর কথায় ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ইসলামের বিধান, যে স্ত্রী স্বামীর সৎ নির্দেশ পালন না করে, তাকে তালাক দেওয়া যায়। তিনিও স্ত্রীর মোহরানা আদায় করে তালাক দিয়ে দিলেন।

অপর দিকে এক ধর্মানুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতা শুনে এক ধনী কন্যা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। পিতামাতার কাছে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁরা খুশী হয়ে হযরত আবদুল্লাহর রহমাতুল্লাহ-এর হাতে তাঁকে সোপর্দ করেন। আর কন্যাকে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রাও দিয়ে দেন। শাদী মোবারক সম্পন্ন হলে হযরত স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহ বলছেন, আমার খুশীর জন্য তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলে। বিনিময়ে আমি তদপেক্ষা উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিলাম। কারণ, তুমি যেন দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে পার– যারা আল্লাহর খুশীর জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, আল্লাহ তার বদলা অবশ্যই দেন।

ইন্তেকাল ঃ জীবনের অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এলে তিনি তা বুঝতে পারেন। আর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। তাঁর এক ভক্ত তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁর তিনটি কন্যা আছেন। তাঁদের জন্য তিনি কী রেখে গেলেন? তিনি বললেন, আল্লাহকে রেখে গেলাম। যাদের জিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ, তাদের জন্য আমার কিছু করার কী প্রয়োজন।

শেষ মুহূর্তে চোখ খুলে ঠোঁটে হালকা হাসির আভাস এনে তিনি বললেন, পুণ্যবানদের কাজ এরূপই হওয়া চাই। কথাটি বলেই তিনি চোখ বুজলেন। আর খুললেন না।

সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহর নিকট কেমন আচরণ পেলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহ-এর কথা জিজ্ঞেস করলেন। হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ বললেন, সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি সেই দলেরই একজন যারা প্রতিদিন দু'বার আল্লাহর দরবারে হাজির হন।

হযরত
আবু আলী শাকীক বলখী
রহমাতুল্লাহ

তুরস্কের এক বিরাট মন্দির। মন্দিরে পাথরের প্রতিমা। মানুষ এ প্রতিমার উপাসনা করে। বলখ দেশের এক বণিক এসেছেন মন্দির দেখতে। বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি তুরস্কে এসেছেন। কোথায় কী আছে ঘুরে ফিরে দেখছেন। মন্দিরে এসে দেখলেন, এক পূজারী নতজানু হয়ে সাশ্রু নয়নে পাথর প্রতিমার পূজা করছেন।

বণিক চুপ করে থাকতে না পেরে তাঁকে বলেই ফেললেন, আপনার সৃষ্টিকর্তা অসীম শক্তির আধার, চিরঞ্জীব। অথচ তাঁকে ফেলে আপনি কি না প্রতিমার পূজা করছেন– যে জড় পদার্থের প্রাণ নেই, জ্ঞান নেই, কোন কিছু করার শক্তি নেই। স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি মানুষ হয়ে আপনি অনুভূতিহীন–আপনার লজ্জা হয় না?

পূজারী বললেন, মেনে নিলাম আমার এ দেবতার কোন শক্তি নেই। কিন্তু আপনার আল্লাহরই বা কী ক্ষমতা আছে শুনি? তা যদি থাকত, তাহলে রুজি-রোজগারের জন্য আপনাকে বলখ ছেড়ে তুরস্কে আসতে হত না। সেখানেই রুজির ব্যবস্থা করতে পারতেন?

পুরোহিতের কথায় বণিকের চোখ খুলে যায়। তাই তো! তিনি কোন অন্যায় বলেননি। সেদিনই তিনি তুরস্ক ত্যাগ করলেন। পথে দেখা হল এক অগ্নি-উপাসকের সঙ্গে। তাঁকেও তিনি কিছু কথা শুনিয়ে দিলেন। অগ্নিপূজক বললেন, তুমি কী কাজ কর? তিনি বললেন, ব্যবসা-বাণিজ্য।

তাহলে তুমিও তো স্বার্থের পেছনে দৌড়াচ্ছ। যা ভাগ্যে আছে, তুমি তা পাবেই, তোমার কি এ বিশ্বাস নেই?

একথা শুনে বণিক আরও সচেতন হলেন। মনে শুরু হল চিন্তা-ভাবনার গভীর আলোড়ন। আর পার্থিব বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল তাঁর মন থেকে। বণিক বৃত্তি ত্যাগ করে তিনি বলখে ফিরে এলেন।

তখন বলখের আমীর ছিলেন আলী ইবনে ঈসা। ঘটনাক্রমে তাঁর পোষা কুকুরটি চুরি যায়। আর চোর সন্দেহে আলীর অনুচরেরা অকথ্য অত্যাচার শুরু করে আলোচ্য বণিকের এক পড়শীর ওপর। আর তিনি তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। যেভাবে হোক, আমীরের কুকুর তিনি বে'র করে দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেচারাকে তিনি উদ্ধার করলেন। তারপর হাত ওঠালেন আল্লাহর দরবারে। দয়াময়! কুকুরের সন্ধান দিন। না হলে আমারও মুখরক্ষা হবে না। আমার প্রতিবেশীকেও অযথা জুলুম সহ্য করতে হবে। তবে মুখরক্ষা নিয়ে আমার তেমন ভাবনা নেই। আমি ভাবছি নির্দোষ প্রতিবেশীর কথা, দয়া করে ঐ দুর্বল দাসকে বিপন্মুক্ত করুন।

আল্লাহ্ এ প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। কুকুর চোর নিজে এসে বণিকের কাছে সেটি দিয়ে গেল। আর তিনি প্রসন্ন চিত্তে তা পৌঁছে দিলে আমীরের কাছে। আল্লাহ্র অনির্বচনীয় মহিমায় তিনি পরিপূর্ণরূপে এক আত্ম-নিবেদিত দাসে পরিণত হলেন।

এই মহিমান্বিত মানুষটি নাম হল হযরত আবু আলী শাকীক বলখী রহমাতুল্লাহ। বলখের এক মহান সাধক, বহু ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা। আল্লাহর প্রতি অন্তহীন নির্ভরতা ছিল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর একটি বিশিষ্ট গুণ। বহু জ্ঞান-তাপসের কাছ থেকে তিনি মারেফত বিদ্যা লাভ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, এক হাজার সাত' জন পীরের কাছ থেকে বিদ্যার্জন করেন। তাঁর নিজের শিষ্য সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। তাদের অন্যতম হলেন সমকালের বিখ্যাত জ্ঞান-সাধক হযরত হাতেম ইবনে আসাম রহমাতুল্লাহ। তরীকত ও হাকীকত শাস্ত্রে তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন হযরত ইব্রাহীম আদিহাম রহমাতুল্লাহ। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মন্তব্য করেন, বহু মাশায়েখের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছি, প্রচুর পুস্তকও অধ্যয়ন করেছি। আর এটুকু জেনেছি যে, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উপায় চারটি জিনিসে নিহিত। যথা ঃ (১) রুজির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা, (২) যেকোন কাজের মধ্যে সরলতা বজায় রাখা, (৩) শয়তানের সাথে শত্রুতা রাখা ও (৪) মৃত্যুর জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা।

আল্লাহর প্রতি তাঁর অপরিসীম নির্ভরতার কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি এই নির্ভরতার শিক্ষা পান সামান্য একটি ভৃত্যের কাছ থেকে। একবার বলখে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ যখন দিশেহারা তখন দেখা যায় একটি ভৃত্য দিব্যি আমোদ-আহলাদে মত্ত। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ তাকে বললেন, দেশ ধ্বংস হতে চলেছে আর তুমি আনন্দে মতোয়ারা, তোমার কি কোন চিন্তা-ভাবনা নেই? সে বলে, আমার মনিবের গোলাভরা শস্য, আমার আবার ভাবনা কি? এ কথায় তাঁর টনক নড়ে। সামান্য একজন ভৃত্য যদি তার মনিবের ওপর এতখানি নির্ভরশীল হতে পারে, তাহলে সর্বশক্তির আঁধার যিনি, বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি, সেই আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ন্যস্ত না করে থাকা যায়? ভৃত্যের কথায় আল্লাহর দরবারে তিনি নির্ভরশীলতার মোনাজাত করলেন।

তাঁর এই আল্লাহ্-নির্ভরতার একটি উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর শিষ্য হযরত হাতেম ইবনে আসাম রহমাতুল্লাহ। একবার এক জেহাদে দু'জনেই অংশগ্রহণ করেন। প্রচণ্ড লড়াই চলছে। দু'পক্ষের নিক্ষিপ্ত শরে আকাশ আচ্ছন্ন। হঠাৎ তিনি হাতেম রহমাতুল্লাহ-কে বলেন, এ পরিস্থিতিতে তুমি নিজের অবস্থা কিরূপ মনে করছ। মনে হয় তুমি স্ত্রীর সঙ্গে গত রাতের সুখ-শয়নের কথা ভাবছ। কথাটি বলেই তিনি তাঁর খেরকাটি বালিশের মতো করে তার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। রণভূমিতে আল্লাহর প্রতি চরম নির্ভরতা না থাকলে এটি সম্ভব হত না। আর সে নির্ভরতা ছিল বলেই তাঁর কোন বিপদ ঘটল না।

এক মজলিসে তিনি ভাষণ দিচ্ছেন। হঠাৎ শহরে ভীষণ শোরগোল। শত্রু কর্তৃক শহর আক্রান্ত। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ তৎক্ষণাৎ মজলিস থেকে বেরিয়ে এলেন আর বাতেনী শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুদের প্রতিহত করলেন। ঠিক এই সময় এক শিষ্য তাঁর হাতে এনে দিলেন একটি সুগন্ধি ফুল। তিনি সেটির ঘ্রাণ নিতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে কেউ বলে ওঠেন, বা রে কাণ্ড! মুসলমানের শত্রু হানা দিয়েছে শহরে, আর মুসলমানের ইমাম ফুলের সুবাস গ্রহণে মশগুল। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ বললেন, তা ঠিক। যারা মোনাফেক, তারা ফুলের সুবাস নেওয়াই দেখতে পায়, কিন্তু শত্রুর পরাজয়ের খবর রাখে না। একদিন ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা যদি মৃতের মতো হও তাহলে কবরস্থানে চলে যাও। আর যদি পাগল হয়ে থাক তাহলে পাগলাগারদে যাও। যদি কাফের হয়ে থাক তাহলে দারুল হরবে বাস কর। আর যদি বিশ্বাসী বান্দা হও তবে আল্লাহর পথ অবলম্বন কর।

শ্রমজীবী মানুষের মতো মেহনত করে তিনি তাঁর জীবিকানির্বাহ করতেন। তা দেখে একজন ধনী ব্যক্তি বললেন, কাজ করে খাচ্ছেন বলে মানুষ আপনাকে হেয় চোখে দেখছে। তার চেয়ে বরং আমি আপনাকে টাকা দিই। আপনি তা ইচ্ছামতো খরচ করুন। তিনি বললেন, যদি পাঁচটি জিনিসের ভয় না থাকত, তাহলে আপনার প্রস্তাবটি মেনে নেওয়া যেত। যেমন–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১) আমাকে দান করলে আপনার টাকা কমে যাবে।

(২) আমার কাছ থেকে টাকা চুরিও যেতে পারে।

(৩) হতে পারে আমাকে টাকা দেওয়ার পর আপনার মনে কষ্ট হবে।

(৪) এমনও হতে পারে, আমার কোন ত্রুটি হলে আপনি টাকা ফেরত নেবার চেষ্টা করবেন।

(৫) মৃত্যুর পর আমি যে খালি হাত সে খালি হাতই হয়ে যাব।

এক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি এবার হজ্জযাত্রার ইচ্ছে করছি। আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বললেন, আপনার পাথেয় আছে তো?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার চারটি জিনিস আছে। যথা–

(১) আমি কাউকেই আল্লাহর চেয়ে বেশী দাতা মনে করি না।

(২) আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার জন্য নির্দিষ্ট রুজিতে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না।

(৩) আল্লাহ্ সর্বস্থলে বিদ্যমান।

(৪) আল্লাহ্ আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল।

তাঁর কথা শুনে হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, আপনার সম্বল আছে। আপনি হজ্জে যেতে পারেন। আশা করি, আল্লাহ আপনার বাসনা পূর্ণ করবেন।

একবার হজ্জযাত্রার সময় তিনি বাগদাদে আসেন। বাগদাদের খলিফা তখন হারুনুর রশীদ। তাঁর আগমনবার্তা পেয়ে তিনি পরিপূর্ণ ভক্তি ও বিনয় সহকারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং কিছু মূল্যবান উপদেশ প্রার্থনা করেন। তিনি বললেন, আপনি মনে করেন, আপনি খোলাফায়ে রাশেদীনের উত্তরাধিকারী। আল্লাহ্ পাক আপনার বিবেক, সততা ও ইনসাফ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

আল্লাহ্ আপনাকে তরবারি, বেত্র-দণ্ড ও ধন-সম্পদ এজন্য দিয়েছেন যে, আপনি ধন-সম্পদ দ্বারা দ্বীন-দুঃখীদের সাহায্য করবেন। শরীয়তের বিধান যারা মানে না, বেত্র-দন্ডের দ্বারা তাদের পথে আনবেন। যারা অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটায়, অস্ত্র সে ঘাতকের শিরচ্ছেদ করবেন। আপনি যদি এ দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে রোজ কিয়ামতে আপনাকে জাহান্নামীদের নেতা বানিয়ে দেওয়া হবে। আপনার উপমা সমুদ্র। আর আপনার অমাত্যবর্গ ও রাজকর্মচারীরা হলেন তা থেকে বর্হিগত শাখানদী। অতএব ন্যায়নিষ্ঠ শাসনই আপনার অবশ্য কর্তব্য, যাতে আপনার কর্মচারীরাও ন্যায়ানুবর্তী হয়।

তারপর তিনি খলীফা হারুনুর রশীদকে জিজ্ঞেস করলেন, মনে করুন, আপনি রয়েছেন ধু-ধু এক মরুর তাপদগ্ধ মধ্যাহ্নে, পিপাসার্ত হয়ে ছটফট করছেন, অথচ কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই। তখন যদি কেউ এসে আপনাকে বলে, আপনার অর্ধেক রাজত্ব লিখে দিলে এক গ্লাস পানি দিতে পারি, তখন প্রাণ রক্ষার তাগিদে আপনি কি তা দিতে রাজি হবেন? খলীফা বললেন, নিশ্চয়ই। তখন আবার প্রশ্নঃ ঐ পানি পান করার পর আপনার প্রস্রাব যদি বন্ধ হয়ে যায়, প্রবল বেগ থাকা সত্ত্বেও প্রস্রাব যদি নির্গত না হয়, তখন এ ক্লেশ দূর করে দেওয়ার বিনিময়ে যদি কোন চিকিৎসক বলেন যে, আপনার রাজ্যের বাকী অর্ধাংশ দিতে হবে, তখন কি আপনি রাজি হবেন?

খলীফা আবারও উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই। কেননা, ধন-মান-রাজ্য সব কিছুর চেয়ে প্রাণের মূল্য অনেক বেশী। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ এবার বললেন, তাহলেই বুঝুন, যে রাজ্য, সম্পদ পানির মূল্যে বিক্রি হয়ে যায়। তা কিছুতেই গৌরবের বস্তু নয়।

তাঁর এ কথা শুনে খলীফা হারুনুর রশীদ অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন। তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ আবার মক্কায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চলে গেলেন। সেখানে তাঁকে ঘিরে অসংখ্য মানুষের ভিড়। তিনি তাদের বললেন, এখানে রুজির সন্ধান করা নির্বুদ্ধিতা। মক্কায় তখন অবস্থান করছেন হযরত ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি এখানে জীবিকার ব্যাপারে কী করেন? তিনি উত্তর দেন, খাবার পেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না পেলে ধৈর্য্যধারণ করি।

একথা শুনে শাকীক রহমাতুল্লাহ বললেন, কুকুরগুলির অবস্থাও অনুরূপ। খাবার পেলে তারা লেজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানায়। না পেলে ধৈর্য্যধারণ করে। এবার প্রশ্ন করলেন হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ– এ ব্যাপারে আপনি কি করেন? তিনি জবাব দিলেন, আমার হাতে কিছু এলে ধৈর্যধারণ করি।

তাঁর উত্তর শুনে হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ স্বস্নেহে তাঁর মাথায় চুমু দিয়ে বললেন, আপনি আমার গুরু।

মক্কা থেকে তিনি আবার ফিরলেন বাগদাদে। বাগদাদের এক জনসভায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন, আমার এ বিদেশযাত্রায় আমি চার দাং (চব্বিশ রতি) রূপা রেখেছিলাম। তা এখনও আমার কাছে আছে। একথা শুনে এক তরুণ বলল, হুযুর! আপনি যখন আপনার সঙ্গে ঐ রূপা নেন তখন কি আল্লাহ ছিলেন না? না, তাঁর ওপর আপনার আস্থা ছিল না? তরুণের কথা শুনে তিনি বিমর্ষ হলেন। বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। বলেই বক্তৃতা মঞ্চ থেকে নেমে এলেন।

এক বৃদ্ধ এসে একদিন বললেন, আমি বহু পাপ করেছি। আমাকে তওবা করিয়ে দিন। তিনি বললেন, আপনি বড় দেরী করে ফেলেছেন। আগে এলেন না কেন? বৃদ্ধ বললেন, না আমি তাড়াতাড়িই এসেছি। মৃত্যুর আগে যে তওবা করতে আসে, সে কি তাড়াতাড়ি এল না?

বৃদ্ধের কথা বেশ অর্থবহ ও যুক্তিপূর্ণ। হযরত শাকীক রহমাতুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, আপনি তাড়াতাড়ি এসেছেন। আর সত্য কথাই বলেছেন।

তাঁর অমূল্য উপদেশসমূহ ঃ

১. তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম কেউ বলছে, যে ব্যক্তি রুজির ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার স্বভাব উত্তম হয়। এবাদতে তার প্রেরণা আসে।

২. বিপন্ন হয়ে চীৎকার করে যে অস্থির হয়, সে যেন তীর-ধনুক নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

৩. উপাসনার আসল বস্তু হল আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর রহমতের আশা করা ও তাঁর ওপর বিশ্বাস বজায় রাখা।

৪. যার সঙ্গে তিনটি বস্তু নেই সে জাহান্নাম থেকে রেহাই পাবে না। সেগুলো হল– (১) শান্তি, (২) ভয়, (৩) ব্যাকুলতা।

৫. তিনটি বস্তু সাধকগণের সাথী। যথা– (১) মনের স্বাধীনতা, (২) হিসাব-নিকাশে অপরিপক্কতা ও (৩) হৃদয়ে প্রশান্তি বা সুখ।

৬. মৃত্যুর জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কেননা, মৃত্যু হাজির হবেই। আর তা হাজির হলে কখনও ফিরে যাবে না।

৭. মানুষের ধর্মনিষ্ঠা তিনটি বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। যেমন– (১) ধর্মীয় আদেশ ও নিষেধ দ্বারা, (২) ধর্মীয় ও বৈষয়িক কথাবার্তা দ্বারা, (৩) ধর্মের সঙ্গে বেশী সম্পর্ক না দুনিয়ার সঙ্গে– তার দ্বারা।

৮. প্রায় সাতশ' পণ্ডিতের কাছে প্রশ্ন করে দেখেছি যে– (১) জ্ঞানী কে? (২) ধনী কে? (৩) দরবেশ কে? ও (৪) কৃপণ কে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁরা একই জবাব দিয়েছেন– (১) যে ব্যক্তি দুনিয়ার সঙ্গে প্রেম করে না, দুনিয়াদারীর লোভে পড়ে না, প্রতারিত হয়, সেই জ্ঞানী। (২) যে আল্লাহর ভাগ-বাঁটোয়ারায় খুশী, সেই ধনী। (৩) যার অন্তরে বেশী ধন লাভের আকাঙ্খা নেই, সেই দরবেশ। (৪) যে আল্লাহর মালপত্রের হক আদায় করে না সেই কৃপন।

হযরত
ইব্রাহীম আদহাম
রহমাতুল্লাহ

মহা-প্রতাপশালী বাদশাহর দাপটে পৃথিবী কম্পমান। প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী তিনি। শান-শওকতে ভরপুর। যখন রাস্তা দিয়ে চলেন, তখন তাঁর অগ্রভাগে চলে স্বর্ণঢালধারী চল্লিশ জন অশ্বারোহী। পশ্চাদ্ভাগে আরও চল্লিশ জন দেহরক্ষী।

রাত্রি গভীর। নিস্তব্ধ পৃথিবী। বাদশাহ কিন্তু নিদ্রিত নন। এবাদতে মগ্ন। হারেমের সুবর্ণ পালঙ্গে, সুকোমল শয্যায় তিনি ধ্যানরত। হঠাৎ কাছে কোথাও কার যেন পদশব্দ শুনলেন তিনি। মনে হল, ছাদের ওপর দিয়ে কে যেন ক্রস্ত-পায়ে চলে গেল। কে, কে ও? তিনি জিজ্ঞেস করেন।

উত্তর এল, আমি তোমর এক বন্ধু। আমার একটি উট হারিয়েছে। তাই খুঁজছি। বন্ধু? উট হারিয়েছে বলে সেটা সে খুঁজতে এসেছে রাজপ্রাসাদের ছাদের ওপর? বিরক্ত হয়ে তিনি তাকে মূর্খ বলে ধমক দেন। কিন্তু ও-পক্ষ থেকে জবাব আসে, আমার এ কাজটিকে তুমি মূর্খতা বলছ। কিন্তু তুমি কি করছ? সোনার পালঙ্গে শুয়ে, সুবর্ণ জরির মহার্ঘ্য পোশাকে ভূষিত হয়ে আল্লাহর ধ্যান করছ। তোমার কাজটি কি এর চেয়েও বোকামি নয়?

চেতনার ওপর চাবুক এসে পড়ে। শুরু হয়ে যায় এক অভূতপূর্ব আলোড়ন। অনুশোচনায় তিনি দগ্ধ হতে থাকেন। অদৃশ্য বন্ধু রাতের ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেড়ে নিয়ে গেল মহাশক্তির শাহেনশাহর চোখের ঘুম। দারুণ দুশ্চিন্তায় রাত ভোর হয়ে এল।

পরদিন। পাত্রমিত্র-পরিবৃত অবস্থায় রাজদরবারে তিনি উপবিষ্ট। এমন সময় মহাতেজস্বীঃ এক পুরুষ দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন। বাদশাহ বললেন, কে আপনি? কি চান? আমি এক মুসাফির। এ মুসাফিরখানায় কিছুক্ষন বিশ্রাম নিতে চাই। কিন্তু এটা তো মুসাফিরখানা নয়। আমার বাসভবন। তাই?

আপনার আগে এখানে কে বাস করতেন?

আমার পিতা।

তাঁর আগে?

আমার পিতামহ।

তাঁর আগে?

আমার প্রপিতামহ।

তাঁরা সব কোথায়?

তাঁরা সব চলে গেছেন।

এখানে যখন একজন আসে আর চলে যায়, তখনও আপনি এটিকে মুসাফিরখানা বলবেন না? এ যদি স্থায়ী বাসভবন হত, তাহলে তাঁরা আজ এখানে বাস করতেন। বলে সেই তেজস্বী পুরুষ যেমন এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। তাঁকে তখন কেউ যেমন বাধা দেয়নি,তেমনি এখনও বাধা পেলেন না। দরবার কক্ষ ছেড়ে সদর্পে চলে গেলেন।

ঝড় উঠেছিল মনের আকাশে। এখন তা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে প্রবল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঝটিকায় পরিণত হল। সিংহাসন থেকে বাদশাহ নেমে এলেন। আর ছুটে গেলেন অচেনা আগন্তুকের পেছনে পেছনে। অনেকখানি পথ অতিক্রম করে তিনি তাঁর নাগাল পেলেন। শঙ্কিত বক্ষে শুধালেন, আপনি কে আলোকময়। প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে নিনাদিত হল, আমি আল্লাহর দাস খিজির।

আত্মপরিচয় দান করেই আগন্তুক অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ হল না। গভীর অতৃপ্তি আর উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ নিয়ে শাহেনশাহ ফিরে এলেন। আর এ অবস্থা তাঁর সর্বস্ব দখল করল। রুটিন মাফিক দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করেন ঠিকই, কিন্তু মন তাতে থাকে না। অশান্তি আর অস্থিরতা তাঁকে অবিরাম কুরে কুরে খায়।

এ মনোবিকলনের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি মৃগয়ায় গেলেন। বিজন বাসাতে যদি যন্ত্রণা ভেসে যায়। পাখীর ডানায় ভর করে যদি উড়ে যায় মনের অশান্তি।

শিকারে এসে হঠাৎ তিনি দল ছুট হলেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ একা নিবিড় নির্জনে নিঃসঙ্গ। হঠাৎ শব্দ এল কানে ইব্রাহীম! এখনও সাবধান হও। মুত্যু আসার আগেই জেগে ওঠ।

একবার নয় এ শব্দ বারবার উচ্চারিত হল। হঠাৎ চোখে পড়ল এক হরিণ। তাকে তাক করে তীর যে মুহূর্তে ছুঁড়তে যাবেন তখন হরিণ বলে উঠল, ইব্রাহীম, তুমি আমাকে শিকার করতে পারবে না। বরং তোমাকে শিকার করার জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে। তুমি ভ্রান্ত। এসব কাজের জন্যই কি দুনিয়ায় এসেছ? বাদশাহ হতবাক। শিকার করা হল না। তিনি ফিরলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! যে ঘোড়ার ওপর তিনি বসে রয়েছেন, তার জিন থেকেও হরিণের কথার প্রতিধ্বনি উথতি হচ্ছে। সেই সতর্কতা সূচক ধ্বনি-সঙ্কেত বিদুৎ তরঙ্গের মত তাঁর স্নায়ুকোষে ছড়িয়ে গেল। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। দু'চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রুর উষ্ণ-প্রবাহ। সিক্ত হল বসন-ভূষণ, সিক্ত হল তাঁর প্রিয় অশ্ব।

একটি মুহূর্ত এসে তাঁর এতদিনের লালিত জীবনকে আমূল বদলে দিল। স্থির করলেন, আর লোকালয়ে ফিরবেন না। আর বাদশাহী নয়, তখত নয়। এবার শুরু হোক তাঁর ধ্যান-মৌন জীবন।

কিছুদূর গিয়ে তিনি চটের বস্ত্র পরিহিত এক রাখালের দেখা পেলেন। তার সঙ্গে বদলে নিলেন পরিচ্ছদ-পোশাক। সোনার অঙ্গ থেকে খসে গেল রাজভূষণ। বলখের বিখ্যাত বাদশাহ মুহূর্তের মধ্যে হয়ে গেলেন এক দীনাতিদীন ফকীর। শুরু হল তাঁর আরণ্য জীবন। শুরু হল ধ্যান। এখন থেকে তওবা আর ক্রন্দনই হল তাঁর একমাত্র অবলম্বন।

কে এই মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ, যিনি মহাসাধকে রূপান্তরিত হলেন? বলখের সিংহাসন ছেড়ে আসন নিলেন মানুষের বুকের তলায়? তিনিই হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রহমাতুল্লাহ

নিবিড় নির্জনে পরিবর্তিত মানুষটি। অতঃপর ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন এক পুলের কাছে। দেখলেন একটি অন্ধ লোক পুল পার হচ্ছে। টলমল করছিল সে। হয়তো পড়েই যেত। কিন্তু ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ বলে উঠলেন, ইয়া আল্লাহ্! একে রক্ষা করুন। কি আশ্চর্য, বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, লোকটি শূন্যে বিচরণ করছে। আরও আলোড়িত হল তাঁর হৃদয়-মন।

তারপর এলেন নিশাপুরে। আশ্রয় নিলেন এক অন্ধকার গুহায়। দেখতে দেখতে ন'বছর পার হয়ে গেল আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে। এবাদত মানে সে এক কঠিন তপস্যা। প্রতি শুক্রবার গুহা থেকে বের হয়ে তিনি বনে-জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন নিশাপুরের বাজারে। তাতে যে আয় হত, তা দিয়ে রুটি কিনতেন। সে রুটির

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্ধেক দান করতেন গরীব-দুঃখীকে, আর অর্ধেক নিজে খেতেন। খুবই সামান্য খাবার। তাই খেয়ে জুমআর নামাজ পড়ে আবার ঢুকতেন গুহায়। বেরিয়ে আসতেন পরবর্তী শুক্রবারে।

শীতের এক গভীর রাত। গুহার মধ্যে নামাজে নিমগ্ন তিনি। প্রবল শীত। তার ওপর তুষারপাত। হাঁড়-কাঁপুনে ঠাণ্ডায় একরকম জমে গেলেন তিনি। প্রচণ্ড সর্দি। অবস্থা খুবই ঘোলাটে। তবুও এবাদতে কোন ব্যতিক্রম নেই, শৈথিল্য নেই। দেহ অবশ। মাথা ভারী হয়ে উঠল পাহাড় সমান। হয়তো এবাদতে এবার বিঘ্ন ঘটবে। আর হয়তো পারবেন না। একটু আগুনের যদি ব্যবস্থা হত এ সময়, তাহলে কী চমৎকারই না হত। এসব কথা ভাবছেন, মনে হল কে যেন তাঁকে একটি চামড়ার তৈরী গরম পোশাক পরিয়ে দিল। গরম হয়ে উঠল গা-গতর। পরম নিশ্চিন্তে এবাদতে রাত কেটে গেল তাঁর। পরদিন সকালে দেখলেন, গরম পোশাক নয়, তাঁকে জড়িয়ে আছে এক বৃহৎ অজগর। বলাবাহুল্য তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার হল। আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করলেন, দয়াময়, যাকে আমি আপনার ভীষণ গজবস্বরূপ মনে করি, তাকেই আপনি আপনার রহমতস্বরূপ নামিয়ে দিলেন। আপনার কুদরত বোঝা ভার। ধন্য আপনার কারিগরি। দেখতে দেখতে মাথা নিচু করে অজগর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হযরত ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ –এবাদত -বন্দেগীর কথা ক্রমশ ঃ লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে মানুষ ছুটে এল গুহাবাসীকে দেখতে। গভীর অরণ্য জনারণ্যে পরিণত হল। ফলে গুহা ত্যাগ করে তিনি মক্কায় চলে গেলেন।

শোনা যায়, পরিত্যক্ত গুহাটি দেখতে এসেছিলেন অন্য এক দরবেশ হযরত আবু সাঈদ রহমাতুল্লাহ। নিছক কৌতূহলবশেই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু এসে অবাক হয়ে গেলেন। গুহার মধ্যে অপূর্ব এক সু গন্ধ ঘুরপাক খাচ্ছে। মৃগনাভির চেয়েও যা উত্তম। সে এক জান্নাতী সুবাস -যার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা করা চলে না। বনে অবস্থানকালে এক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁকে ইসমে আজম অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাকের মহান শ্রেষ্ঠ নাম শিক্ষা দেন বলে শোনা যায়। ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি হলেন হযরত খিজির রহমাতুল্লাহ– এর ভ্রাতা ইলিয়াস। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে হযরত খিজির রহমাতুল্লাহ কথা প্রসঙ্গে এ কথা বলেন। দু'জনের মধ্যে নানা কথাবার্তা হয়। কথিত আছে, সেদিনই তিনি তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আর এই সাধনাপথেই মারেফাতের জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য–লাভে সক্ষম হন।

তাঁর মক্কা পরিভ্রমনের কাহিনীও বেশ চমকপ্রদ। মক্কার পথে ইরাক সীমান্তে যাতুল এরকে তিনি সত্তরজন দরবেশের দেখা পান। একজন মাত্র জীবিত। আর সবাই মৃত-রক্তাক্ত অবস্থায় শায়িত। যিনি জীবতি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ তাঁরই কাছে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলেন। তিনি অবশ্য প্রথমে তাঁকে সদুপদেশ দিলেন। যেমন, কেবলমাত্র পানিকেই জীবনের অবলম্বন কর। আল্লাহ্‌ থেকে দূরে সরে যাবে না। সরে গেলে তাঁর রহমত থেকেও সরে যাবে। আবার খুব বেশী কাছাকাছি হয়ো না। ক্লান্তি আসবে। অপরাধ করে অশান্তি সৃষ্টি করা মোটেই উচিত নয়। হত্যাকারী কপট বন্ধুদের থেকে সাবধান– ইত্যাদি। পরে ঘটনার বিবরণ দিলেন। বললেন, একটি সংসার বিবাগী দরবেশ দল আল্লাহর ওপর নির্ভর করেই তাঁর পথে চলছিলেন। তাঁরা স্থির করেন, কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে ভয় করবেন না। তিনি ছাড়া আর কারও ওপর নির্ভর করবেন না। তো, এই জঙ্গল পার হয়ে কাবা শরীফে পৌছেই তাঁরা হযরত খিজির (অঃ)-এর দেখা পান। তাঁকে সালাম জানিয়ে সানন্দে তাঁরা হযরত খিজির (অঃ)–এর দেখা পান। তাঁকে সালাম জানিয়ে সানন্দে তাঁরা বলে উঠলেন, আল্লাহকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধন্যবাদ, আমাদের পরিশ্রম সার্থক, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ। ধন্যবাদ আল্লাহকে যেম এমন মহান ব্যক্তি আমাদের অভ্যর্থনার এসেছেন। ঠিক তখনই তাঁরা আসমানী শব্দ শুনলেন, রে ভণ্ডের দল, আমার সঙ্গে তোমাদের কি এই প্রতিজ্ঞা ছিল? আমাকে ভুলে তোমরা কি এবার অন্যের সাথে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হলে? যাও, এ পররাধে আমি তোমাদের খতম করে ফেলব। হলও ঠিক তাই। ঐ সেই প্রেম-দগ্ধ শায়িত ব্যক্তিগণ, জীবিত ব্যক্তি হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ–কে দেখালেন। বললেন, খুব সাবধানে এগিয়ে যাও। আর তা না হলে বিপদসঙ্কুল পথ থেকে এখনই প্রত্যাবর্তন কর।

হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ তাঁর কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আপনি কিভাবে রক্ষা পেলেন? তিনি বললেন, এরা অবশ্য সবাই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। আর আমি এঁদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করছিলাম। আমি তখনও সিদ্ধি লাভ করিনি। বিশুদ্ধ প্রেমিক হবার চেষ্টায় ছিলাম। বলতে বলতে হঠাৎ তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

এক নতুন অভিজ্ঞতা হল আদহাম রহমাতুল্লাহ-এর। আরও গভীর সাধনায় ডুবে গেলেন। কেবল এবাদত বন্দেগী আর ক্রন্দন- এই হল তাঁর পথ চলার পদ্ধতি। একদিন নয়, একটানা চল্লিশ বছর ধরে তিনি এবাদত আর ক্রন্দন করতে করতে মক্কার পথে অগ্রসর হলেন। তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে এলেন মক্কার অনেক দরবেশ। কিন্তু তিনি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা পৌঁছে গেলেন মক্কার সন্নিকটে। আবার ওদিক থেকে দরবেশগণের এক সেবক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, অদূরবর্তী কাফেলায় কী ইব্রাহীম আদহাম আছেন?

ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ বললেন, ঐ অবাধ্য লোকটির কাছে তোমার কাজ কি? তাঁর কথায় রেগে গিয়ে সেবক তাঁকে এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দেয়। তুমি এমন এক সাধককে অবাধ্য বলছ? আসলে তুমিই অবাধ্য।

ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি তো বলছি, আমি অবাধ্য। এই বলে তিনি কিছুটা দূরে সরে গেলেন। তারপর নিজেকেই বলতে থাকেন, তুমি আশা করেছিলে যে, মক্কার দরবেশগণ তোমাকে স্বাগতম জানাবে। এবার যোগ্য শাস্তি পেলে তো। আল্লাহকে ধন্যবাদ, তুমি যেমনটি আশা করেছিলে তেমন ফলই পেলে।

পরে ঐ খাদেম অবশ্য তাঁকে চিনতে পেরে ক্ষমা চেয়ে নেন।

মক্কায় পৌঁছে তিনি স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস শুরু করেন। বহু লোক তাঁর কাছে দীক্ষা নেয়। জীবিকার জন্য তিনি বনে-জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতেন। কখনও কখনও শাক-সবজিও বিক্রি করতেন। রাখালের কাজও করতেন।

বলখ ছেড়ে আসার সময় তাঁর স্ত্রী ও এক শিশুপুত্র বর্তমান ছিল। বড় হয়ে ছেলেটি বাপের কথা জিজ্ঞেস করেন। মা তাঁকে সব কথা খুলে বলেন। তিনি যে এখন মক্কাবাসী তা-ও তাঁকে জানান। মায়ের অনুমতি নিয়ে পিতার সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে চার হাজার হজ্জযাত্রীর যাবতীয় খরচ বহন করে, হজ্জযাত্রী ও জননীসহ তিনি একদিন এসে গেলেন মক্কায়। হরম শরীফে দরবেশী পোশাক পরিহিত লোকজনদের কাছে পিতার কথা জিজ্ঞেস করেন। তাঁরা জানালেন, তিনিই তাঁদের দীক্ষাগুরু। এখন তিনি বনে গেছেন কাঠ কাটতে। সেগুলি বিক্রি করে আমাদের জন্য রুটি কিনবেন।

পিতার কথা শুনে পুত্র ছুটে যান বনের দিকে। দেখলেন একটা বুড়ো মানুষ এক বোঝা কাঠ নিয়ে বাজারে চলেছেন। তাঁকেই তাঁর পিতা ভেবে তিনি তাঁর পিছু নিলেন। কান্নায় বুক ভেসে গেল তাঁর। বাজারে গিয়ে বৃদ্ধ এই বলে কাঠ বেচতে লাগলেন; হালাল জিনিসের বদলে কে হালাল জিনিস কিনতে চায়? তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক ব্যক্তি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাঠগুলি কিনে নিয়ে তার বদলে কয়েকখানি রুটি দিল। আর রুটি এসে তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। তারপর নামাজ আদায় করে সবাই মিলে খেলেন।

আদহাম পুত্র সব দেখলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় দিলেন না। সশিস্য আদহাম রহমাতুল্লাহ যখন কাবা ঘর তওয়াফ করছিলেন, তখন তিনিও কাবা প্রদক্ষিণ শুরু করলেন। একবার মুখোমুখি হলেন দু'জনে। পিতার চোখ পড়ল পুত্রের চোখে। তিনি অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কাজটি তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। শিষ্যগণ অবাক হলেন।

তওয়াফ শেষ হলে শিষ্যরা জিজ্ঞেস করেন আপনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, শ্মশ্রুহীন যুবক ও অপরিচিতা নারীর দিকে চোখ তুলে তাকাবে না। অথচ আপনি ঐ ধরনের এক যুবকের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিলেন। এর কারণ কি?

তিনি বললেন, বলখ ছেড়ে আসার সময় আমি আমার এক দুগ্ধপোষ্য শিশুকে রেখে এসেছিলাম। মনে হল যুবকটি বোধহয় আমার সেই শিশু পুত্র।

তাঁর কথাটি শিষ্যদের মাথায় রইল। পরদিন একজন মুরীদ বলখ থেকে আগত হজ্জযাত্রীদের তাঁবুগুলি খুঁজতে শুরু করলেন। এক রেশমী কাপড়ের তাঁবুর ভেতরে তিনি তরুণকে দেখলেন। দামী আসনে বসে তিনি একমনে পবিত্র কোরআন পাঠ করছেন। তাঁকে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে তরুণ তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমি একটা জিনিস জানতে এসেছি। বলুন তো আপনি কার পুত্র? তরুণ কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমি আমার পিতাকে দেখিনি। তবে গতকাল যে বৃদ্ধ লোকটিকে আমি কাঠের বোঝা নিয়ে যেতে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে তিনিই আমার পিতা। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলে হয়তো আমার সংশয় দূর হত। তাঁর নাম ইব্রাহীম আদহাম। মুরীদ বললেনম আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

তরুণ পুত্রকে তিনি নিয়ে এলেন হয়ত আদহাম রহমাতুল্লাহ-এর কাছে।

আল্লাহর অশেষ ইচ্ছায় দীর্ঘ দিন পর পিতা- পুত্রে মিলন ঘটল পবিত্র মক্কা শরীফে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বিপুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন। যেন আকাশ ও পৃথিবী প্রবল কাঁন্নায় উথলে উঠল। এক সময় তাঁরা সংজ্ঞা হারালেন। জ্ঞান ফিরে এলে হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ পুত্রকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন্ ধর্ম পালন করছ বাপ?

পুত্র বলেন, আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারী।

পবিত্র কোরআন শিখেছ?

কি আব্বা।

কিছু ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছ কি?

জ্বি। আল্লার রহমতে তাও করেছি।

আলহামদু লিল্লাহ ! খুব খুশী হলেন হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ। এবার বিদায় নেবার পালা । হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ এবার তাঁর আপন বলয়ে ফিরতে চাইলেন। কিন্তু বাধা এল পুত্র ও অশ্রুমতী স্ত্রীর তরফ থেকে। তখন আকাশের দিকে চোখ তুলে তাপস বললেন, আল্লাহ্ গো আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

তার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ঘটে গেল ঘটনাটি। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন হযরতের প্রিয়তম পুত্র। আর উঠলেন না। নিঃশ্বাস শেষবারের মত বেরিয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই বিমূঢ় হয়ে গেলেন। শিষ্যরা বললেন এ কি হল হুজর ! তিনি জবাব দিলেন, আমি যখন পুত্র দর্শনে পাগল হয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিলাম তখন আমার কাছে এক দৈববাণী আসে ইব্রাহীম, তুমি না আমার বন্ধুত্বের দাবী কর। কিন্তু এখন দেখছি, আমার ভালোবাসার সঙ্গে অন্যকেও হৃদয়ে স্থান দিয়েছ। তুমি তোমার শিষ্যদের উপদেশ দাও স্ত্রী পুত্র কণ্যার প্রেমে আবদ্ধ হবে না। অথচ তুমি নিজেই তাদের আকর্ষণে অস্থির। ঐ বাণী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুনে আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাই, প্রভু গো, হয় আমাকে না হয় আমার পুত্রকে আপনার দরবারে তুলে নিন। আল্লাহ্ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। পুত্রের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হল।

মনে প্রশ্ন আসে, হযরত ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ–এর মত মহান সাধক নির্দোষ পুত্রের মৃত্যু কামনা করলেন? তখন অন্য জ্যোতিস্ক- হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা মনে পড়ে। প্রিয়তম প্রভুর নির্দেশ পালনে, প্রভুর সন্তোষ বিধানে তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্রের গলায় ধারালো ছুরি বসিয়েছিলেন। আল্লাহর পথের পথিক যাঁরা, তাঁরা কি কখনও মানবিক বা স্নায়ুবিক দুর্বলতার শিকার হন?

হযরত ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ- এর বড় ইচ্ছা রাত্রে কাবা গৃহে একান্তে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করবেন। একদিন অপূর্ব সুযোগও এসে গেল। রাতে তিনি ছাড়া কাবা ঘরে কোন জনপ্রাণী ছিল না। আর এই সুযোগ হাতছাড়া হতে না দিয়ে তিনিও পবিত্র গৃহে হাত রেখে নিজের পাপের জন্য তওবা করলেন। আর আল্লাহর দরবারে মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হল অদৃশ্য বাণী ঃ ইব্রাহীম, তোমার মত সমগ্র সৃষ্টি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এখনই যদি তোমাকে ক্ষমা করে দিই, তাহলে রোজ- কিয়ামতে আমার ক্ষমাগুণটি কিভাবে প্রকাশ করব?

প্রভু গো, অন্ততঃ আমাকে মাফ করে দিন। ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ কাতরভাবে বললেন।

উত্তর এলঃ তুমি নিজের জন্য প্রার্থনা না করে অন্যের জন্য কর। তোমার পক্ষে তাই হবে শোভন ও সুন্দর। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়জনের কাছে কী চান, এ ঘটনায় তা স্পষ্ট হয়ে যায়। শুধু নিজের মুক্তি নয় মানুষের মুক্তির জন্য আল্লাহর দাসগণ সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকত।

আপনি রাজ্যত্যাগ করলেন কেন? তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, একদিন রাজসিংহাসনে বসে আছি। সামনে ছিল একখানি সুদৃশ্য আয়না। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তিনি কবরের মধ্যে রয়েছেন। কোন সঙ্গী সাথী নেই, একা। সঙ্গে পাথেয়ও কিছু নেই। বিচারকক্ষে বিচারক বসে আছেন। কিন্তু নিজের পক্ষ অবলম্বন করার মত কোন কাগজ-পত্র তাঁর কাছে নেই। এই দৃশ্য দেখে তিনি চিরদিনের মত সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করেন।

খোরাসান ত্যাগ করলেন কেন? আবারও প্রশ্ন হল। তাঁর জবাব. ভিড়ের জন্য। সবাই আসত তাঁর খোঁজ-খবর নিতে। তিনি গতকাল কেমন ছিলেন, আজ কেমন আছেন, এসব জানতে চাইত।

আপনি স্ত্রী গ্রহণ করেন না কেন?

স্ত্রী কি এই উদ্দেশ্যে স্বামী গ্রহণ করে যে, সে অন্ন বস্ত্র-হীন ও খালি পায়ে দিন কাটবে? আমার যা অবস্থা তাতে একজন স্ত্রীলোককে কি করে প্রতারণা ও ফাঁকির বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারি?

এক দরবেশকে পর নিন্দা করতে দেখে তিনি তাঁকে বলেন, আপনি বোধহয় বিনামূল্যে দরবেশী কিনেছেন?

দরবেশ অনুতপ্ত হয়ে বললেন, দরবেশী কেউ আবার মূল্যের বিনিময়ে কেনে নাকি?

তিনি জবাব দেন, কেন, আমি তো বলখ রাজ্যের বিনিময়ে দরবেশী লাভ করেছি। আর আমি লাভবানও বটে।

এক ব্যক্তি তাঁকে এক হাজার দেরহাম দিতে গেলেন। তিনি বললেনম গরীবের দান আমি গ্রহণ করি না। সে বলল,আমি গরীব নই।

তবে কী ধনী?

জি হ্যাঁ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমার যা আছে, তুমি কী তারও বেশী চাও না?

চাই।

তাহলে তুমি ভিক্ষুক ছাড়া আর কি? দেরহাম ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তিনি আরও বললেন, আমি দারিদ্র কামনা করি অথচ আমার কাছে আসে কেবল ধন-সম্পদ। কী বিপদ!

আল্লাহর তরফ থেকে তিনি কল্যাণকর যা কিছু লাভ করতেন, তখন চুপ করে থাকতে পারতেন না। সে সু-খবর তিনি জোরেশোরে প্রকাশ করতেন।

বলতেন, হে রাজা-বাদশাহগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর অভাবনীয় মহিমা ও শক্তির নিদর্শন দেখে যাও। তাঁর কথা ছিল, যারা রিপুর দাস, তারা সত্যনিষ্ঠ নয়, আর সত্যনিষ্ঠ না হলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনও সম্ভব নয়। তিনি বলেন, তিনটি অবস্থায় যার মন আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ নয়, তার জন্য সত্যের দরজা উন্মুক্ত নয়। (১) কোরআন তেলাওয়াতের সময়, (২) নামাজ পড়ার সময় ও (৩) মোরাকাবা- মোশাহাদার সময়।।

আরেফগণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাঁরা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর চিন্তায় বিভোর থাকেন। আর যে কোন বিষয় বা বস্তু থেকে জ্ঞান আহরণ করেন।

একদা চলার পথে তিনি একখন্ড পাথর দেখতে পান। তাতে লেখা ছিল, পাথরখানা তুলে পড়ে দেখ। তিনি পাথর তুলে পড়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে , তুমি যা জান না, তা জানার জন্য কেন চেষ্টা করছ না? তিনি নিজেই এটি বলেছেন। সেই সঙ্গে আরও বললেন, পার্থিব জগতে যা লাভ করা কষ্টকর, মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তাই বেশী মূল্যবান।

যিনি তপস্বী তাঁর সামনে থেকে তিনটি বিষয় সরে গেলেই পথ প্রশস্ত হল। যেমনঃ (১) দুনিয়ার বাদশাহী লাভ করেও তাতে খুশী না হওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাজত্বের প্রতি বিমুখ হওয়া, (২) রাজত্ব চলে গেলেও দুঃখিত না হওয়া । (৩) মানুষের স্তুতি-প্রশংসা বা দানের প্রতি লোভাতুর না হওয়া। কেননা প্রশংসা লোভী মানুষ কাপুরুষ বিশেষ, কাপুরুষের মধ্যে সততা ও সৎসাহসের অভাব থাকে। আর তা আল্লাহ্ প্রাপ্তির অন্তরায়।

আল্লাহর প্রেমিক হতে চাইলে শরীয়তবিরোধী সব কাজ ছাড়তে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু মন থেকে তাড়াতে হবে। হালাল খাদ্য খেতে হবে। অনুপম ইচ্ছা পুর্ণ করে-রাতের তাহাজ্জুদ নামাজ ও দিনের রোজা অপেক্ষাও উত্তম। হালাল খাদ্য ছাড়া নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি উপাসনা অনুষঙ্গের মাধ্যমে কেউ কোনদিন সাধক হতে পারে না। কোন এক ব্যক্তিকে কথা প্রসঙ্গে হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ হালাল খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে এসব কথা বলেন।

কোন এক সাধকের সাধনা বিষয়ে লোকমুখে নানা কথা শুনে তিনি তাঁকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারপর একদিন চলেই গেলেন সেখানে। তাঁকে পেয়ে দরবেশ খুব খুশী। কম করেও তিন দিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। বলামাত্র তিনি রাজি। কেননা, তিনি তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। দেখলেন সত্যিই তিনি এবাদত বন্দেগীতে-অনুরাগী। তাঁর এগুণ বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। রাতে চলে বিরাম বিশ্রামহীন, এবাদত। নিজেকে তাঁর তুলনায় তুচ্ছ মনে হল আদহাম রহমাতুল্লাহ-এর। তাছাড়া তাঁর আতিথেয়তাও তাঁকে অবাক করে দেয়। নানা ধরনের উপাদেয় ও সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করে তিনি তাঁকে আপ্যায়িত করেন। আর তখন-তখনই তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয় সন্দেহের বীজ। দরবেশের বাড়ীতে খাবার-দাবারের এত তোড়-জোড় কেন? তাও পরীক্ষা করে দেখলেন। আর জানা গেল, না, তাঁর এই খানদানী খানা হালাল নয় আদৌ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনদিন কেটে গেল। এবার বিদায়। যাবার সময় দরবেশকে তিনি মেহমান হওয়ার অনুরোধ করলেন। রাজিও হয়ে গেলেন দরবেশ। মেহমানকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ। আর তাঁকে হালাল খাদ্য খাওয়াতে শুরু করলেন। আশ্চর্য ব্যাপার। দরবেশের উপাসনা বা আল্লাহ্-প্রেমের মাত্রা অনেকখানি কমে গেল। আর এর কারণ দরবেশও বুঝতে পারলেন না। অগত্যা তিনি হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ-কে কারণটা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি কিছু করিনি। সব করার করেছে আমার পরিবেশিত খাদ্য। এতদিন আপনি অবৈধ খাবার খেয়েছেন। তাই শয়তান আপনার মধ্যে যাতায়াতের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। আর আপনার এবাদত-বন্দেগী ছিল আসলে তারই কারসাজি। এবারে আপনার পেটে পড়েছে হালাল খাবার। আর ইবলীসের আনাগোনাও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আপনি যেটুকু উপাসনা করছেন, তারমধ্যে কোন ভেজাল নেই, তওবা করুন। এখন থেকে হালাল রুজির ওপর নির্ভর করুন। জানবেন, এবাদত-বন্দেগী হালাল রুজির ওপর নির্ভরশীল। হারাম খাবার খেয়ে যে এবাদত তা মূলত শয়তানী প্ররোচনা।

একবার তিনি হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহ-কে কথা প্রসঙ্গে বললেন, আপনি অবশ্যই বিপুল জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু আপনাকে আরও বেশী বিশ্বাসী হতে হবে। অর্থাৎ তাপসগণের ত্রুটি বিচ্যুতি দুর্বলতা সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন।

হযরত শাকীক বলখী রহমাতুল্লাহ একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি দুনিয়া থেকে এত বেশী দূরে থাকেন কেন? তিনি জবাব দেন, মানুষ যদি আমাকে দেখে কুলি-মজুর বা পাগল মনে করে তো একটু শান্তিতে দ্বীনের সেবা করা যায়।

দিনের বেলায় তাঁকে কুলি-মজুর মনে করা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা, তিনি দিনে ঘাস কাটতেন মাঠে। আর তা বিক্রি করে রুটি কিনতেন। আর সে রুটিও দিয়ে দিতেন দরবেশদের। আর রাতের বেলায় বিরামহীন এবাদত এটাই তাঁর কাজ।

লোকে জিজ্ঞেস করত, আপনার চোখে কি ঘুম আসে না? তিনি বলতেন, আল্লাহর আসক্তিতে আমার শান্তি লোপ পেয়ে গেছে। হৃদয়ে যার অশান্তি, তার ঘুম আসবে কি করে? নামাজ সম্পন্ন করে মুখের ওপর হাত রেখে বলতেন, আল্লাহ্ না করুন, এ নামাজ যদি আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হয়, তাহলে কেমন হবে?

একদিন খাবার জুটল না। অনাহারে তিনি চার রাকাআত শোকরানার নামাজ পড়লেন। পরদিনও তাই। আর সেদিনও তিনি চার রাকাআত শুকরিয়ার নামাজ পড়লেন। এভাবে এক সপ্তাহ চলে গেল। না খেয়ে না খেয়ে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। আর এ অবস্থায় আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, প্রভু গো! এখন কিছু খেতে দিলে ভালো হত। মোনাজাত শেষ হলে এক তরুণ এসে তাঁকে অতিথি হিসেবে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে সে তাঁর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, হুযুর। আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য। আমার যা কিছু দেখছেন, সবই আপনার। হযরত বললেন, কিন্তু আমি তো তোমাকে মুক্তি দিয়েছিলাম। তোমার যা কিছু, সবই তোমার। তুমিই এ সবের মালিক। যাক, যা হবার হয়েছে। এবার আমাকে যেতে দাও। বলে তখনই তিনি তাঁর আস্তানায় ফিরলেন। আর হাত ওঠালেন আল্লাহর দরবারে। প্রভু আমার ভুল হয়েছে। আর কখনও কোন কিছু চাইব না। আমি মাত্র এক টুকরো রুটি চেয়েছিলাম। আর আপনি রাজ্যের সম্পদ আমার সামনে ধরে দিলেন।

শিষ্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও অনুরাগের একটি অবিস্মরণীয় উদাহরণ আছে। তাঁর এক শিষ্য অসুস্থ অবস্থায় শুয়েছিল এক পুরানো ভাঙ্গা মসজিদে। মসজিদের দরজা কপাটশূন্য। হু-হু করে হিমেল হাওয়া ঢুকছে ঘরে। দরজায় কিছু ঝুলিয়ে দিয়ে বাতাস

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আটকানো যাবে, তারও উপায় নেই। অথচ অসুস্থ লোকটাকে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ নির্দিধায় দাঁড়িয়ে রইলেন দরজায়– যতদূর সম্ভব ঠান্ডা বাতাস প্রতিহত করলেন। আর এইভাবে রাত ভোর হয়ে গেল।

আর একটি উদাহরণ ঃ এক সফরে তাঁর ভ্রমণ-সঙ্গী ছিলেন হযরত সোহায়েল ইবনে ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ। হঠাৎ তিনি দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ নিজের সর্বস্ব বিক্রি করে দিলেন। এমনকি গাধাটিও। আর দেশে ফেরার সময় কিছুটা সুস্থ, দুর্বল সোহায়েল রহমাতুল্লাহ-কে কাঁধে নিয়ে তিন দিনের পথ অতিক্রম করলেন।

হযরত ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ-এর হালাল খাদ্যাভাসের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি কত সচেতন ছিলেন, তা জানা যায় যখন তিনি বলেন যে, চল্লিশ বছর ধরে তিনি মক্কার কোন ফল মুখে দেননি। কারণ? কারণ, ফলের বাগানগুলি তখন সেনা বিভাগের লোকেরা কিনে নিয়েছিল অবৈধ উপার্জনের টাকায়। জীবনে তিনি বহুবার হজ্জে গেছেন– পায়ে হেঁটে প্রত্যেকবার। মক্কায় দীর্ঘ অবস্থানকালে তিনি জমজম কূপের পানি পান করেননি। কেননা, কূপ থেকে পানি তোলার বালতিটা সরকারী।

আগেই বলা হয়েছে, হালাল রুজি-রোজগারের জন্য তিনি দিনের বেলায় ঘাস বা কাঠ কাটতেন। আর সেগুলির বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা রুটি কিনে দরবেশদের খাওয়াতেন, নিজেও খেতেন। কখনও কখনও দিন-মজুরের কাজও করতেন।

একবার সন্ধ্যা উতরে গেল। তিনি ফিরলেন না। তাঁর শিষ্যারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর যার যা ছিল তাই দিয়ে খাবার কিনে খেয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। অনেক রাতে হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ বাসায় ফিরলেন। দেখলেন, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সঙ্গে আটা কিনে এনেছিলেন। কাউকে না জাগিয়ে নিজেই রুটি বানাতে গেলেন। কিন্তু মুশকিল হল উনুন নিয়ে। কিছুতেই আগুন জ্বলছে না। কত ফুঁ দিলেন। তাও না। এমন সময় একজনের ঘুম ভাঙল। তিনি আবার অন্যদের জাগিয়ে দিলেন। মুর্শিদের কান্ড দেখে মুরীদরা বললেন, এত রাত্রে এ আপনি কী করছেন? তিনি যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আমার আজ খুব দেরী হয়ে গেল। দেখি তোমরা সব ঘুমে অচেতন। ক্ষুধায় কত কষ্ট হয়েছে তোমাদের। তাই নিজেই রুটি তৈরী করতে লাগলাম। ভেবেছিলাম, রুটি হলেই তোমাদের জাগাব। তার আগেই তোমরা ...।

শিষ্যরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন। মুর্শিদ না মুরীদ-কে কার খেদমত করবেন? চিরকালের জন্য এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন হযরত ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ। তাঁর শিষ্য হওয়ার শর্ত ছিল বিচিত্র। তিনটি শর্ত আরোপ করতেন তিনি।

(১) আমি তোমাদের পরিচর্যা করব। আপত্তি করবে না।

(২) নামাজের আযান আমিই দেব।

(৩) আমার যা খাবার জুটবে, তাই তোমাদের দেব। খেতে সঙ্কোচবোধ করবে না।

দীর্ঘ দিন তাঁর সংস্পর্শে থেকে এক সহচর একদিন বিদায় নিলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি বললেন, হুযুর, আমি অনেকদিন আপনার সঙ্গে ছিলাম। আমার মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা দেখেছেন, দয়া করে বলুন। হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ উত্তর দিলেন, তুমি আমার সর্বক্ষণের সৎ বন্ধু। সুতরাং তোমার দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা আমার চোখে পড়েনি।

একটি বড় পরিবার। পরিবার সদস্য অনেক। সকলের অন্ন জোটাতে কর্তা হিমশিম খেয়ে যান। একদিন তো অন্নের সংস্থান করাই গেল না। ব্যর্থ, বিপন্ন মানুষটি বাড়ী ফিরছিলেন। রাস্তায় হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে দেখা। তাঁকে পরিবার-কর্তা বললেন, আপনাকে দেখে আমার হিংসা হয়। কেন, জানেন? আপনার সংসার নেই। তাই

www.AmarIslam.com

সংসারের চিন্তাও নেই। নিশ্চিন্তে দিব্যি রয়েছেন আপনি। আর আমি যে কী দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছি, সংসারী হলে বুঝতে পারতেন। হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, ভাই, আমি সারা জীবন যে পুণ্য করেছি, সব তুমি নাও। আর তোমার আজকের এ ভাবনাটুকু আমায় দিয়ে দাও।

খলীফা মোতাসেম বিল্লাহর সমকালীন লোক ছিলেন হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ। একদিন খলীফা তাঁকে বললেন, আপনি অপরের জন্য কী করছেন আর নিজের জন্যইবা কি করছেন?

হযরত উত্তর দিলেন, পার্থিব জীবনে যারা ভোগ-বিলাসের কামনা করে, তাদের অনুকূলে আমি সে সব পরিত্যাগ করেছি। যারা পরকাল চায়, আমি তাদের দিকে চেয়ে তা থেকে ফিরে গেছি। আল্লাহর দীদার লাভ করব বলে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকাই সার করেছি।

এত বড় সাধক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু একটি ঘটনায় বেশ লজ্জা পান। এক ক্ষৌরকার তাঁর ক্ষৌরকর্ম করছিল। তাঁর এক শিষ্য বললেন, আপনার কাছে কিছু থাকলে একে মজুরি বাবদ দিয়ে দেবেন। হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ-এর কাছে ছিল মুদ্রা-ভর্তি একটা থলে। তিনি সেটা ক্ষৌরকারকে দিলেন। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। ক্ষৌরকার তাঁকে ঐ থলেটা দান করলেন। আর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ। আরে, কর কী! ওতে যে সব সোনার মোহর রয়েছে। ক্ষৌরকার এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, তাতে কি? ওতে যে সোনার মোহর রয়েছে তা আমি জানি। আর যাকে দান করলাম, সেও জানে। আপনার মনশ্চক্ষু এখনও উন্মীলিত হয়নি দেখা যাচ্ছে। যে লোক শুধু ধন-সম্পদে ধনী, সে প্রকৃত ধনী নয়। অন্তরের ধনে যে ধনবান, প্রকৃত ধনী তাকেই বলে।

বলাবাহুল্য, ক্ষৌরকারের কথায় বড় লজ্জিত হলেন। ধিক্কার দিলেন নিজের অন্তর ও প্রবৃত্তিকে। আসলে ক্ষৌরকার ও ভিক্ষুক যে তাঁকে শিক্ষা দিতে এসেছিল, তা বুঝতে তাঁর দেরী হল না।

রাজসিংহাসন ত্যাগ করে সাধনার পথে এসে তিনি কি কোন ব্যাপারে আনন্দ লাভ করেছেন? তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, বহু ব্যাপারে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। একবার তিনি নৌকাযোগে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁর ছেঁড়া-ময়লা পোশাক আর রুক্ষ চুল দেখে নৌকার অন্যান্য যাত্রীরা তাঁকে পাগল বলে মনে করে। একজন কৌতুকপ্রিয় রসিক ব্যক্তি তাঁর মাথার চুল ধরে টেনে বেশ মজা পাচ্ছিল। বারবার গলা ধাক্কাও দিচ্ছিল সে। সবাই বেশ মজা উপভোগ করছিল। তিনিও প্রবৃত্তির অপমানজনিত কারণে আত্মহারা হয়েছিলেন।

হঠাৎ নদীতে উঠল প্রবল ঢেউ। নৌকাটা আর সামলানো যাচ্ছিল না। মাঝি বলল, নৌকার ভার কিছুটা কমাতে পারলে হয়তো রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। না হলে যা অবস্থা– তাতে কী হবে বলা মুশকিল। মাঝির কথা শুনে একটা লোক তাঁর কান ধরে বলল, যা ব্যাটা, নদীতে ঝাঁপ দে, নইলে ঠেলে ফেলে দেব। সে এত জোরে কান ধরে টানছিল যে, মনে হচ্ছিল কানটা বুঝি উপড়ে যাবে। এই সময় প্রবৃত্তির অপমান ও দীনতা দেখে তিনি প্রচুর আনন্দ পান। আর তখন আচমকা ঝড় থেমে যায়। নদী শান্ত হয়। তাঁকে ঝাঁপ দিয়ে নৌকার বোঝা কমাতে হল না।

আর একদিন তিনি বিশ্রাম নিতে এক মসজিদে ঢুকলেন। কিন্তু ওখানে যারা ছিল, তারা জংলী মনে করে তাঁকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। তিনি শুধু রাতটুকু আশ্রয় দেবার জন্য খুব কাকুতি-মিনতি করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তারা তাঁকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দরজার কাছে টেনে এনে এমন জোরে ধাক্কা দিল যে, তিনি টাল সামলাতে না পেরে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে লাগলেন। মাথায় দারুণ চোট লাগল। কিন্তু গড়াতে গড়তে তাঁর মনে হল, প্রতিটি ধাপে মারেফাতের জটিল তত্ত্বের এক একটি স্তর তিনি যেন আয়ত্ত করে ফেললেন। এই দুর্দশার সময় এক রসিক পুরুষ তাঁর মাথায় প্রস্রাব ঢেলে দিল। এই সময় প্রবৃত্তি বেশ জব্দ হওয়ায় তিনি খুবই আনন্দ পান।

আর একবার পরনে তাঁর চামড়ার জোব্বা। দারুণ ময়লা। উকুন থিক থিক করছে। সেগুলি এমনভাবে কামড়াতে শুরু করল যে, দু'হাত দিয়ে তিনি গা চুলকাতে লাগলেন। চুলকাতে চুলকাতে অস্থির। তখন তাঁর মনে হল, অতীতের বাদশাহী জীবনের জরির কাজ করা রেশমী পোশাকের কথা। আর তখন প্রবৃত্তির বেশ কিছু শিক্ষা হয়েছে ভেবে তিনি প্রভূত আনন্দ লাভ করেন।

কিন্তু প্রবৃত্তির মৃত্যু নেই। হঠাৎ সে জেগে ওঠে। একবার আল্লাহর ধ্যানমগ্ন হওয়ার জন্য তিনি গেলেন এক নির্জন প্রান্তরে। বেশ কিছুদিন কেটে গেল সেখানে। কিন্তু খাওয়া জুটল না। ওখান থেকে কিছু দূরে তাঁর এক হিতৈষী বন্ধু ছিল। একবার ভাবলেন, তার কাছেই যাওয়া যাক। কিন্তু পরে মনে হল, না, তাহলে তাঁর সাধনা নষ্ট হবে। কাজেই তিনি গেলেন এক মসজিদে। আর মনে মনে বলতে লাগলেন, আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করলাম, যিনি চিরঞ্জীব, অমর। হঠাৎ গায়েবী আওয়াজ হল, পৃথিবী থেকে প্রকৃত নির্ভরকারী বিলীন হয়ে গেছে। তুমিও কৃত্রিম। প্রকৃত বন্ধুর কাছে কী খাওয়ার ইচ্ছা জানাতে হয়?

এক দরবেশকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে কোথা থেকে জীবিকা সংগ্রহ করেন?

দরবেশ জবাব দেন, সেটা আমার জানার কথা নয়। যিনি আমাকে জীবিকা দেন, বরং তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

একবার তিনি একটি দাস ক্রয় করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বলল, আপনি যে নাম ধরে ডাকবেন।

তুমি খাবে কি?

আপনি যা খেতে দেবেন।

তুমি কি পরবে?

আপনি যা পরতে দেবেন।

তোমার নিজের কী ইচ্ছা, বল না। ক্রীতদাসের আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা।

তার এ ধরনের কথাবার্তা শুনে মনে মনে তিনি নিজেকেই ধিক্কার দিলেন। তাঁর মনে হল, প্রকৃত দাসত্ব কাকে বলে, এখনও তাঁর শেখা হয়নি। প্রবল কান্না এল তাঁর। আর এভাবে কাঁদতে কাঁদতে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

কিভাবে তাঁর সময় কাটে? এ প্রশ্নর উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর চারটি বাহন আছে। যেমন– (১) কৃতজ্ঞতা– আল্লাহ যখন কিছু দান করেন, তখন কৃতজ্ঞতার বাহনে চড়ে তিনি আল্লাহর দরবারে হাজির হন।

(২) বিশুদ্ধ প্রেম– যখন এবাদতের উদ্দেশে গমন করেন, তখন তাঁর বাহন হল বিশুদ্ধ প্রেম।

(৩) ধৈর্য্য– যখন কোন বিপদ আসে জীবনে, তখন ধৈর্য্যের বাহনে চড়ে তিনি অগ্রসর হন।

(৪) তওবা– আর যখন কোন পাপ কাজ করে ফেলেন, তখন তওবার বাহনে চড়ে তিনি আল্লাহর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তুমি যে পর্যন্ত নিজের স্ত্রীকে বিধবা, সন্তানদের এতিম আর রাতের বিছানাকে কবর মনে না করবে, সে পর্যন্ত তুমি নিজেকে সাধক পর্যায়-ভুক্ত বলে মনে করবে না।

একবার এক সাধক– সমাবেশে গিয়ে বসতে যাবেন, তাঁরা তাঁকে এই বলে বাধা দিলেন যে, তাঁর শরীরে এখনও বাদশাহীর গন্ধ আছে। দ্বিরুক্তি না করে তিনি দূরে গিয়ে বসলেন।

আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের মনের ওপর পর্দা পড়ে কেন? – তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বললেন, আল্লাহ্ যা ভালোবাসেন, মানুষ তার বদলে অন্য কিছু ভালোবাসে, তাই।

তাঁর উপদেশ– একমাত্র আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। আর সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বর্জন করবে। এক লোককে তিনি বললেন, তুমি যা বেঁধে রেখেছ, তা খুলে ফেল, আর যা খোলা আছে তা বেঁধে রাখো। সে বলল, একটু খুলে বলুন হুযুর। বুঝতে পারছি না। তিনি এবার পরিষ্কার করে বললেন, বন্ধ টাকার থলে খুলে দান কর। আর অশ্লীল কথা বলা বন্ধ কর।

তওয়াফ রত অবস্থায় তিনি এক লোককে বললেন, যে পর্যন্ত না তোমার ভেতরের চারটি বস্তু বর্জন করে অন্য চারটি বস্তু অর্জন করবে, সে পর্যন্ত তুমি পূন্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। যেমন– (১) ধন-দৌলত ও প্রভুত্ব ছেড়ে দাসত্ব ও ফকিরী গ্রহণ কর।

(২) মান-সম্মানের আশা ছেড়ে দাও। অপমান ও হীনতা স্বীকার কর।

(৩) নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ কর, কর্মতৎপর হও।

(৪) অহমিকা বর্জন করে বিনয়ী হও।

সত্য-সন্ধিৎসু এক ব্যক্তির প্রতি তাঁর উপদেশ

(১) তুমি যদি পাপকর্ম কর, তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত রেজেক খাবে না।

লোকটি বলল, রেজেকদাতা একমাত্র আল্লাহ। তাঁকে বাদ দিয়ে আর কার কাছ থেকে রেজেক গ্রহণ করব? হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ বললেন, তা ঠিক। তবে তুমি তাঁর রেজেক খাবে অথচ তাঁর অবাধ্য হবে, তা হয় না।

(২) তুমি যদি পাপ করতে চাও, তাহলে আল্লাহর রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। কেননা, যারা রাজ্যে বাস করবে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, এ হতে পারে না।

লোকটি বলে, আল্লাহর রাজ্য ছাড়া অন্য কারও রাজ্য আছে কি? তিনি বললেন, তা যদি বুঝে থাক, তবে যেভাবে যা করা দরকার তাই কর।

(৩) তুমি যদি একান্তই পাপ করতে চাও, তাহলে এমন জায়গায় গিয়ে তা কর, যেন তিনি না দেখেন।

লোকটি বলল, তিনি তো সর্বত্রই বিরাজমান। আর সব কিছুই দেখতে পান।

হযরত বললেন, তুমি যার রুজি খাবে, যার রাজ্যে বাস করবে, তাঁর সামনে বসে তাঁরই অবাধ্য হবে, এর চেয়ে অপরাধ আর বিশ্বাসঘাতকতা আর কী আছে?

(৪) যখন মৃত্যুর দূত এসে উপস্থিত হবে, তখন তার কাছ থেকে তওবা করার সময় চেয়ে নেবে।

লোকটি বলল, কিন্তু আজরাঈল কি তাতে রাজি হবেন? হযরত বললেন, যদি সে কথা বুঝে থাক, তবে এখনই তওবা করে নাও।

(৫) মৃত্যুর পর যখন মুনকার-নকীর প্রশ্ন করতে আসবে, তখন তাদের তাড়িয়ে দিও। লোকটি বলল, তা কি সম্ভব?

হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ বললেন, তাই যদি বুঝে থাক, তাহলে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি নাও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৬) রোজ কিয়ামতে আল্লাহ যখন পাপীদের জাহান্নামে নিয়ে যাবার জন্য ফেরেশতাদের হুকুম দেবেন, তখন তারা তোমার কাছে হাজির হলে বলবে, আমি যাব না।

লোকটি বলল, তারা তো আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে। হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ বললেন, তাহলে পাপ কাজ ছেড়ে দাও। তাঁর কথা শুনে লোকটি বলল, আপনি যা যা বললেন, তা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত বললেন, তাহলে তুমি সমস্ত পাপকর্ম পরিত্যাগ কর।

এবার লোকটি বলল, আমার জন্য তাহলে এ কাজটি করাই ভালো আর অন্যান্য কাজ অপেক্ষা এটি সহজতরও বটে। এই বলে সে তখনই তওবা করে যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত হয়ে পুণ্যময় জীবন যাপন করতে লাগল।

কিছু লোক তাঁকে বলল, আমরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, অথচ তা কবুল হয় না কেন? তিনি বললেন, তার কারণ, আল্লাহকে তোমরা ভালো করেই জান। অথচ তাঁর নির্দেশ পালন কর না। রাসূলুল্লাহকে জান ও বিশ্বাস কর। অথচ তাঁকে অনুসরণ কর না। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত কর, অথচ তাঁর ওপর আমল কর না। পুণ্যবানদের জন্য জান্নাত তৈরী হয়েছে। তোমরা তা ভালোভাবেই জান। অথচ নিজেরা পুণ্যবান হওয়ার মত কাজ কর না। পাপীদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি হয়েছে তাও তোমাদের জানা। অথচ পাপকর্ম থেকে তোমরা বিরত হও না। তোমরা জান, শয়তান তোমাদের শত্রু। অথচ তাকে শত্রু মনে কর না। বরং তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন কর। মৃত্যু অনিবার্য তোমরা জান। অথচ তার জন্য তোমাদের কোন প্রস্তুতি নেই। সন্তানরা পিতামাতাকে কাফন-দাফন করে আসছে, অথচ তোমরা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করছ না। মন্দ স্বভাব সংশোধন করে উত্তম স্বভাব অবলম্বন করছ না। নিজেদের বদভ্যাস আছে, অথচ অন্যদের খুঁত ধরতে যাও। ভেবে দেখ, এই যাদের অবস্থা, তাদের প্রার্থনা কি করে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে?

তুচ্ছ প্রশ্নেরও তিনি তত্ত্বপূর্ণ উত্তর দিতেন।

একজন বলল, গোশতের দাম খুব বেড়ে গেছে। কি করা যায় হুযুর?

তিনি বললেন, গোশত খাওয়া বাদ দাও। তাতে দাম বাড় ক বা কমুক, কিছু যাবে আসবে না।

হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ একবার আমন্ত্রিত হলেন। কিন্তু আমন্ত্রণ-স্থলে যেতে তাঁর কিছু দেরী হল। সবাই বলাবলি করতে লাগল, লোকটা ঐ রকমই। কথা দিয়ে কথা রক্ষা করার গুরুত্ব বোঝে না। এমন সময়ে তিনি হাজির হলেন। কথাগুলি তাঁর কানে গিয়েছিল। বললেন, নিয়ম হচ্ছে, মানুষ প্রথমে রুটি মুখে পুরবে, তারপর গোশত। কিন্তু তোমরা দেখছি, গোশত প্রথমে মুখে নিচ্ছ। অর্থাৎ একটু অপেক্ষা না করেই পরনিন্দা শুরু করে দিয়েছ।

জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তিনি একবার এক হাম্মামখানায় প্রবেশ করলে সেখানকার লোকে সাধারণ এক ভিক্ষুক মনে করে তাঁকে বাধা দিল। তখন তিনি একটি চমৎকার কথা বলেন। গরীব লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন শয়তানের ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই, তখন উপাসনা ছাড়া কী করে আল্লাহর ঘরে ঢোকা যেতে পারে?

একবার হজ্জ মওসুমে একটানা তিনদিন উপবাসে কাটল তাঁর। তখন শয়তান এসে বলল, বলখের বাদশাহী ছেড়ে এভাবে কষ্টভোগ ছাড়া আর কিছু পেয়েছ কি?

তিনি অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আল্লাহকে বললেন, প্রভু গো! আপনার এ বন্ধুর মনে কষ্ট দেবার জন্যই কি আপনি শয়তানকে পাঠিয়েছেন? আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর এল, তোমার জামার পকেটে যা আছে ফেলে দাও। তাহলে এর কারণ বুঝতে পারবে। তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, দুটি রূপার টাকা আছে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা দুটি ছুঁড়ে ফেললেন, আর শয়তানও অদৃশ্য হয়ে গেল।

হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ একটি ফলের বাগান পাহারা দিচ্ছেন। বাগানের মালিক তাঁকে কিছু মিষ্টি ডালিম আনতে বললেন। ডালিম আনা হল। মালিক সেগুলি কেটে ফেললেন। খুব টক। বললেন, তুমি তো বাগান পাহারা দাও। বাগানের ফলও খেয়ে দেখেছ। কোন্‌টি টক আর কোন্‌টি মিষ্টি, নিশ্চয় বলতে পারবে। কিন্তু যেগুলি এনে দিলে তা বেশ টক। এর কারণ কী? তিনি বললেন, আপনি বাগান পাহারা দেবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন, ফল খাবার জন্য নয়। কাজেই কোন্‌টি টক আর কোন্‌টি মিষ্টি, আমি কী করে জানব?

প্রহরীর কথায় মালিকের সন্দেহ হয়। তিনি বললেন, তোমার কথায় সততার যে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তোমাকে হযরত ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ মনে হচ্ছে। এ কথার উত্তর না দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রহরার কাজ ছেড়ে চলে গেলেন।

গভীর রাত। হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ নিদ্রাচ্ছন্ন। চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হাতে একখানি বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ফেরেশতা প্রধানকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ওখানা? আর এ দিয়ে আপনি কি করবেন? জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, এতে আল্লাহর বন্ধুদের নাম লেখব। ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ বললেন, আমার নামটাও লেখবেন কি? তিনি বললেন, না। আপনি আল্লাহর বন্ধু নন। ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ হতাশ না হয়ে বললেন, তা না হলেও আমি তাঁর বন্ধুগণের বন্ধু তো বটে। তাঁর কথা শুনে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, আমি আপনার নামটিই সর্বপ্রথমে লেখবার নির্দেশ পেয়েছি।

এ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন স্বয়ং ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ।

আর এক রাতের ঘটনা। তিনি রয়েছেন বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে। মসজিদে কাউকে রাত কাটাতে দেওয়া হত না। তিনিও তা জানতেন। তাই নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন চাটাইয়ের মধ্যে। রাত তখন দুপুর। হঠাৎ মসজিদের দরজা খুলে যায়। আর চল্লিশ জন জোব্বা পরিহিত অনুচর সঙ্গে নিয়ে এক বৃদ্ধ দরবেশ মসজিদে ঢুকে পড়লেন। তাঁর পরনে জোব্বা। প্রথমে তাঁরা দু'রাকয়াত নামাজ পড়লেন। তারপর বৃদ্ধ দরবেশ তাঁর সঙ্গীদের দিকে মুখ করে বসলেন। এ সময় কেউ বললেন, আজ মসজিদে আর একজন লোক আছে। দরবেশ বললেন, হ্যাঁ। সে ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রহমাতুল্লাহ। আজ চল্লিশ দিন ধরে সে এবাদতে কোন স্বাদ পাচ্ছে না।

এবার চাটাই থেকে বেরিয়ে এলেন ইব্রাহীম আদহাম রহমাতুল্লাহ। বললেন, আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য জনাব। কিন্তু দয়া করে এর কারণটা বলুন। দরবেশ বললেন, আপনি একদিন বসরা শহরে খেজুর কিনেছিলেন। খেজুর বিক্রেতা যখন খেজুর ওজন করছিল, তখন একটি খেজুর নিচে পড়ে যাওয়ায় আপনি আপনার প্রাপ্য মনে করে সেটি খেয়েছিলেন। আপনি যে এবাদতে স্বাদ পাচ্ছেন না, তার এই হল কারণ। দরবেশের কথা শুনে তিনি ভোরেই বসরা চলে যান আর খেজুর বিক্রেতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, খেজুর বিক্রেতা তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার কারণ শুনে অবাক হয়ে যান। সে বলে, পরের দ্রব্য হরণের অপরাধ যদি এতই গুরুতর হয়, তাহলে আমি না জানি কত অসংখ্য অপরাধ করেছি। এই বলে সে খেজুরের ব্যবসা ছেড়ে দেয়। আর তওবা করে আল্লাহর এবাদতে আত্মনিয়োগ করে। পরবর্তীকালে সে এক বিখ্যাত সাধকে পরিণত হয়। একজন সৈনিকের সঙ্গে তাঁর একদিন কথোপকথন হয়।

সৈনিক। আপনি কে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আদহাম রহমাতুল্লাহ একজন দাস।

আপনার বাড়ী কোথায়?

ঐদিকে (কবরস্থানের দিকে ইশারা করে)।

আপনি আমার সঙ্গে উপহাস করছেন? এইবলে তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে বেত্রাঘাত করতে করতে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। লোকেরা সৈনিককে বলল, তুমি কার সঙ্গে কী ব্যবহার করছ। উনি ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রহমাতুল্লাহ।

সঙ্গে সঙ্গে সৈনিক হযরতের পায়ের তলায় পড়ে ক্ষমা চায়। ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ বলেন, তোমার অপ্রস্তুত হওয়ার কারণ নেই। আমি তোমার প্রতি রুষ্ট হয়নি। বরং তুমি আমার প্রতি যে ব্যবহার করেছ, তার জন্য দোয়া করছি। কেননা, তোমার এ আচরণ আমার; জান্নাতবাসের কারণ হয়েছে। অতএব, দোয়া করি, আল্লাহ তোমাকেও জান্নাত নসীব করুন।

হযরতের কথায় আশ্বস্ত হয়ে সৈনিক বলল, হুযুর! আপনার নাম-ঠিকানা জানতে চাইলে আপনি অমন উপহাস করলেন কেন? হযরত বললেন, আমি মোটেই উপহাস করিনি। বরং সত্য কথাই বলেছি। মানুষ মাত্রই আল্লাহর দাস। আর কবরস্থানই তার প্রকৃত বাসস্থান। কেননা, মানুষ দুনিয়াতে থাকে মাত্র কয়েকটি দিন। কিন্তু কবরে বাস করে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত।

পথে একদিন এক মাতালের সঙ্গে দেখা। তার মুখভর্তি ধুলোমাটি, ময়লা। বড় বিশ্রী। তিনি তার অবস্থা দেখে পানি এনে মুখ ধুয়ে দিলেন। বললেন, যে মুখ দিয়ে আল্লাহ পাকের নামোচ্চারণ হয়, তা অমন নোংরা করে রেখেছ কেন? মাতালের কোন জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ চলে গেছেন। কথা শুনে মাতাল তওবা করল। প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে আর মদ ছোঁবে না। ঐ রাতেই হযরত স্বপ্ন দেখলেন। আল্লাহ্ বলছেন, তুমি আমার নামের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য মাতালের মুখ ধুয়ে দিয়েছ। এর বিনিময়ে আমি তোমার অন্তর পরিষ্কার করে দিলাম।

পবিত্র হৃদয়ের ছোঁয়ায় সবকিছু পবিত্র হয়ে যায়। সামান্য একটি গাছও। বায়তুল মুকাদ্দাস সফরে হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হযরত মুহাম্মদ মুবারককে নিয়ে একটি ডালিম গাছের তলায় নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে তাঁরা রওনা দিচ্ছেন, তখন ডালিম গাছের আবেদন শোনা গেল। আপনারা মেহেরবানী করে আমার দুটো ফল খেয়ে আমাকে ধন্য করুন। গাছের আবেদনে সাড়া দিয়ে দু'জনেই ফল খেলেন। ফলগুলি খুব টক। যাই হোক, কিছুদিন পর, ঐ পথে ফেরার সময় তাঁরা স্ববিস্ময়ে দেখলেন, ছোট গাছটি এই কয়দিনে অনেক বড় হয়ে গেছে। আর তার ফলও বেশ সুস্বাদু হয়েছে। কথিত আছে, গাছটি নাকি বছরে দুবার ফল দিত।

এক পাহাড়ে বসে কথা হল হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ আর এক দরবেশ। দরবেশের প্রশ্নঃ পূর্ণ আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি হওয়ার পরিচয় কি? হযরত উত্তর দিলেন, তিনি যদি পাহাড়কে চলতে বলেন, পাহাড় চলতে শুরু করে। আর আশ্চর্যের কথা, তাঁরা যে পাহাড়ের ওপর বসেছিলেন, তা চলতে শুরু করল। ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ বললেন, হে পাহাড়! আমি তো তোমাকে চলতে বলিনি। তুমি চলতে লাগলে কেন? অমনি পাহাড় পূর্বেকার মতো স্থির হয়ে গেল।

একবার তিনি চলেছেন নৌকাযোগে। হঠাৎ নদীতে উঠল ঝড়। নৌকা দুলতে লাগল। এই বুঝি ডুবে যায়। যাত্রীরা প্রাণভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তখন শোনা গেল অদৃশ্য লোকের শব্দ। তোমরা ভীত হয়ো না। তোমাদের নৌকায় রয়েছেন হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রহমাতুল্লাহ।

আর একদিন অনুরূপ অবস্থা। সেদিন অবশ্য তিনি ছাড়াও নৌকায় ছিল পবিত্র কোরআন শরীফ। তুফানে তরী তখন টালমাটাল, তখন হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ-এর আকুল প্রার্থনা শোনা গেল। প্রভু গো! আমাদের ডুবিয়ে মারবেন? সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-তুফান থেমে যায়।

আর একদিন হযরত যাবেন নদীর ওপারে। খেয়া নৌকায় পার হতে হবে। কিন্তু পারের কড়ি নেই। মাঝি তা দাবী করবেই। তিনি আর কী করেন। নদী তীরে দু'রাকআত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলেন, আল্লাহ গো! আমি নদী পার হতে চাই। অথচ আমার কাছে একটিও পয়সা নেই। কী হবে প্রভু? প্রার্থনা শেষ হলে দেখা গেল, নদীতটের বালুকণা স্বর্ণ রেণুতে পরিণত হয়েছে। আর তিনি তাই এক মুঠো তুলে খেয়া মাঝিকে দিলেন। পরম খুশীতে ডগমগ হয়ে মাঝি তাঁকে পার করে দিল।

আর একদিন টাইগ্রীস নদীর তীরে বসে হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ তাঁর পরনের ছেঁড়া পোশাক সেলাই করছেন আপন মনে। তা দেখে এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করে, বলখের সিংহাসন ত্যাগ করে আপনার কী লাভ হল বলুন তো? ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ তার কথার উত্তর না দিয়ে হাতের সূঁচ ছুঁড়ে ফেললেন নদীতে। তারপর তাকে বললেন, তুমি ঐ সূচটি তুলে দিতে পার? লোকটি বলে, তা কী করে সম্ভব? তখন তিনি নদীকে কী যেন ইঙ্গিত করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নদীতে মাছ ভেসে উঠল পানির ওপর। প্রত্যেকের মুখেই এক-একটি সোনার সূচ। তিনি বললেন, আমি তো সোনার সূঁচ চাইনি। নিজের সূঁচটিই চেয়েছি মাত্র। বলামাত্র একটি মাছ তাঁর সূঁচটি তাঁর সামনে ছুঁড়ে দিল। তিনি এবার লোকটিকে বললেন, দেখলে! রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি খুব তুচ্ছ জিনিসই লাভ করেছি, তাই না?

বলা বাহুল্য, নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে মহাসাধকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। নির্বোধ না হলে কি সে ঐ ধরনের প্রশ্ন করতে যায়।

হযরত একবার চলেছেন কোথাও। সাথে বেশ কয়েকজন দরবেশ। তাঁরা পৌঁছলেন এক কেল্লায়। কেল্লার দরজায় অনেকগুলি কাঠের টুকরো পড়ে ছিল। কাছে ছিল একটি ঝর্ণা। সুতরাং তাঁরা সে রাতটি সেখানেই কাটাবেন বলে স্থির করলেন। রাতের দিকে কাঠের টুকরো গুলি জ্বালানো হল।

এক সাথী-দরবেশ বললেন, আমরা এখন যদি হালাল গোশত পেতাম, তাহলে দিব্যি রান্না করে খেতে পারতাম। হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ তখন নামাজ পড়ছেন। কথাটি কানে গেল তাঁর। নামাজ শেষ করে তিনি বললেন, আল্লাহর অসীম শক্তি। ইচ্ছা করলে তিনি আমাদের জন্য হালাল গোশতের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এই বলে তিনি আবার নামাজে রত হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দরবেশগণ বাঘের ডাক শুনতে পেলেন। আর দেখতে দেখতে একটি বাঘ এক বুনো হরিণ তাড়া করে সেখানে নিয়ে এল। তাঁরা এই হরিণকেই জবেহ্ করে সেটির গোশত দিয়ে কাবাব বানিয়ে খেলেন। কাছে বসে বাঘটি সবকিছু দেখল।

একবার তিনি চলেছেন হজ্জের নিয়তে কাবার পথে। কয়েকজন সঙ্গীও রয়েছে। যেতে যেতে একজন বলল, আমি কপর্দকশূন্য হুযুর। আমাদের কাছে কোন পাথেয় নেই।

হযরত বললেন, তোমার কি আল্লাহর ওপর এতটুকু ভরসা নেই? ধন-সম্পদের প্রতি এতই যদি তোমার আগ্রহ তাহলে ঐ গাছটির দিকে তাকাও।

তার কথা শুনে লোকটি দেখল, গাছটির মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা সবকিছুই সোনার।

একবার কুয়া থেকে পানি তুলবেন বলে তিনি বালতি নামালেন। বালতি উঠে এলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেখা গেল, পানির বদলে উঠে এসেছে এক বালতি সোনা। তিনি আবার বালতি ফেললেন। এবার উঠে এল এক বালতি রূপা আবারও বালতি নামালেন এবার উঠল এক বালতি মোতি। তখন আল্লাহর দরবারে তিনি আরজ করলেন, প্রভু গো! আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করছেন? সোনা-রূপা-মোতি নিয়ে আমি কী করব? পবিত্রতা অর্জনের জন্য আমার শুধু পানির প্রয়োজন।

হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ শেষ জীবনে পরিপূর্ণ নির্জনতায় ডুবে যান। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর কোন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। কোথায়, কখন, কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয় কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু মৃত্যুর পর মুহূর্তে একটি অদৃশ্য শব্দ বহু মানুষের শ্রুতিগোচর হয়েছিল। তা হল, তোমরা জেনে রেখো, দুনিয়ার শান্তি দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে। এই আসমানী ঘোষণার মাধ্যমে পৃথিবীর লোকের কাছে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়ে যায়। তিনি কোথায় সমাধিস্থ হন তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলছেন বাগদাদে, কেউ বলছেন শাস দেশে। শাম দেশে হযরত লুত (আঃ)-এর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয় বলেও একটি কথা চালু আছে। একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন তাঁর প্রিয় বন্ধু কোথায়, পৃথিবীর কোন্ অংশের মাটিকে ধন্য করে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির ঘুমে ঘুমিয়ে আছেন।

ইবনে জামান ও ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ

লোক মুখে ওয়ায়েস কারনী রহমাতুল্লাহ-এর নাম শুনে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য খুবই উতলা হয়ে উঠলেন ইবনে জামান। তাঁর শারীরিক বর্ণনা জানা ছিল। একদিন ফোরাত নদীতে তিনি তাঁকে ওযু করতে দেখলেন। আর চিহ্নগুলি মিলিয়ে নিলেন মনে মনে। বুঝলেন, যাঁকে তিনি খুঁজছেন, ইনিই তিনি। ইবনে জামান তাঁকে সালাম জানিয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন।

তিনি সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু করমর্দন করলেন না। ইবনে জামান দেখলেন, কী অপরিসীম দারিদ্র্য ও দৈন্যদশায় ক্লিষ্ট হয়েছেন ওয়ায়েস কারনী রহমাতুল্লাহ। দারিদ্র্য-জর্জর লোকটিকে দেখে ইবনে জামানের চোখে পানি এল। তিনি কাঁদলেন। কাঁদলেন ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ-ও। ইবনে জামান বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।

হযরত ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ বললেন, হে হারম ইবনে জামান! আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন! আপনি কি জন্য এখানে এসেছেন? আর আমার সন্ধানই বা পেলেন কার কাছে? ইবনে জামান তাঁর কথা শুনে বিস্মিত। বললেন, জনাব আপনি আমার ও আমার পিতার নাম জানলেন কি করে? এর আগে তো আপনি আমাকে কখনও দেখেননি। হয়তো আমার কথা কখনও কারও কাছে শুনতেও পাননি।

ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ বললেন, যার জ্ঞানের অগোচর কিছুই নেই, তিনিই আমাকে জ্ঞাপন করেছেন। আমার আত্মা আপনার আত্মাকে চিনেছে।

তারপর ইবনে জামান মহান তাপসকে অনুরোধ করলেন, দয়া করে, রাসূলে কারীম সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ওয়ায়েস বললেন, আমি তাঁকে নিজের চোখে দেখিনি। কিন্তু তাঁর পূত-পবিত্র বাণী অন্যের মুখে শুনেছি। আমি মুহাদ্দেস বা ভাষ্যকার হতে চাইনা। আমার অন্য কাজ আছে।

আপনি যদি পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত পাঠ করে শোনান তো আমি শুনি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবনে জামানের অনুরোধে ওয়ায়েস কারনী রহমাতুল্লাহ পাঠ শুরু করলেন, 'আউজু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম।' এটুকু উচ্চারণ করেই তিনি আকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতেই পাঠ করে গেলেন, 'অমা খালাকতুন জ্বিন্না ওয়াল ইনসানা ইল্লা-লিইয়াবুদুন'– আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার উপাসনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করিনি।

আয়াতটি পাঠ করেই তিনি জোরেশোরে চিৎকার করে উঠলেন। মনে হল, তিনি বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু না, ইবনে জামানের উদ্দেশ্যে বললেন, বলুন, আপনি কি উদ্দেশে এখানে এসেছে? ইবনে জামান বললেন, আপনার প্রতি আমার ভক্তি ও ভালোবাসাই আমাকে টেনে এনেছে।

যিনি আল্লাহকে চিনেছেন তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাথে ভালোবাসা করে শান্তি পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে কেউ কোনদিন সুখী হতে পারে না।

এ ধরনের কথাবার্তার পরে ইবনে জামান আবার অনুরোধ করলেন, দয়া করে আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ এ অনুরোধ রক্ষা করলেন। বললেন, যখন ঘুমিয়ে যাবেন, তখন মনে করবেন মৃত্যু আপনার শিয়রে। আর যখন জেগে থাকবেন, তখন জানবেন মৃত্যু রয়েছে চোখের সামনে। কোন পাপকে ছোট মনে করবেন না। কেননা, পাপকে ছোট মনে করাও পাপ।

ইবনে জামানের পরবর্তী প্রশ্নঃ আমি এখন কোথায় বসবাস করব জনাব?

আপনি সিরিয়া চলে যান।

অপরিচিত দেশে আমার গ্রাসাচ্ছাদন কিভাবে চলবে?

যার মনে এত চিন্তা-ভাবনা, উপদেশে তার কোন কাজ হবে না।

দয়া করে আরও কিছু বলুন।

আপনার পিতার মৃত্যু হয়েছে। হযরত আদম, নূহ, মূসা, ঈসা, এমনকি শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-ও ইন্তেকাল করেছেন। তাই ওমরও মৃত্যুপথের পথিক। কথাটা বলেই তিনি হায় ওমর! হায়, ওমর! বলে কাঁদতে লাগলেন।

ইবনে জামান কেমন যেন দিশেহারা হয়ে বললেন, আল্লাহ আপনার ভাল করুন। কিন্তু জনাব, হযরত ওমর (রাঃ) তো মৃত্যুবরণ করেননি।

হযরত ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ বললেন, আল্লাহ আমাকে তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়ে দিয়েছেন। পরে বললেন, আসলে আপনি আমি আমরা সবাই মৃতদেরই দলভুক্ত।

এরপর নামাযের সময় উপস্থিত হলে হযরত ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ নামায সম্পন্ন করে দোয়া করলেন। তারপর বললেন, পাক কোরআন ও আল্লাহর ওলীদের কথা মেনে চলবেন। আর মুহূর্তের জন্যও মৃত্যুর কথা ভুলে যাবেন না। ইবনে জামান, আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। আমিও আপনার জন্যে দোয়া করছি। আপনি খাঁটি মুসলিমের জীবন যাপন করবেন। তিনি এবার ইবনে জামানকে পথনির্দেশ করে বললেন, আপনি এই পথ ধরে চলে যান। আমিও অন্য পথে বিদায় নিচ্ছি।

ইবনে জামান তাঁর সঙ্গে কিছুদূর যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।

বিদায় মুহূর্তটি করুণ হয়ে উঠল। দু'জনই কাঁদলেন। ইবনে জামানের সঙ্গে হযরত ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ-এর সেই প্রথম ও শেষ দেখা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মহাসাধকের জীবনচর্চাঃ

একটি বিবরণে পাওয়া যায়, হযরত ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ ফজরের নামায শেষ করে তসবীহ পড়তে পড়তে জোহরের ওয়াক্তে পৌঁছে যেতেন। আবার জোহরের নামায শেষে তসবীহ পাঠ করতে করতে যেত আসরের ওয়াক্ত। এই ভাবে নামায ও তসবীহ পাঠ চলত নিরবচ্ছিন্নভাবে কয়েক দিন ও রাত। আহার নেই, নিদ্রা নেই। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া নেই। আর এই জন্য ওযু বা গোসলেরও প্রয়োজন হতো না তাঁর। বিরামহীন এবাদত-বন্দেগী যেন তাঁর মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

বহু বিনিদ্র রজনী তিনি যাপন করেছেন। বলতেন, এই রাতটি আমার কিয়ামের জন্য, এই রাতটি রুকুর জন্য। এই রাতটি সেজদার জন্য ইত্যাদি।

লোকে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, হযরত আপনি কেমন আছেন? তিনি বলতেন, কী বলব, সেজদায় গিয়ে সেজদার তসবীহ পাঠ করতে করতে রাত কাবার হয়ে যায়। ফেরেশতাদের মতো একটু এবাদত করব মনে করি, কিন্তু আর হয়ে ওঠে না।

আপনি কেমন আছেন? –এই প্রশ্নের উত্তরে একবার বলেন, কেমন আছি তা কি করে বলব! ভোরে উঠে সন্ধ্যার আগেই মৃত্যু আসবে কিনা যে বলতে পারে না, সে আর কেমন থাকবে?

প্রশ্নকর্তা বললেন, তবুও বলুন, আপনার অবস্থা কি?

তিনি বললেন, এক সহায়-সম্পদহীন পথিক। তার পথ যে খুবই দীর্ঘ।

কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেন, নামাযের একাগ্রতা বলতে কি বোঝায়?

তাঁর উত্তর, যে নামাযে তীরবিদ্ধ হলেও নামায সম্পন্নকারী তা টের পায় না।

একবার তাঁর কাছে একটি লোকের এক আশ্চর্য খবর এল। লোকটি নাকি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কবরস্থানে বসে গলায় কাফনের কাপড় ঝুলিয়ে কেবল কেঁদে যাচ্ছে। আর কিছু করে না।

খবর শুনে হযরত ওয়ায়েস রহমাতুল্লাহ বললেন, তোমরা আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। সত্যিই, দীর্ঘদিন কেঁদে কেঁদে বেচারা কঙ্কালসার। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম– সব ছিকেয় উঠেছে। হযরত তাকে বললেন, হে ভ্রান্ত! কবর ও কাফনের কাপড় তোমাকে আল্লাহর নিকট থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। তোমাকে বিপথগামী করেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড় আর আল্লাহর পথ ধর।

হযরতের কথায় লোকটির হুঁশ হল। তওবা করে সে নামায-রোযা শুরু করে দিল।

শোনা যায়, একবার তিনি পর পর তিনদিন ধরে উপবাস রইলেন। চতুর্থ দিনে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে খাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল রাস্তার ওপর পড়ে থাকা একটি দীনারের ওপর। তাঁর মনে হল, হয়তো এটি অন্য লোকের। পড়ে গেছে পথের ওপর। কাজেই দীনারটি তুলে নিলেন না। এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। প্রচন্ড ক্ষুধার তাড়না। স্থির করলেন, কচি ঘাস চিবিয়ে ক্ষুধার জ্বালা মেটাবেন। ঠিক এ সময় কে যেন একখানি গরম রুটি তাঁর সমেন রেখে দিল। কিন্তু রুটির মালিক অন্য কেউ হবে ভেবে, তাও তিনি এড়িয়ে গেলেন। তখন একটি ছাগল বলল, এ রুটি আপনারই। দেখুন, আপনি যাঁর দাস, আমিও তাঁর দাস। ওয়ায়েস এ ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন। আর রুটিখানা তুলে নিলেন। ওদিকে চোখের পলকে ছাগলটি মিলিয়ে গেল।

এমন পবিত্রত্মা সচরাচর বিরল। হযরত ওয়ায়েস কারনী রহমাতুল্লাহ প্রকৃতই আল্লাহর এক মহান সৃষ্টি। মানুষ কত উন্নত হতে পারে, তিনি তার একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ। দীর্ঘ জীবন শেষে তিনি জান্নাতবাসী হন। কেউ কেউ বলেন, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে যোগদান করে শাহাদত বরণ করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিভিন্ন সময় বর্ণিত মহাতাপসের বাণীসমূহ ঃ

১. তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন, আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রতি তোমার যদি আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তাহলে আসমান-জমিন তুল্য এবাদত করলেও তা কবুল হবে না। সে এবাদত নিস্ফল। সে ব্যক্তি বলে, কিভাবে আস্থা রাখতে হবে?

২. তাঁর উত্তর, তোমার যা কিছু আছে, অর্থাৎ তোমাকে যা দিয়েছেন, তাতেই তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকবে। অন্য কোন জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

৩. তিনি আরও বলেন, তিনটি জিনিস যে খুব বেশী ভালোবাসে জাহান্নাম তার কণ্ঠ থেকেও নিকটবর্তী। যেমন (ক) সুখাদ্য, (খ) উত্তম পোশাক ও (গ) আমীর-ওমরার উমেদারী।

৪. তিনি বলেন, যে লোক আল্লাহকে চিনেছে, তার কাছে কোন কিছু গোপন নেই। আর তার মাধ্যমে আল্লাহকে জানা সম্ভব।

৫. শান্তি রয়েছে নির্জনতার মধ্যেই।

৬. একত্ববাদের জ্ঞান কেবল তখনই লাভ করা যায়, যখন আল্লাহর চিন্তা ছাড়া অন্য সব চিন্তা মন থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভুত হয়। আল্লাহর দরবারে মনকে হাজির রাখা চাই। তাহলে শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

৭. উচ্চ মর্যাদার অন্বেষণ করেছি, আর তা পেয়েছি বিনয়ের মাধ্যমে। গৌরব অর্জনের বাসনা ছিল, তা অর্জন করেছি দরিদ্রের মধ্যে। নেতৃত্ব লাভের আশা করছি, তা পেয়েছি সত্যের ভিতরে। আভিজাত্যের ইচ্ছা ছিল, আল্লাহ্-ভীতির মধ্য দিয়ে তা লাভ করেছি। মহত্ত্বের সন্ধান করেছি, আর তা পেয়েছি তুষ্টির মাধ্যমে। নির্ভরতার সন্ধান করেছি, আর তা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার মাধ্যমে পেয়ে গেছি।

হযরত ওয়াসে রহমাতুল্লাহ

'হে প্রভু! আপনি আপনার প্রিয় বন্ধুগণের ন্যায় আমাকেও অভাব গ্রস্ত করে রেখেছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, আমার কোন্ গুণে মুগ্ধ হয়ে আপনি আমাকে এ মর্যাদা দান করেছেন?'

প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এক মহান তাপসের এ মোনাজাতে স্পষ্ট হয়, দারিদ্র্যকে তিনি কী উচ্চ মর্যাদায় মহিমান্বিত করেছেন। অভাব গ্রস্থ হওয়াও মানুষের একটি গুণের মর্যাদা– একথা তিনিই পরম গভীর অনুরাগে উচ্চারণ করেন।

এই মহা-তাপসের নাম হযরত ওয়াসে রহমাতুল্লাহ। সে যুগের এক প্রখ্যাত আলেম ও সাধক ছিলেন তিনি। সারাজীবনে শুধু শুকনা রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেয়েছেন। অন্য কোন সু-স্বাদু উত্তম মুখরোচক খাদ্য গ্রহণ করেননি। তিনি বলতেন, যারা এরূপ আহার করে, তাদের কখনও অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

তাঁর জীবনে এমন বহুবার হয়েছে যে, হয়ত দু'চার দিন চলে গেল, খাবার কিছুই জুটল না। হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে তাঁর যাতায়াত ছিল।

তাঁকে দেখে হযরত হাসান খুব বেশী খুশী হতেন। সেখান থেকে কিছু খেয়ে আসতেন মাঝে মাঝে।

তাঁর সম্বন্ধে হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ বলতেন, তাঁর মতো ভাগ্যবান ব্যক্তি আর নেই, যিনি পেটে ক্ষুধা নিয়ে সকাল বেলায় বিছানা থেকে ওঠেন আর ক্ষুধা নিয়েই রাতের বেলায় বিছানায় যান। আর এত কষ্ট সত্ত্বেও আল্লাহর এবাদতে বিমুখ হন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরমুখাপেক্ষী আর পরনির্ভরশীল না হওয়াকেই তিনি বলতেন প্রকৃত বাদশাহী। তাঁর কথা, তুমি যদি বেলায়েতের অধিকারী হতে চাও এবং কারও কাছ থেকে কোন কিছু প্রত্যাশা না কর আর সৃষ্টিজগতকে একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করতে পার, তাহলে তোমাকে আর কারও মুখাপেক্ষী হতে হবে না, কারও প্রতি কোন কাজে নির্ভরও করতে হবে না।

হযরত মালেক দীনার রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ অপেক্ষা রসনা সংযত করাই কঠিন।

প্রখ্যাত সাধক কোতায়বা রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। একদিন তিনি তাঁর দরবারে হাজির হন অতি সাধারণ জীর্ণ পোশাকে। হযরত কোতায়বা রহমাতুল্লাহ তাঁর পোশাকের অবস্থা দেখে বললেন, আপনি এমন পোশাক পরেছেন কেন? হযরত ওয়াসে কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন। তিনি আবারও বলেন, কী হল! কথা বলছেন না যে! এবার তিনি বললেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর কী দেব ভেবে পাচ্ছি না। আমি উভয় সঙ্কটে পড়েছি। যদি বলি দরবেশ-ফকীরের পোশাক এরূপ সাদা সিধা অনাড়ম্বর হওয়া উচিত, তাতে একটা অহমিকার ভাব ফুটে ওঠে। আবার যদি বলি, আল্লাহ আমাকে দামী পোশাক পরার তওফীক দেননি, তিনি যেভাবে রেখেছেন সেই ভাবে সে রকম পোশাক পরে আছি, তাতেও মনে হয় আল্লাহর ওপর কিছু অভিমান-অভিযোগ প্রকাশ পায়। তাই আমি কিছু না বলে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করি।

অর্থাৎ সামান্য অহমিকাও তাঁকে বিব্রত করত। আর বিলাসিতার ব্যাপারটি তিনি মোটেই মেনে নিতে পারতেন না। তাঁর পুত্রের মধ্যে অহমিকা ও বিলাসিতার কিছু আভাস পেয়ে তাকে কাছে ডেকে তিনি বললেন, তুমি কে, তা কি তুমি জান? তোমার মাকে মাত্র দু'শ দেরহাম দিয়ে বিয়ে করে এনেছি। আর আমি তোমার পিতা– সকলের চেয়ে এক অধম মুসলমান। আল্লাহর এক দীনতম দাসানুদাস। এখন ভেবে দেখ, মা-বাবা যার তুচ্ছতম দাস-দাসী, তাদের সন্তান হয়ে অহঙ্কার প্রকাশ করা কি তোমার শোভা পায়?

এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হুযুর, আপনি ভালো ও সুস্থ মনে আছেন তো? তিনি জবাব দেন, প্রতি মুহূর্তে জীবনের আয়ু ক্ষয় হয়ে চলেছে। কিন্তু পুণ্য বলতে কিছু নেই। বরং পাপের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় কি ভালো থাকা যায়? না মনে-প্রাণে সুস্থ থাকা সম্ভব?

হযরত ওয়াসে প্রায় বলতেন, আমি সব জিনিসের মধ্যেই আল্লাহর নিদর্শন দেখি।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয় আপনি কি আল্লাহকে চিনেছেন। তিনি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকেন। তারপর বললেন, আল্লাহকে যে চিনেছে সেই নির্বাক ও নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহকে চিনবার পর মানুষ আর বেশী কথা বলতে পারে না। আর আল্লাহর অশেষ ইচ্ছায় যার মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, সে কখনও আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দিকে ফিরেও দেখে না। তিনি আরও বললেন, কেউ কোনদিন প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না, যতদিন না তার মনে আশা ও নিরাশা সমান ভাবে বিরাজ করে।

বহু ওলী-দরবেশের সংস্পর্শ-ধন্য মহান আল্লাহ-প্রেমী এই সাধক অধ্যাত্ম-জগতের এক বিস্ময়কর আদর্শ হিসেবে আলোক স্তম্ভের মতো মানুষের মনোলোকে বিরাজ করছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
হাবীব আজমী
রহমাতুল্লাহ

বসরার এক বিত্তশালী সুদ ব্যবসায়ী। সুদের বিরাট কারবার। শহরে প্রচুর তার খাতক। তিনি তাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সুদ আদায় করেন। খুব কড়া লোক– কঠোর হৃদয়।

একদিন সুদ আদায়ে তিনি গেলেন এক খাতকের বাড়ী। বাড়ীর মালিক তখন অনুপস্থিত। তার স্ত্রী বলল, সে তো নেই। আর আপনাকে দেবার মতো টাকাও নেই। সুদের মহাজন কিন্তু শুনবেন না। কিছু আদায় না করে খালি হাতে তিনি কিছুতেই ফিরতেন না। বললেন, টাকা না থাক আর কিছু কি নেই? যা আছে তাই দাও। একটি ছাগলের মাথা আছে; স্ত্রীলোকটি বললেন। যদি ঋণের সুদ হিসেবে নিতে চান তবে তাই দিতে পারি। মহাজন তাতেই খুশী। বললেন তাই দাও।

অতএব, ছাগলের মাথা নিয়েই তিনি বাড়ী ফিরলেন। গিন্নীকে বললেন রান্না করতে। গিন্নী জানালেন, বাড়ীতে আজ রুটিও নেই জ্বালানিও নেই। অতএব, মহাজন ছুটলেন অন্য এক খাতকের বাড়ীতে। রুটি আর জ্বালানি এনে স্ত্রীকে দিলেন। রান্না হল। উত্তম রান্না। আর তা পরিবেশিত হল। মহাজন খেতে বসে গেলেন। আর তখন– তখনই এক ভিখারী এসে দরজায় দাঁড়ায়। তার প্রার্থনা– কিছু খাবার। মহাজন সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, এখানে কিছু হবে না। এখন ঘরে যা আছে তা দিলেও তোমার পেট ভরবে না। অথচ আমার অসুবিধা হবে। ভিখারী আর কী করে। নিঃশব্দে চলে যায়। আর স্ত্রী রান্না ঘরে গিয়ে স্বামীর জন্য যে খাবার নিতে যাবেন, তখুনি দেখেন যে, গোশত টকটকে লাল তাজা রক্ত। তিনি ভয়ে ভয়ে স্বামীকে বললেন, দেখুন কী ব্যাপার! গোশত ঝোল সব রক্তে পরিণত হল কেন?

দেখে-শুনে মহাজনও থ হয়ে গেলেন। অবাক কাণ্ড! কোথা থেকে কী হল, ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে ভাবান্তর দেখা দিল। কী কারণে এক পেয়ালা গোশত, রক্তে পরিণত হল, বুঝতে তাঁর অসুবিধা হল না। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল তাঁর। সুদের বদলে মানুষের রক্ত শুষে খেয়েছেন তিনি। তাই আজ ঠোঁটের কাছে রক্তের পেয়ালা। স্ত্রীকে বললেন, এ আমার এতদিনের কু-কর্মের ফল। এই মুহূর্তে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আর সুদের কারবার করব না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার ওপরে গজব পাঠাবেন। এটি তারই পূর্বাভাস।

পরের দিন সুদের বদলে মূল টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে মহাজন বেরিয়ে পড়লেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, ককেটি ছেলে খেলা করছে। তাঁকে দেখামাত্র ছেলেরা বলে উঠল, ঐ যে সুদখোর আসছে। চল, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। না হলে এর গায়ের বাতাস গায়ে লাগলে আমরাও ঘৃণিত মানুষ হয়ে যাব। বলতে বলতে তারা সত্যিই দৌড়ে পালাল।

কথাগুলো কানে গিয়েছিল মহাজনের। লজ্জায়-দুঃখে তিনি যেন মাটিতে মিশে যেতে চাইলেন। মনে এল প্রচুর অনুশোচনা ও ধিক্কার। পৃথিবী অর্থহীন হয়ে গেল তার নিকট। আর খাতকদের সঙ্গে দেখা করা নয়। মত যখন পরিবর্তিত হয়েছে, তখন পথেরও পরিবর্তন প্রয়োজন। পথ-যাত্রা তিনি চলার গতি ঘুরিয়ে দিলেন হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর দরবারের দিকে। মহাসাধক হাসান রহমাতুল্লাহ তাঁকে তওবা পড়িয়ে দ্বীন-দুনিয়া সম্বন্ধে কিছু অমূল্য উপদেশ দিলেন।

হাসানের দরবার থেকে বাড়ী ফিরছেন। পথে এক খাতকের সঙ্গে দেখা। রক্তশোষক মহাজনকে দেখামাত্র সে দৌড় লাগাল আর কী! কিন্তু মহাজন বললেন, শোন, তোমার আর পালাবার দরকার নেই বরং এখান থেকে আমারই পালিয়ে যাওয়া উচিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরপর আর একদিন পথে বেরিয়েছিলেন তিনি। দেখলেন, আজও বেশ কিছু ছেলে রাস্তার ওপর খেলা করছে। মহাজনকে দেখে তারা খেলা বন্ধ করে বলতে থাকে, এখন খেলা উচিত নয়। ঐ দেখ, তওবাকারী আসছেন। তাঁর গায়ে যদি ধুলোবালি লাগে তাহলে আমাদের পাপ হবে। তাছাড়া তিনি যদি এভাবে আমাদের খেলতে দেখেন, তাহলে অখুশীও হবেন।

অর্থাৎ হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর নিকট তওবা করে তিনি যে আল্লাহর এবাদত শুরু করেছেন, সে খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে।

ছেলের মুখে এসব কথা শুনে মহাজনের বুকে যেন আবেগের ঢেউ ওঠে। কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন, হে মহিমাময়! আপনার মহিমার অন্ত নেই। মাত্র কয়েকটি দিন হল, আমি আপনার পথ অবলম্বন করেছি। অথচ এর মধ্যে আপনার এবং বিধ করুণা। আপনি পারেন না এমন কিছু নেই।

পরদিনই তিনি ঘোষণা করে দিলেন, যে সব লোক মহাজনের কাছে সোনা-রূপোর গয়না বন্ধক দিয়ে সুদে টাকা ধার নিয়েছে তারা যেন অবিলম্বে ঐ সব বন্ধকী মাল ফেরত নিয়ে নেয়। আর তার জন্য ঋণের টাকা দিতে হবে না। তিনি সবকিছু মওকুফ করে দিয়েছেন।

ঘোষণা শুনে শহর শুদ্ধ লোক খুশী। সবাই দোয়া করল তাঁকে আর ফিরিয়ে নিয়ে গেল নিজ নিজ সোনা ও রূপার বন্ধকী মাল। তাছাড়া মহাজনের যা কিছু নিজস্ব ছিল, তাও তিনি বিলিয়ে দিলেন গরীবদের মাঝে। এমনকি তাঁর নিজের একটি মাত্র জামা আর তাঁর স্ত্রীর একখানি শীত বস্ত্র– তাও দিয়ে দিলেন এক মিসকীনকে। যিনি ছিলেন এক রক্ত-শোষক জোঁক, তিনি হয়ে গেলেন সর্বস্ব ত্যাগী দীন ভিখারী। বিষয়াসক্তির প্রাবল্য ছিল যার শিরায়, আল্লাহর অনুপম ইচ্ছায় স্বার্থ-শূন্য মাসুম দরবেশ হয়ে গেলেন। কে এই কুসদী-জীবী মহাজন, যিনি অপাপবিদ্ধ মহাতাপসে রূপান্তরিত হলেন?

তিনিই হযরত হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ। ইরানের আজম এলাকার ছিলেন বলে তাঁর নামটি আজমী শব্দ দ্বারা খচিত। তাঁর কঠোর জীবন-সাধনা বিশ্বের বিস্ময়। সত্যবাদিতা, সততা ও নিষ্ঠার জন্য তিনি চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। লক্ষণীয়, তিনি হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর সমসাময়িক সুখ্যাত সাধক ছিলে।

এবাদতে মগ্নতা ঃ

নিঃস্ব অবস্থায় সংসার চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীর জন্য ফোরাত নদীকূলে একটি কুটির নির্মাণ করলেন। দিনের বেলায় তিনি দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। আর দিন ফুরালে কুটিরে গিয়ে মহান প্রভুর এবাদতে মগ্ন হতেন। তাঁর স্ত্রীও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন।

দিন যেতে লাগল উপবাসে, অর্ধোবাসে। তাঁর স্ত্রী কিন্তু অচিরেই কাতর হয়ে পড়েন আর স্বামীর কাছে কিছু খাবার চান। হাবীব রহমাতুল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি এক্ষুণি মজুর খেটে কিছু রোজগার করে আনছি।

বললেন বটে, কিন্তু মজুর না খেটে তিনি হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর বাড়ী হয়ে সোজা চলে গেলেন নদী তীরবর্তী এবাদতখানায়। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরলে তাঁর স্ত্রী আবার খাবারের খোঁজ নিলেন। হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি যে মনিবের মজদুরি শুরু করেছি, তিনি এক বিরাট মহাজন। সবেমাত্র কাজ শুরু করেছি। এক্ষুণি মজুরি চাইতে লজ্জা লাগছে। কম করেও দশটা দিন যাক। তখন কিছু চাইব বলে মনে মনে ভেবে রেখেছি। তুমি খুব কষ্ট সহ্য করছ তা বুঝছি। তবে আর একটু ধৈর্য্য ধর। নিশ্চয়ই এর বিনিময়ে কিছু পাব। এত কষ্ট বৃথা যেতে পারে না।

www.AmarIslam.com

স্ত্রী আর কিছু না বলে চুপচাপ রইলেন সময় নিঃশব্দে পার হয়ে গেল। হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ নিবিড় সাধনায় মগ্ন। দেখতে দেখতে ন'দিন কেটে গেল। দশম দিনে স্ত্রীর কাছে বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল তাঁর। তিনি এবার ভাবছেন, আজ গিয়ে তাঁকে কী বলবেন? কী নিয়ে বাড়ী ফিরবেন। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। এদিকে হযরত গৃহিণী বাড়ীতে একা। তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে। প্রতি মুহূর্তে স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় রয়েছেন তিনি। আজ দশ দিন। অবশ্যই কিছু আহার্য নিয়ে সহাস্যে তিনি বাড়ীর আঙিনায় এসে দাঁড়াবেন। ঐ বুঝি তাঁর পদধ্বনি। হ্যাঁ, তাই তো, পায়ের আওয়াজই বটে। তবে তাঁর নয়, দুয়ারে চার তরুণের মিলিত পায়ের শব্দ শোনা গেল। অবাক হয়ে তাপস-পত্নী দেখলেন, তরুণেরা সঙ্গে এনেছে এক বস্তা আটা, বিরাট এক পাত্র ভর্তি গোশত, এক ভাঁড় মধু, এক ডিব্বা ঘি, আর তিনশ' দেরহাম ভর্তি একটি থলে। তাঁরা বললেন, তাঁর কাজে যত বেশী উন্নতি হবে, তাঁর মজুরিও তত বেড়ে যাবে।

মাল পত্র নামিয়ে দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে লঘু পায়ে বাড়ীতে এলেন হযরত হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ। মুখে বিষণ্নতার ছাপ। পত্নীকে মৌখিক সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তাঁর কোন গত্যান্তর নেই। অনশণক্লিষ্ট পত্নীর চোখের দিকে তিনি তাকাবেন কী করে? আর তাঁর প্রশ্নের জবাবে কীই বা উত্তর দেবেন? কিন্তু ওকি! পত্নীর উপবাসী মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মনে হল, মুখখানি প্রসন্ন-প্রফুল্ল। আর ঘরের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে মধু ও খাঁটি ঘিয়ের ম-ম গন্ধ। অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার বল তো?

স্ত্রী বললেন, আপনার মনিব খুব ভালো লোক। সবকিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন। পুরো ঘটনা শুনে হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ আল্লাহর উদ্দেশ্যে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তিনি অন্তর্যামী সর্বদর্শী। নিজের দায়িত্ব পালনে অনলস। তাই পিয় বন্ধুর প্রতি কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটি হয়নি। তরুণের ছদ্মবেশে ফেরেশতা পাঠিয়ে জান্নাতী সওগাত দিয়ে গেছেন। স্ত্রীকে বললেন, দেখলে গো, একটু কষ্ট স্বীকার করে আল্লাহর ওপর নির্ভর করায় তিনি কী উপঢৌকন দিয়ে গেলেন।

তাঁর সাধনা আরও গভীরতর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি মানুষের জন্য যা দোয়া করেন তা ফল-প্রসূ হত। একদিন এক মহিলা তাঁর দরবারে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বহুদিন হল আমার একমাত্র ছেলে হারিয়ে গেছে। তার কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। আমার চোখ অন্ধকার। বেঁচে থাকা অর্থহীন। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেন।

তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে?

সে দু'টি রূপার টাকা বের করে দিল। হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ টাকা দু'টি এক ভিখারীকে দান করে দিলেন। তারপর পুত্রহারা জননীকে বললেন, মা গো! বাড়ী যাও। গিয়ে দেখবে, তোমার ছেলে বাড়ী ফিরেছে। আর একথা শুনে সে ছুটে গেল বাড়ীর পথে। বেশী দূর যেতে হল না। জননীর কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হল আনন্দ আবেগ– দয়াময়! আপনার দয়ায় আমি আমার হারানো নিধি ফিরে পেয়েছি। এদিকে মাকে পথে দেখতে পেয়ে ছেলেও ছুটে এল তার কাছে। বলল, আমি পথ হারিয়ে কেরমান শহরে গিয়ে পড়েছিলাম। আমাকে দেশে পৌঁছে দেবার মতো কোন লোক আমি পাইনি। অগত্যা একজন শিক্ষকের কাছে আমি লেখাপড়া শুরু করি। উনি আমাকে বাজারে গোশত কিনতে পাঠান। গোশত কিনে বাজার থেকে ফিরছি, হঠাৎ এক প্রবল ঘূর্ণিবায়ু আমাকে শূন্যে উঠিয়ে নিল। তার পূর্ব মুহূর্তে আমার কানে ভেসে আসে, কে যেন বাতাসকে বললেন, হে বাতাস! তুমি ছেলেটাকে তার দেশে পৌঁছে দাও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনে পড়ে হযরত সুলায়মান (আঃ) বাতাসের ওপর ভর করে এক মাসের পথ একদিনে পাড়ি দিতে পারতেন। রাণী বিলকিসের সিংহাসন চোখের পলকে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর রাজধানীতে নীত হয়। যখন যা ইচ্ছা, আল্লাহ্ তখনই তা করতে পারেন। তাঁর বায়ুযানের চেয়ে দ্রুতগামী যান কবে কোন্ মানুষ তৈরী করতে পেরেছে? আল্লাহর ক্ষমতার কি কোন তুলনা আছে?

শহর বসরায় একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। খেতে না পেয়ে সাধারণ মানুষ মৃত্যুর কবলে। হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ বড় বড় বণিকের কাছ থেকে বাকীতে খাদ্য শস্য কিনে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। পরে মহাজনেরা টাকা আদায়ে এলে একটি থলে থেকে টাকা বের করে তিনি যাবতীয় পাওনা শোধ করে দিতেন। বলা হয়, ঐ টাকার থলেটি তাঁর বালিশের তলায় থাকত। আর যখনই টাকা বের করতেন, তখনই থলেটি আপনা হতে আবার পূর্ণ হয়ে যেত।

আরও আশ্চর্যের কথা, হজ্জ মওসুমে জিলহজের ৮ তারিখ বসরার লোক তাঁকে বসরায় দেখতে পেতেন। পরদিন ৯ জিলহজ তাঁকে দেখা যেত মক্কা শরীফে। বসরা থেকে আগত হজ্জযাত্রীদের সঙ্গে তিনি আরাফাতের ময়দানে যাচ্ছেন। অথচ বসরা থেকে মক্কা বেশ কয়েকদিনের দূর-পথ।

দুই মহাতাপসের মিলন ঃ বসরার এক চৌরাস্তার পাশে ছিল হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ-এর বাড়ী। তিনি প্রায়ই একটি চামড়ার পোশাক পরতেন। একদিন জামাটি খুলে চৌরাস্তার ওপর রেখে তিনি কোন কাজে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ। জামাটি দেখে তাঁর মনে হল আত্ম-ভোলা হাবীব হয়ত ভুলে জামাটি এখানে ফেলে গিয়েছে। এভাবে এটি এখানে পড়ে থাকলে কেউ কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে ভেবে তিনি ওখানে পায়চারি করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ ফিরে এসে পায়চারিরত তাপসকে দেখতে পেলেন। তিনি হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এখানে এভাবে পায়চারি করার কারণ কী হুযুর?

হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি কার ওপর ভরসা করে জামাটি এখানে ফেলে রেখে গিয়েছ মন-ভোলা?

হাবীব রহমাতুল্লাহ উত্তর দিলেন, যিনি আপনাকে এর পাহারায় মোতায়েন করেছেন তাঁরই ওপর নির্ভর করেছিলাম। উত্তর শুনে হরত হাসান রহমাতুল্লাহ তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, হাবীব! তুমি ধন্য।

একদিন হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ হঠাৎ এসে পড়লেন হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ-এর বাসভবনে। তাঁর ভান্ডারে তখন যবের রুটি আর সামান্য লবণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি তাই এনে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-এর সামনে উপস্থিত করলেন। মহামান্য অতিথিও দ্বিরুক্তি না করে দিব্যি বসে গেলেন আহারে। ঠিক তখনই দরজায় হাঁক দিল এক ভিখারী। সেও কিছু খাবার চায়। হাবীব রহমাতুল্লাহ হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর খাবার পাত্র থেকে পুরো রুটিখানা আর লবণটুকু তুলে নিয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন।

এবার হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বললেন, তোমাকে সুযোগ্য লোক বলে আমি মনে করতাম এবং এখনও তাই করি। কিন্তু তার সাথে জ্ঞানেরও সংযোগ ঘটলে ভাল হত। মেহমানের সামনে থেকে এভাবে সম্পূর্ণ খাবার উঠিয়ে নেওয়া জ্ঞানীর কাজ নয়।

হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ নিরুত্তর রইলেন। পরে তাঁরই এক পরিচারক খাঞ্জাভর্তি খাবার এনে হাজির। নানা রকম সু-স্বাদু, উত্তম খাবার। খাঞ্জায় পাঁচশ' মুদ্রাও ছিল। হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ মুদ্রাগুলো গরীব লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। অতঃপর

www.AmarIslam.com

মহান অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসলেন। খাওয়া শেষ হল পরম পরিতৃপ্তি সহকারে। শেষে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ-কে উদ্দেশ্য করে হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ বললেন, হযরত! আপনি খুব বড় সাধক সন্দেহ নেই। আপনি বিদ্যা ও জ্ঞানের সাগরও বটে। তবে এর সাথে কিছুটা বেশী ইয়াকীন থাকলে আরও ভালো হত।

হযরত হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ একদিন মাগরিবের নামাজের ইমামতি করছেন। এ সময় হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ এসে জামাতে শামিল হলেন। নামাজ পড়ার সময় হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ ঠিকভাবে সূরা ফাতেহার আলহামদু শব্দের উচ্চারণ করতে পারলেন না। তাঁর অশুদ্ধ উচ্চারণ শুনে হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ মনে করলেন, এই ইমামের পেছনে নামাজ পড়লে তো নামাজ আদায় হবে না। তিনি জামাত ছেড়ে একা একা নামাজ পড়লেন।

আর ঐ রাতেই হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ এক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি যেন আল্লাহর কাছে জানতে চাইছেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার সন্তুষ্টি লাভের উপায় কি? মহিমাময় আল্লাহ্ তাঁকে জানালেন, তুমি আমার সন্তুষ্টি লাভ করেছ ঠিকই, কিন্তু তার মর্যাদা রক্ষা করনি।

কেমন করে প্রভু? তিনি ফের জিজ্ঞেস করলেন।

আল্লাহ্ বললেন, তুমি আমার প্রিয়জন হাবীবের কেরাত পাঠের অশুদ্ধতাই দেখলে, অথচ তাঁর অন্তরের বিশুদ্ধতার দিকে নজর দিলে না। জেনে রেখো, বহিরাঙ্গের বিশুদ্ধতার চেয়ে অন্তরঙ্গের বিশুদ্ধতার অনেক বেশী মূল্য। আজ তুমি যদি হাবীব আজমীর পেছনে নামাজ পড়তে তাহলে সে নামাজ তোমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট নামাজ হত।

হযরত হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ কিন্তু জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট কাজই করেছেন। একবার হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সৈন্যদের ভয়ে হযরত হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ-এর এবাদতগাহে ঢুকে পড়েন। তাঁর পেছনেই সৈন্যদল এসে হাজির। তাঁরা হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করল, হাসান গেল কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, মসজিদে আছেন। সেনারা তন্ন তন্ন করে মসজিদ খুঁজল। কিন্তু তাঁকে কোথাও পেল না। তারা আবার আজমী রহমাতুল্লাহ-কে শুধালেন, ঠিক করে বলুন, তিনি কোথায় আছেন? হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ বললেন, বলেছি তো, তিনি মসজিদেই আছেন।

তারা আবারও মসজিদ খুঁজে দেখল খুব ভালো করে। কিন্তু এবারও তাঁর পাত্তা পেল না। পাত্তা না পেয়ে তারা বিরক্ত হল। রেগেও গেল। তারপর রাগত স্বরে হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ-কে বলল, হাজ্জাজ যে আপনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, তা তিনি ঠিকই করেন। আপনারা তার উপযুক্তই বটে। আপনারা মিথ্যাবাদী। মসজিদের কোথাও হাসান নেই, অথচ আপনি বলছেন, তিনি এখানেই আছেন। হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি নিজের চোখে তাঁকে মসজিদে ঢুকতে দেখেছি। এখন আপনারা যদি তাঁকে দেখতে না পান তো, আমি কী করব?

তাঁর কথা তাদের বিশ্বাস হল না। তারা চলে গেল। হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ বেরিয়ে এসে হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, ওরা যে বারবার আমার সামনে দিয়ে গেল। এমনকি আমার ওপর হাতও রাখল একবার, অথচ আমাকে সনাক্ত করতে পারল না। আমি দুঃখ প্রকাশ করছিলাম, আমি তোমার গুরু হওয়া সত্ত্বেও তুমি মসজিদে আমার প্রবেশ-সংবাদ ওদের জানিয়ে দিলে। তোমার কি এটা উচিত হয়েছে?

হাবীব রহমাতুল্লাহ বললেন, দেখুন, সত্য তো বলতেই হবে। আর আমি সত্য বলেছি বলেই আপনি আজ বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। না হলে দু'জনেই বন্দী হতাম।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ কালাম পাঠ করেছিলে হাবীব, যার দৌলতে ওরা আমাকে দেখেও দেখতে পেল না।

হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ উত্তর দিলেন, আমি দু'বার পবিত্র আয়তুল কুরসী, দশবার সূরা এখলাস ও দশবার 'আমানার রাসূল' ... পাঠ করে আল্লাহর সমীপে বলেছিলাম, প্রভু আমার! আমি আমার গুরুকে আপনার হাতে সোপর্দ করলাম। আপনি তাঁকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়জনের কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। তিনি নির্বিঘ্ন রইলেন।

অপাপবিদ্ধ হৃদয় ঃ একবার দজলা নদীর পারে যাবার জন্য খেয়া নৌকার প্রতীক্ষায় আছেন হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ। এমন সময় কোথা থেকে সেখানে এসে পড়লেন হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ। ওপারে যাবার জন্য তিনি নৌকার অপেক্ষায় আছেন এই কথা জানতে পেরে হাবীব রহমাতুল্লাহ বললেন, কেন হুযুর, আপনিই তো বলেছেন, মন পরিষ্কার রেখে পানির ওপরে দিয়ে হেঁটে যাবে। আমি নিজে তা পরীক্ষা করেছি। এই দেখুন, বলে তিনি পায়ে হেঁটে পানির ওপর দিয়ে নদী পার হয়ে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত হাসান অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর সম্বিৎ ফিরে এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার কী হয়েছিল হুযুর? তিনি উত্তর দিলেন, আমার শিষ্য হাবীব আমার নির্দেশ অনুযায়ী অমন করে অনায়াসে নদী পার হয়ে গেল, অথচ আমি পারলাম না। তখন আমার মনে হঠাৎ বিচারদিবসের কথা উদয় হল, আমি কি পুলসিরাত পার হতে পারব? যদি না পারি, আমার কি হবে? এ কথা ভেবে আমি বেহুশ হয়ে যাই।

পরে একদিন তিনি তাঁর শাগরেদকে বললেন, সেদিন তোমার যোগ্যতা দেখে আমি অবাক হয়েছি। বল, কোন্ আমল দ্বারা তুমি এ যোগ্যতা অর্জন করেছ?

হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ বললেন, হুযুর! আপনারই শিক্ষাঃ

(ক) মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর কর।

(খ) পার্থিব জীবনের আসক্তি পরিহার কর।

(গ) বিপদ-আপদকে সম্পদ বলে বিবেচনা করে মনে-প্রাণে বিশ্বাস কর যে, সবই আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়।

এরপর আল্লাহর নাম স্মরণ করে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। তখন হযরত হাসান রহমাতুল্লাহ আল্লহাকে সম্বোধন করে বললেন, প্রভু গো! অনেকেই আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে সফল হয়ে গেল, কিন্তু আমি যে অযোগ্য থেকে গেলাম।

এসব ঘটনার বিবরণ শুনে মনে হতে পারে, হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ তাঁর গুরু হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর চেয়েও উন্নত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বিষয়টি এভাবে নিলে ঠিক হবে না। আল্লাহর কাছে এলমের মর্যাদা অনেক বেশী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে রাব্বুল আলামীন বলেছিলেন, হে নবী! আপনি প্রার্থনা করুন, হে প্রভু! আপনি আমার এলম বৃদ্ধি করুন।

পণ্ডিতগণ বলেন, তরীকতের পথে কারামতের দরজা চৌদ্দ আর মারেফতের আঠারো। কারামত সফল হয় এবাদতের মাধ্যমে। আর মারেফতের সাফল্য নির্ভর করে এলমে– প্রজ্ঞা তথা বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধ্যান ও গবেষণার ওপর।

হযরত সুলায়মান (আঃ) একাধারে আল্লাহর নবী আর মহাশক্তিধর সম্রাট ছিলেন। জ্বিন-পরী, দৈত্য-দানব, পশু-পক্ষী এমনকি বাতাসের ওপরেও তাঁর প্রভুত্ব কায়েম ছিল। অথচ তিনি ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুবর্তী। তাঁকে তওরাতের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হত। তাতেই বোঝা যায়, কারামতের দিক দিয়ে হযরত হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহ-এর স্থান উচ্চে মনে হলেও এলমে মারেফত, হাকীকত, তরীকত ও শরীয়তের সামগ্রিক বিচারে হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর স্থান শীর্ষে।

www.AmarIslam.com

বিশ্ব-নন্দিত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ একবার কোন এক স্থানে মিলিত হন। ঘটনাক্রমে সেখানে হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ-ও উপস্থিত হন। ইমাম হাম্বল রহমাতুল্লাহ প্রশ্নটা করেই বসলেন– কোন লোক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেনি। আর কোন্ ওয়াক্ত আদায় করেনি তাও তার মনে নেই, এক্ষেত্রে সে কী করবে?

হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ বললেন, মনে হয় লোকটা বড় বেশী ভ্রান্ত। তার কিছু শেখা দরকার। পুরো পাঁচ ওাক্ত নামাজই তাকে আদায় করতে হবে। এ জ্ঞানগর্ভ উত্তরে ইমামদ্বয় বিস্মিত হলেন।

মহাসাধকের ব্যবহারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য মানুষকে আরও বেশী মুগ্ধ করে। প্রায় বিশ বছর ধরে একজন পরিচারিকা তাঁর সেবা করেছেন। অথচ তিনি কখনও তাঁর চেহারা দেখেননি। একদিন তিনি তাঁকেই বললেন, আমার পরিচারিকাকে ডেকে দাও দেখি। সে বলল, হুযুর, আমিই তো আপনার পরিচারিকা।

দীর্ঘ দিনের মধ্যে যার চোখ-মুখ-চেহারার দিকে এক পলকও যিনি তাকাননি, তাঁকে তিনি চিনবেন কী করে?

মহা-তাপস আল্লাহকে বলতেন, আপনাকে লাভ করে যে খুশী হতে পারেনি, সে যেন অন্য কিছু লাভ করেও খুশী না হয়। আপনার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, অন্যের প্রতি তার যেন আকর্ষণ না থাকে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি কিসে লাভ করা যায়? কেউ প্রশ্ন করেন। তাঁর উত্তর, হৃদয়কে একাগ্র ও অকপট করতে হবে। পাক কালামের পাঠ শুনলেই তিনি কাঁদতেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হত, আপনি তো আজমী। কোরআনের ভাষা আরবী। এর অর্থ না বুঝেই আপনি কাঁদেন কেন? তাঁর উত্তরঃ আমি আজমী ঠিকই। কিন্তু আমার অন্তর আরবী ময়। এক সাধক একদিন তাঁর সম্বন্ধে বলে ফেললেন, এই আজমী হলেও তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এক খুনীকে হত্যাপরাধে শূলে দেওয়া হয়। কিন্তু লোকে স্বপ্ন দেখে, সে দিব্যি উন্নত পোশাকে জান্নাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, আমাকে যখন শূলে চড়ানো হয়, তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ। তিনি আমার পারলৌকিক মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আর সেই দোয়ার বরকতেই আমার এই জান্নাতবাস।

হযরত
আবু হাশেম মক্কী
রহমাতুল্লাহ

মুসলিম দুনিয়ার খলীফা হেশাম বিন আবদুল মালেক। মহা-প্রতাপশালী, মহিমান্বিত। কিন্তু তিনিও এক মহাতাপসকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি শাসক। শাসন কাজে নিযুক্ত থেকে আমি কিভাবে মুক্তি পেতে পারি?

দরবেশ উত্তর দিলেন, আপনার প্রতিটি দেরহাম যেন সিদ্ধ স্থান থেকে উপার্জিত হয় আর সিদ্ধ স্থানে ব্যয় করা হয়। তা কি সম্ভব? খলীফার কুণ্ঠিত জিজ্ঞাসা। জাহান্নামের ভয়ে যে ভীত আর জান্নাতের লোভে লালায়িত, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন যার উদ্দেশ্য, তার পক্ষে সেটি খুবই সহজ ও সম্ভব।

এই মহা প্রাজ্ঞ সাধক হলেন হযরত আবু হাশেম মক্কী রহমাতুল্লাহ। অত্যন্ত আল্লাহ্ভীরু, ধর্মনিষ্ঠ এক মানুষ। জগতের বহু উজ্জ্বল পুরুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছিল তাঁর। বিশেষ করে হযরত আনাস (রাঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমুখের সান্নিধ্য তাঁর ভাবী জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বহু বিদগ্ধ পন্ডিত বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর জীবনালেখ্য আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত আবু ওসমান মক্কী রহমাতুল্লাহ।

তাঁর বক্তব্য ছিল, পার্থিব কামনা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, বিচার দিবসে পার্থিব বিষয়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলা হবে, যে বস্তুগুলোকে নিকৃষ্ট বলে আল্লাহ্ পাক নির্দিষ্ট করেন, এরা মনের আনন্দে সেগুলোকেই গ্রহণ করে। আজ এইজন্য এদের কার্যকলাপকে পদপিষ্ট করা হল।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় বা বস্তু নেই, যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না, ব্যগ্রতা বা অস্থিরতার শিকার হতে হয় না। তার কোন আনন্দময় পরিণতি নেই। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর তুচ্ছতম বস্তুর প্রতি মানুষের আসক্তি পরকালের বৃহত্তম বস্তুসমূহ থেকে তাকে বঞ্চিত করে।

মানুষের জন্য দু'টি বিষয়ই মূল কথা। প্রথমটি হল, যে জিনিস তার জন্য সংরক্ষিত তা সে পাবে। যদি তার থেকে সে দূরে পালিয়ে যায়, তবু তা পেছনে পেছনে ছুটে যাবে। দ্বিতীয়টি হল, যা তার নয়, অন্যের জন্য রাখা হয়েছে, তা সে পাবে না। তার জন্য যত চেষ্টাই সে করুক, প্রাণপাত করেও সে কিছুতেই তা থেকে পেতে পারে না।

তাঁর আর একটি কথা খুবই মূল্যবান। তিনি বলতেন, দোয়া না করার ফল দোয়া করে ব্যর্থ হওয়ার দুঃখও বিপদ থেকে বেশী মারাত্মক।

তিনি স্পষ্ট করে বলেন, মানুষ এমন এক যুগে উপনীত, যখন সে কাজের চেয়ে কথায় এবং আমলের চেয়ে বিদ্যায় বেশী সন্তুষ্ট। অতএব বলতে হয়, সর্বোৎকৃষ্ট সময়ে অর্থাৎ রাসূলে কারীমের উম্মতের যুগে জন্মগ্রহণ করেও সে নিকৃষ্ট লোক হিসাবে গণ্য।

তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত, যে আল্লাহর ওপর খুশী, সে কখনও মানুষের কাছে কোন কিছুর প্রত্যাশা করে না।

একদিন তিনি চলেছেন এক কসাইখানার সামনে দিয়ে। তাঁকে দেখে কসাই বলল, ভালো মাল আছে নিয়ে যান। তিনি বললেন, আমার কাছে পয়সা নেই। কসাই বলল, তাতে কী, ধার নিয়ে যান। পয়সা হলে দেবেন। হযরত হাশেম রহমাতুল্লাহ বললেন, তার চেয়ে বরং প্রবৃত্তির কাছে কিছু সময় ধার ধার চেয়ে নেওয়া ভালো। কসাই এবার কড়া ভাষায় বলল, তাই তো পাঁজরের হাড় ক'খানা গোনা যায়। হযরত হাশেম রহমাতুল্লাহ তার উত্তরে বললেন, তবুও দেহে যতটুকু গোশত আছে, তাতে কবরের কীটগুলোর অনেক দিন চলবে।

এই মহান সাধক সম্বন্ধে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে বাগদাদে গিয়ে শুনলেন যে, আবু হাশেম রহমাতুল্লাহ বাগদাদে আছেন। তাঁর সাথে দেখা করার জন্য তিনি সেখানে গেলেন। আবু হাশেম রহমাতুল্লাহ তখন ঘুমিয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পরে ঘুম থেকে জেগে তাঁকে দেখে বললেন, খুব ভালোই হয়েছে। আমি এমাত্র নবী করীম (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আপনার সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছেন। আপনি আপনার মায়ের হক আদায় করুন। তাঁর সেবায় নিযুক্ত হোন। আপনার জন্য হজ্জ আদায় অপেক্ষা মায়ের সেবা ও হক আদায় করা খুব বেশী দরকার, সেটি উত্তমও বটে। কাজেই আপনি এ মুহূর্তে দেশে ফিরে যান। মায়ের সেবা-পরিচর্যা করুন। তাঁর দোয়া লাভ করুন।

উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, অতঃপর আর মক্কা শরীফে না গিয়ে তাঁর পরামর্শ মতো দেশে ফিরে বৃদ্ধা জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম।

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু হাশেম রহমাতুল্লাহ-কে যে মহামূল্য নির্দেশ দান করেন, তাতে তাঁর হৃদয়ের পবিত্রতা ও নবী-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
ওতবা বিন গোলাম
রহমাতুল্লাহ

এক রূপসীর প্রেমে পড়ে গেলেন এক তরুণ। দারুণ দুর্নিবার প্রেম। প্রচণ্ড আসক্তি। তাঁর এই প্রেমের কথা অবশ্য গোপন না করে তিনি সুন্দরীর কাছে পৌছে দিলেন। রূপসী শুধু রূপসীই নন, পরম বিদূষীও বটে। তিনি তরুণের প্রেমাসক্তির খবর শুনে এক দাসীকে তাঁর কাছে পাঠালেন। সে তরুণের কাছে জেনে আসবে, তিনি তাঁর দেহের কোন্ অঙ্গটি দেখে এতদূর আকৃষ্ট হলেন।

তরুণ সকাশে উপস্থিত হয়ে দাসী সে কথাটিই জিজ্ঞেস করে। তিনি বললেন, আমি তার অন্য অঙ্গ তো দেখিনি। শুধু চোখ দু'টিই আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ঐ চোখের আকর্ষণেই আমি প্রেমে-বিহ্বল।

উত্তর নিয়ে দাসী ফিরে এল। আর সেই রূপসী তরুণী, নিজের সেই অনিন্দ্য চোখ দু'টি উপড়ে দাসীর হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তরুণের কাছে।

শিউরে উঠলেন তরুণ। এও কি সম্ভব? অথচ, শুধু সম্ভব নয়, যাঁর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আসক্তি, তিনি কেমন অবলীলা-ক্রমে তাঁর অমূল্য নয়নমণি তাঁকে উপঢৌকন দিলেন। বিপুল ভাবান্তর সৃষ্টি হল তাঁর মনে। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী মিথ্যে হয়ে গেল। হায় আসক্তি! মানুষকে তুমি কোথায় নামিয়ে দাও! কালবিলম্ব না করে তিনি ছুটলেন হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শুরু হয়ে গেল তাঁর কঠোর জীবন সাধনা। অনন্ত করুণাময়ের অশেষ ইচ্ছায় একদিন তিনি সিদ্ধি লাভ করলেন। সফলকাম এই সাধকের নাম হযরত ওতবা বিন গোলাম রহমাতুল্লাহ। হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর মুরীদ– এক উজ্জ্বল ভক্ত।

যেমন গুরু তেমনি শিষ্য। সাধনার শীর্ষবিন্দুতে পৌছে তিনি যা ইচ্ছা করতেন, আল্লাহর রহমতে তাই করতে পারতেন। একদিন স্বয়ং গুরু দেখতে পেলেন, হযরত ওতবা রহমাতুল্লাহ দিব্যি পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অবাক হয়ে তিনি শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ক্ষমতা তুমি কোথায় পেলে? শিষ্য ওতবা রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি আমাকে যা নির্দেশ দেন আমি মনে-প্রাণে তা পালন করি। তাছাড়া আপনি তো এ কাজগুলো ত্রিশ বছর আগে করতেন। আল্লাহ্ পাকের অসীম করুণায় আমি এখন এগুলো করতে পারি।

তিনি ছিলেন এক চাষী। নিজেই চাষবাস করতেন। নিজের হাতে গম পেষাই করে রুটি বানাতেন। একখানি মাত্র রুটি খেয়ে এক সপ্তাহব্যাপী আল্লাহর এবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, আমার দু'কাঁধে দু'ফেরেশতা-কিরামান-কাতেবীনের পাপ-পুণ্যের হিসাব লেখার কথা মনে পড়লেই আমার মনে লজ্জা আসত।

তাঁর বিমল হৃদয়ে আল্লাহ্ প্রেম ও ভীতি কিরূপ স্থান ছিল, তা একটি ঘটনায় জানা যায়।

তখন শীতকাল। কনকনে শীত নেমেছে। একদিন দেখা গেল, মাত্র একটি জামা গায়ে চড়িয়ে হযরত ওতবা বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রতিবেশীর বাড়ীর দেওয়ালের কাছে। ভীষণ শীতেও তাঁর গায়ের জামাটি ভিজে উঠেছে ঘামে। এভাবে এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, কিছুদিন আগে তাঁর বাড়ীতে কয়েকজন অতিথি এসেছিলেন। খাবারের পর তাঁরা হাতের তেল-চর্বি ছাড়াবার জন্য ঐ দেওয়ালের কিছু মাটি খসিয়ে নিয়ে হাত মর্দন করেন। তারপর পানি দিয়ে হাত ধুয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফেলেন। কিন্তু বাড়ীর মালিকের অনুমতি নেওয়া হয়নি। তিনি অবশ্য প্রতিবেশীকে সে কথা জানিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। কিন্তু তবুও কী যে হয়, এখান দিয়ে গেলেই তাঁর অপরাধ বোধ জেগে ওঠে। মনে হয়, বিনা অনুমতিতে দেওয়ালের মাটি ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। এ অন্যায় কাজের জন্য রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ যদি বলে ফেলেন, তাঁর অতিথি যখন এ কাজ করেছে, তখন এর জন্য তিনিই দায়ী। তখন কী উত্তর দেবেন, এ ভয়েই তিনি বিবর্ণ হয়ে যান।

হযরত ওতবা ছিলেন ধ্যান-মগ্নতা ভাব-তন্ময়তার প্রতীক, প্রতিমূর্তি। জনবহুল রাস্তার মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে তিনি এসেছেন হযরত আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, বাড়ী থেকে বের হয়ে রাস্তায় আপনার কার কার সাথে দেখা হেয়েছে? তিনি নির্দ্বিধায় বললেন, না, কারো সঙ্গেই আমার দেখা হয়নি।

অর্থাৎ আত্মমগ্ন অবস্থায় তিনি জনাকীর্ণ বাজার পেরিয়ে এসেছেন।

একদিন তাঁর মা বললেন, নিজের দিকে একটু নজর দাও বাবা। দেহ-মনের কিছু সুখ-শান্তিও প্রয়োজন আছে।

তার জবাবে তিনি বললেন, মা বিচার দিবসে যেন আমার দেহ ও মনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, এই আমার ইচ্ছা। কেননা, তা চিরস্থায়ী হবে। জগত-সংসার তো কেবল জগত-সংসারের জন্য। এখানে সাময়িক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে যদি অনন্ত-কালের সুখ-শান্তি অর্জন করা যায়, তবে তার চেয়ে আর সৌভাগ্যের কী আছে?

খুব সাদাসিধা মানুষ ছিলেন তিনি। খাবার-দাবার কিংবা বেশ-ভূষার প্রতি কোন মনোযোগ ছিল না। বস্তুতঃ কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন কেটেছে। তাঁর আল্লাহ্-প্রেম ছিল নিষ্কাম। একবার সারারাত জেগে আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা জানান, তার ভাষা ছিল এ রকম– প্রভু গো! আপনি আমার কল্যাণ করুন, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখব। আর যদি শাস্তি দেন, তবুও আমার বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। কখনও কোন অবস্থায়ই এ বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হবে না।

এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, জান্নাতের এক হুর এসে তাঁকে বলছেন, ওতবা, আমি তোমার ওপর আসক্ত। তাই অনুরোধ, কখনও এমন কাজ করো না, যা তোমার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে। হযরত ওতবা রহমাতুল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলেন, আমি তো আল্লাহর প্রেমে বিভোর হয়ে দুনিয়া বর্জন করেছি। অতএব আপনার প্রতি কি দৃষ্টি দিতে পারি?

অনুরুদ্ধ হয়ে কখনও তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয়ও দিয়েছেন। একজনের অনুরোধ ছিল, তাঁকে কিছু খুরমা জোগাড় করে দিতে হবে। তৎক্ষণাৎ তাঁর থলে থেকে কিছু টাটকা খুরমা তাঁকে বের করে দেন। তাঁর অন্তিম মুহূর্তটি বড়ই বিস্ময়কর।

সমকালের শ্রেষ্ঠ তাপসী হযরত রাবেয়া বসরী রহমাতুল্লাহ। তাঁর কাছে বহু সাধকের নিত্য যাতায়াত ছিল। একদিন তাঁর দরবারে উপস্থিত রয়েছেন সাধক সাম্মাক ও হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহ। হঠাৎ সেখানে হাজির হলেন হযরত ওতবা বিন গোলাম রহমাতুল্লাহ। আজ পরনে মামুলী পোশাক নয়। বরং পরিপাটি পোশাক পরিহিত অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর দিকে চোখ রেখে হযরত সাম্মাক রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনাকে দেখে কিছুটা দেমাকী মনে হচ্ছে!

হযরত ওতবা রহমাতুল্লাহ বললেন, তা হতেই পারে। আমি এক অধম দাস। কিন্তু তবুও মহা-প্রতাপশালী আল্লাহর দাস। অতএব তাঁর কি কোন প্রভাবই আমার মধ্যে পড়বে না? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভুতল-শায়ী হলেন। সবাই তাঁর কাছে এসে দেখলেন, তিনি তাঁর মহা-প্রতাপশালী প্রতিপালকের কাছে চলে গেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরে এক পবিত্র হৃদয়ের মানুষ স্বপ্নে দেখেন, হযরত ওতবা রহমাতুল্লাহ-এর চেহারার আধখানা কালো দেখাচ্ছে। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, ছাত্র-জীবনে তিনি এক রূপলাবণ্যময় বালকের চেহারায় আকৃষ্ট হন। মৃত্যুর পর যখন তাঁকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন এক বিষধর সাপ বেরিয়ে এসে তাঁকে দংশন করে বলল, সে দিনের সেই দৃষ্টির এই হল শাস্তি। তিনি যদি আবার তার দিকে দৃষ্টি দিতেন, তাহলে তাঁর শাস্তি আরও কঠোর হত।

তাঁর এই শাস্তির বিবরণও মানুষের টনক নড়িয়ে দেয়।

হযরত
ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ
রহমাতুল্লাহ

আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল বালুময় প্রান্তর। আরব মরুভূমি। মরুপথে চলেছে এক বাণিজ্য কাফেলা। খুব সাবধানে, সতর্ক হয়ে। কখন কাফেলার ওপর দস্যুদল হানা দেয়। বাণিজ্য যাত্রীরা প্রতি মুহূর্তে সজাগ সচেতন।

হঠাৎ দস্যুকণ্ঠ ভেসে এল মরুর বাতাসে। উপায় নেই। লুটেরার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। এক বণিকের সঙ্গে আছে অনেক টাকাকড়ি। দস্যুদের হাতে পড়লে সব যাবে। তাই সে চঞ্চল হয়ে উঠল। কোথাও যদি টাকাগুলো লুকিয়ে ফেলা যায় তাহলে খুব ভালো হয়। ব্যস্ত হয়ে সে এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়ায়। আর নজরে পড়ে একটি তাঁবু। ত্রস্ত পায়ে সে এগিয়ে গেল তাঁবুর দিকে। দেখল, একটি লোক নিবিষ্ট-চিত্তে নামাজ পড়ছেন, তাঁর পরনে চটের পোশাক। মাথায় পশমী টুপি। গলায় বিশাল জপ-মালা। তাঁবুর ভেতরে উঁকি মেরে সে দেখে, নামাজ শেষে এখন তিনি তসবীহ জপ করছেন।

খুশীতে ভরে উঠল তার মন। ঠিক জায়গায় সে এসেছে। উপযুক্ত লোক খুঁজে পেয়েছে। এই দরবেশের কাছেই দিব্যি সে তার টাকাকড়ি লুকিয়ে রাখতে পারে। অতএব, সে ঢুকে পড়ে তাঁবুর ভেতর। আর টাকাগুলো লুকিয়ে রাখার জন্য দরবেশকে অনুরোধ জানায়। তিনি তাকে টাকা রাখার জন্য একটি জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর লুটতরাজ শেষ। বাণিজ্য যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করে দস্যুরা উধাও। ঐ বণিক এবার তার টাকা ফিরিয়ে নেবার জন্য আবার তাঁবুতে আসে। আর এসে যা দেখে, তাতে তার প্রাণ উড়ে যায়। এবার দরবেশ আর একা নন। এই মাত্র যারা বাণিজ্য কাফেলা লুট করল, সেই দস্যুরাই তাঁবুর ভেতরে বসে লুণ্ঠিত মালের ভাগ-বাঁটোয়ারা করছে। তার বুঝতে দেরী হল না যে, যার জিম্মায় সে টাকা রেখে গিয়েছে আসলে সে এক দস্যু। দরবেশ সেজে ডাকাত দলের নেতৃত্ব দেয়। তার অনুশোচনার আর অন্ত রইল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে এই সব কথা ভাবছে, হঠাৎ দস্যু সর্দার তাকে দেখে ফেললেন। বললেন, তুমি এখানে কি জন্য এসেছ?

সে সাহসভরে বলল, আমি আপনার হেফাজতে টাকা রেখেছিলাম। সেগুলো নিতে এসেছি।

নিয়ে যাও, খুব সহজভাবে বললেন তিনি।

বণিক যেখানে টাকা রেখেছিল সেখান থেকে সব টাকা তুলে নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু বড় ধাঁধায় পড়ে গেল বেচারা।

দলের অন্য দস্যুরা এ টাকা ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু দরবেশ-রূপী দস্যু সর্দার বলেছিলেন, আমার প্রতি লোকটার ধারণা ভালো ছিল। আমাকে নির্ভরশীল বলে সে মনে করেছি। যেমন– আল্লাহর প্রতি আমি ভালো ধারণা পোষণ করি ও তাঁকে নির্ভরশীল বলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জানি। তাই তাঁর সেই ভালো ধারণাকে আমি সত্যে পরিণত করলাম। আশা করি, আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে আমার ভালো ধারণাকে সত্যে পরিণত করবেন।

পথে যেতে যেতে দরবেশের কথাগুলো তার বারবার মনে পড়তে লাগল। এও কি সম্ভব? অথচ শুধু সম্ভব নয়, নিরঙ্কুশভাবে সত্য।

এরপর আর একটি বাণিজ্য কাফেলা লুণ্ঠিত হল। কাফেলার এক লোক এক লুটেরাকে শুধাল, তোমাদের কি সর্দার নেই।

সে এখন কোথায়?

তিনি এক নদী-তীরে নামাজ পড়ছেন।

এখন তো নামাজের সময় নয়।

উনি নফল নামাজ পড়ছেন।

তিনি খানাপিনা করেন কখন?

উনি দিনে রোজা রাখেন।

এখন তো রমযান নয়।

তা নয়। উনি নফল রোজা রাখেন।

দলপতির কাছে তাকে নিয়ে গেলে সে জিজ্ঞেস করে, আপনার নামাজ-রোজা ও দস্যুবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতি কোথায়? তিনি বললেন, আল্লাহর কোরআন পড়েছ? সেখানে একটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় দল নিজেদের পাপসমূহকে স্বীকার করল এবং পুণ্য কাজগুলোকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

দস্যু প্রধানের কথাবার্তা শুনে বণিক অবাক হয়ে গেল।

অবাক হওয়ার কথাই বটে। অন্তরে আল্লহার প্রতি অপরিমেয় অনুরক্তি। অথচ বাইরে দুর্ধর্ষ দস্যুবৃত্তি। একাধারে দরবেশ ও দস্যু।

এই বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বটি হলেন ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ। সে কালের এক সুবিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ। সফলকাম সাধক।

লুটেরা দলের দলনেতা হিসাবেও তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। কাফেলায় স্ত্রীলোক থাকলে তার ওপর হামলা না করার নির্দেশ ছিল তাঁর। কারও কাছে অল্প-স্বল্প টাকা থাকলে তা লুট করা হত না বা লুণ্ঠিত মালপত্রের একটা অংশ কাফেলা যাত্রীদের ফিরিয়ে দেয়া হত।

প্রথম জীবনে তিনি এক নারীর প্রেমে পড়েন। লুটপাট করে যা কিছু পেতেন, তা সবই দিয়ে দিতেন তাঁকে। আবার মাঝে মাঝে তার কাছে গিয়ে কান্নাকাটিও করতেন। এক বিচিত্র-চরিত্রের মানুষ।

আল্লাহ্ পাকের অনুপম ইচ্ছায় একদিন আচমকা পরিবর্তন এল তাঁর মন-মানসিকতায়, চিন্তা-ভাবনায়।

এক রাতে তিনি তাঁর তাঁবু থেকে শুনতে পেলেন এক কাফেলাযাত্রীর কোরআন আবৃত্তিঃ এখনও কি আল্লাহর স্মরণ দ্বারা ঈমানদারগণের হৃদয় সমূহকে ভীত ও জাগরিত করার সময় আসেনি? আয়াতটি শুনে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ-এর। বুকের তলায় বসে কে যেন বলে উঠল, রে দুরাত্মা! এভাবে আর কতদিন লুটপাট চালিয়ে যাবি? ঢের হয়েছে, আর নয়। এবার তওবা করার সময় হয়েছে। কেননা, তোর পাপ এখন সীমা অতিক্রম করেছে।

অন্তরের এ আহ্বান আর তিরস্কার বৃথা গেল না। আলোর জন্য তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তওবা করে চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত হলেন।

তাঁর এই পরিবর্তন কতখানি সচল, কিছুক্ষণ পরেই তা বোঝা গেল। ঐ পথে আর একদল বণিক এসে পড়ল। তাঁবুতে বসে তিনি তাদেরও কথাবার্তা শুনতে পেলেন। ভীত-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সন্ত্রস্ত লোকগুলো বলাবলি করছে, এ পথে আসা মোটেই ঠিক হয়নি। কেননা, এ পথেই ইবনে ইয়াজের তাঁবু আছে। কথাগুলো কানে আসা মাত্র তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে বণিক দল! তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমাদের জন্য সুখবর। দস্যু নেতা ফোজায়েলের জীবনধারা বদলে গেছে। সে তওবা করেছে। এখন তোমাদের কাছে থেকে সে নিজেই চলে যাচ্ছে।

দেখা গেল, সত্যিই আকুল ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি দৌড় শুরু করলেন। বণিক দল বুঝল, যার ভয়ে তারা ভীত, তিনি আজ নিজেই ভীত হয়ে দস্যু জীবনের অন্তরালে চলে গেলেন।

পথে এক লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি তাঁকে খলীফার কাছে নিয়ে যাবার অনুরোধ করলেন। সে তাঁকে নিয়ে গেল খলীফার দরবারে। খলীফা তাঁর প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ ছিলেন। কোন দিন তাঁকে ধরতে পারলে চরম শাস্তি দেবেন, এমন সংকল্পও তাঁর ছিল। কিন্তু আজ তিনি দেখলেন, যে ফোজায়েলকে তিনি জানেন, এ সে নয়। এ এক অন্য মানুষ। আমূল পরিবর্তন হয়েছে তার। সুতরাং হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। ফিরে যেতে বললেন নিজের দেশে।

নিজের দেশেই ফিরে এলেন ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ। একদিন তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা বাড়ীর দরজায় একটি অস্ফুট ভাঙা স্বর শুনল। সে স্বর পরিচিত। কিন্তু অমন বিকৃত কেন? নিশ্চয়ই আহত হয়ে বাড়ী ফিরেছে। দ্রুত বাড়ির বাইরে এসে তারা জিজ্ঞেস করে, কোথায় আঘাত লাগল আপনার? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আঘাত লেগেছে। তবে সেটা শরীরে নয়, মনে। তাঁর মানসিক পরিবর্তন ধরা পড়ল একটু পরেই। বাড়ীতে ঢুকে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমি মক্কা যেতে চাই। এ বিষয়ে তোমার মত কি? স্ত্রী বললেন, আমার নিজস্ব কোন মত নেই। আমি আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব। আপনার সেবা-পরিচর্যাই আমার কাম্য।

স্ত্রীকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন মক্কা শরীফে। আঁধার থেকে আলোর ভুবনে। আধ্যাত্মিক জীবনে। শুরু হয়ে গেল মহাজীবনের সাধনা। আর এ সাধনা বৃথা গেল না। আল্লাহর আশীর্বাদ-পুষ্ট হয়ে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন এক প্রধান হাদীরূপে। আর আলোর অভিসারে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসতে লাগল অসংখ্য মানুষ।

বাগদাদ থেকে তাঁর আপন জনেরা এল তাঁকে দেখার জন্য। তিনি দেখা করলেন না। কিন্তু দেখা না করে তারাও মক্কা ছেড়ে গেল না। অবশেষে একদিন তিনি তাঁর বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের আলস্য আর উদাসীনতা দূর করে দিন। আল্লাহর কাছে এই আমার প্রার্থনা। তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন হও। এর বেশী আর কিছু বলতে আমি রাজি নই।

অত্যন্ত হতাশ হয়ে আত্মীয়-স্বজনেরা ফিরে গেল।

ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ তাঁর পূর্ব-কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চান। এক ইহুদী ছাড়া সবাই তাঁকে ক্ষমা করেছিল। ইহুদী একটি শর্ত নিয়ে বসল। সে বলল, কাছের ঐ পাহাড়গুলোকে উৎখাত করতে পারলে ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ-কে সে ক্ষমা করবে। কঠিন শর্ত। খুব বিপদে পড়লেন ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ। অবশেষে আল্লাহর নাম স্মরণ করে একদিন পাহাড়ের মাটি সরাতে শুরু করলেন। তওবাকারীকে মদদ দিলেন আল্লাহ্। একদিন আচমকা এক ঘূর্ণিঝড়ে পাহাড়গুলি উড়ে গেল।

ইহুদীর বিদ্বেষভাব কেটে গেল। একদিন সে চলে এল ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। বলল, আমি মনে মনে সংকল্প করেছি, আমার লুণ্ঠিত মাল ফেরত না পেলে আমি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কখনই ক্ষমা করব না। এখন সেই শপথের কাফফারা দেওয়া উচিত। আপনি এক কাজ করুন। এই টাকার থলি আমি আপনাকে দান করছি। ঐ থেকে আমার লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিনিময় মূল্য হিসাবে নিজের হাতে আমাকে দান করুন। তাহলে আমার কাফফারা আদায় হবে এবং আপনাকেও আমি ক্ষমা করতে পারব।

ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ তাই করলেন। কিন্তু এবার এল নতুন শর্ত। ইহুদীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে হবে। ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ তাও করলেন।

ইহুদী এখন মুসলমান। এবার সে জানাল, তিনি স্বপ্নে বই পড়ে জেনেছেন যে, প্রকৃত তওবাকারীর হাতের ছোঁয়ায় মাটি সোনা হয়ে যায়। বললেন, আমার ঐ থলের টাকাগুলো ছিল মাটির। আপনি যখন নিজের হাতে সেটি আমাকে দিলেন, তখন তা খুলে দেখি, সেগুলো সত্যিই খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে। এখন আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আপনাদের ইসলাম ধর্ম অবশ্যই একটি বিশুদ্ধ ধর্ম।

এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ খুবই আন্তরিকভাবে তওবা করে অধ্যাত্ম-জীবনে প্রবেশ করেছেন। আর অনন্ত করুণাময় আল্লাহ্ সানন্দে তাঁকে তাঁর প্রিয়জন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

খলীফা
হারুণ অর রশীদ

এক সময় খরীফা হারুণ অর রশীদের মনোবিকলন শুরু হয়। কিছুই তাঁর ভালো লাগে না। মনে দারুণ অশান্তি। ফজল বারমাকীকে ডেকে বললেন, আমাকে কোন আল্লাহর ওলীর কাছে নিয়ে চলুন। হয়ত তাঁর কাছে গিয়ে আমি শান্তি পাব। বারমাকী তাঁকে নিয়ে গেলেন হযরত সুফিয়ান সওরীর রহমাতুল্লাহ-র বাড়ীতে। খলীফার আগমনবার্তা পেয়ে সুফিয়ান সওরী রহমাতুল্লাহ বললেন, তাঁকে তলব করলে তিনি নিজেই খলীফার দরবারে গিয়ে হাজির হতেন। স্বয়ং খলীফার আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। হারুনুর রশীদ এ কথা শুনে ফজল বারমাকীকে বললেন, আমি যাকে চাই ইনি সে ব্যক্তি নন। তখন ফজলের মনে হল, হয়ত ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ-ই তাঁর কাঙ্খিত পুরুষ। অতএব তাঁরা সেখানে গেলেন।

ইবনে ইয়াজের রহমাতুল্লাহ বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে দুজনে শুনলেন, ভেতরে কোরআন শরীফ পাঠ হচ্ছে। তিনি পাঠ করছেন, অপকর্মকারীরা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ঈমানদার ও পুণ্যবানদের মধ্যে গণ্য করব।

আয়াতটি শুনে খলীফা বলেন, উপদেশপ্রার্থী হিসাবে আমার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট। এবার দরজায় করাঘাত করা হল। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, কে? জবাবে বলা হল, আমীরুল মুমেনীন।

এখানে তাঁর কী প্রয়োজন? আমারই বা তাঁর কাছে কী প্রয়োজন? আপনারা আমাকে সংসারের দিকে টেনে নেবেন না।

ফজল বারমাকী বললেন, দেশের খলীফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সকলেরই কর্তব্য।

ফোজায়েল রহমাতুল্লাহি বললেন, আমাকে কেন এত জ্বালাতন করছেন? তাঁর বিরক্তি সত্ত্বেও ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাওয়া হল। তিনি বললেন, আমি অনুমতি দিচ্ছি না। তবে খলীফা যদি একান্তই ভেতরে আসতে চান তো সেটি তাঁর ইচ্ছা। যাই হোক, খলীফা ভেতরে ঢোকা মাত্র ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন– বাদশাহ যেন তাঁর মুখ দেখতে না পান। বাদশাহ অবশ্য ঐ আঁধারেই হাত বাড়িয়ে দিলেন ফোজায়েল

রহমাতুল্লাহ-এর দিকে। হাতে হাত মিলল। ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ হায়! কী নরম হাত! এ হাত জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেলে হয়। বলেই তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন।

খলীফা হারুনুর রশীদ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, আমাকে কিছু বলুন। নামাজ শেষ করে ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনার পিতামহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিতৃব্য ছিলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে খলীফা পদের প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলে করীম বললেন, চাচাজী, আপনাকে দেশাধিপত্য না দিয়ে আপনার নিজের ওপর শাসন-কর্তৃত্ব দিলাম। মনে রাখবেন, হাজার বছর ধরে খলীফা হয়ে জনসেবার চেয়ে আল্লাহর এবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা অনেক গুণে শ্রেয়। বিচার দিবসে নেতৃত্ব লজ্জা পায়, অপদস্থতার কারণ হয়।

বাদশাহ বললেন, আরও কিছু বলুন।

ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ বললেন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সলীম ইবনে আবদুল্লাহ, রাওয়াহা ইবনে হাইয়্যান রহমাতুল্লাহ প্রমুখ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, আমার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হল তা পালনের জন্য কিভাবে কি করতে হবে আপনারাই তা ঠিক করে দিন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন, বিচার দিবসে যদি শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি চান, তাহলে বৃদ্ধ মুসলিমগণকে পিতৃতুল্য, তরুণদের ভ্রাতৃতুল্য, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সন্তানতুল্য, স্ত্রীলোকদের জননী ও ভগিনীতুল্য জ্ঞান করবেন।

খলীফা হারুন বললেন, আরও কিছু বলুন।

ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ আরও বললেন, আমার আশঙ্কা, আপনার এই দেহ-সুষমা ও কোমল শরীর জাহান্নামের আগুনে ঝলসে কদাকার হয়ে না যায়। কেননা, অনেক আমীর-বাদশাহ সেদিন জাহান্নামের আগুনের শিকার হবে।

দারুণ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন খলীফা হারুনুর রশীদ। বুক ঠেলে কান্না উথলে উঠল।

ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ বলে চললেন, আল্লাহকে ভয় করুন। পরকালের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকুন। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ আপনাকে আপনার প্রতিটি প্রজা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সে জন্য তৈরী থাকুন। একটি বৃদ্ধাও যদি রাত্রে অভুক্ত থেকে পরদিন সকালে আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানায়, তাহলে আপনার অবস্থা মারাত্মক হবে।

ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ-এর কথায় খলীফা প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়েন। সে কান্না সহ্য করতে পারলেন না ফজল বারমাকী। ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, এবার ক্ষান্ত হন তাপস আপনি যে বাদশাহকে মেরে ফেলার জোগাড় করছেন। ফজলকে রীতিমত ধমক দিলেন ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ। তুমি চুপ কর হামান। তুমি আর তোমার দলের লোকেরাই খলীফার সর্বনাশ করছো, আমি নই।

খলীফার কান্না আরও বেড়ে যায়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি তাঁর সঙ্গীকে বললেন, উনি আপনাকে হামান বলছেন, তার মানে আমাকে ফিরাউন বলে মনে করছেন। পরে তাপস-ফোজায়েলকে তিনি প্রশ্ন করেন, আপনি কি ঋণী?

হ্যাঁ, আমি আল্লাহর কাছে ঋণী। তাঁর নির্দেশ পালন ও এবাদতেই আমার ঋণ। এ ঋণের জন্য তিনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে তা আমার জন্য পরম পরিতাপ ও বিপদের কারণ হবে। কোন লোকের কাছে আপনি ঋণী কিনা, আমি তাই জানতে চাইছি, খলীফা বললেন।

ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ বললেন, আল্লাহকে ধন্যবাদ। আমি তাঁর কাছ থেকে প্রভূত সম্পদ লাভ করেছি। তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। আর অন্যের কাছে ঋণী হওয়ার প্রশ্নও নেই।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতঃপর খলীফা হারুন তাঁর পায়ের কাছে এক হাজার দীনারের একটি থলে রেখে বললেন, এ মুদ্রাগুলো সম্পূর্ণ হালাল। এগুলো আমি আমার মায়ের সম্পত্তি থেকে পেয়েছি। দয়া করে নির্দিধায় গ্রহণ করুন।

ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ বড় ব্যথা পেলেন। বললেন, আমার সব কথা বৃথা গেল। এখনই আপনার অবিচার শুরু হয়ে গেল। আপনার ভার লাঘব করার জন্য আমি আপনাকে মুক্তির দিকে আহ্বান করছি।

আর আপনি আমার বোঝা ভারী করে নিজেকে মৃত্যু-গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। হায়, হায়, আমার একটি কথাও কাজে লাগল না। এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। খলীফা ও তাঁর অনুচর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাদশাহ বারমাকীকে বললেন, হ্যাঁ, ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ-ই প্রকৃত সাধক বটে।

পিতা-পুত্র ঃ

নিজের ছেলেকে কোলে নিয়ে খুব আদর করছেন ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ। ছেলে বলল, আব্বা! আপনি কি আমাকে খুব ভালোবাসেন? পিতা বললেন, অবশ্যই। প্রাণের ন্যায় ভালোবাসি।

আপনি কি আল্লাহকে ভালোবাসেন?

নিশ্চয়ই। তাঁকে আমি মনে-প্রাণে ভালোবাসি।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব? একই সময়ে একই হৃদয়ে দু'জনের ভালোবাসা কি স্থান পায়?

ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ চমকে উঠলেন। এ কথা কি তাঁর পুত্রের? নাকি মহান আল্লাহর? সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় পুত্রকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে হাত ওঠালেন। প্রভু গো! আমি শুধু আপনারই ভালোবাসায় আমার হৃদয়-মন সমর্পণ করলাম।

আর একটি পরিবর্তন এল তাঁর পবিত্র জীবনে।

তিনি একবার দেখলেন, আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ বিলাপ করছে। সকাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে মহিমাময় প্রভুর দরবারে। এ দৃশ্য দেখে তিনিও বিচলিত হয়ে বললেন, প্রভু আমার! এতগুলো মানুষ এক সঙ্গে যদি কোন কৃপণের কাছে কাকুতি-মিনতি করে সাহায্য-প্রার্থী হয়, তাহলে সেও কিছুতেই তাদের আর নিরাশ করতে পারে না।

প্রভু গো! আপনি দাতা শ্রেষ্ঠ, দয়াময়! নিঃসন্দেহে আপনি প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি মনে করেন আরাফাতে কান্নারত সবাইকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন? তিনি বললেন, এদের মধ্যে অধম ফোজায়েল যদি না থাকত, তাহলে সম্ভবতঃ সকলেই আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করত। বিনয় মানুষকে কী মহত্ব দেয়, ঘটনাটি তার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

মানুষ কখন আল্লাহ প্রেমের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি একই মনোভাব পোষণ করে– তাঁর কাছ থেকে কিছু লাভ করুক বা না করুক।

প্রশ্নঃ কোন লোক হয়ত এই ভয়ে "লাব্বায়েক' (আল্লাহ্ আমি হাজির) বলে না যে, পাছে তার উত্তরে তাকে শুনতে হয় 'লা-লাব্বায়েক' (না, তুমি উপস্থিত হওনি)– এই ধরনের লোক সম্বন্ধে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন?

উত্তর ঃ আমি মনে করি, এ লোকের মর্যাদা লাব্বায়েক উচ্চারণকারীদের অপেক্ষা অনেক বেশী।

ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ সম্পর্কে হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, দুনিয়ায় উন্নতির উপায় যিনি অনুসন্ধান করেন, তিনি লোক-চক্ষে হেয়প্রতিপন্ন হন। ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ একবার তাঁর কাছে কিছু উপদেশ শোনার

আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ্ বলেন, আপনি অনুসারী হোন, কিন্তু অনুসরণীয় হবেন না। হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, পরহেজগারী উত্তম না রেজা? তিনি জবাব দেন, রেজা। কেননা, রেজাতে যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি যা পান তার চেয়ে বেশী চান না। যা পেয়েছেন তাতেই তিনি তৃপ্ত।

হযরত সুফিয়ান সওরী রহমাতুল্লাহ এক রাতে হযরত ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ এর বাড়ীতে অবস্থান করেন। বলাবাহুল্য, ধর্ম আলোচনার মধ্য দিয়ে রাত শেষ হয়। পরদিন সকালে বিদায় নেবার প্রাক্কালে তিনি বলেন, রাতটি আমাদের জন্য খুবই শুভ ও কল্যাণ-প্রসূ হল। ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ এ কথায় প্রতিবাদ করে বললেন, না, তা নয়। বরং রাতটি খুব অশুভ হয়ে গেল।

কেন?

আপনি সারারাত আমাকে তোষামদ করার ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলেছেন। আর আমিও উত্তর দিতে গিয়ে আপনাকে খুশী করার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ, আমরা আলাপ-আলোচনায় মত্ত ছিলাম ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানানো বা এবাদত-আনুগত্যের কিছু ছিল না। কাজেই এ রাতটা আমাদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি।

এত সূক্ষ্ম ভাবনা ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ-এর মত সাধকের পক্ষেই সম্ভব। এক লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তিনি তার আগমনের হেতু জানতে চাইলেন। লোকটি বলল, আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত ও আপনার অমূল্য কথাবার্তা শুনে সন্তোষ লাভের জন্য এসেছি।

হযরত ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ বললেন, আল্লাহর কসম, তোমার কথাটি পশুত্বের ভাব ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুত তুমি আমাকে মিথ্যা দিয়ে প্রতারিত করলে। আর আমিও তোমাকে তাই করব। অতএব তুমি বিদায় হও।

এই আত্ম-মগ্ন সাধক রোগাক্রান্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন এই কারণে যে, তাহলে তাঁকে আর জামাতে নামাজ আদায় বা জনসমাজে যেতে হবে না। দুটি কাজই গণসংযোগ বটে; আর তা আল্লার ধ্যানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। প্রকৃত ধ্যান তাকেই বলে, যাতে হৃদয় ও চোখ শুধু আল্লাহতেই নিবদ্ধ থাকে। এবাদতে যদি অন্যের দিকে দৃষ্টি যায় অথবা মনে অন্য কিছু খেয়াল আসে, তাহলে তা প্রকৃত উপাসনা নয়।

তাঁর উপদেশ বাণী ঃ

১. সেই নির্জনবাস শ্রেয়– যেখানে আমি কাউকে দেখতে পাই না এবং আমাকেও কেউ দেখে না।

২. যে আমার পাশ দিয়ে চলে যায় অথচ আমাকে সালাম জানায় না, ব্যাধিগ্রস্ত হলে যে আমাকে দেখতে আসে না, জানব, সেই আমার প্রতি সবচেয়ে সহানুভূতিশীল।

৩. রাতের আগমনই খুশীর কারণ। কেননা, তখন নীরবে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হওয়া যায়। আর দিনের আমন দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে। কেননা তখন জনসমাগমে আল্লাহর ধ্যান-এবাদতে বিঘ্ন ঘটে।

৪. যে নির্জনতা পছন্দ করে না, বরং মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ভালোবাসে, সে প্রকৃত শান্তি থেকে দূরে থাকে।

৫. যে আমল সম্পর্কিত কথা বলে কিন্তু আমল করে না, তার কথাবার্তা কোন কাজে আসে না।

৬. আল্লাহকে যে ভয় করে তার বাকশক্তি লোপ পায়।

৭. আল্লাহ্ যাকে ভালোবাসেন তার ওপর নানা রকম আপদ-বিপদ আসে। আর তিনি যাকে শত্রু বলে মনে করেন, সে সুখে-শান্তিতে বাস করে।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮. সব কিছুর যাকাত আছে। জ্ঞানের যাকাত চিন্তা-ভাবনা। রাসূলে করীম (সঃ) এই জন্য গভীর চিন্তায় ও ধ্যানে রত থাকতেন।

৯. মনে যার আল্লাহ্-ভীতি, তার মুখে অর্থহীন কথা বের হয় না। আল্লাহ্-ভীতি তার কাম-প্রবৃত্তি ও আসক্তি নষ্ট করে। তার পরনিন্দা-পরচর্চার স্বভাবও দূর হয়।

১০. পৃথিবীর সব কিছু যদি আমার জন্য সিদ্ধ বৈধ করে দেওয়া হয়, তবুও গলিত শব মনে করে আমি তা গ্রহণ করতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করব। সংসারে প্রবেশ করা কঠিন কাজ নয়, কঠিন হল তা থেকে বেরিয়ে আসা।

১১. পৃথিবী একটি পাগলা গারদ-স্বরূপ, আর তার অধিবাসীরা পাগলের মত। বন্দীরা যেমন বন্দি-শালায় শৃঙ্খল-বদ্ধ, তারাও তেমনি দুনিয়ার মায়া-মমতায় আবদ্ধ।

১২. মনে রেখো, পারলৌকিক সম্পদের ঘাটতি না করে পৃথিবীতে কাউকে সম্পদ দান করা যায় না। জাগতিক জীবনে তুমি যা অর্জন করেছ, পরকালে তাই কাটা যাবে। এখন এ জীবনে কম বা বেশী উপার্জন করা তোমার অভিরুচি।

১৩. পার্থিব জীবনে দামী পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি আসক্ত হয়ো না। কেননা, তাহলে জান্নাতী লেবাস ও সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

১৪. আল্লাহ্ পর্বতসমূহকে বললেন, তোমাদের একটি পর্বতে আমি আমার এক নবীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। একমাত্র তুর পর্বত ছাড়া সবাই দর্পভরে তা অস্বীকার করল। কিন্তু তুরের নম্রতায় খুশী হয়ে আল্লাহ সেখানে মূসা (আঃ) নবীর সঙ্গে বাক-বিনিময় করেন, তাতে তুর পর্বতের গৌরব বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর কাছে নম্র ভাব প্রকাশ করা, তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া আর তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকার নামই বিনয়।

১৫. যে নিজেকে নিজে সম্মানিত মনে করে সে বিনয়ী নয়। তোমরা কেউ তিনটি বিষয়ের খোঁজ করো না। কেননা, তা পাওয়া যাবে না। যেমন–

(১) এমন আলেম, যিনি জ্ঞান, বিদ্যা ও আমলে সমান সমান।

(২) এমন দরবেশ, যাঁর নির্মলতা বা বিশুদ্ধতা কাজের অনুরূপ।

(৩) এমন ভাই, যে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত।

১৬. যে আপন ভাইয়ের সঙ্গে বাহ্যিক প্রীতি প্রদর্শন করে কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, আল্লাহ্ পাক তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন। এরূপ ব্যক্তি বিচার দিবসে অন্ধ ও বধির হয়ে ওঠবে।

১৭. পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা কপটতার নামান্তর। লোক দেখানো সৎ কাজ সম্পাদন শেরেকী হিসাবে গণ্য হয়। আল্লাহ্ তোমাকে এ দুটি বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখলেই তোমার মাঝে খাঁটি আল্লাহ্ প্রেম সৃষ্টি হবে।

১৮. আল্লাহ্ যখন যে অবস্থায় রাখেন তাতে সন্তুষ্ট থাকার নামই ত্যাগ।

১৯. আল্লাহ্ সম্পর্কে যিনি যত বেশী জ্ঞান লাভ করেন তিনি তত বেশী তাঁর ইবাদত করেন। দুনিয়ার কারও কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা না করাই বীরত্ব।

২০. যিনি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী, তিনিই তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হন। আর যিনি আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করেন, তিনি কখনই আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল নন।

২১. কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি আল্লাহ্কে ভালোবাস? তো চুপ করে থাকাই ভালো। কেননা, যদি বল ভালোবাসি না, তাহলে তা হবে অধর্ম। আর যদি বল ভালোবাসি, তাহলে তা হবে মিথ্যা। কেননা তোমার কাজ তার বিপরীত।

২২. কেউ কোন চতুষ্পদ জন্তুকে অভিশাপ দিলে সে এর উত্তরে আমীন বলে। তারপর এই বলে প্রার্থনা করে, আমার ও এই ব্যক্তির মধ্যে যে তোমার বেশী অবাধ্য– এই অভিশাপ তার ওপর আপতিত হোক।

২৩. দুটি জিনিস হৃদয় ধ্বংস করে–

(১) অধিক ভোজন,

(২) বেশী শয়ন।

২৪. অজ্ঞতা-প্রসূত অবস্থায় অনেকের মধ্যে কিছু কিছু স্বভাব দেখা যায়। যেমন–

(১) বিস্ময়কর কিছু না দেখেও হাসা

(২) লোককে উপদেশ প্রদান কিন্তু নিজে তদনুরূপ আমল না করা

(৩) রাত্রি জাগরণে আলস্য করা।

২৫. আল্লাহ্ তাঁর এক নবীকে নির্দেশ দেন, আপনি পাপীদের আশ্বাস দিন, তারা যদি তওবা করে, আমি তা কবুল করব। আর পুণ্যবানদের এই বলে ভয় দেখান যে, আমি ইচ্ছা করলেই সবাইকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হযরত ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রায়ই বলতেন, প্রভু গো! আপনি অনেক সময় আমাকে অনাহারে রাখেণ এমনকি রাতের বেলায় আমার ঘরে আলোর ব্যবস্থাও থাকে না। জানি, এসব আপনার প্রিয়জনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমাকে আপনি এ মর্যাদা দান করলেন কেন জানি না, তবে যদি এতই করলেন, তবে আরও রহমত দান করুন। আমাকে আপনার শাস্তি থেকে রেহাই দিন।

তাঁকে কখনও হাসতে দেখা যায়নি। কিন্তু যেদিন তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়, সেদিন তিনি হেসে ওঠেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, বুঝলাম যে, আল্লাহ্ আমার ছেলের মৃত্যুতে খুশী। তাই তাঁর খুশীর সঙ্গে আমিও খুশী হলাম। আর স্বাভাবিকভাবে আমার মুখে হাসি ফুটল।

তিনি বলেন, নবী-রাসূলগণের প্রতি আমার কোন ঈর্ষা নেই। কেননা, তাঁরাও মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, বিচার ও পুলসেরাতের শিকার। হাশরের মাঠে তাঁরাও নফসী নফসী করবেন। ফেরেশতাগণের ওপরও আমার কোন হিংসা নেই। কেননা, মানুষের চেয়ে তাঁদের ভয় আরও বেশী। আমার হিংসা কেবল তাদের প্রতি যারা এখনও মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেনি।

এক ব্যক্তির চমৎকার কোরআন পাঠ শুনে তিনি তাঁকে তাঁর পুত্রের কাছে, কোরআন শিক্ষা করতে বললেন। তবে সূরা 'আল কারিয়া' পাঠ করতে নিষেধ করলেন। কেননা, ঐ সূরায় রোজ কিয়ামতের যে বর্ণনা আছে, তা শুনে ছেলেটি হয়ত বেসামাল হয়ে ওঠবে। হলও তাই। কারী সাহেব তাঁর ছেলের কাছে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করলেন, আর ঘটনাচক্রে 'আল কারিয়া' সূরাটিও আবৃত্তি করলেন। তা শুনে ছেলেটি এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে, মুহূর্তের মধ্যে সে মারা গেল।

হযরত ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ মৃত্যুকালে স্ত্রী ও দুই মেয়ে রেখে যান। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলে রাখেন, তাঁর মৃত্যুর পর ও স্ত্রীর মৃত্যুর আগে স্ত্রী যেন মেয়ে দুটিকে নিয়ে আবু কোবায়েস পর্বতে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে, প্রভু গো! আমার স্বামীর ইচ্ছাক্রমে এ প্রার্থনা করছি। জীবিতকালে আমি আমার কন্যা দুটির হেফাজত করেছি সাধ্যমত। এখন আমার জীবন সন্ধ্যা ঘনায়মান। তাই অনাথিনীদের আপনার হাতেই সমর্পণ করছি। আপনি ইচ্ছা মত এদের ব্যবস্থা করুন।

অতঃপর একদিন হযরত ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ তাঁর প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেলেন। একদিন তাঁর পত্নীর জীবনেও শেষলগ্ন এসে গেল। স্বামীর নির্দেশমত কন্যাদ্বয়সহ আবু কোবায়েস পর্বতে গিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে অন্তিম প্রার্থনা জানালেন। আর তখন ঐ পথ ধরে চরছিলেন ইয়েমেনের বাদশাহ। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুই পুত্র। তিনি ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ-এর পত্নীর প্রার্থনা শুনে কৌতূহল-ক্রান্ত হয়ে তাঁদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাছে এলেন। সব বৃত্তান্ত শুনলেন। তারপর বললেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমার এই ছেলে দুটির সঙ্গে আপনার মেয়েদের বিয়ে দিতে চাই। তাপস-পত্নী বললেন, না, আমার কোন আপত্তি নেই।

জনপদ থেকে তখনই পালকি সংগ্রহ করে এনে ইয়েমেনের সুলতান সাড়ম্বরে তাঁদের দেশে নিয়ে গেলেন এবং মহা ধুমধামের সঙ্গে শুভ শাদী মোবারক সম্পন্ন হল।

আল্লাহর প্রিয়জন, এই মহান তাপস অর্জন করলেন আল্লাহর অপূর্ব রহমত।

হযরত
বিশর হাফী
রহমাতুল্লাহ

ভীষণ মদ্যপায়ী এক লোক। নাম তার বিশর হাফী। দিনরাত শুঁড়িখানায় পড়ে থাকেন বেহুঁশ হয়ে। একদিন মত্ত অবস্থায় পথ চলতে চলতে রাস্তার ওপর এক টুকরো কাগজ পড়ে থাকতে দেখলেন। কাগজে লেখা ছিল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। দেখামাত্র তিনি কাগজখানি খুব যত্ন করে তুলে দিলেন। নিয়ে গেলেন বাড়ীতে। আর ধুলো-ময়লা সাফ করে আতর মাখিয়ে সেটি রেখে দিলেন বাড়ীর কোন এক উঁচু জায়গায়। পবিত্র কালামকে রক্ষা করলেন পরম ভক্তিভরে।

আর ঐ রাতেই এক দরবেশ স্বপ্ন দেখলেন। আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, তুমি বিশর হাফীকে বলো, সে যেমন আমার নামের সম্মান দিয়ে উঁচু জায়গায় রেখেছে, তেমনি আমিও তার মনকে পুণ্য সুবাসিত পবিত্র করব। আমার মধ্যে তাকে গ্রহণ করে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেব।

দরবেশ বড় সংশয়ে পড়লেন। স্বপ্ন স্বপ্নই। নাকি সত্যিই এর কোন অর্থ পূর্ণ ইঙ্গিত আছে। বিশর হাফীর মতো একটা মাতালের কি এমন সৌভাগ্য হবে যে, স্বয়ং আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি দু'রাকআত নামাজ পড়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আবারও অনুরূপ স্বপ্ন দেখলেন। পর পর তিনবার একই স্বপ্নাদেশ পেলেন তিনি। তখন আর কোন সন্দেহ রইল না। তিনি বেরিয়ে পড়লেন বিশরের সন্ধানে। ভোর বেলাতেও তাঁকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। বাড়ীর লোকজন জানাল, তিনি শরাবখানায় আছেন। অগত্যা দরবেশকে যেতে হল শরাবের আড্ডায়। শুনলেন, সত্যিই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। এক লোককে ডেকে দরবেশ বললেন, বিশর হাফীকে বল, আমি তাকে একটি সুখবর দিতে এসেছি। ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়েছেন বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ। সুখবরের কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছ থেকে সুখবর এনেছেন? দরবেশ বললেন, আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহর কাছ থেকে? বুক কেঁপে উঠল বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ-এর। কঁকিয়ে উঠলেন তিনি। সংবাদটি সত্যই শুভ না অশুভ? দরবেশ তাঁকে কাছে ডেকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বললেন।

শুনে যেন তাঁর বুকের তল থেকে বেরিয়ে এল অন্য এক বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ। মাতাল বন্ধুদের সম্বোধন করে বলে ওঠলেন– বন্ধুগণ, চললাম। তোমরা আমাকে আর তোমাদের সঙ্গে পাবে না। সেদিনই তওবা করে, লোকালয় ছেড়ে চলে গেলেন নিবিড় নির্জনে। আর আল্লাহর এবাদতে আত্ম-সমাহিত হলেন।

পরবর্তীকালে শরীয়তে সুপণ্ডিত হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। আর মারেফতে দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁর মামা আলী ইবনে হাশরাশের কাছে। তাঁর জন্ম মারভ নগরে। অবশ্য বসবাস করেছেন সুবিখ্যাত বাগদাদ শহরে।

'হাফী' শব্দের অর্থ নগ্নপদ। আল্লাহর ভয়ে তিনি এতদূর ভীত হন যে, জুতা পরা ছেড়ে

www.AmarIslam.com

দেন। আজীবন খালি পায়ে চলাফেরা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথম যেদিন আমার প্রভুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেদিন আমি খালি পায়ে ছিলাম। তাই এখন জুতা পরতে আমার লজ্জাবোধ হয়। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্ আমাদের জন্য মৃত্তিকাকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহর পেতে দেওয়া বিছানার ওপর জুতা পায়ে চলা আমার কাছে বেআদবী মনে হয়।

একশ্রেণীর তাপস মাটির টুকরা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতেন না। মাটির ওপর থুথুও ফেলতেন না। কেননা জমিনের ওপর সর্বত্রই তাঁরা আল্লাহর নূর দেখতে পেতেন। হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ ছিলেন এই শ্রেণীর সাধক। কেউ কেউ বলেন, সাধকের চোখও আল্লাহর নূরস্বরূপ। কেননা, সে চোখ দিয়ে তাঁরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছুই দেখতে পান না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সাহাবাগণের জানাযার পেছনে যাওয়ার সময় দু'পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে চলতেন। বলতেন, ফেরেশতাগণের পালকের ওপর পা ফেলতে ভয় হয়। যেহেতু তাঁরা আল্লাহর নূর ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রখ্যাত হাদীস ও ফেকাহবেত্তা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ প্রায়ই হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে যেতেন। ইমাম হাম্বলের রহমাতুল্লাহ অনুগামীরা অনুযোগ করতেন, আপনার মতো একজন মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিশর হাফীর রহমাতুল্লাহ কাছে যাওয়া কি মর্যাদাহানিকর নয়? ইমাম উত্তর দেন, হাদীস বা ফেকাহশাস্ত্রে হয়ত তাঁর চেয়ে আমার জ্ঞান বেশী। কিন্তু তিনি আল্লাহকে আমার চেয়ে অনেক বেশী চেনেন। বস্তুত তিনি তাঁর কাছে আল্লাহর বিষয়েই জানতে চাইতেন।

হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ-এর চিন্তামগ্নতা বিস্ময়কর। রাতের বেলায় বাড়ীতে ঢুকছেন। একপা রেখেছেন ভেতরে, অন্য পা বাইরে। একটা কিছু ভাবতে গিয়ে ঐ অবস্থায় রয়ে গেলেন সারারাত। বোনের বাড়ীর সিঁড়ি বেয়ে ওঠছেন। কী একটা কথা মনে এল। আর তাই নিয়ে চিন্তা করতে করতে আর সিঁড়ি টপকানো হল না। ওখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ভোর রাতে যখন ফজরের আজান হল, তখন চলে গেলেন মসজিদে নামাজ আদায় করতে। তাঁর ভাবনার কথা জানতে চাইলে তিনি তাঁর বোনকে বললেন, বাগদাদ শহরে বিশর নামে আরও কয়েকজন লোক আছে। একজন ইহুদী, একজন খ্রীস্টান ও একজন অগ্নিপূজক। এদিকে আবার তাঁর নামও বিশর। আর তিনি মুসলমান। আল্লাহ্ তাকে ইসলাম ধর্মের মতো মহাসম্পদ দান করেছেন। আর অন্য বিশরগণ তা থেকে বঞ্চিত। তিনি কত সৌভাগ্যবান আর ওরা কত হতভাগ্য। এ কথা ভাবতে গিয়েই তাঁর এ অবস্থা।

একবার হযরত বেলাল খাস রহমাতুল্লাহ হযরত খিজির রহমাতুল্লাহ-কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তিনজন বিখ্যাত মানুষ সম্পর্কে হযরত খিজিরের রহমাতুল্লাহ অভিমত জানতে চান। এই তিন জনের একজন ছিলেন হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ। অন্য দুজন হলেন দুই দিকপাল– ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ। ইমাম শাফেয়ীকে শীর্ষস্থানীয় ওলী বলে তিনি মনে করতেন। ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ সম্পর্কে বললেন, তিনি একজন সত্য-সন্ধিৎসু। আর বিশর হাফী সম্বন্ধে মন্তব্য, তিনি সমকালের অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

হযরত বিশর রহমাতুল্লাহ-এর হাদীস বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু জীবনে কোনদিন হাদীস বর্ণনা করেননি। তার কারণ হিসাবে বলেন, আমার অন্তরে মর্যাদা ও খ্যাতি লাভের বাসনা না থাকলে আমি অবশ্যই হাদীস বর্ণনা করতাম।

বাগদাদ শহরে বৈধ-অবৈধ খাদ্যের ভেদ-বিচার নেই। বরং অবৈধ খাদ্যের চলই বেশী। এ রকম প্রশ্ন তুলে কিছু লোক হযরত বিশর রহমাতুল্লাহ-এর কাছে জানতে চান,

www.AmarIslam.com

তিনি কোথা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেন। তিনি জবাব দেন, আপনারা যেখান থেকে সংগ্রহ করেন সেখান থেকেই।

তাহলে আপনি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন কিরূপে? খুব অল্প আহার ও কম বন্ধুত্ব স্থাপনের মাধ্যমে। তিনি বললেন, যে বেশী খায়, বেশী হাসে, আর যে কম খায় আর বেশী কাঁদে– এরা উভয়ে কি সমান?

তাঁর বক্তব্য, হালাল খাবারও খুব বেশী খাওয়া উচিত নয়। কেননা, তাতে বাজে খরচের দোষ ঘটে।

তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, মাঝে মাঝে ইচ্ছা জাগলেও তিনি চল্লিশ বছর ধরে একটানা ছাগ-গোশতের ঝোল দিয়ে রুটি খাননি। কখনও কখনও খেতেন শুধু সবজি ও আনাজের ঝোল। আর সরকারী কূপের পানি পান করতেন না।

প্রচণ্ড শীতে আদুল গায়ে তিনি ঠক ঠক করে কাঁপতেন। এত কষ্টবরণ করছেন কেন, জিজ্ঞেস করলে বলতেন, গরীব-দুঃখীদের অর্থ সাহায্য করবেন, এমন সঙ্গতি তো তাঁর নেই। তাই তাদের কষ্ট সরাসরি নিজে বরণ করে তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন মাত্র।

আহমদ ইবনে ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, একদিন তাঁকে তিনি হযরত মারুফ রহমাতুল্লাহ-এর নিকট খবর পৌঁছে দিতে বললেন যে, ফজরের নামাজের পর তিনি তাঁর কাছে যাবেন। আহমদ ইবনে ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ হযরত মারুফ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে খবরটা পৌঁছে দিলেন। তাঁর খানকা শরীফ ছিল মসজিদের কাছে টাইগ্রীস নদীর তীরে। তাঁরা দুজনেই ফজর থেকে শুরু করে এশা পর্যন্ত সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ এলেন না। তাঁদের মনে খটকা লাগল। তাঁর মতো লোকও কি কথার খেলাপ করে! হঠাৎ তাঁরা দেখেন, বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ মসজিদের মেঝে থেকে জায়নামাজ গুটিয়ে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছেন। তারপর হযরত মারুফ রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে একত্রে নদীর ওপর জায়নামাজ বিছিয়ে দুজনে সারারাত গোপন কথাবার্তায় কাটিয়ে দিলেন। ভোর বেলায় আহমদ ইবনে ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ যখন চলে যাচ্ছেন, তখন হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ খপ করে তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, তিনি যেন তাঁর জীবিতকালে এ গোপন ব্যাপারটি কারও কাছে প্রকাশ না করেন। হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ-এর জীবিতাবস্থায় তিনি সত্যিই এ কথা কাউকে বলেননি।

এক আলোচনা সভায় নানা কথার ফাঁকে একজন হযরত বিশর রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, খুব গোপনে কারো থেকে কিছু নিয়ে তা যদি গরীব-দুঃখীদের দান করেন তো ক্ষতি কী? কথাটি মোটেই ভালো লাগল না হযরত হাফী রহমাতুল্লাহ-এর। কিন্তু তার ওপর বিরক্ত না হয়ে সামান্য হেসে বললেন, তিন ধরনের গরীব লোক আছে। যেমন–

(১) যে কখনও কিছু চায় না এবং কেউ কিছু দিলেও নেয় না। আসলে এই শ্রেণীর গরীব লোক আত্মিক শক্তিসম্পন্ন। আল্লাহর দরবারে কিছু প্রার্থনা করলে তারা তা পেয়ে যায়।

(২) কিছু গরীব আছে, যারা কখনও কিছু চায় না বটে, কিন্তু কেউ যদি নিজে থেকে কিছু দেয়, তো তারা নেয়। এরা মোটামুটি মাঝারি ধরনের নির্ভরশীল। এরা জান্নাতের যাবতীয় প্রাচুর্য উপভোগ করবে।

(৩) আর এক শ্রেণীর গরীব লোক আছে, যারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে প্রবৃত্তিকে দমন রাখে। আর সদা-সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে।

একটি নির্জন ঝরণার ধারে বসেছিলেন হযরত আলী জুরজানী রহমাতুল্লাহ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঘটনাচক্রে সেখানে এসে পড়েন হযরত হাফী রহমাতুল্লাহ। তাঁকে দেখেই দৌড় লাগালেন জুরজানী রহমাতুল্লাহ। তাঁর কৃত কোন অপরাধের জন্য তাঁকে মানুষের মুখ দেখতে হল– এই জন্য তিনি আত্মগোপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু হযরত হাফী রহমাতুল্লাহও তাঁর পেছনে পেছনে ছুটলেন। বারবার বলতে লাগলেন, দয়া করে আমাকে কিছু উপদেশ দিয়ে যান। তখন হযরত জুরজানী রহমাতুল্লাহ তাঁকে বললেন, গরীব-দুঃখীকে ভালোবাসো। ধৈর্যধারণ কর। প্রবৃত্তিকে শত্রু মনে কর। প্রবৃত্তি যা চায়, তার বিপরীত কাজ কর। আর নিজের বাড়ীখানাকে কবরের চেয়েও বেশী মালপত্র মুক্ত রাখো। তাহলে দুনিয়া ছেড়ে যাবার সময় কোন রকম কষ্ট পেতে হবে না।

একবার তাঁর হজ্জযাত্রার সঙ্গী হবার জন্য কিছু লোক আগ্রহ প্রকাশ করল। তিনি তাদের তিনটি শর্ত দিলেন। যথা– (১) কেউ পাথেয় নেবে না, (২) পথে কেউ কারো কাছে কিছু চাইবে না। আর (৩) নিজে থেকে কিছু দিলেও তা নিতে পারবে না। তারা বলল, প্রথম প্রস্তাব দুটি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু তৃতীয়টি চলবে না। তখন হযরত বললেন, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতাই হজ্জযাত্রীদের পাথেয়। তোমরা যদি কারও কাছ থেকে কিছু নেবে না বলে প্রতিজ্ঞা কর, তাহলে তাতে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা প্রমাণিত হয়। আর এর দ্বারা বেলায়াতের দরজাও অর্জিত হয়।

হযরত খিজির (আঃ)-এর সঙ্গে হযরত হাফী (রাঃ)-এর একবার দেখা হয়। বাইরে থেকে এসে নিজের বাড়ীতেই তিনি তাঁকে দেখতে পান। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে খিজির (আঃ) বললেন, আল্লাহ্ তোমার এবাদতের পথ সহজ করে দিন আর তা গোপন রাখুন।

একদিন এক লোক বলল, আমার কাছে এক হাজার দেরহাম আছে। আমি হজ্জে যেতে চাই। হযরত হাফী রহমাতুল্লাহ বললেন, এ টাকা কোন দেনাদার লোকের দেনা শোধ আর কোন গরীব অভিভাবককে সংসার চালানোর খরচ বাবদ দিয়ে দাও। তাহলে তুমি হজ্জের চেয়েও বেশী পুণ্য অর্জন করবে। কিন্তু হজ্জে যাওয়ার যে খুব আমার ইচ্ছা, লোকটি বলল। তখন হযরত হাফী রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ উপায়ে এ টাকা উপার্জন করেছ। এইজন্য অধিক পুণ্যার্জনে তোমার তেমন আগ্রহ নেই।

একবার তিনি এক কবর স্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, মৃত ব্যক্তিরা কী একটা জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। এর রহস্য জানার জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন। তখন অদৃশ্য আওয়াজ এল, মৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস কর। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সাত দিন আগে এক লোক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সূরা ইখলাস পাঠ করে মৃতদের আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। আর সেই সওয়াব আজ সাত দিন ধরে তারা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিয়ে এখনও শেষ করতে পারেনি।

হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ রাসূলে করীম (সঃ)-কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি বলতে পারেন, আপনার কালের সাধক-জ্ঞানীদের মধ্যে আপনার মর্যাদা সবচেয়ে বেশী করা হল কেন? হযরত হাফী রহমাতুল্লাহ উত্তর দেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তা বলতে পারব না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আপনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করার নীতি পালন করছেন। মুসলিমদের সৎ পথে পরিচালিত করছেন। আমার আসহাব ও আহলে বাইতকে ভালবাসছেন। এ কারণে আল্লাহ্ আপনার এত মর্যাদা দিয়েছেন। পরে তিনি যখন আবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে স্বপ্নে দেখেন, তখন তাঁর কাছে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করেন। রাসূলে কারীম বললেন, পুন্যার্জনের জন্য ধনী ও আমীরগণের ফকীর-দরবেশদের সেবাযত্ন করা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু গরীবদের ধনী ও আমীরদের কাছে হাত না পেতে কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা উত্তম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ বেশ কিছু মূল্যবান কথা বলে গেছেন। যেমন ঃ

(১) তোমরা তোমাদের অর্থ ও জ্ঞান খরচ করবে। নিয়ম হল, পানি যতই প্রবাহিত হয়, ততই তা পরিষ্কার থাকে। কিন্তু বদ্ধ পানি অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়।

(২) যেব্যক্তি এ জগতে সম্মানিত হতে চায়, তার তিনটি বস্তু থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। তা হল ঃ (ক) কোন সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী হওয়া (খ) কারও দোষ খোঁজা, (গ) দাওয়াত ছাড়া কারও অতিথি হওয়া।

(৩) পার্থিব যশঃ-খ্যাতি যার কাম্য, সে পারলৌকিক স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। লোকের কাছে সুবিদিত হওয়ার বাসনা পার্থিব আসক্তির মূল কারণ।'

(৪) যে পর্যন্ত তুমি ও তোমার রিপুর মধ্যে একটি পাঁচিল দাঁড় না করাবে, সে পর্যন্ত তুমি এবাদতের স্বাদ লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।

(৫) তিনটি কাজ খুব কঠিন। (ক) অভাবে দান করা। (খ) ভীত অবস্থায় সততা রক্ষা করা এবং (গ) নির্জনে কর্মনিষ্ঠা বজায় রাখা।

(৬) সন্দেহজনক বস্তু থেকে পরহেজ করা মনকে সদা নিয়ন্ত্রণে রাখাই পরহেজগারী।

(৭) আল্লাহ্ তাঁর দাসকে ধৈর্য ও মারেফতের চেয়ে বড় কোন বস্তু দান করেননি। মারেফতপন্থীরাই আল্লাহর প্রকৃত দাস। যিনি তাঁর প্রতিপালকের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখেন, তিনিই সুফী সাধক। আর মারেফতপন্থী সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না, চেনে না এবং সম্মান দেয় না। যে সরল অন্তকরণে ও সততার সঙ্গে আল্লাহর ধ্যানে রত হয়; সে নিগ্রহ ভোগ করে।

হযরত হাফী রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি কখনও দুনিয়াদারদের কাছে বসা বা তাদের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করা পছন্দ করি না।

কোন লোক হযরত হাফী রহমাতুল্লাহ-এর সামনে বললেন, আমি আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম। লোকটির কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি অসত্য কথা উচ্চারণ করলে। তোমার বাক্য যদি সত্য হত, তাহলে তিনি যা করতেন তাতেই তুমি খুশী থাকতে।

তিনি আরও বললেন, যদি কোন ব্যাপারে তোমার মনে অহঙ্কার আসে, তাহলে তুমি মৌনতা অবলম্বন কর। আর যদি ঐ অবস্থায়ও তোমার মনে গর্ব থেকে যায় তাহলে নীরবতা ভঙ্গ করে কথা বলতে থাক।

হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ-এর পার্থিব জীবনের বিদায় মুহূর্ত আসন্ন হয়ে ওঠলে তিনি ভয়ানক ভীত হয়ে পড়েন। লোকে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে বলে এত অস্থির হয়ে উঠেছেন? তিনি বললেন, না। আমার এ অস্থিরতার এবং ভীতির কারণ হচ্ছে, এবার আমাকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে।

অন্তিম শয্যায় এক লোক তার অভাবের কথা জানালে তিনি তাকে তাঁর গায়ের জামাটি দান করে অন্য একটি জামা পরে নিলেন। এ জামাটি পরেই হযরত বিশর রহমাতুল্লাহ দেহত্যাগ করেন।

শোনা যায়, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোন পশু-প্রাণী বাগদাদের রাজপথে মল ত্যাগ করত না। কারণ তিনি সব সময় খালি পায়ে চলাফেরা করতেন। কিন্তু একবার চতুষ্পদ কোন প্রাণী রাস্তায় মলত্যাগ করে। তাতে পশুর মালিক হায়! হায়! করে ওঠেন। কেননা, তাঁর মনে হল, হয়ত হযরত বিশর রহমাতুল্লাহ আর ইহলোকে নেই। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সত্যিই তাই। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুর পর বহু লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। আর তা-ও মানুষের এক আলোকিত অভিজ্ঞতা। একজন তাঁকে (স্বপ্নে) জিজ্ঞেস করে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কিরূপ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আচরণ করলেন? তিনি জবাব দেন, আল্লাহ্ আমার ওপর রেগে বলেন, তুমি দুনিয়াতে আমাকে এত ভয় করে চলতে কেন? আমার 'করীম' নামটির ওপর তোমার কি পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না?

অন্য একজনের অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, পৃথিবীতে আমাকে খুশী করার জন্য তুমি যে সব বস্তু পানাহার করনি, এখন তা অনায়াসে উপভোগ কর। আর একজন (স্বপ্নযোগে) তাঁকে প্রশ্ন করেন, ওফাতের পর আল্লাহ্ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করলেন? উত্তরে হযরত বিশর রহমাতুল্লাহ বলেন, আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, পৃথিবীতে আমি তোমাকে মানুষের মনে যে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তার বিনিময়ে তুমি যদি আগুনের মধ্যে বসেও আমাকে সেজদা করতে, তাহলেও আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পূর্ণ হত না।

আর একজনের একই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, আল্লাহ্ আমাকে মাফ করেছেন। আর জায়গা দিয়েছেন জান্নাত। আল্লাহ্ বলেন, তোমাকে ধন্যবাদ, আমি যে সময় তোমার প্রাণ হরণ করলাম তখন পৃথিবীতে তোমার তুল্য পরম বন্ধু আর কাউকে পাওয়া গেল না। তাঁর এই সব উত্তর থেকে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়, আল্লাহ্ পাকের কী অপরিসীম বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন।

হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ-এর ধর্মনিষ্ঠা তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। একবার এক মহিলা এসে প্রখ্যাত হাদীসবিদ্ ইমাম আহমদ্ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করেন, গতরাতে আমি আমার বাড়ীতে বসে সুতা কাটছিলাম। হঠাৎ দেখি, এক বৃদ্ধা মশাল হাতে রাজপথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর আমি সেই মশালের আলোতেও কিছু সুতা কেটেছি। এখন বলুন জনাব, ঐ বৃদ্ধার বিনা অনুমতিতে তার মশালের আলোতে আমার সুতা কাটা বৈধ হয়েছে কিনা? হযরত হাম্বল রহমাতুল্লাহ প্রশ্নকারিণী মহিলার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ-এর বোন। ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ কেঁদে ফেললেন, মাননীয়া, আপনার পক্ষে এটি বৈধ হতে পারে না। আপনার উচিত ভাইয়ের আদর্শ অনুসরণ করা। তাঁর কথা তো আপনি জানেন। কোন খাদ্য বস্তু সন্দেহ জনক হলে তাঁর হাত তাতে সায় দিত না। আপনা থেকেই হাত ওঠে আসত।

হযরত দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ

কে যেন কাঁদছে। আর কাঁদতে কাঁদতে বলছে, তোমার কি এমন কোন মুখ ছিল যে তার ওপর মৃত্তিকা মিশ্রিত হয়নি এবং তোমার কি এমন চক্ষু ছিল যা জমিনে নিক্ষিপ্ত হয়নি।

বিচিত্র কান্না। আরও বিচিত্র কথাগুলো। কথাগুলির মর্ম অনুধাবন করতে পারলেন না জনৈক শ্রোতা। চলে এলেন হযরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ দেখলেন, মর্মপীড়ার ছাপ রয়েছে তার সারা মুখ জুড়ে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোমার? তুমি এত বিমর্ষ কেন?

তিনি জানালেন, দুনিয়া সম্বন্ধে তাঁর আর কোন উৎসাহ নেই। তার মনের মধ্যে যা চলছে, তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কোন বইয়ে তিনি তার অর্থ খুঁজে পাননি। কোন সমাধানই তাঁর মনঃপুত হয়নি। আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ তাঁকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন মানুষের সংসর্গ থেকে দূরে থাকেন। বাড়ীর মধ্যে নিরিবিলিতে একাগ্র সাধনায় মগ্ন হন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম আজমের নির্দেশে তিনি তাই করলেন। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি বাড়ীর নির্জন পরিবেশে নিরিবিলি ধ্যান-এবাদতে নিমগ্ন থাকলেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন হযরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ তাঁর নিকট হাজির হয়ে বললেন, আর এভাবে থাকার দরকার নেই। তুমি এখন অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের কাছে গিয়ে মারেফত বিদ্যা শিক্ষা কর।

তদনুযায়ী তিনি প্রায় এক বছর ধরে ইমাম মুরশিদগণের দরবারে যাওয়া-আসা করতেন। অবশ্য তিনি নিজে কিছুই বলতেন না। তাঁরা যা বলতেন চুপচাপ বসে কথা শুনে যেতেন। এভাবে এক বছর পূর্ণ হলে তাঁর মনে হল, যেন ত্রিশ বছরের সাধনা সফল হয়েছে। তারপর তিনি যান হযরত হাবীব রায়ী রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। তাঁর সাহচর্যে থেকে তিনি এমন এক অবস্থায় উপনীত হন যে, বাইরের বইপত্র তাঁর কাছে গৌণ মনে হয়। সব বই পানিতে নিক্ষেপ করে তিনি আবার নির্জন সাধনায় নিমগ্ন হন। আর আল্লাহর রহমতে সিদ্ধি-লাভ করেন।

আত্ম-সমর্পিত এই নীরব সাধকের নাম হযরত দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ। সাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়। বিশেষতঃ ফেকাহশাস্ত্রে তাঁর স্থান ছিল শীর্ষে। ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ-এর তিনি এক সুযোগ্য শিষ্য। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি তাঁর কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। হযরত ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ ও হযরত আদহাম রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল। আর আগেই বলা হয়েছে, হযরত হাবীব রায়ী রহমাতুল্লাহ ছিলেন তাঁর মারেফতের মুরশিদ।

পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি বিশ দেরহাম পান। আর বিশ বছর ধরে তিনি তা নিজের কাছে জমা রাখেন। তিনি বলতেন, এগুলো রেখেছি আমার এবাদতের একাগ্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে। একটি মুহূর্তও তিনি নষ্ট করতেন না। এমনকি খেতে বসে রুটি ইত্যাদি না চিবিয়ে পানিতে ভিজিয়ে শরবতের মতো পান করতেন। বলতেন, রুটি চিবিয়ে খেতে যে সময় ব্যয় হয়, তাতে পবিত্র কোরআনের অনন্ত পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করা যায়।

একদিন আবু বকর আইয়াশ তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, একখানি রুটি হাতে নিয়ে তিনি চুপচাপ কাঁদছেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রুটি হালাল না হারাম তা জানা নেই। তাই ইতস্ততঃ করছি। একদিন অন্য একজন দেখেন, একটা পানির পাত্র রোদে রেখে দিয়েছেন। তিনি বললেন, পানি রোদে রেখেছেন কেন? গরম হয়ে যাবে যে! হযরত দাউদ রহমাতুল্লাহ বললেন, যখন পানি রাখি তখন ওখানে ছায়া ছিল। পরে রোদ এসেছে। কিন্তু এখন পাত্রটি তুলে নিয়ে ছায়ায় রাখতে আমার লজ্জা হয়। কেননা আল্লাহ মনে করতে পারেন, তাঁর ধ্যান বন্ধ রেখে আরামের তাগিদে আমি সেটি অন্যত্র সরিয়ে রেখেছি।

হযরত দাউদ রহমাতুল্লাহ-এর পৈতৃক বাড়ীটি ছিল পুরাতন, কিন্তু বৃহৎ। বাড়ীর এক অংশ ভেঙে পড়ায় তিনি অন্য অংশে বাস করতে থাকেন। কিছুদিন পর সে অংশটিও ধ্বসে যায়। তিনি আশ্রয় নেন বাড়ির দরজায়। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, বাড়ীটা মেরামত করছেন না কেন? তিনি জবাব দেন, আমি আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ, পার্থিব জগতে আমি কোন বাড়ী নির্মাণ করব না। আর একজন বাড়ীর দুরবস্থার বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বললেন, বিশ বছর ধরে এ বাড়ীর দিকে আমার নজর নেই। আমার খেয়াল দৃষ্টি অন্য দিকে।

একবার কয়েকজন লোক তাঁকে বলল, আপনি এভাবে মানুষের সংস্রব সংসর্গ ছেড়ে দিয়েছেন কেন? তিনি বললেন, কার সংস্রবে যাব বল? যদি আমি আমার চেয়ে কম বয়সী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লোকের কাছে যাই, বয়োজ্যেষ্ঠ বলে তারা আমাকে ধর্মোপদেশ দেবে না। আর যদি বড়দের কাছে যাই, তাহলে তারা দোষত্রুটি শুধরে না দিয়ে আমার সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবে, আমাকে নির্দোষ-নিখুঁত মনে করবে। অতএব লোকের সংস্রবে আমার কী লাভ! তাঁকে আবারও জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি এখনও শাদী করছেন না কেন?

তিনি বললেন, আমি একটি মহিলার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারব না।

কী রকম? শাদীর পরে তার খোরপোষের দায়িত্ব নিতে হবে। সেটা আমার দ্বারা হবে না।

আপনি দাড়িতে চিরুনি ব্যবহার করেন না কেন?

তাঁর উত্তর ঃ আমার সময় কই?

জ্যোৎস্নার আলো ভরা এক রাত। বাড়ীর ছাদে উঠে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন আর আকাশের অসংখ্য গ্রহ-তারার বিষয়ে চিন্তা করছেন। হঠাৎ দেখা গেল, তিনি কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। পড়ার শব্দে আশপাশের লোকেরা ভাবল, হয়ত ছাদে চোর উঠেছে। তড়িঘড়ি ছাদের ওপরে উঠে এসে তারা দেখে, হযরত দাউদ রহমাতুল্লাহ পড়ে রয়েছেন। তারা বলল, আপনাকে এভাবে কে ফেলে দিল? তিনি বললেন, তা তো বলতে পারি না। কেননা, আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

শোনা যায়, তিনি একাধারে রোজা রাখতেন। এক গ্রীষ্মের দুপুরে রোদে বসে তিনি এবাদত করছেন। মা তাঁকে ছায়ায় বসতে বললেন। কিন্তু তিনি বললেন, আত্মার আরামের উদ্দেশ্যে স্থান পরিবর্তন করতে তাঁর লজ্জা হয়।

বাগদাদ শহরের লোক তাঁকে বড্ড জ্বালাতে শুরু করে। অতিষ্ঠ হয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে বলেন, দয়াময়, আপনি আমার পরনের কাপড়খানি নিয়ে নিন। তাহলে আমি আর জামায়াতে অংশ নিতে পারব না আর মানুষের সঙ্গেও আমার দেখা-সাক্ষাত হবে না। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেন। একদিন সত্যিই তাঁর পরনের কাপড় হারিয়ে যায়। তখন গভীর নির্জনে এবাদত-বন্দেগী করার অঢেল সুযোগ এসে যায়।

হযরত দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ ছিলেন চিন্তাশীল, বিষণ্ন মানুষ, কোন সময়ে তাঁকে প্রসন্ন দেখাত না। তিনি বলতেন, প্রতি মুহূর্তে মনে যার আল্লাহর ভয়, সে প্রসন্ন থাকবে কি করে? কিন্তু একবার এক দরবেশ তাঁকে প্রফুল্ল দেখে কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি চমৎকার জবাব দেন। বললেন, আল্লাহ প্রেমের শরাব পান করে নেশাচ্ছন্ন হয়ে তিনি আনন্দ অনুভব করছেন।

ঘটনাচক্রে তিনি যদি লোকজনের ভিড়ের মধ্যে পড়ে যেতেন, তাহলে 'ঐ সৈন্য আসছে, সৈন্য আসছে' বলতে বলতে দৌড়ে পালাতেন। তারা জিজ্ঞেস করত, কার সৈন্য আসছে? তিনি বলতেন, কবরস্থানের মৃতদের সৈন্য।

তিনি প্রচুর অমূল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন। যেমন–

(১) দুনিয়া থেকে রোজা রাখ আর পরকালে গিয়ে ইফতার কর।

(২) কু-বচন থেকে বিরত থাক।

(৩) সৃষ্টি থেকে দূরে থাক।

(৪) দ্বীনকে দুনিয়ার ওপর গুরুত্ব দাও। সম্ভব হলে দুনিয়াকে ভুলে যাও।

(৫) মৃত্যুকে ঈদের উৎসব মনে কর। আর বাঘ দেখে মানুষ যেমন পালিয়ে যায়, তেমনি দুনিয়াদার লোকদের থেকে পালিয়ে যাও।

(৬) দুনিয়াদার লোক থেকে মন উঠিয়ে দাও। জিবকে নিয়ন্ত্রণ কর। লোক-সংসর্গ থেকে একা বাস কর। বিষয়ী লোকেরা যেমন সুখ-শান্তির জন্য দুনিয়াকে ভালোবাসে, তেমনি ধর্মকর্মের জন্য তুমিও দুনিয়াকে পছন্দ কর।

(৭) মৃত ব্যক্তিগণ তোমার জন্য কবরে অপেক্ষা করছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৮) যে ব্যক্তি অপরকে তওবা করায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দেয়, অথচ নিজে তা পালন করে না, তার উপমা সেই শিকারীর মতো যে নিজে শিকার করে অথচ অন্য লোক কাবাব খায়।

(৯) তুমি যদি শান্তিকামী হও, তাহলে দুনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নাও। যদি পরকালের সম্মান চাও তবে ইহকালের অহমিকা ত্যাগ কর।

প্রখ্যাত সাধক হযরত ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ তাঁর সঙ্গে দুবার দেখা করেন। একবার তিনি তাঁকে ভাঙা ছাদের নিচে দেখে বলেছিলেন, এর নিচে বসা উচিত নয়, কেননা এটি ভেঙে পড়ার উপক্রম। হযরত দাউদ রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি অবশ্য বিশ বছর ধরে এই ছাদের তলায় আছি। কিন্তু কখনও ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখিনি।

দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় হযরত ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ তাঁর কাছে কিছু উপদেশ চাইলে তিনি বললেন, লোক-সংসর্গ থেকে দূরে থাকুন।

হযরত মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহ বলেন, দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু, দুনিয়াদার ও তাদের অহঙ্কার-অহমিকা সব কিছুই তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ ও ঘৃণার বস্তু ছিল। আর এই জন্য তিনি দুনিয়াদার মানুষকে অপবাদ দিতেন। তাদের অবস্থার জন্য তিনি খুব দুঃখও প্রকাশ করতেন। তিনি যখন কাপড় ধুতেন তখন বলতেন, আমি যদি আমার অন্তরকেও এভাবে ধুয়ে-মুছে সাফ করতে পারতাম, তাহলে কত ভালোই না হত। গরীব-দুঃখীদের তিনি খুব সম্মান করতেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ। একবার ক্ষৌরকর্মের পারিশ্রমিক বাবদ ক্ষৌরকারকে তিনি একটি মুদ্রা দেন। তা দেখে কেউ বলেন, এটি নিছক অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়। তিনি বলেন, মোটেই নয়। বরং এটি গরীবের প্রতি সহৃদয়তার নিদর্শন। যাদের মধ্যে মানবতা নেই, আল্লাহ্ তাদের এবাদত কবুল করেন না।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ এই দুজনের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ-কেই তিনি সম্মান ও সমাদর করতেন। পক্ষান্তরে আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ-কে সেভাবে নিতে পারতেন না। তাঁদের দুজনের মধ্যে মাসআলা-সংক্রান্ত কোন মতবিরোধ সৃষ্টি হলে হযরত দাউদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে আসতেন। দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ-এর দিকে পিঠ রেখে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ-এর দিকে মুখ করে বসতেন। যা কিছু জিজ্ঞেস বা বলার, তা বলতেন ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ কে। আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে কথা বলতেন না। এমনকি তাঁর নামটা পর্যন্ত মুখে আনতেন না। ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ-এর বক্তব্য সঠিক হলে বলতেন, হ্যাঁ, এই লোকটি ঠিকই বলেছে।

দু'জনের প্রতি দু'রকম ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ ধন-সম্পদ তুচ্ছ করে সাধনার পথে এসেছেন। ধন-মান, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার চেয়ে তিনি বেশী মূল্য দিয়েছেন ধ্যান-জ্ঞানকে। কিন্তু আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ ঠিক এর বিপরীত। ইমাম আজম নীতির প্রশ্নে কারাবরণ করেছেন, কিন্তু কাজীর পদ গ্রহণ করেননি। অথচ তাঁরই শিষ্য আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ শিক্ষাগুরুর দৃষ্টান্ত সামনে থাকা সত্ত্বেও কাজীর পদ গ্রহণ করেন। কাজেই পার্থিব ধনাকাঙ্খা ও খ্যাতির লোভে যে লোক শিক্ষাগুরুর নীতি বিসর্জন দেয়, তিনি তাঁর সাথে কথা বলবেন কী করে?

একবার খলীফা এসেছেন হযরত দাউদ রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে রয়েছেন আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ। কিন্তু তিনি তাঁদের ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন না। অগত্যা খলীফা ধরলেন তাঁর জননীকে। তিনি যেন এ ব্যাপারে একটু সুপারিশ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেন। কিন্তু মায়ের সুপারিশও তিনি গ্রাহ্য করলেন। সাফ বলে দিলেন, অত্যাচারীর নিকট তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর মা তখন উপায়ান্তর না দেখে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলেন, মায়ের নির্দেশ পালন করা আপনার বিধান। খলীফার কাছে আমার কোন পার্থিব প্রয়োজন নেই। শুধু তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়াই আমার ইচ্ছা। হযরত তায়ী রহমাতুল্লাহ মায়ের এই মোনাজাত শুনে বাধ্য হয়ে খলীফাকে ভেতরে আসার অনুমতি দেন।

যাক, খলীফা ভেতরে এসে তাঁর সামনে বসলেন। কিন্তু কোন কথাবার্তা নেই। একটি শব্দহীন সময় পার হয়ে গেল। অবশেষে বিদায় নেবার জন্য খলীফা উঠে দাঁড়ালেন আর একটি স্বর্ণমুদ্রা তাঁর সামনে রেখে বললেন, এটি গ্রহণ করুন। আমার হালাল উপার্জন। এতে কোন রকম দোষত্রুটি নেই। দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ বললেন, এটি আপনি তুলে নিন। আমার অর্থের প্রয়োজন নেই। আমার বাড়ীখানা বৈধ মালপত্রের বিনিময়ে বিক্রি করেছি। তাতেই আমার চলছে। আল্লাহকে বলেছি, যেদিন মালপত্র শেষ হয়ে যাবে, তিনি যেন সেদিন আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নেন। পৃথিবীর কারো কাছে আমি হাত পাততে চাই না। আশা করি আল্লাহ আমার প্রার্থনা পূরণ করবেন। খলীফা বাধ্য হয়ে মুদ্রাটি তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ হযরত তায়ী রহমাতুল্লাহ-এর এক অনুচরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, সংসার খরচের জন্য কী পরিমাণ টাকা তাঁর আছে। তিনি বললেন, দশ দেরহাম রূপোর টাকা এখনও হাতে আছে। আর দৈনিক এক দিরহাম খরচ হয়। এরপর একদিন ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ মেহরাবে পিঠ লাগিয়ে মসজিদে বসে আছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, আজ দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। পরে জানা গেল, তাঁর অনুমান সত্য। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, এখানে বসে তিনি কী করে এ খবর পেলেন? ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ বললেন, হিসাব করে দেখলাম, তাঁর দৈনিক খরচের টাকা ফুরিয়ে গেছে। আর আমি ভালো করেই জানি, হযরত তায়ী রহমাতুল্লাহ-এর প্রার্থনা কখনও বৃথা যায় না।

ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ দাউদ-জননীকে জিজ্ঞেস করে তাঁর ওফাতের বিবরণ শুনলেন। দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ সারারাত ধরে নামাজ পড়েছেন। শেষ রাতে সেই যে সেজদায় গেলেন, আর উঠলেন না। অনেকক্ষণ পর ফজরের সময় হলে তাঁর মা তাঁকে নামাযের সময় হয়েছে বলে জাগাতে গেলেন। কিন্তু ডাকাডাকির পরও তাঁর মাথা যখন মাটি থেকে উঠল না, তখন তিনি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি আর নেই। সবাইকে ছেড়ে নিঃশব্দে তাঁর প্রভুর কাছে ফিরে গেছেন।

জনৈক সাধক বলেন, দারুণ গরমে রোদে বসে তিনি একদিন পাক কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তোরণের নিচে ঐ জায়গায় তিনি রাতেও শুতেন। বালিশের বদলে মাথার তলায় রাখতেন একখানা ইট। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে এভাবে কোরআন পড়তে দেখে সাধক বলেন, হুযুর, আপনি রাজি হলে আপনাকে একটু আরামদায়ক জায়গায় নিয়ে যেতাম। তাতে আপনার কষ্ট কিছুটা লাঘব হত। তিনি উত্তর দিলেন, নফসের আরাম ও শান্তির জন্য কোন কিছু করা আমি লজ্জাজনক বলে মনে করি। আমি এখনও প্রবৃত্তির কাছে কোনদিন পরাস্ত হইনি। এই শেষ সময়েও আমি তার কাছে পরাজিত হতে চাই না।

বিদায় মুহূর্ত আসন্ন হয়ে উঠলে তিনি অসিয়ত করে গেলেন, মৃত্যুর পর তাঁকে যেন তাঁর ঐ ভাঙা দেওয়ালের কাছেই দাফন করা হয়। যাতে কবরের কাছে কোনদিন বেশী লোকের সমাগম না হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সে রাতে বহু দূরের এক দরবেশ স্বপ্নে দেখেন, হযরত দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ যেন সশরীরে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নের এ বিবরণ নিবেদন করার জন্য তিনি দ্রুত ছুটে চললেন তাঁর বাড়ির দিকে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলেন, সব শেষ।

শোনা যায়, তাঁর মৃত্যুর পর শূন্যে একটা শব্দ শোনা গেল, দাউদ তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছেন। আর আল্লাহ তাঁর প্রতি খুব খুশী হয়েছেন।

হযরত
হুসাইন মানসুর হাল্লাজ
রহমাতুল্লাহ

হযরত হুসাইন মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ আধ্যাত্ম জগতের এক বিস্ময়কর পুরুষ ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা যেমন ছিল অসাধারণ, তেমনি তাঁর আধ্যাত্ম চেতনাও ছিল অপরিসীম। বহু গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। কিন্তু বক্তব্য বিষয়ের গুঢ়ার্থ ছিল দুর্বোধ্য। এবাদতে তো কথাই নেই। তাঁর আল্লাহ্ প্রেমেরও কোন তুলনা ছিল না। আল্লাহ্ প্রেমে তিনি ছিলেন নিয়ত অস্থির। আল্লাহর বিরহানলে তিনি দগ্ধ হয়েছেন দিন রাত। আর এজন্য জীবনে কষ্টও পেয়েছেন প্রচুর। শেষ পর্যন্ত নিজের অমূল্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষের হাতে।

মানুষ তাঁর কাজকর্মে বিরক্ত হতেন। তাঁর বহু কাজে আপত্তি ছিল সুফী দরবেশগণেরও। তাঁরা সে সবের প্রতিবাদ করতেন। তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তার মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে তাঁরা বলতেন, তাসাওউফে তাঁর কোন দখল নেই। অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ খাফীফ রহমাতুল্লাহ, হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ, হযরত আবুল কাসেম নসরাবাদী রহমাতুল্লাহ, ইবনে আতা রহমাতুল্লাহ প্রমুখ প্রখ্যাত তাপসগণ তাঁকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দরবেশ বলে মনে করতেন। আবার অনেকে তাঁকে কাফের বলেছেন। তাঁর ওপর অত্যাচার করেছেন। অনেকে বলেন, তিনি ছিলেন ইত্তেহাদী। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পেতেন না। মূলত এই গূঢ়তত্ত্ব সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। বাগদাদের কিছু লোক হাল্লাজী বা তাঁর অনুসারী বলে দাবী করতেন আর নানা অপকর্মে লিপ্ত হতেন।

তিনি একবার বলেছিলেন 'আনাল হক'। অর্থাৎ আমিই আল্লাহ্। তাঁর ওপর যে অকথ্য জুলুম হয়, তার কারণই হল এ উক্তি। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকার হযরত ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি এটাকেই অত্যন্ত আশ্চর্য মনে করি যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন তূর পর্বতে আল্লাহর জ্যোতি দর্শন করেন, তখন গাছ থেকে 'ইন্নী আনাল্লাহ' নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ এই শব্দ শোনা গিয়েছিল। বলা হয়, এ আওয়াজ ছিল স্বয়ং আল্লাহর, গাছের নয়। তা হলে হযরত মানসুর হাল্লাজের রহমাতুল্লাহ মুখ থেকে যখন 'আনাল হক' কথাটি বের হয়, তখন কেন বলা হবে না তাঁর মুখের বাণীটি আসলে আল্লাহর বাণী। হযরত হুসাইন মানসুর হাল্লাজের রহমাতুল্লাহ মুখের কথা নয়। হযরত ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ আর বলেন, তাঁর বেলায়ও তো বলা যেতে পারে যে, তাঁর জবানে খোদ আল্লাহই 'আনাল হক' কথাটি উচ্চারণ করেছেন। এটি হযরত হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ-এর কথা নয়। তিনি নিজে আল্লাহ হওয়ার দাবীও করেননি।

হযরত শায়খ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ বলেন, বাগদাদ শহরে হুসাইন মানসুর নামে এক জাদুকর ছিল, কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে তাপসকে গুলিয়ে ফেলেছেন। আসল ঘটনা কিন্তু অন্য রকম। জাদুকরের জন্ম ওয়াসেত শহরে আর মানসুর হাল্লাহর রহমাতুল্লাহ বাস

করতেন বাগদাদে। যাই হোক, হযরত আবদুল্লাহ খফীফ বলেন, হুসাইন মানসুর রহমাতুল্লাহ আল্লাহর মারেফাতে জ্ঞানী ছিলেন। হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ বলেন, হযরত মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ ও আমি- আমরা দু'জন একই অবস্থার লোক। পার্থক্য'টুকু এই যে, আল্লাহর দাবীদার মনে করে মানুষ তাঁকে ধ্বংস করেছে, আর আমাকে পাগল মনে করে দূর করে দিয়েছে।

হযরত মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ-এর সঠিক জন্মস্থান জানা যায় না। তবে তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় বাগদাদে। আঠারো বছর বয়সে তিনি তশ্‌তরে চলে যান। সেখানে হযরত আবদুল্লাহ তশ্‌তরী রহমাতুল্লাহ-এর সংস্পর্শে দু'বছর কাটান। তারপর বসরা। বসরা থেকে দাওহারকা। সেখানে হযরত আমর ইবনে ওসমান মক্কী রহমাতুল্লাহ-এর সাহচার্যে আসেন। আর এখানেই তিনি বিবাহ করেন। হযরত ইয়াকুব আতা রহমাতুল্লাহ-এর কন্যাকে। অতঃপর হযরত ইয়াকুব রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি বাগদাদে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে চলে আসেন। এখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে তিনি চলে যান মক্কায়। সেখানে এক বছর কাটান। তারপর একদল সুফী সাধকের সঙ্গে তিনি আবার বাগদাদে আসেন। এই সময় তিনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-এর কাছে একটি জটিল মাসআলার উত্তর জানতে চান। কিন্তু হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, তুমি কুব শীঘ্র ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলবে। হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি যেদিন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলব, সেদিন আপনার অঙ্গেও এ সুফী পোশাকের পরিবর্তে মামুলী পোশাক দেখা যাবে।

দু'জনের ভবিষ্যাদ্বাণীই সফল হয়। পরবর্তীকালে, তাঁর আপাতঃ শরীয় বিরোধী কার্যকলাপের জন্য দেশের সমগ্র আলেম সমাজ যখন তাঁকে হত্যা করার ফতোয়া দেন, তখন কেবল হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-ই ফতোয়ায় সই করেননি। কেননা, তখন পর্যন্ত তিনি প্রকৃত সুফীই ছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে হযরত হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ-এর হত্যার সিদ্ধান্তে সম্মতি পোষণ করা সম্ভব ছিল না। দেশের খলীফা বললেন, মানসুর রহমাতুল্লাহ-এর বিরুদ্ধে এ ফতোয়াকে যদি শুদ্ধ প্রমাণ করতে হয়, তবে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-এর স্বাক্ষর একান্ত জরুরী। উপায়ান্তর না দেখে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ সুফীর পোশাক পরিত্যাগ করে খানকা থেকে মাদ্রাসায় চলে গেলেন। আর সেখানে প্রকাশ্য আলেমের পোশাক পরে ফতোয়ায় সই করলেন। তাতে তিনি মন্তব্যে লেখেন, প্রকাশ্য কাজকর্মের দিক থেকে মানসুর প্রাণদন্ডের উপযুক্ত। আর ফতোওয়া প্রদান করা হয় সাধারণতঃ বিচার বা ব্যবস্থা অনুসারেই। গুপ্ত অবস্থা মানুষের জন্য দেখা সম্ভব নয়। তার বিচার ব্যবস্থা আল্লাহই করে থাকেন।

হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে মাসআলার উত্তর না পেয়ে হযরত হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ মনে এত বেশী দুঃখ পান যে, তাঁকে কিছু না বলেই স-স্ত্রীক তশ্‌তরে চলে যান। তশ্‌তরবাসী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তিনি এক বছরেরও ওপর সেখানে স-সম্মানে বাস করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মতানৈক্য হতে খুব বেশী দেরী হল না। কারও মন যুগিয়ে চলা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। বিশেষ করে আলেম সমাজকে তিনি তেমন আমল দিতেন না। তার ওপর ছিল হযরতের আমর ইবনে ওসমান মক্কী রহমাতুল্লাহ-এর প্ররোচনা। তিনি তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি মক্কা থেকে তাঁর বিরুদ্ধে খোরাসানবাসীদের উত্তেজিত করে তোলেন। ফলে মর্মাহত মানসুর রহমাতুল্লাহ দরবেশী পোশাক ছেড়ে সাধারণ বেশে সমাজের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গেলেন। এ যেন এক অজ্ঞাতবাস। আর এভাবে কাটল পাঁচ বছর। তিনি কখনও খোরাসানে, কখনও মাওরান্নহরে, কখনও বা নীমরোজে, সিস্তানে, কেরমানে- ইত্যাদি নানা স্থানে ঘুরে

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বেড়ান। শেষে গেলেন পারস্যে। আর এখানে রচনা করলেন বহু মূল্যবান গ্রন্থ। তাছাড়া আহওয়াজবাসীদের উপদেশ দিয়ে তাদের অনুকূল্য লাভ করলেন। তাঁর বক্তৃতা, উপদেশ সব কিছুই ছিল গূঢ় রহস্যপূর্ণ। এ জন্য স্থানীয় জনগণ তাঁর নাম দেন হাল্লাজুল আসরার। হাল্লাজ আরবী শব্দ যার অর্থ হল ধুনকার, ধানুকী, যে তুলা ধুনে।

শোনা যায়, একবার তুলার স্তূপের দিকে ইশারা করামাত্র সেগুলি খুব সুন্দরভাবে ধুনা হয়ে যায়। আর তখন থেকেই তিনি হাল্লাজ নামে অভিহিত হন।

পাঁচ বছর আত্মগোপনের পর তিনি বসরায় ফিরে আসেন। আর আবারও সুফী পোশাক পরিধান করেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তিনি যান মক্কায়। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই হযরত ইয়াকুব নাহারজুরী রহমাতুল্লাহ তাঁকে জাদুকর বলে আখ্যা দেন। বাধ্য হয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন বসরায়। ওখানে এক বছর কাটিয়ে আহওয়াজ হয়ে তিনি চলে আসেন হিন্দুস্থানে। হিন্দুস্থান থেকে খোরাসান, মাওরাউন্নহর প্রভৃতি দেশ ঘুরে ঘুরে চলে যান চীনে। তারপর আবার মক্কা শরীফে। এবার সেখানে দু'বছর কাটান। তারপর মক্কা থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর মধ্যে দারুণ পরিবর্তন আসে। তখন তাঁর কথাবার্তা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই এরপর তিনি যখনই যে দেশে গেছেন তখনই মানুষের কাছে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়েছেন। এক এক সময় তিনি এত বেশী দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও উৎপীড়ন সহ্য করেন যে, আর কোন সাধক-দরবেশকে তা কখনও সহ্য করতে হয়নি। শোনা যায়, তাঁর গূঢ় রহস্যপূর্ণ, দুর্বোধ্য কথা ও আচরণের কারণে তিনি অন্তত পঞ্চাশটি দেশ থেকে বিতাড়িত হন। অথচ ইনিই যখন আগের দফায় বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন তাঁর জ্ঞান মুগ্ধ মানুষ তাঁকে নানা সম্মানে ও উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ভারতবাসী তাঁকে বলতেন আবুল মুগীস, চীনারা বলতেন, আবুল মুঈন, খোরাসানীরা বলতেন, আবুল মনীর, পারস্যবাসীরা বলতেন, আবু আবদুল্লাহ যাহিদ, খুজিস্তানবাসীরা বলতেন, হাল্লাজুল আসরার, বাগদাদ ও বসরার মানুষ তাঁকে মুগবের নামে সম্মানিত করেন।

শোনা যায়, তিনি দিনে-রাতে চারশ রাকয়াত নফল নামায পড়তেন। কিন্তু নিজের জন্য ঐ নফলকে তিনি ফরজ করে নেন। সবাই বলতেন, তিনি যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তাতে এত কষ্ট করার কি দরকার? তিনি তার উত্তরে বলতেন, কষ্ট-ক্লেশ আল্লাহ্-প্রেমীদের মনে ঠাঁই পায় না। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মৃত মানুষের মতো হয়ে যান।

দীর্ঘ বিশ বছর ধরে তিনি একই পোশাকে উপাসনা করতেন। একবার লোকে জোর করে তা খুলে নেয়। তখন দেখা যায়, তার ভেতরে জমে আছে অসংখ্য উকুন। তার কোন কোনটির ওজন নাকি ছিল প্রায় তিন রতি। একজন একটি বিছে দেখতে পেয়ে মারতে যায়। তিনি নিষেধ করেন। বলেন, ওটি তাঁর সঙ্গে রয়েছে প্রায় বারো বছর।

তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন হযরত রুশী খেরাদ সমরকন্দী। একবার হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ-এর চারশ সঙ্গী নিয়ে এক বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করছিলেন। সঙ্গীরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাঁকে বললেন, এখন যদি ভুনা মাথা (ছাগলের) ও রুটি খেতে পেতাম তো বড় তৃপ্তি হত। তিনি তাঁদের সারিবদ্ধ অবস্থায় বসিয়ে দিয়ে নিজের পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে একটি মাথা ও রুটি এনে একজনকে দিলেন। আর এই ভঙ্গিতে চারশ' জনকেই মাথা ও রুটি খাওয়ালেন। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গীরা খেজুর খেতে চাইলে তিনি সটান দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের বললেন, তোমরা আমাকে ধরে নাড়া দাও। তাঁরা নাড়া দিতেই প্রচুর পাকা খেজুর পড়তে লাগল। তাঁরা বেশ মজা করে খেজুর খেলেন।

একবার তিনি চলেছেন এক বন্য পথে। সঙ্গে অনেক সঙ্গী। তাঁরা আঙুর খেতে চাইলেন। তিনি তাঁর ডান হাতখানন যেমনি ওপরে ওঠালেন অমনি হাত ভর্তি আঙুর এল। আর এভাবে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বেশ কয়েকবার শূন্যে হাত তুলে তিনি পেটপুরে তাদের আঙুর খাওয়ালেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের হালুয়া খাবার ইচ্ছা হলো। আর অলৌকিক শক্তি বলে তিনি তাঁদের সে ইচ্ছাও পূরণ করলেন। একজন বলল, হালুয়ার স্বাদ হুবহু বাগদাদের হালুয়ার মতো। তিনি বললেন, আল্লাহর রহমতে আমার জন্য বাগদাদের বাজার আর বন-জঙ্গল দুইই সমান।

ঐদিন বাগদাদের বাবে এনতাকিয়া বাজারের এক হালুয়ার দোকান থেকে হালুয়া ভর্তি একটি কড়াই হঠাৎ উধাও হয়। তিনি যখন সদলবলে বাগদাদে পৌঁছলেন, তখন এক মুরীদের কাছে কড়াইটি দেখতে পেয়ে দোকানদার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি আপনি কোথায় পেলেন? মুরীদ ঘটনাটি বললেন। আর হলুয়া বিক্রেতা অবাক হয়ে হযরত মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে দীক্ষা নিলেন।

একবার হজ্জ যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন চার হাজার হজ্জযাত্রী। তাঁদের নিয়ে তিনি মক্কায় পৌঁছে কাবা ঘরের সামনে ঐ যে দাঁড়ালেন, পুরো একবছর আর নড়লেন না। এভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সূর্যের তাপে তাঁর দেহ গলে গিয়ে চর্বি বেরোতে লাগল। গায়ের চামড়া গেল ফেটে। কিন্তু তিনি এক চুলও নড়লেন না। এ অবস্থায় এক লোক প্রতিদিন তাঁকে একটি রুটি এক কুঁজো পানি দিয়ে আসত। তার থেকে মাত্র ঢোক পানি আর এক টুকরো রুটি খেয়ে বাকী সব রেখে দিতেন।

হযরত মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ আরাফাতের মাঠে গিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন, প্রভু গো আপনি পথ ভ্রষ্ট মানুষের পথপ্রদর্শক। আমি যদি সত্যিই কাফের হয়ে থাকি, তবে আমার কুফরীই বাড়িয়ে দিন। যখন লোকজন তাঁর চারপাশ থেকে চলে যেত, তখন তিনি আবার দোয়া করতেন, প্রভু! আমি আপনার একত্ব স্বীকার ও বিশ্বাস করেই আপনি ছাড়া আর কারও এবাদত করি না। আর আপনার দেয়া দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম বলে তা প্রকাশ করতে পারি না। অতএব, আমার অনুরোধ, আমার বদলে আপনিই আপনার নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করুন। কেননা, আপনার প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের সম্পূর্ণ শোকর আদায় আপনার কোন বান্দার দ্বারা সম্ভব নয়। সেটি কেবল আপনার দ্বারাই হতে পারে।

হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, হযরত মূসা (আঃ) একবার ইবলীসকে জিজ্ঞেস করেন, সে হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করেনি কেন? ইবলীস বলল, সে আল্লাহর প্রত্যক্ষদর্শী ও সেজদাকারী ছিল। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে সেজদা করার তার কাছে সঙ্গত নয় বলে মনে হয়েছিল। আল্লাহর দীদারের মূল্য ও গুরুত্ব কী অপরিসীম, হযরত মূসা (আঃ) তা জানেন। আল্লাহর দীদার লাভের প্রতি তাঁর তীব্র বাসনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন, পাহাড়টার দিকে তাকান। আর আপনিও প্রবল বাসনা নিয়ে পাহাড়টির দিকে দৃষ্টি দেন।

ধৈর্যের সংজ্ঞা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ বলেন, হাত-পা কেটে ফেললেও, শূলে চড়ালেও দুঃখ না করা এবং বিচলিত না হওয়ার নাম ধৈর্য। হযরত ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ বলেন, আশ্চর্য লাগে, হযরত মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ-এর প্রতি শূলার যে ঘটনা ঘটল, তাতে এতটুকু দুঃখ বা আক্ষেপ প্রকাশ করলেন না।

হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ গেছেন হযরত হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ-কে হত্যা করতে। হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি এমন এক গুরুতর কাজ করার ইচ্ছা করেছি যার কারণে আমি পাগল প্রায়। আর আমি নিজেই তো মৃত্যুকে আহবান করেছি। অতএব, আপনি আমাকে হত্যা করবেন না।

আগেই বলা হয়েছে, তাঁর 'আনাল হক' মানুষের রোষ বৃদ্ধি করে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়, আপনার আল্লাহত্বের দাবী কি কুফরী নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় হল, সবকিছুই তাঁর। আর আপনাদেরই কথায়, তিনি কখনও বিলুপ্ত হন না। তবে কি হুসাইন মানসুর বিলীন হয়ে গেছে?

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ-এর কথার অন্য অর্থ করা যায় কিনা। তিনি বললেন, আর সে চেষ্টা করো না। কেননা, সময় পার হয়ে গেছে। এখন আলেম সমাজ ও খোদ খলীফা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছেন। তিনিও একবছর ধরে বন্দী। তাঁর অনুসারীরা তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। তিনি তাঁদের কথার সন্তোষজনক জবাবও দিতেন। কিন্তু এখন লোকজনের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কয়েকজন বিদগ্ধ পণ্ডিত তাঁর কাছে দু'জন লোককে এ কথা বলে পাঠান যে' আনাল হক উচ্চারণ করে তিনি যে অপরাধ করেছেন তার জন্য তওবা করলে তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তিনি তা পারবেন না। হযরত আতা রহমাতুল্লাহও তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবও ছিল ঐরকম। কিন্তু তাঁকেও তিনি একই জবাব দিয়েছেন।

কথিত আছে, প্রথম রাতে তাঁকে বন্দী করা হলে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। দ্বিতীয় রাতে দেখা যায় তিনিও নেই, জেলখানাও নেই। তৃতীয় রাত্রে অবশ্য তাঁকে এবং জেলখানাকেও দেখা যায়। এ ঘটনার মর্ম জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, প্রথম রাতে আমি আল্লাহর দরবারে চলে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় রাতে খোদ আল্লাহ্ এখানে উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় রাত্রে জেলখানা ও আমি আবার হাজির হলাম। কেননা, শরীয়তের বিধান রক্ষার জন্য আল্লাহ্ আবার আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন কর।

কথিত আছে, তিনি কারাগারে দৈনিক এক হাজার রাকাআত নফল নামায পড়তেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি যখন নিজেকে আল্লাহ্ বলে ঘোষণা করছেন, তখন এ নামায কার উদ্দেশ্যে? তিনি উত্তর দেন, আমার সম্বন্ধে আমিই ভালো জানি।

শোনা যায়, কারাগারে তখন তিনশ কয়েদী ছিল। তিনি তাদের মুক্তি দিতে পারেন বলে ঘোষনা করেন। কিভাবে তা সম্ভব বলে তাঁকে প্রশ্ন করা হল। কেননা তিনি নিজেও একজন বন্দী। পারলে আগে তিনি নিজেকেই মুক্ত করুন না? হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি যে আল্লাহর বন্দী। আর শরীয়তেরও অনুসরণ করি। না হলে ইচ্ছা করলে চোখের ইশরায় সব শৃঙ্খল ছিন্ন করতে পারি। এই বলে আঙুলের ইশরা সত্যিই সব কয়েদীর শেকল ছিঁড়ে ফেললেন। কয়েদীরা বলল, আমরা এখন বেরোব কেমন করে? জেলের দরজা যে বন্ধ। তিনি তখন ইশরা করতেই দেয়ালে কয়েকটি জানালা তৈরী হয়ে গেল। কয়েদীদের বললেন, যাও, চলে যাও।

আপনি আসবেন না? তারা বলল।

তিনি বললেন, প্রভুর সঙ্গে আমার একটা গোপন ব্যাপার আছে। তার মীমাংসা হবে শূলে চড়ে। পরদিন প্রহরীরা দেখল, জেল শূন্য। একটিও কয়েদী নেই। তারা জিজ্ঞেস করল, কয়েদীরা কোথা? তিনি বললেন, আমি সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি।

তবে আপনি থেকে গেলেন কেন? তারা বলল।

আমার ওপর মালিকের খেদ রয়েছে। সে জন্য অপেক্ষা করছি।

খলীফার কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি হুকুম দিলেন, চাবুক মেরে তাঁকে কতল করা হোক। তা না হলে আরও বিপত্তি ঘটতে পারে। নির্দেশমত তাঁকে কারাগার থেকে বের করে এনে তিন'শ ঘা চাবুক বসানো হল। কিন্তু তাতেও তাঁর আনাল হক উচ্চারণ বন্ধ হল না। বরং আরও জোরে তিনি তা করতে লাগলেন। যে লোকটি আঘাত করছিল, সে বলল, প্রতিটি আঘাতে শোনা গেছে, মানসুর ভয় পেও না।

অত আঘাত সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার, অবিচল। তারপর তাঁকে শূলে চড়াবার জন্য নিয়ে যাওয়া হল। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখার জন্য প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটে। সেই বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, হক, হক, আনাল হক। এমন সময় এক দরবেশ তাঁর সামনে এসে বললেন, প্রেম কি বস্তু? তিনি বললেন, আজ নিজের চোখেই তা দেখতে পাবেন। কাল এবং পরশুও দেখতে পাবেন। অর্থাৎ, প্রথম দিন তাঁকে হত্যা করা হবে। দ্বিতীয় দিন তাঁর মরদেহ পুড়িয়ে ছাই করা হবে। তৃতীয় দিন সে ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হবে। এগুলিই হল প্রেমের নিদর্শন।

তাঁকে যখন শূলে চড়ানো হয়, তখন তাঁর সেবক এসে তাঁর শেষ উপদেশ প্রার্থনা করেন। তিনি বললেন, নিজেকে যেকোন সৎ কাজে নিয়োজিত রেখো। না হলে রিপু তোমাকে মন্দ কাজে লাগিয়ে দেবে। তাঁর ছেলে এসে কিছু শুনতে চাইলেন। তিনি বললেন, দুনিয়ার সবাই পুণ্য কর্মের চেষ্টায় আছে। তুমি এমন একটি কাজের চেষ্টা কর, যার একটি কণা সারা বিশ্বের মানুষ ও জ্বিনের আমল হতেও উত্তম হয়। সেটি হল হাকীকতের একটি অণু।

অতঃপর তিনি সানন্দে শূলকাঠের দিকে এগিয়ে গেলেন। আপনার এত খুশী কিসের? কেউ তাঁকে শুধাল। তিনি বললেন, কারণ, আমি আমার ডেরায় যাচ্ছি। এর চেয়ে বেশী আনন্দের সময় আর কখন হবে? এবার তিনি বিড়বিড় করে আবৃত্তি করতে লাগলেনঃ আমার বন্ধু আমার প্রতি মোটেই অবিচার করেননি। অতিথিকে যেমন পবিত্র ও উত্তম শরাব পান করানো হয়, আমার প্রভুও আমাকে তেমনি পান করিয়েছেন। শরাবের পাত্র কয়েকবার পান করাবার পর খাপ ও তরবারি-সহ এগিয়ে যাবার জন্য বন্ধু আমাকে সাদরে আহ্বান জানালেন। আর এই হল ঐ ব্যক্তির উপযুক্ত আযাব যে গ্রীষ্মকালে অজগরের সঙ্গে বসে পুরাতন শরাব পান করে।

তাকে নিয়ে যাওয়া হল শূলের তলায়। তিনি শূল চুম্বন করলেন। তারপর শূলের সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, বীর পুরুষের মেরাজ হল শূলদণ্ড। এবার তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন, প্রভু গো! যা চেয়েছিলাম তাই পেলাম। যখন তাঁকে শূলে চড়ানো হল, তখন তাঁর শিষ্যগণ বললেন, হুজুর! যারা আপনার ওপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করল, আর আমরা যারা আপনার সমর্থক, তাদের প্রতি আপনার ধারণা কি? তিনি বললেন, যারা আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখাল, তারা দ্বিগুণ পুণ্য অর্জন করবে। আর যারা আমাকে সমর্থন করছে ও আমার প্রতি পবিত্র ধারণা পোষণ করছ, তারা পাবে মাত্র একটি সওয়াব। কেননা, তোমরা আমার প্রতি কেবল ভালো ধারণাই পোষণ করছ। আর তারা একত্ববাদের শক্তি ও শরীয়তের কঠিন বিধান-এ দু'য়র তাড়নায় তাড়িত। মনে রেখো, ইসলামে তওহীদই আসল। আর ভালো ধারণা তার শাখা মাত্র।

তিনি নাকি যৌবনে এক তরুণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সে কথা তাঁর মনে এল। আর বললেন, এতদিন পর আজ তার প্রতিশোধ নেয়া হল। এবার হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ এসে তাঁকে তাসাওউফ বা সাধনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আপনি যা দেখেছেন তা তাসাওউফের নিম্ন শ্রেণী। তাহলে উচ্চ কোন্‌টি? শিবলী রহমাতুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, সেটি আপনার জ্ঞানের বাইরে।

এবার তাঁর ওপর পাথর ছোঁড়া শুরু হল। এমন কি হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ ও একটি ঢিল নিক্ষেপ করলেন। আর হযরত হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ আর্তনাদ করে উঠলেন। লোকে তাঁকে বললেন, এত পাথর ছোঁড়া হচ্ছে, অথচ আপনি নির্বিকার। কিন্তু শিবলী রহমাতুল্লাহ-এর সামান্য ঢিলের আঘাতে আপনি অমন চিৎকার করলেন কেন? তিনি বললেন, যারা পাথর নিক্ষেপ করছে তারা রয়েছে অজ্ঞানতার আঁধারে। কিন্তু হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শিবলী রহমাতুল্লাহ-এর মতো জানাশোনা লোক আমার ওপর ঢিল ছুঁড়ছেন, এ দুঃখ কি সহ্য করা যায়?

শূলে চড়িয়ে প্রথমে তাঁর হাত কেটে দেয়া হয়। তিনি মন্তব্য করলেন, এ লোকটির এই হাত কাটা সহজ বটে, কিন্তু যে অদৃশ্য হাত দিয়ে সে আরশের ওপর থেকে গৌরবের মুকুট টেনে আনছে, তা কে কাটতে পারে? তারপর তাঁর পা কাটা হল। তখনও তাঁর সহাস্য মন্তব্য; এই পায়ের সাহায্যে পৃথিবীতে চলাফেরা করেছি। আর এখন এই পা কেটে ফেলা হল। কিন্তু আমার যে অদৃশ্য পা আছে, জান্নাতে আমি তার সাহায্যেই বিচরণ করব। তোমাদের ক্ষমতা থাকলে সে পা কেটে নাও দেখি! বলে দু'হাতের রক্ত নিয়ে তিনি মুখে মাখতে লাগলেন। এ আপনি কি করছেন? তাঁকে সবাই বলে। তিনি বললেন, আমার শরীরের রক্ত ঝরছে প্রচুর। তাই মুখখানি সাদা হয়ে গেছে। তোমাদের মনে হতে পারে, বুঝি বা ভয়েই মুখখানি সাদা হয়ে গেছে। তাই মুখে রক্ত মেখে লাল করে নিলাম।

তারপর তিনি হাতে রক্ত মাখতে লাগলেন। বললেন, ওজু বানাচ্ছি। লোকে বলে কি রকম? তিনি বললেন, দু'রাকায়াত এশকের নামায আছে, যা রক্ত দ্বারা ওজু করে আদায় করতে হয়।

এরপর তাঁর চোখ উপড়ে ফেলা হল। আর এ দৃশ্য দেখতে না পেরে জনগণ কান্নায় ভেঙে পড়ল। অবশ্য কেউ কেউ তখনও তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ছিল। এবার তাঁর জিভ কাটতে উদ্যত হলে তিনি একটু থামতে বললেন। তারপর শূন্যে দৃষ্টি ছড়িয়ে বললেন, প্রভু! এরা যে আমাকে এত কষ্ট দিল এজন্য এদের আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন না। যদিও তারা আমার হাত পা কেটেছে, তবুও তারা সবাই রয়েছে আপনার পথে। তারা যদি আমার মাথাও কেটে নেয়, তবুও তাদের উদ্দেশ্য শুধু আপনারই দীদার লাভ করা।

এবার তাঁর নাক ও কান কেটে দেয়া হল। তাঁর ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ তখনও বন্ধ হয়নি। তাঁর শেষ কথা হল ঃ আমি একত্ববাদের প্রেমিক। একত্বের প্রতি প্রেম হল, এককে একই জানা আর অন্য কাউকে সেখানে স্থান না দেয়া। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন; "যারা ঈমান আনে না এবং কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে তা থেকে পালিয়ে যায়, অথচ তারা অন্তরে জানে যে, এ অবধারিত সত্য, তারাই সহাস্যে রাসূলে করীম রহমাতুল্লাহ-কে তাড়াতাড়ি কিয়ামত এনে দেখাতে বলে। আর যারা ঈমান আনে (সেই ভয়ঙ্কর দিনে নাম শুনে) ভয়ে ভীত হয় ও কুকর্ম থেকে বিরত থাকে, তারাই কিয়ামতকে সত্য বলে জানে ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।"

এটুকু বলার পরই তাঁর জিভ কেটে নেয়া হল। তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এল। এল সন্ধ্যা। এবার খলীফার নির্দেশ ঃ দেহ থেকে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করা হোক। এ আদেশ পালনে ঘাতকেরা প্রস্তুত। হঠাৎ মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ স-শব্দে হেসে উঠলেন। কিন্তু জনতার মধ্যে জেগে উঠল কান্নার রোল। আর সেই হাঁসি কান্নার মধ্যেই তাঁর শিরচ্ছেদ করা হল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ উচ্চারণ করতে শুরু করল আনাল হক, আনাল হক। তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করা হল। বাকী রইল শুধু গলা আর পিঠ। কিন্তু তাঁর খণ্ডিত অঙ্গ থেকেও নিনাদিত হল আনাল হক আনাল হক। শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ে আনাল হক বলতে শুরু করল। আর এমনিভাবে রাত কেটে গেল। দ্বিতীয় দিন সবাই স-বিস্ময়ে দেখল, আগে শুধু এক মুখে আনাল হক উচ্চারিত হচ্ছিল। এখন তা শতমুখে উচ্চারিত হচ্ছে। খলীফার লোকজন এবার হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারা তাঁর খণ্ডিত দেহাংশগুলি আগুনে পুড়ে ছাই করে ফেলল। কিন্তু তাতে বিপদ বেড়ে গেল সহস্র গুণ। প্রতিটি ভস্মকণা থেকে শব্দ উঠতে থাকল আনাল হক, আনাল হক।

বেগতিক বুঝে খলীফা নির্দেশ দিলেন, তাঁর দেহ-ভস্ম দজলা নদীতে ফেলে দেয়া হোক। কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রশাসন কর্মীরা তাই করল। কিন্তু তার ফল হল আরও মারাত্মক। হঠাৎ দজলা নদী ফুঁসে উঠল বিপুল জলোচ্ছ্বাসে। আর উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ আনাল হক আনাল হক বলতে বলতে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ল নদী-তটে। জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হল। হয়ত ক্রুদ্ধ নদী বাগদাদ মহানগরী গ্রাস করে ফেলবে। সবাই তখন দিশেহারা।

হযরত মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ ঐ ক্ষমতাবলে ভবিষ্যতের কথা জেনে নিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর এক শিষ্যকে বলে যান, তাঁর দেহ ভস্ম দজলা বক্ষে নিপতিত হলে তা ভীষণ আকার ধারণ করবে। তখন তিনি যেন তাঁর খিরকাটি নদীকে দেখিয়ে দেন। তা হলে সে শান্ত হয়ে যাবে। হঠাৎ কথাটি মনে পড়ল ঐ শিষ্যের। তিনি তাড়াতাড়ি তার খিরকাটি নিয়ে নদীর সামনে ধরলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নদী শান্ত হয়ে গেল। নিক্ষিপ্ত ভস্ম এসে জমা হল নদী-তীরে। আর তা তুলে নিয়ে লোকেরা কবর খুঁড়ে তাতে দাফন করল। ভয়ংকর এক বিপর্যয় থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পেল। অন্য কোন তাপসের মৃত্যুর পর মানুষ এমন বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেনি।

একজন বিখ্যাত জ্ঞানী বলেন, যখনই হযরত মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ-এর প্রতি অমানবিক আচরণের মর্মান্তিক দৃশ্যটি মানস পটে ভেসে ওঠে, তখন আপনা থেকে আমার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয় যে, তাঁর সাথে এরূপ ব্যবহার করা হল কেন? আর এ প্রশ্নও মনের মধ্যে নিয়ত ঘুরপাক খায়, যারা তাঁর প্রতি এ ধরনের নিষ্ঠুর আচরণ করল, রোজ কিয়ামতে তাঁদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? হযরত আব্বাস তুসী রহমাতুল্লাহ বলেন, রোজ কিয়ামতে হাশরের মাঠে তাঁকে বেঁধে রাখা হবে, না হলে তাঁর দ্বারা এক তুমুল কান্ড সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কোন এক দরবেশ বলেন, যে রাতে হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ-কে শূলে দেয়া হয়, সে রাতে ভোর পর্যন্ত তিনি শূল কাঠের নিচে মোরাকাবায় কাটিয়ে দেন। ভোরের দিকে তিনি এক অদৃশ্য বাণী শুনতে পান। তাতে বলা হয়, আমি আমার গোপন রহস্যাবলীর একমাত্র রহস্য মানসুরের কাছে উন্মোচন করেছিলাম যা সে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিল। যার ফলে তাকে এরূপ কঠোর পরিণতির শিকার হতে হল। কোন শাহী রহস্য ফাঁস করে দিলে তার পরিণতি এরূপই হয়ে থাকে।

হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ বলেন, তাঁর দেহ ভস্ম দাফন করার পর তিনি সেখানেই সারা রাত উপাসনায় কাটিয়ে দেন। ভোরবেলায় আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন। হে প্রভু, মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ একজন মুমিন বান্দা ছিলেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, প্রেমিক, তওহীদবাদী। তা সত্ত্বেও আপনি তাঁকে এমন কঠিন অবস্থায় ফেলে দিলেন? তাঁর প্রার্থনা তখনও শেষ হয়নি। হঠাৎ তাঁর ঘুম নামে দু'চোখে আর তিনি স্বপ্ন দেখেন, রোজ কিয়ামত উপস্থিত। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করছেন, আমি তাঁর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার এজন্য করেছি যে, সে আমার গোপন রহস্য মানুষের কাছে ফাঁস করে দিত। যে গোপন রহস্য দজলা নদীর ওপর প্রকাশ করা উচিত ছিল সে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল। হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ দ্বিতীয় রাতে পুনরায় তাঁকে স্বপ্নযোগে দেখেন। আর তাঁর অবস্থা জানতে চান। তিনি উত্তর দেন, আল্লাহ্ তাঁকে অনুপম জান্নাতে জায়গা দিয়েছেন। তিনি আরও জানতে চান, তাঁর সমর্থক ও বিরোধী— এই দু'দলের সঙ্গে আল্লাহ্ কিরূপ ব্যবহার করবেন। তিনি বললেন, দু'দলের ওপরই আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। একদল আমাকে বিশেষভাবে জানত ও আমার সম্বন্ধে ভালো ধারণা করত। অন্য দল জানত না, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমার বিরোধিতা করত। তাই উভয় দলই আল্লাহর প্রিয় ও করুণার পাত্র বলে বিবেচিত।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন এক দরবেশ স্বপ্ন দেখেন, হাশরের মাঠে হযরত মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ শরাবের পেয়ালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর দেহের সঙ্গে মাথা যুক্ত নয়। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পৃথিবীতে যাদের শিরচ্ছেদ হয়েছে, তারাই হাশরের মাঠে শরাবের পেয়ালার অধিকারী হবে।

হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ বলেন, হযরত হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ-কে যখন শূলে তোলা হয়, তখন ইবলীস তাঁর সামনে এসে বলে, আপনি যা বলেছেন আমিও তাই বলেছিলাম। আপনি আনাল হক বলছেন, আমি বলতাম আনা খাইরুন (আমি সর্বোত্তম)। তবে কেন আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আর আমার প্রতি অভিশাপ অবতীর্ণ হল? হযরত হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ জবাব দেন, তুমি তা বলেছিলে অহমিকা-প্রসূত হয়ে স্বেচ্ছায়। আর আমি আনাল হক বলেছিলাম আমার আমিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে আল্লাহরই ইচ্ছায়। এই হল অনুগ্রহ ও অভিশাপের কারণ। জেনে রেখো, অহঙ্কার আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত ঘৃণিত, নিকৃষ্ট। পক্ষান্তরে আমিত্ব বিসর্জন দেয়া হল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও পছন্দনীয় কাজ।

হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হলে হযরত মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ বলেন, তিনি ছিলেন সর্বাবস্থায় সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফেরাইন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যঃ সে-ও খাঁটি ছিল। কেননা, আল্লাহ্ 'খাস' ও 'আম' (বিশেষ ও সাধারণ) দুই শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। উভয় শ্রেণীই নিজ নিজ পথে চলে। আর উভয় শ্রেণীর পথ-প্রদর্শক হলেন আল্লাহ্।

তিনি বলেনঃ

১. আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হয়ে যারা ইহলোক-পরলোক সবকিছু ভুলে যায়, তারাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

২. সুফী ব্যক্তি বড় একা এই কারণে যে, আল্লাহ্ ছাড়া তিনি কোন কিছুর খবর রাখেন না। অন্যরাও তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছু জানতে পারে না।

৩. ঈমানের আলোয় আল্লাহর অনুসন্ধান কর।

৪. হেকমত তীর সদৃশ। আল্লাহ্ তীরন্দাজ। আর তাঁর নিশানা সৃষ্টিজগত।

৫. মুমিন তিনিই যিনি ধন-সম্পদকে দুষণীয় মনে করে স্বপ্নের রাজ্যে সন্তোষ অবলম্বন করেন।

৬. সৃষ্টি বিপর্যয়ে ধৈর্যধারণ করা ও আল্লাহকে ভালোভাবে জেনে নেয়াই হল সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্র।

৭. আমলকে অসততা থেকে পবিত্র রাখাই হল আখলাক।

৮. সাধারণ মানুষের জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানীর অধ্যাত্ম-চিন্তা, বিদ্বানগণের জ্যোতি এবং পূর্ববর্তী মুক্তিপ্রাপ্তদের পথই হল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই আল্লাহর পথে সম্পৃক্ত ও জড়িত।

৯. বাদশাহ যেমন ভোগবিলাস, রাজ্য দখল প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত, অনুরূপভাবে আমরাও সদা-সর্বদা বিপদ-আপদ আশায় ব্যস্ত থাকি।

১০. উপাসনার মঞ্জিল পার হবার পর মানুষ স্বাধীনতা লাভ করে।

১১. বেশী লম্বা হাত কী দোয়ার না এবাদতের? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কোন হাতই লক্ষ্যস্থলে পৌছাতে পারে না। কেননা, প্রার্থনার হাত পৌছাতে পারে স্বীকৃতির সীমা পর্যন্ত। আর এবাদতের হাত পৌছায় শরীয়তের দামান পর্যন্ত। খাঁটি দাসগণের কাছে এর কোনটিই অছন্দনীয় নয়।

১২. আল্লাহর হাকীকত যার জন্য খুলে যায়, সামান্য কাজের মাধ্যমেই তা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যার প্রতি তা উন্মুক্ত হবার হয়, বহু সৎ কাজের বিনিময়েও তা কখনই হয় না।

১৩. যতক্ষণ পর্যন্ত বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা না যাবে, আল্লাহর এনায়েত সে পর্যন্ত হাসিল করা সম্ভব হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
হারেস মোহাসেবী
রহমাতুল্লাহ

হযরত হারেস মোহাসেবী রহমাতুল্লাহ হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-এর সমসাময়িক সাধক। শরীয়ত ও মারেফতের পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী এই তাপস মানবতার মূর্ত প্রতীক। বহু অমূল্য দ্বীনী গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। হযরত শেষ আবু আবদুল্লাহ খাফীফ রহমাতুল্লাহ যে পাঁচজন অনুকরণযোগ্য তত্ত্বজ্ঞানী তাপসের নাম উল্লেখ করেন, তার মধ্যে হযরত হারেস রহমাতুল্লাহ অন্যতম। অন্য চারজন হলেন, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ, হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ, হযরত ইবনে আতা রহমাতুল্লাহ ও হযরত আমর ইবনে ওসমান মক্কী রহমাতুল্লাহ।

হযরত হারেস রহমাতুল্লাহ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। আর পুরোটাই তিনি দিয়ে দেন বায়তুল মালে। তাঁর এই দানের কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, তাঁর পিতা কাদরিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আর মুসলিমদের মধ্যে এ সম্প্রদায়টি অগ্নিপূজক। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করেন যাতে বলা হয়েছে, 'কোন অগ্নিপূজকের মীরাস মুসলমানদের জন্য সিদ্ধ নয়। আর এই জন্যই তাঁর পিতার অর্থাৎ একজন অগ্নিপূজকের মীরাস তিনি গ্রহণ করেননি।

তাঁর একটি অলৌকিকতা বৈশিষ্ট্য ছিল। যখনই কোন সন্দেহজনক আহার গ্রহণ করতে যেতেন, তখনই তাঁর হাত আপনা থেকেই সঙ্কুচিত হয়ে যেত। আর তিনি বুঝতে পারতেন যে, এ খাদ্য বিশুদ্ধ বা বৈধ নয়।

এমনকি একদিন প্রখ্যাত সাধক হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-এর বাড়ীতেও এমন কাণ্ড ঘটেছিল। তিনি সেদিন হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর অতিথি ছিলেন। খানা পরিবেশিত হলে ক্ষুধার্ত তাপস যেই হাত বাড়ালেন, অমনি তাঁর ডান হাতের আঙ্গুলগুলো সঙ্কুচিত হয়ে গেল। অবশ্য জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-এর সম্মানার্থে এক লোকমা খাবার মুখে দিলেন। কিন্তু তাও ভেতরে গেল না, আটকে রইল কণ্ঠনালীতে। পরে বাইরে এসে মুখে আঙ্গুল পুরে সব বমি করে দিলেন।

পরে একদিন হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেদিন আপনার কি হয়েছিল? তিনি তাঁর সেই অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-ও বুঝলেন, হতে পারে। সেদিনের খাবার ছিল সন্দেহ-যুক্ত। কেননা, সে খাবার এসেছিল প্রতিবেশীর এক বিবাহ বাড়ী থেকে। তিনি অবশ্য হযরত হারেস রহমাতুল্লাহ-কে সমাদর করে আবার তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

এদিন হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর বাড়ীতে ছিল মোটা আটার তৈরী শুকনা রুটি। তাই নিয়ে দু'জনে খেতে বসলেন। আর হযরত হারেস রহমাতুল্লাহ পরম তৃপ্তি সহকারে ঐ শুকনা মোটা রুটিই খেলেন। বন্ধুকে বললেন, দরবেশগণের জন্য এরূপ খাবারই তৃপ্তিদায়ক। অর্থাৎ বৈধতা বা বিশুদ্ধতাই খাদ্যের সবচেয়ে বড় গুণ।

হযরত হারেস রহমাতুল্লাহ বলেন, দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তাঁর কান তাঁর হৃদয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা শোনেনি। তারপর আরও ত্রিশ বছর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাঁর অন্তরের কথা আর কেউ শুনতে পাননি। তিনি বলেন, কেউ যদি কারোর নামাজ পড়া দেখে খুশী হয়, তাহলে সে নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কিনা সে নিয়ে চিন্তা করছিলাম। কিন্তু এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তেমন নামাজ কবুল হতে পারে না।

যারা সূক্ষ্ম হিসাব রক্ষা করে চলেন, তাঁদের পরীক্ষা করে তিনি কতকগুলো বৈশিষ্ট্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেখতে পান। তাঁর বক্তব্য, তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহের উচ্চ-মর্যাদা লাভ করেছেন। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও পবিত্রতা থাকলে রিপুর কামনা-বাসনা, তাড়নার বিপরীত কাজ করা যায়। রিপুর বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যার সঙ্কল্প দৃঢ় ও মনোবল অটুট। বস্তুত সেটি তাঁর পক্ষে সহজসাধ্যও বটে। অতএব তাঁর কথা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হও আর এ স্বভাবগুলো রপ্ত কর। যথা–

১. সত্য হোক, মিথ্যা হোক– যে কোন বিষয়ে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহর নামে শপথ করো না।

২. মিথ্যা পরিহার কর।

৩. প্রতিজ্ঞা না করা ভালো, তবে করলে তা পূর্ণ কর।

৪. কেউ জুলুম করলে তাকে অভিশাপ দিও না। প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা করো না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে ধৈর্যধারণ কর।

৫. শরিক মোনাফেক বলে কারোর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিও না।

৬. প্রকাশ্যে বা গোপনে পাপ চিন্তা করো না। নিজের প্রবৃত্তিকে যে কোন পাপ থেকে বিরত রাখ।

৭. নিজের কষ্টের বোঝা নিজেই বহন কর। অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিও না।

৮. লোভ দমন করে পুরোপুরি নির্লোভ হও।

৯. আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে কোন কিছু আশা করো না।

১০. উচ্চ আসন খুঁজতে যেও না। তোমার চেয়ে কাউকে হেয় বা ছোট ভেবো না।

১১. আল্লাহর নির্দেশ পালনই হল আল্লাহর সন্তুষ্টি।

১২. বিপদ-আপদের লক্ষ্যস্থল হয়ে থাকাই ধৈর্য।

১৩. বিপদে অধৈর্য না হওয়াই উৎসর্গ।

১৪. যার প্রতি আল্লাহ্ নারাজ, তার থেকে দূরে থাকাই শরম।

১৫. কোন কিছুর প্রতি প্রেম-প্রীতি অক্ষুণ্ন রেখে, তার উদ্দেশ্যে নিজের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করে ভেতরে-বাইরে তার সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখাই হল মহব্বত।

১৬. যে কাজের ফলে রোজ কিয়ামতে শাস্তি বা ভয়ের আশঙ্কা আছে, তা থেকে বিরত থাকাই হল ভয়ের লক্ষণ।

১৭. নির্জন সাধনায় যে হৃদয় সুখানুভব করে, সে হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম বিদ্যমান আর পৃথিবীর প্রেম-শূন্য। এ ধরনের লোক আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিক।

১৮. নির্জনে আল্লাহর উপাসনা করা ও যে বস্তুর সঙ্গে বিষয়ী লোকেরা জড়িত তা থেকে দূরে থাকাই হল আল্লাহপ্রেমের লক্ষণ।

একবার হযরত হারেস রহমাতুল্লাহ মারেফত বিদ্যার ওপর একখানি গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন। একদিন এক সাধক তাঁকে বললেন, মারেফত শিক্ষা দেওয়ার অধিকার মানুষের না আল্লহর? দরবেশের এ প্রশ্ন তাঁকে চিন্তিত করে। তাঁর গ্রন্থ প্রণয়ন স্থগিত হয়। কিন্তু পরে তাঁর মনে হয়, মারেফত শিক্ষা দেওয়ার অধিকার আল্লাহর বান্দাদেরও আছে। কেননা, আল্লাহ তাঁর প্রিয় দাসকে সে শিক্ষালাভের তওফিক দান করেন। সুতরাং তার হক আদায় করা বান্দার কর্তব্য। এই ধারণা অনুবর্তী হয়ে তিনি আবার গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন।

কপর্দক শূন্য অবস্থায় হযরত হারেস রহমাতুল্লাহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাগদাদে। আগেই বলা হয়েছে, পৈতৃক ধন-সম্পত্তি তিনি দিয়ে দেন বায়তুল মালে। অতএব নিঃসীম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জীবন কাটে। শূন্য হাতে পৃথিবীতে এসে শূন্য হাতেই তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেন। তাপস-জগতে তাঁর নিঃস্ব-জীবনের নমুনা একান্ত বিরল। তেমনি অন্তরৈশ্বর্যে তাঁর মতো বিত্তশালীর সংখ্যাও আঙ্গুলে গণনাযোগ্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
আবু সুলায়মান দারানী
রহমাতুল্লাহ

হযরত আবু সুলায়মান রহমাতুল্লাহ শাম দেশের দারা নামক এক গ্রামের অধিবাসী। এই জন্য তিনি দারানী নামে সুপরিচিত। হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য তিনি সাধককুলে বিশিষ্ট হয়ে আছেন। কঠোর সাধনা ও উপবাসের জন্যও তিনি সুবিদিত। তাঁর কথা ছিল গভীর অর্থব্যঞ্জক ও মূল্যবান। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, শরীয়ত ও মারেফত সমুদ্রে তিনি যেন এক সুদক্ষ সাঁতারু।

তাঁর বক্তব্যের অভিনবত্বও উল্লেখযোগ্য। হযরত সুলায়মান রহমাতুল্লাহ-এর এক শিষ্য তাঁকে বলেন, এক রাত্রে নির্জনে নামাজ পড়ে তিনি খুব শান্তি ও তৃপ্তি পান। এ কথা শুনে তিনি বলেন, তুমি দীর্ঘদিন এ পথে থেকেও জনসমাগম ও নির্জনতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারনি। মুমিন বান্দার জন্য জনসমাগত বা অপ্রকাশ্য কখনও কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

প্রচণ্ড শীতের এক রাত। মসজিদে নামাজ পড়ছেন আবু সুলায়মান রহমাতুল্লাহ। নামাজ শেষে যখন মোনাজাত করতে যাবেন, তখন একখানা হাত কাপড়ের ওপর অন্যখান তলায় ঢেকে রেখে উঠালেন আল্লাহর দরবারে। আর এভাবেই মোনাজাত শেষ করলেন। আর ঐ রাতেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন, আল্লাহ্ বলছেন, তুমি যে হাতখানা তুলে মোনাজাত করেছিলে, সে হাতের পাওনাটা মিটিয়ে দিয়েছি। যদি অপর হাতখানা ওঠাতে, তাহলে তার পাওনাও পেয়ে যেতে। এই স্বপ্নের পর তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, যত অসুবিধাই থাক, আর কোনদিন তিনি এ কাজ করবেন না।

এক রাতে স্বপ্নযোগে তিনি এক অনিন্দ্যসুন্দরী হুরকে দেখতে পান। হুর বলছেন, আপনি কী আরামে আছেন। এদিকে আমি প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে আপনার বিরহে দিন গুনছি।

আর এক রাতে তিনি এক চির যৌবনা হুরকে স্বপ্নে দেখেন। অপরূপ ভঙ্গিতে তিনি তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনার এ রূপরাশি এল কোথা থেকে? হুর জবাব দিলেন, আপনি এক রাতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ফেলেছিলেন। আপনার ঐ অশ্রুপাতেই আমার রূপ এত বৃদ্ধি পেয়েছে। পাপীদের চোখের পানিতে হুরুদের দেহ-সুষমা কুসুমবর্ণে রঞ্জিত হয়।

হযরত সুলায়মান রহমাতুল্লাহ তাঁর এক বন্ধুকে মক্কা শরীফে বারবার যমযম কূপের পানি পান করতে দেখে বলেন, কূপের পানি যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন কী করবে? সে বলল, আল্লাহ্ তোমাকে পুণ্য ফল প্রদান করুন। আসলে আমি এতদিন পূজা করে চলছিলাম। এই বলে সে কূপের এলাকা ছেড়ে চলে যায়। কিছু লোক হযরত সালেহ ইবনে আবদুল করীম রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করে, আশা ও ভয় এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি বেশী ভালো? তিনি বললেন, দুটিই অন্তরের বস্তু, আলো স্বরূপ। তবে আশা থেকে ভয়ের পাল্লাই ভারী। এ কথা যখন আবু সুলায়মান শুনতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, আমার মতে যাবতীয় এবাদতে বন্দেগীর ভিত্তি হল ভয়। কেননা, আশা এবাদতে আলস্য আনে, মানুষকে উদাসীন করে। কিন্তু ইহকাল পরকালের সব কিছুর ভিত্তি হল ভয়-ভীতি। ভয়ের তুলনায় আশা যখন অধিক হয়, তখন অন্তরে আসে অবহেলা। অন্যদিকে ভয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবাদতও বৃদ্ধি পায়। হযরত লোকমান (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহকে এই পরিমাণ ভয় কর যেন তাঁর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে পড়। আবার আশা-আকাঙ্খা পোষণ করতে গিয়ে যেন একেবারে নির্ভয়ও না হও।

আহমদ খারী বলেন, আবু সুলায়মান এহরাম বাঁধার কালে লাব্বায়েক (আমি হাজির) বলতেন না। তার কারণ, তিনি বলতেন, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেন, আপনার অত্যাচারী উম্মতদের জানিয়ে দিন, তারা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কেননা, যে অত্যাচারী আমাকে স্মরণ করে, আমি অভিশাপের সঙ্গে তাকে স্মরণ করি। তিনি আরও বলতেন, আমি শুনেছি যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত অর্থ দ্বারা হজ্জ কর্ম সম্পন্ন করে ও লাব্বায়েক বলে, তখন তার উত্তরে বলা হয়, না, তুমি হাজির হওনি। আর যে পর্যন্ত তুমি তোমার হাতের জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করবে সে পর্যন্ত তোমার মঙ্গল হয় না যেন।

হযরত ফোজায়েল ইবনে ইয়াজ রহমাতুল্লাহ-এর পুত্র আল্লাহর শাস্তির আয়াত শুনতে পেতেন না। হযরত ইয়াজ রহমাতুল্লাহ এর কারণ হিসাবে বলেন, অল্প পাপের জন্যই সে অমন ভীত হয়ে পড়েছে।

আবু সুলায়মান রহমাতুল্লাহ বলেন, খারাপ স্বপ্ন মানুষের জন্য গজবস্বরূপ। সব সময় উদরপূর্তি কর খাওয়ার ফলেই এ বিপদ দেখা দেয় — উদরপূর্তি ভোজন আরও ছয়টি মন্দ ফল সৃষ্টি করে । যেমনঃ (১) এবাদতে মনোযোগ কম হয়, (২) জ্ঞান-বুদ্ধির কথা মনে থাকে না। (৩) নরম ব্যবহার করার অভ্যাস লোপ পায়। (৪) এবাদতকে মনে হয় ভারী বস্তু। (৫) কুপ্রবৃত্তির তাড়না প্রবল হয়। (৬) ঘন ঘন মলত্যাগ করতে হয়, তাতে নিশ্চিত নিরুদ্বেগ এবাদতে বিঘ্ন ঘটে।

ক্ষুধা পরম উপকারী বস্তু। আল্লাহ্ তাঁর একান্ত প্রিয় দাস ছাড়া অন্য কাউকে ক্ষুধা সহ্য করার শক্তি দেন না। (১) ক্ষুধা পরকালে পরিতৃপ্তি সহকারে খাদ্য উপভোগের মূল চাবিকাঠি। (২) ক্ষুধা মানুষের দৈহিক ও পারত্রিক প্রয়োজন পূর্ণ করে। (৩) ক্ষুধার দ্বারা নফস দুর্বল ও আত্মা কোমল হয়। (৪) ক্ষুধার মাধ্যমে আসমানী জ্ঞান তথা গুপ্ত ও প্রকাশ্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়। হযরত সুলায়মান রহমাতুল্লাহ বলেন, সারাদিন ধরে এবাদতের তুলনায় রাতে এক গ্রাস হালাল খাদ্য গ্রহণ অনেক ভালো। তিনি আরও বলেন, প্রবৃত্তিগত তাড়নার মোকাবিলায় তার মুক্তিই প্রবল, যার অন্তর আল্লাহর আলোয় আলোকিত। এ আলো মানুষকে দুনিয়ার দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে আখেরাতের দিকে নিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, যে লোক মাঝপথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করে সে কখনও আসল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। তিনি বলেন, সারাজীবনে যে লোক সামান্য খুলুসিয়তও হাসিল করেছে, সে-ই সৌভাগ্যবান। তিনি আরও বলেন, মানুষ যখন ইসলাম অবলম্বন করে তখন সে নফসের তাড়নাসমূহ ও ছলনা-প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি লাভ করে ।

তিনি বলেন, সত্যবাদী লোকের অন্তরে যা আছে, সে যদি তা প্রকাশ করতে চায় তো জবান তাকে সাহায্য করে।

রেজা বা সন্দোষ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কোন কোন লোক এমনও রয়েছে, যারা রেজা বা সন্তোষের ক্ষেত্রে ধৈর্যকেও লজ্জার কারণ বলে মনে করেন। অর্থাৎ, বিপদে এ ভাব প্রকাশ করেন না যে, আমি ধৈর্য অবলম্বন করি। পক্ষান্তরে, রেজা বা সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাজের স্বীকৃতিতে আমার আমিত্ব ভাব মোটেই নেই। তার দ্বারা প্রভু যা করান তাতেই খুশী। মূলকথা, ধৈয্যের সম্বন্ধে বান্দার সাথে তার রেজার সম্বন্ধ আল্লাহর সঙ্গে।

আল্লাহর দরবারে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ও জাহান্নামের মুক্তি কামনা না করে তাঁর খুশীতে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই প্রকৃত রেজা। ধৈর্য্য অবলম্বনকারী বিপদ-আপদ সহ্য করে নেয় দায়ে পড়ে। মনে তার আনন্দের কোন অস্তিত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যার মধ্যে রেজা থাকে, সে যেন অবস্থাকে স্বীকার করে নেয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি বলেন, আমি রেজার এই স্তরে পৌঁছেছি। জাহান্নামের সাতটি স্তরও যদি আমার ডান চোখের ওপর রাখা হয়, তবুও আমার মনে এ ভাবের উদয় হবে না যে, কেন বাম চোখের ওপর স্থাপন করা হল না।

বিনয় বা নম্রতা সম্বন্ধে তিনি বলেন, নিজের কোন ব্যাপারে গর্ব বা অহমিকা প্রকাশ না করাকেই বিনয় বা নম্রতা বলে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার নফসকে না চিনে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নম্রতা আসে না। যোহদ বা ত্যাগ সম্বন্ধে তিনি বলেন, যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে নিয়ে যায়, সে সব বস্তু যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাকে যোহদ বা ত্যাগ বলে। ত্যাগের নিদর্শন হল নিকৃষ্ট বস্তুর মোকাবিলা করতে গিয়ে উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি প্রলুব্ধ না হওয়া।

তাঁর অমূল্য উপদেশ ঃ

১। শুধু মুখে ত্যাগ স্বীকার করাও সোনা-রূপার চেয়ে দামী।

২। পার্থিব মোহই যেকোন পাপের উৎস।

৩। যেকোন বিপদ-বিপর্যয়কে আল্লাহর ইচ্ছা মনে করে আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুকে পরিত্যাগ করাই নামই তাসাওউফ।

৪। ক্ষুধা, উপবাস এবাদতের জন্য জরুরী।

৫। পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে অধিক চিন্তা-ভাবনা করা পারলৌকিক বিষয়ের ওপর পর্দাস্বরূপ।

৬। ধৈর্যে জ্ঞান ও চিন্তা বাড়ে আর ধ্যানে বাড়ে আল্লাহর ভয়।

৭। চোখে কান্নার এবং মনে চিন্তার অভ্যাস কর।

৮। আল্লাহকে চিনতে হলে মন থেকে অন্য সব চিন্তা দূর করে ফেলতে হবে।

৯। যে উপদেশ দাতা খোঁজে সে যেন দিবারাতের পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করে।

১০। বান্দা যতক্ষণ এবাদতে লিপ্ত থাকে, ফেরেশ্তাগণও ততক্ষণ জান্নাতের বাগিচায় তাদের প্রতিটি এবাদতের বিনিময়ে এক একটি বৃক্ষরোপণ করেন। যখন সে উপাসনা থেকে বিরত হয়, তখন ফেরেশ্তাগণও অবসর গ্রহণ করেন।

১১। যে এবাদতে পৃথিবীতে স্বাদ পাওয়া যায় না, সে এবাদত দ্বারা পরকালেও প্রতিদান মিলবে না। তৃপ্তিই হল এবাদতের স্বীকৃতি ও লক্ষণ।

১২। যাহেদ বা ত্যাগীদের শেষ সোপান মুতাওয়াক্কেলীনদের প্রথম সোপান।

১৩। আল্লাহ্ আরেফ বা তত্ত্ব জ্ঞানী ব্যক্তিদের স্বপ্নের মাধ্যমে এমন দরজা দান করেন, মুর্খদের নামাজের মধ্যেও তা লাভ হয় না। আরেফগণের বাতেনী চোখ যখন খুলে যায়, তখন জাহেরী চোখ বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ জাহেরী চোখ দারাও তখন তারা শুধু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পায় না।

১৪। আল্লাহর নৈকট্যলাভ তখনই হয়, যখন দ্বীন-দুনিয়াকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। মারেফত চুপ থাকার নিকটবর্তী।

১৫। যার অন্তর আল্লাহর আলোয় আলোকিত, তার অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। যে এবাদতে কষ্ট সহ্য করে তা তার মুক্তি জন্য উসিলা হয়ে যায়।

১৬। ধৈর্যের মত উত্তম বস্তু আর নেই। তবে ধৈর্য দু'রকমের। (১) যে কাজের প্রতি আসক্তি নেই, তাতে ধৈর্যধারণ করা (২) আল্লাহর বিধানে নিষিদ্ধ, এরূপ কাজের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

১৭। যেব্যক্তি আত্মিক শ্রম দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতের যোগ্য হয়ে যায়।

১৮। আল্লাহ্ বলেন, যে বান্দা আমার নিকট শরম বা লজ্জা প্রকাশ করে, রোজ কিয়ামতে আমি তার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি আবৃত করে রাখব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৯। তোমার প্রিয় বন্ধুও যদি ক্রোধ বা বিরক্তিবশতঃ তোমার মতে বিপরীত কোন কথা বলে, তবে তাকে কোন ভালো-মন্দ কথা বলবে না। কেননা, হতে পারে সে তখন তোমার প্রতি অধিকতর কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে বসবে।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ বলেন, আবু সুলায়মান দারানী রহমাতুল্লাহ অত্যন্ত পরহেজগার ও সতর্ক ব্যক্তি ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, আমি সুফী-দরবেশদের কাছে যেসব কথা শুনতাম, তার অনুকূলে কোরআন-হাদীস থেকে সাক্ষ্য পাওয়া না গেলে আমি আমল থেকে বিরত থাকতাম।

তিনি সাহাবী হযরত মাআয ইবনে জাবাল রহমাতুল্লাহ থেকেও কিছু জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করেন। তিনি মোনাজাতের সময় বলতেন, হে দয়াময়!! যে আপনার বিধি-নিষেধ অমান্য করে, সে আপনার খেদমতের উপযুক্ত হতে পারে না।

অন্তিম মুহূর্তে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন, আমি এমন এক প্রভুর কাছে চলেছি যিনি ছোট ছোট পাপের হিসাব রাখেন ও বড় বড় পাপের শাস্তি বিধান করেন। এটিই তাঁর শেষ কথা। তাঁর মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নযোগে জানতে পারেন যে, তিনি আল্লাহর দয়া ও রহমত লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি ও সুনাম কিছুটা ক্ষতির কারণ হয়েছে।

হযরত
মুহাম্মদ সাম্মাক
রহমাতুল্লাহ

হযরত মুহাম্মদ সাম্মাক রহমাতুল্লাহ খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলের এক মহাত্যাগী তাপস। বিশেষ করে বাগ্মিতার জন্য তিনি বিশ্বখ্যাত। হযরত মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহ-এর মত সাধকের হৃদয়ের দুয়ার খুলে যায় তাঁর হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতায়। খলীফাও ছিলেন তাঁর একান্ত ভক্ত। তিনি একবার খলীফাকে বলেন, যেকোন বস্তুর চেয়ে ত্যাগের মাহাত্ম্য অনেক বেশী।

একবার হযরত সাম্মাক রহমাতুল্লাহ ভীষন অসুস্থ। হযরত আহমদ হাওয়ারী রহমাতুল্লাহ তাঁর চিকিৎসার জন্য বিশেষভাবে সক্রিয় হন। তাঁর প্রস্রাব পরীক্ষা করা হয় এবং তদনুযায়ী চিকিৎসার জন্য হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ এক চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় এক শান্ত সৌম্য বৃদ্ধের। তিনি হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর যাত্রার উদ্দেশ্য জেনে বিস্ময়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর এক বন্ধুর সাহায্যের জন্য তুমি চলেছ আল্লাহর এক শত্রুর কাছে? আল্লাহর শত্রু বলতে তিনি চিকিৎসকের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। কেননা ঐ চিকিৎসক ছিলেন অগ্নি-উপাসক। বৃদ্ধ হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, তুমি সাম্মাককে বল, সে যেন ব্যাধি-কবলিত স্থানটিতে হাত রেখে পাঠ করে

"আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীমি ওয়া বিলহাক্কি আনযালনাহু ওয়া বিলহাক্কি নাযালা।" আল্লাহর রহমতে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

অতএব বৃদ্ধের উপদেশ শিরোধার্য করে হযরত আহমদ হাওয়ারী রহমাতুল্লাহ ফিরে এলেন সাম্মাক রহমাতুল্লাহ-এর কাছে এবং ঘটনাটি বিশদ বিবরণ দিলেন। হযরত সাম্মাক তাঁর নির্দেশানুযায়ী তৎক্ষণাৎ উল্লিখিত দোয়াটি পাঠ করে ব্যথার স্থানে ফুঁ দিলেন আর আল্লাহর অসীম দয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠলেন। কিন্তু পথিমধ্যে যে সৌম্য দর্শন বৃদ্ধের দেখা হল তিনি কে? হযরত সাম্মাক রহমাতুল্লাহ বললেন, তিনিই মহাত্মা খাজা খিযির (আঃ)।

হযরত সাম্মাক রহমাতুল্লাহ বলেন, তাওয়াযুর অর্থ হল নিজেকে সবচেয়ে ছোট মনে

www.AmarIslam.com

করা। তিনি আরও বলেন, প্রাচীনকালের লোকেরা ছিলেন ওষুধ সাদৃশ। যার দ্বারা মানুষ রোগমুক্ত হত। আর এ কালের লোকেরা বিষতুল্য, যারা দ্বারা মানুষ আরও বেশী রোগ-গ্রস্ত হয়। তিনি বলেন, এককালে উপদেশদাতাগণ উপদেশদান খুব কঠিন কাজ বলে মনে করতেন। যেমন আজকার বিদ্যা অনুযায়ী চর্চা করা কঠিন কাজ বলে মনে করা হয়। এখন যেমন আমলরত আলেমের সংখ্যা খুব নগণ্য, তেমনি তখন উপদেশদাতাগণের সংখ্যাও ছিল খুব স্বল্প।

কথিত আছে, হযরত সাম্মাক রহমাতুল্লাহ চিরকুমার ছিলেন। বিবাহের প্রতি তাঁর অনীহার কারণ হিসাবে তিনি বলেন, আমি দুটি শয়তানের মোকাবিলা করতে সক্ষম নই। আমার নিজের সঙ্গে এক শয়তান ও স্ত্রীর সঙ্গে আরেক শয়তান– এই দুই শয়তান যদি একত্র হয়, তাহলে আমার অবস্থা কী দাঁড়াবে?

মৃত্যুর পূর্বে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করেন, হে প্রভূ!! আপনি ভালো করেই জানেন, আমি যখন পাপের কাজে লিপ্ত ছিলাম তখনও আমি আমার বন্ধুবর্গ ও ভক্তবৃন্দকে ভালোবাসতাম। শ্রদ্ধা-ভক্তি করতাম। আপনি আপনার এ অধম বান্দার সেই ভালোবাসা আর ভক্তি শ্রদ্ধাকে তার মাগফেরাতের কারণস্বরূপ গণ্য করুন।

তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহর দরবারে আপনি কিরূপ ব্যবহার লাভ করলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং উত্তম আচরণই প্রদর্শন করেছেন। তবে দাম্পত্য জীবনের তথা সন্তান সন্ততির ঝামেলা ও ব্যতিব্যস্ততার যে পৃথক মহিমা, আমি তা থেকে বঞ্চিত।

হযরত
মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তুসী
রহমাতুল্লাহ

মহা-তাপসগণের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তুসী রহমাতুল্লাহকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মূর্ত প্রতীক মনে করা হয়। কেননা তিনি রাসূলে কারীম জীবনাচরণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। আবার খোরাসানের শান্তি-রক্ষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি বিশ্ব জোড়া। খোরাসান প্রদেশের তুস শহরে তাঁর জন্ম হয় বলে তাঁর নামের সঙ্গে তুসী পদবী সংযোজিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে কঠিন সাধনার ক্ষেত্রে তিনি এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব।

আগেই বলা হয়েছে, মহানবীর তরীকা তিনি পালন করতেন অক্ষরে অক্ষরে। একবার তিনি চলেছেন নিশাপুরে। সঙ্গে রয়েছেন হযরত মুসা রেজা রহমাতুল্লাহ-এর পুত্র ইমাম আলী রহমাতুল্লাহ। উটের লাগাম ছিল ইসহাক ইবনে জাহেরিয়ার হাতে। মুহাম্মদ ইবনে আসলাম যখন শহরে প্রবেশ করছেন, তখন দেখা গেল, তাঁর পরনে রয়েছে মোটা কোম্বল, মাথায় চটের চুপি, আর কাঁধে বইপত্রের বোঁচকা। অভূত-পূর্ব এ দৃশ্য দেখে নিশাপুরবাসীরা অশ্রু-সিক্ত হয়ে উঠলেন।

অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল তাঁর। তাঁর বক্তব্য এমন হৃদয়-গ্রাহী ছিল যে, কম করেও পঞ্চাশ হাজার পথ ভ্রান্ত লোক তওবা করে আল্লাহর পথে শামিল হয়।

পবিত্র কোরআনকে মাখলুক বা অনিত্য সৃষ্ট বস্তু বলে স্বীকার করতে হবে-আলেম সম্প্রদায় ও সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর এ রকম চাপ সৃষ্টি করা হয়। তিনি বললেন, ধর্ম-বিরোধী এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারব না। আর এ অস্বীকৃতির ফলে তাঁর দু'বছর কারাদণ্ড হয়। কারাগারে থাকাকালীন তিনি প্রতি শুক্রবার জুমআ আদায়ের জন্য স্নান ও ওযু সেরে কাঁধে জায়নামাজ নিয়ে চলে আসতেন জেলখানার দরজায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলাবাহুল্য, দ্বারক্ষরা তাঁকে বাধা দিত আর তিনি এ কথা বলে ফিরে যেতেন, হে প্রভু! আমার যা করার, সাধ্যমত আমি তা করেছি, এখন সব কিছু আপনিই জানেন।

কারাবাস শেষ হল। একদিন শোনা গেল, নিশাপুরের নতুন শাসক আবদুল্লাহ ইবনে তাহের শহরে আসছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সাড়া পড়ে গেল সারা শহরে। দলে দলে শহরবাসী ছুটে গেল তাঁকে সালাম জানাতে। একটানা তিন দিন ধরে শুধু মানুষ আর মানুষ। অভিভূতঃ আবদুল্লাহ জানতে চাইলেন, শহরের বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে আর কেউ আসতে বাকী রয়েছে কিনা? তাঁকে বলা হল, মাত্র দু'জন লোক এখনও আসেননি। একজন আহমদ হারব আর অন্যজন মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তুসী রহমাতুল্লাহ। তাঁদের না আসার কারণ তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, এঁরা বিশিষ্ট সাধক। কখনও কোন বাদশাহর দরবারে সালাম জানাতে যান না।

এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে তাহের বললেন, তাঁরা যদি আমাকে সালাম জানাতে না আসেন তবে আমি নিজেই তাঁদের সালাম জানাতে যাব। তিনি ঠিক করলেন, প্রথমে সালাম জানাবেন আহমদ হারব রহমাতুল্লাহ-কে। আহমদ হারব রহমাতুল্লাহ-এর কাছে আগাম খবর চলে গেল। তিনি বললেন, এখন দেখছি লোকটির সঙ্গে দেখা না করে উপায় নেই।

আবদুল্লাহ এলেন তাঁর দরবারে। হযরত হারব রহমাতুল্লাহ অনেকক্ষণ বসে রইলেন মাথা নিচু করে। তারপর চোখ তুলে তাকালেন শাসকের দিকে। বললেন, আমি শুনেছি, আপনি রূপবান ব্যক্তি। এখন দেখছি তা সত্য। আপনার নিকট আমার বক্তব্য হল, এই সুন্দর চেহারাকে কোন পাপ দ্বারা কলুষিত করবেন না।

এরপর শাসক গেলেন হযরত মুহাম্মদ ইবনে আসলাম রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। কিন্তু তিনি তাঁকে ভেতরে যাবার অনুমতি দিলেন না। আবদুল্লাহ কী করবেন ভাবছেন, তঠাৎ তাঁর মনে হল, আজ শুক্রবার। আর জুমা আদায়ের জন্য তিনি অবশ্যই মসজিদে যাবেন। তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। তাই তিনি হযরত আসলাম তুসী রহমাতুল্লাহ-এর বাড়ীর দরজায় ঘোড়ার পিঠেই বসে রইলেন তাঁর প্রতীক্ষায়।

কিছুক্ষন পর সত্যিই তিনি বেরিয়ে এলেন বাড়ী থেকে। আর আবদুল্লাহ ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে কদমবুসি করলেন আর বললেন, হে প্রভু! আমি গুণাহগার বান্দা বলে ইনি আমাকে শত্রু মনে করেন। অতএব হে প্রভু! আপনি আপনার রহমতের দ্বারা এ অধমকে ঐ মহাপুরুষের উসিলায় পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

কিছুদিন পরে ইবনে আসলাম রহমাতুল্লাহ নিশাপুর থেকে তুস শহরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। তিনি যে মসজিদে নামাজ পড়তেন। স্থানীয় লোকেরা সেটিকে খুবই বরকতময় মনে করত। কিছুদিন তিনি আরবেও কাটান।

রোমের এক তরীকত-পন্থী সাধক একবার স্বপ্ন দেখলেন ইবলীস শূন্য থেকে আছড়ে পড়ল মাটির ওপর। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এরূপ দশা হল কেন? শয়তান বলল, এখন ওযু করতে বসে হযরত মুহাম্মদ ইবনে আসলাম এমন গলা খাঁকার দিলেন যে, তার শব্দে আমি ভয়ে কেঁপে ওঠে ছিটকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে যাই। মাটিতে প্রায় সেঁধিয়েই গিয়েছিলাম আর কী!

কথিত আছে, তাঁর বাড়ীর সামনেই একটি ঝর্ণা ছিল। কিন্তু যেহেতু সেটি সাধারণের সম্পত্তি, অতএব পানির একান্ত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবনে কোনদিন ঐ ঝর্ণার পানি ব্যবহার করেননি। বরং শোনা যায়, একবার ঝর্ণার পানির উৎস বন্ধ হয়ে গেলে তিনি ইন্দিরা থেকে বালতি ভর্তি পানি উঠিয়ে সেটি পুনরায় চালু করেন।

হযরত ইবনে আসলাম রহমাতুল্লাহ ছিলেন দানশীল ব্যক্তি। টাকা ধার করেও গরীব-

www.AmarIslam.com

দুঃখীদের বিলাতেন। একবার এক ইহুদী মহাজন তাঁর কাছে গিয়ে ধার নেওয়া টাকা পরিশোধ করতে বলেন। কিন্তু তখন তাঁর কাছে কিছুই নেই। তাই তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন।

তার কিছু আগে তিনি একটি কাঠের কলম কাটছিলেন। নিচে পড়েছিল কিছু টুকরা। তিনি ইহুদীকে দু'টুকরা কাঠ তুলে নিতে বললেন। ইহুদী এর উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও কৌতূহল-বশতঃ দুটি টুকরা হাতে নিলেন। আর সেগুলো তাঁর হাতে ছোঁয়া পাওয়ামাত্র ঝকঝকে সোনার টুকরোয় পরিণত হয়ে গেল। মহাজন সবিস্ময়ে বলে ওঠলেন, যে ধর্মের সাধক ব্যক্তির দোয়ার উসিলায় কাঠ সোনা হয়ে যায়, সে ধর্মের গুণ ও সততা অবিসম্বাদিত। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত আবু আলী একজন মশহুর আলেম। তিনি একবার নিশাপুরের মসজিদে এলেন ভাষণ দিতে। ঘটনাক্রমে সেখানে সেদিন উপস্থিত রয়েছেন মক্কা ও মদীনার ইমাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি আবু আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, আলেমগণ নবীগণের প্রতিনিধি। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর আলেমকে নবীগণের প্রতিনিধি বলা যায়? আবু আলী বললেন, যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে আমরা নেই।

মসজিদের এক কোণে বসে ছিলেন হযরত মুহাম্মদ ইবনে আসলাম রহমাতুল্লাহ। তাঁকে দেখিয়ে তিনি বললেন, এই শ্রেণীর লোকগণই তাঁদের মধ্যে গণ্য।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আসলাম রহমাতুল্লাহ নিশাপুরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর এক প্রতিবেশী স্বপ্নে দেখলেন, হযরত আসলাম রহমাতুল্লাহ বলেছেন, আজ আমি যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেলাম। ঘুম থেকে ওঠে তিনি রওনা দিলেন হযরতের বাড়ীর দিকে। সেখানে পৌছে দেখেন, তাঁর কাফন-দাফনের আয়োজন চলছে। তিনি যে মোটা কম্বলখানা পরতেন, তা দিয়েই তাঁর কাফনের কাজ সমাধা হয়। যখন তাঁর মরদেহ গোরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দুজন মহিলার কথোপকথন শোনা গেল। তারা পরস্পর বলাবলি করছে, নিজের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়েই তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। দুনিয়ার কোন প্রতারণায় কোনদিন প্রতারিত হননি।

হযরত
আহমদ হারব
রহমাতুল্লাহ

হযরত আহমদ হারব রহমাতুল্লাহ সর্বকালের এক মহান সাধক। তাঁর ভক্ত ও শিষ্যের সংখ্যা ছিল অসংখ্যা। তিনি যে কত উন্নত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তা উপলব্ধি করা যায় অন্য এক আলোকিত পুরুষ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাআয রহমাতুল্লাহ-এর মন্তব্যে। হযরত মাআয তাঁর সম্বন্ধে একবার বলেন, আমার মৃত্যুর পর মাথাটি যেন হযরত আহমদ হারবের পায়ের ওপর রাখা হয়।

তাঁর ধর্মনিষ্ট কিংবদন্তীতুল্য। একবার তাঁর মা মুরগির গোশত রান্না করে তাঁকে খেতে দেন। বলেন, এটি তাঁর পোষা মুরগি। অতএব এর মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু হযরত হারব রহমাতুল্লাহ সে গোশত স্পর্শ করলেন না। বললেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি, মুরগিটি প্রতিবেশীর ছাদের ওপর গিয়ে তার শস্য-দানা খেয়েছিল। কাজেই এ গোশত আমি কিছুতেই খেতে পারি না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

আল্লাহর ধ্যান-এবাদতে তিনি এত বেশী মশগুল থাকতেন যে, তাঁর সময়ের বড় অভাব দেখা দিত। একবার এক বন্ধু তাঁকে একখানি চিঠি দেন। কিন্তু সময়াভাবে তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উত্তর দিতে পারলেন না। অনেক দিন কেটে গেল। চিঠির জবাব না পেয়ে বন্ধু আবার লেখলেন। কিন্তু সে চিঠিরও উত্তর দেবার ফুরসত হল না। অবশেষে তিনি তাঁর এক শিষ্যকে বললেন, আমার বন্ধুকে লেখে দাও, সে যেন আমাকে আর চিঠি না লেখে। কেননা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার কারণে চিঠির উত্তর দেবার অবসর আমার নেই। আমি তোমাকেও বলছি, আল্লাহর যিকিরে তুমিও যেন এভাবে বিভোর হয়ে যাও।

তাঁর ধ্যানের ধরন সত্যিই বিস্ময়কর ছিল। ক্ষৌরকার ক্ষৌরকর্ম করছে আর সেই অবসরে তিনিও আল্লাহর যিকির করছেন। ক্ষৌরকার বলল, কিছুক্ষণের জন্য আপনার ঠোঁট দু'টি বন্ধ রাখুন। হযরত হারব রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি তোমার কাজ কর আমি আমার কাজ করছি। অর্থাৎ আল্লাহর যিকির থেকে তিনি বিরত হলেন না। আর তাতে তাঁর ঠোঁটের কিছু অংশ কেটে-কুটে রক্তাক্ত হয়ে গেল।

এক আশ্চর্য কৌশলে তিনি তাঁর ছেলেকে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্ নির্ভরতার শিক্ষা দেন। ঘরের দেওয়ালে একটি ফুটো করে ছেলেকে বললেন, তোমার যখন যা দরকার তুমি এই ফুটোর কাছে এসে বলবে। এদিকে তিনি তাঁর স্ত্রীকে শিখিয়ে দিলেন, ছেলে যা চায় তা যেন ঐ ফুটো দিয়ে দেওয়া হয়। তবে সাবধান! ছেলে যেন মাকে দেখে না ফেলে। আড়াল থেকে সব কিছু করতে হবে। সেভাবে কাজ চলতে লাগল কিন্তু একদিন মা অনুপস্থি। কোন কাজে বাইরে গেছেন। ছেলে যথারীতি ফুটোর কাছে এসে খাবার চাইল। আর তা পেয়েও গেল। মা ফিরে এসে দেখেন, ছেলে দিব্যি খেতে বসেছে। অবাক হয়ে তিনি বলেন, এ খাবার তুমি পেলে কোথায়? ছেলের চটপট উত্তরঃ রোজ যেখান থেকে পাই।

তিনি হযরত হারব রহমাতুল্লাহ-কে সব খুলে বললেন। আর এ ঘটনা শুনে খুশী মনে তিনি বললেন, আজ থেকে আল্লাহ্ নিজের হাতে তার দায়িত্বভার তুলে নিয়েছেন। তিনিই তাকে খাদ্য যুগিয়েছেন। অতএব আগামীকাল থেকে তোমাকে আর কিছু দিতে হবে না। মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ্ সব কিছু করে দেবেন।

হযরত হারব রহমাতুল্লাহ-এর মতো এক আলোকিত পুরুষের কণ্ঠে পবিত্র কালাম শুনে এক জ্ঞান-তাপসের হৃদয় আলোকিত হয়ে যায়। আর সে আলোর রোশনাই চল্লিশ বছর ধরে তাঁর বুকের তলায় বিরাজ করে। তিনি বলেন, সে কালাম আমি কোন ক্রমেই বিস্মৃত হতে পারি না।

নিশাপুর থেকে কয়েকজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হল না। কিন্তু তাঁর এক পুত্র মদ পান করে মাতালবস্থায় বেহালা বাজাতে বাজাতে অতিথিদের চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল। এতটুকু সম্মান দেখাল না। বলাবাহুল্য, অতিথিগণ অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হলেন। তাঁদের মনের অবস্থা উপলব্ধি করে তিনি জানালেন, আমার ছেলেটি এমন এক রাতে মায়ের গর্ভে আসে, যে রাতে আমি কিছু খাদ্য গ্রহণ করেছিলাম, যা পরে জেনেছি, এসেছিল রাজ-অন্তঃপুর থেকে। রাজবাড়ী থেকে প্রেরিত অবৈধ খাদ্যেই আমার এ কুপুত্রের জন্ম। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

হযরত আহমদ হারব রহমাতুল্লাহ-এর এক অগ্নি উপাসক প্রতিবেশী ব্যবসা উপলক্ষে দেশ-বিদেশ সফর করতেন। একবার বিদেশে তার বাণিজ্য-পণ্য লুট হয়। এ খবর পেয়ে হযরত হারব রহমাতুল্লাহ সশিষ্য তাঁর বাড়ীতে গেলেন সমবেদনা জানাতে। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। প্রতিবেশী বণিক ভাবলেন, উপবাসী তাপস বুঝি অনুগামীদের নিয়ে কিছু খাদ্য প্রার্থনা করতে এসেছেন। কাজেই তিনি খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের খাবারের আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু আহমদ হারব রহমাতুল্লাহ বললেন, ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তাঁরা খাবার খেতে আসেননি। বরং এসেছেন তাঁর বিপদের কথা জানতে। তাঁর

নাকি মাল-পত্র লুট হয়েছে? প্রতিবেশী বললেন, হ্যাঁ। তবে মাল লুট হওয়া সত্ত্বেও তিনটি কারণে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রথমতঃ অন্য লোকে আমার জিনিসপত্র লুট করেছে, কিন্তু আমি কোনদিন কারও কিছু লুট করিনি। দ্বিতীয়তঃ আমার অর্ধেক মাল রক্ষা পেয়েছে। তৃতীয়তঃ আমার পার্থিব মাল-পত্র লুট হয়েছে বটে, কিন্তু পরকালের সব কিছুই রয়ে গেছে।

বণিকের কথা শুনে আহমদ হারব রহমাতুল্লাহ খুব খুশী হলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন, তাঁর কথাবার্তায় বন্ধুত্বের কিছু আভাস পাওয়া গেল। অতঃপর তিনি প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আগুনের পূজা করছেন কেন? তিনি বললেন পরকালে আগুনের শাস্তি থেকে রেহাই পাব বলে। তাছাড়া আল্লাহ্ খুশী হবেন, তার জন্যও বটে। হযরত বললেন, আপনি কী বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন তা একটু ভেবে দেখেছেন কি? আগুনের এমন কি শক্তি আছে? সামান্য একটি বালকও যদি তার ওপর পানি ঢেলে দেয়, তবে তার কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। এমন দুর্বল ও অক্ষম বস্তু কি আপনার জন্য আল্লাহর খুশী আনাতে পারে? আপনি তো দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে আগুনের উপাসনা করে আসছেন। কোন উপকার লাভ করেছেন কি? যদি বলেন, আগুন আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল, তাহলে আসুন, আমরা দু'জনেই আগুনের মধ্যে হাত রেখে দেখি, আপনার হাত সে পুড়িয়ে দেয় না অক্ষত রাখে।

আগুন কারো খাতির করে না। অগ্নি উপাসক তা ভালোভাবেই জানতেন। সুতরাং হযরতের কথায় তার মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। তিনি বললেন, আমি আপনার কাছে চারটি বিষয় জানতে চাই। যদি তা জানতে এবং বুঝতে পারি, তাহলে তৎক্ষণাৎ আগুনের উপাসনা বর্জন করে আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করব। বিষয়গুলো–

(১) আল্লাহ্ মাখলুক কেন সৃষ্টি করলেন?

(২) তাদের রিজিক দিচ্ছেন কেন?

(৩) মৃত্যু দিচ্ছেন কেন?

(৪) মৃত্যুর পর জীবিতই বা কেন করবেন?

হযরত হারব রহমাতুল্লাহ তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। যেমন–

(১) আল্লাহ্ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তারা তাদের স্রষ্টাকে চিনবে বলে।

(২) রিজিক দেওয়ার কারণ হল, প্রতিপালকের দয়া-মায়া ও ক্ষমতার সন্তানদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

(৩) মৃত্যু দেওয়ার উদ্দেশ্য হল আল্লাহর অসীম শক্তি ও কঠোরতর লক্ষণ প্রচার করা।

(৪) পুনর্জীবিত করার উদ্দেশ্য, আল্লাহ যে অদ্বিতীয় ন্যায়নিষ্ঠার অধিকারী তা বাস্তবে প্রমাণিত করা।

হযরত হারবের রহমাতুল্লাহ উত্তর শোনার পর প্রতিবেশী প্রস্তাব দিলেন, আগুনকে একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। সঙ্গে সঙ্গে একজন একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা এনে বণিকের সামনে রাখলেন আর তিনি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। আগুন যে তাকে রেহাই দেবে না, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। কাজেই আগুনের ওপর হাত রাখতে তার সাহস হল না। তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে হযরত হারব রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি কী চিন্তা করছেন তা বুঝেছি। আপনাকে আমি একটি কালাম শিখিয়ে দিচ্ছি। সেটি পাঠ করে আগুনের মধ্যে হাত রাখুন। আল্লাহর রহমতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। কালামটি হল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

কালাম শরীফ পাঠ করে হরত হারব রহমাতুল্লাহ জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় সজোরে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চেপে ধরলেন। কিন্তু কিছুই হল না। হাতের কোন স্থানই এতটুকু পুড়ল না। আর প্রতিবেশী তখনই কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাঁর সম্বন্ধে এরূপ শোনা যায় যে, জীবনে একটি রাতও তিনি ঘুমিয়ে কাটাননি। কেউ কেউ বলতেন, মাঝে-মধ্যে দু'একদিন ঘুম গেলে এমন কি ক্ষতি হবে? তিনি উত্তর দিয়েছেন, যার মাথার ওপর জান্নাত আর পায়ের তলায় জাহান্নাম, অথচ জানা নেই তার স্থান জান্নাতে না জাহান্নামে, সে কী করে ঘুমাতে পারে?

তিনি বলতেন, আমি যদি জানতাম, কে আমার নিন্দা করে, তাহলে সোনা-রূপা দিয়ে তার মন খুশীতে ভরিয়ে দিতাম। কেননা, সে যখন আমার উপকার করছে, তখন তার প্রতিদান দেওয়া আমার একান্ত কর্তব্য।

তিনি আরও বলতেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং তাঁর উপাসনা করতে থাক। আর দুনিয়ার ধোঁকা সম্বন্ধে সজাগ হও। কেননা, তাতে জড়িয়ে পড়লে বহু বিপদের মুখোমুখি হতে হবে।

হযরত
হাতেমে আসাম
রহমাতুল্লাহ

হযরত হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ ছিলেন খোরাসানের অধিবাসী। ত্যাগ-তিতিক্ষা, এবাদত তাঁর মর্যাদা বহু উচ্চে স্থাপন করে। তাঁর সততা, ধর্মভীরুতা এক কথায় নজির বিহীন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর জীবনের একটি মুহূর্তও তিনি আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত করেননি। তাঁর সমগ্র জীবন বস্তুতঃ এক অন্তহীন এবাদত।

তাঁর পীর ছিলেন তাপসপ্রবর হযরত শাকীক বলখী রহমাতুল্লাহ। তাঁর অন্যতম প্রিয় মুরীদ ছিলেন হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ।

হযরত হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ সম্বন্ধে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ বলেন, তিনি এ কালের সিদ্দীক। তাঁর তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনাবলী আল্লাহর পথের পথিকগণের জন্য খুবই মূল্যবান।

একবার মুরীদগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যদি পৃথিবীর লোক তোমাদের জিজ্ঞেস করে, হাতেমে আসামের কাছে তোমরা কী শিখেছ, তো বলবে, আমরা তাঁর কাছে বিদ্যা শিখেছি। যদি তারা বলে, হাতেমে আসাম তো সে ধরনের আলেম ছিলেন না, তখন তোমরা বলবে, আমরা তাঁর কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছি। তাতে তারা যদি বলে, তিনি তো তত্ত্বজ্ঞানীও নন। তখন তোমরা বলবে, আমরা তাঁর কাছে দু'টি বস্তু শিখেছি। এক, নিজের কাছে যা রয়েছে তাতে খুশী থাকা। দুই, অন্যের কাছে যা আছে তার আশা না করা।

একটি ঘটনা সূত্রে তাঁর আসাম পদবী মূল নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। একদিন এক মহিলা তাঁর কাছে এলেন একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে। হঠাৎ সশব্দে তাঁর বায়ু নিঃসরণ হয়। মহিলা খুব লজ্জা পেলেন। যাই হোক, তিনি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তখন হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি আসাম ব্যক্তি (অর্থাৎ কানে কম শুনি) সুতরাং যা বলবে একটু জোরেই বলবে। মহিলা একটু স্বস্তি পেলেন। লজ্জার ভাব কেটে গেল। এরপর বেশ জোরেই তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় পেশ করলেন। আর হযরত হাতেম রহমাতুল্লাহ তার যথাযথ উত্তর দিলেন। আসলে তিনি কানে কম শুনতেন না আদৌ। শুধু মহিলার লজ্জা দূর করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই কানে কম শোনার কথাটা বলেছিলেন। শোনা যায়, ঐ মহিলা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি ঐ রকমই ভান করতেন। সেদিন থেকে তাঁর নামের সঙ্গে 'আসাম' যুক্ত হয়।

একবার বলখের এক জনসমাবেশে মোনাজাত করার সময় তিনি বললেন, হে দয়াময়! আপনি এ জলসার উপস্থিত সবচেয়ে জগন্য পাপীকে মার্জনা করুন। ঘটনাক্রমে সে সভায় এক কাফন-চোরও উপস্থিত ছিল। ঐ রাতেই কাফন চুরি করার জন্য সে একটি কবর খুঁড়ল। আর তখন শোনা গেল আসমানী আওয়াজ, হতভাগা। আজই তো তুমি হযরত হাতেমে আসামের উসিলায় মার্জনা পেয়েছ, আর আজই আবার এই ঘৃণ্য কাজে লেগে গেলে? এই অদৃশ্য শব্দ শুনে সেদিন থেকে সে কাফন চুরির কাজ বরাবরের মতো ছেড়ে দিল।

হযরত রাজী রহমাতুল্লাহ বলেন, দীর্ঘদিন হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ-এর সাহচর্য থেকে মাত্র একদিন ছাড়া আর কোনদিন তাঁকে রাগতে দেখিনি। সেদিন তিনি বাজারের পথে দেখেন এক ব্যবসায়ী তার খাতকের ওপর পাওনা শোধ করার জন্য প্রবল চাপ দিচ্ছে। তার কথা হল, আজই তার দেনা শোধ করতে হবে। না হলে তাকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। এমনকি তাকে মারধরেরও শাসানি দেওয়া হচ্ছে। পাওনাদারদের এই জুলুম দেখে তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে বললেন, দেনাদারের সঙ্গে এমন রুক্ষ ব্যবহার না করে একটু ভদ্র ও নরম ব্যবহার করলেও তো চলে। অযথা মানুষকে এত অপমান করা ভালো নয়।

তাঁর এই কথা শুনে মহাজন আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, যে আমার পাওনা শোধ করে না তার সঙ্গে আবার নরম ব্যবহার কিসের? আজ আমি ছাড়ছি না। তাকে টাকা দিতেই হবে, না হলে উচিত শিক্ষা দেব। তখন হযরত হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ কাঁধ থেকে চাদরখানি তুলে নিয়ে খুব জোরে মাটির ওপর ছুঁড়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, প্রচুর স্বর্ণখণ্ড ছড়িয়ে আছে মাটির ওপর। হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ-এর রাগ তখনও কমেনি। তিনি রেগেই বললেন, খবরদার! তোমার যে পরিমাণ পাওনা আছে তাই নেবে, তার বেশী এক কণাও নেবার চেষ্টা করো না। তা যদি কর, তাহলে কিন্তু তোমার হাত অবশ হয়ে যাবে। কিন্তু তা বললে কি হবে। লালসা দমন করা কঠিন। মহাজন তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী সোনা কুড়িয়ে নিল। আর তৎক্ষণাৎ তার দু'টি হাতই অবশ হয়ে গেল।

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে দাওয়াত করে। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেন– অবশ্য তিনটি শর্তে। যথা–

(১) তিনি নিজের পছন্দমতো জায়গা বসবেন,
(২) নিজের ইচ্ছামতো খাবার খাবেন ও
(৩) তাঁর কথা দাওয়াতকারীকে মেনে নিতে হবে।

যথাসময়ে তিনি দাওয়াতকারীর বাড়ীতে পৌঁছলেন। এবং জুতা না খুলেই ফরাশে বসে গেলেন। আর নিজের থলে হতে দুখানি রুটি বের করে খেতে লাগলেন। তারপর ঐ ব্যক্তিকে বললেন, এখানে একটি তপ্ত তাওয়া আনা হোক। সে আর কি করবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি গরম তাওয়া এনে হাজির করল। হযরত হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ ঐ তাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, আমি দু'খানি রুটি খেয়েছি। তারপর তাওয়ার ওপর থেকে নেমে এসে তিনি সমবেত লোকদের বললেন, তোমরা যদি বিশ্বাস কর, রোজ কিয়ামতে সব কিছুর হিসাব নেওয়া হবে, তবে এই গরম তাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে আজ এখানে সে কি খেয়েছ, তার হিসাব দাও। তারা বললেন, হুযুর! ঐ গরম তাওয়ার ওপর দাঁড়াবার সাধ্য আমাদের নেই।

তখন তিনি বললেন, যদি এখানে বসেই তোমাদের সামান্য কাজের হিসাব না দিতে পার, তাহলে তোমরা আগুনে তৈরী হাশরের মাঠে দাঁড়িয়ে কি করে সারাজীবনের হিসাব

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেবে? এরপর তিনি পবিত্র কোরআনের রোজ কিয়ামতে তোমাদেরকে প্রদত্ত যাবতীয় নেয়ামতেরই হিসাব-নিকাশ হবে– এই আয়াতটির মর্ম শুনিয়ে দিলেন। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি এমন অপূর্ব ছিল যে, তা শুনে প্রতিটি লোক কান্নায় ভেঙে পড়ল।

একদিন এক বিত্তশালী ব্যক্তি তাঁকে কিছু অর্থ গ্রহণ করতে বলেন, যাতে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়, আর তিনিও পুণ্যবান ব্যক্তিকে কিছু সাহায্য করার বদৌলতে কিছু পুণ্যের অধিকারী হন। তাছাড়া আশা পূর্ণ হওয়ার কারণে তিনি মানসিক প্রশান্তিও লাভ করবেন।

হযরত হাতেমে রহমাতুল্লাহ তাঁকে জানালেন একটি ভয়ের কারণে তিনি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতে পারছেন না। সে ভয় হল, যতদিন ঐ ধনী দাতা জীবিত থাকবেন, ততদিন না হয় তাঁর জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা বহাল রাখবেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর হযরত যদি আল্লাহর কাছে এই বলে মোনাজাত করেন যে, তাঁর রুজিদাতার মৃত্যু হয়েছে। হে প্রভু! এবার আপনি আমার রুজির দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তখন আল্লাহ্ যদি বলেন, যার মৃত্যু ঘটে তার কাছ থেকে রুজি গ্রহণ করার কালেই তোমার একথা চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল। তখন তিনি কি করবেন? তাঁর ভয়টা সেখানেই।

আপনার রুজি আসে কোত্থেকে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর তরফ থেকে, যার ভান্ডারে কোন রকমের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই।

প্রশ্নকর্তা আবার বলেন, আপনি তো মানুষের ধন বঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে ভোগ করেন। অথচ বলছেন, রুজি আসে আল্লাহর তরফ থেকে।

তিনি বললেন, তোমাকে বঞ্চনা করে কখনও কিছু নিয়েছি কি? তিনি উত্তর দিলেন, না, তা করেননি। তখন হযরত আসাম রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি যদি মুসলমান হতে, কত ভালো না হত।

প্রশ্নকর্তা বলেন, আপনি কেবল কথার মধ্যে যুক্তির মার-প্যাঁচ প্রয়োগ করেন।

হযরত হাতেমে রহমাতুল্লাহ বললেন, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যাপারে যুক্তি চাইবেন।

লোকটি ঃ যা বলেন সব গতানুগতিক কথা।

হযরত ঃ না এগুলো সব আল্লাহর কথা। প্রত্যেকের জননী তার পিতার জন্য বৈধ হয়েছে কেবল এই বাণীরই মাধ্যমে।

লোকটি ঃ হুযুর, আপনার রুজি কি সত্যিই আসমান থেকে আসে?

হযরত ঃ শুধু আমার কেন, সব রুজিই আসমান থেকে আসে। আল্লাহ বলেন, আসমানেই রুজি সংরক্ষিত রয়েছে।

লোকটি ঃ তাহলে আপনি ঘরে শুয়ে থাকুন। দেখি কী করে আপনার মুখে রুজি এসে পড়ে।

হযরত ঃ শিশুকালে দু'বছর তো শায়িত ছিলাম। তখন আমার রিজিক আপনা থেকে মুখে আসত বৈকি।

লোকটি ঃ দুনিয়াতে বীজ বপন না করে কাউকে শস্য কাটতে দেখেছেন কি?

হযরত ঃ হ্যাঁ, দেখেছি। তুমি তোমার মাথার চুল কি কখনও বপন করেছ? অথচ তা কিছুদিন পরপর কাটছ কিনা।

লোকটি ঃ আপনি ভূতল থেকে শূন্যে গমন করুন। দেখি সেখানে কে আপনাকে রুজি দেয়।

হযরত ঃ হ্যাঁ, পাখী হলে সেখানেও রুজি পাওয়া যেত।

লোকটি ঃ তবে তো মাটির নিচে রুজি পাওয়া যাবে।

হযরত ঃ পিঁপড়া হলে তো মাটির নিচেই যেতাম।

হযরতের এমন সূক্ষ্ম যুক্তি সম্মত উত্তর শুনে লোকটি এবার নিরুত্তর হয়ে গেলেন। পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে তিনি বিনীতভাবে বললেন, আমাকে কিছু শিক্ষা দিন হুযুর।

হযরত হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ বললেন, কোন লোকের নিকট কিছু আশা করো না। তাহলে তোমার নিকটও কেউ কিছু আশা করবে না। নগণ্য কর্ম এমন গোপনে সম্পন্ন করো, যেন তুমি ও আল্লাহ্ ছাড়া কেউই জানতে না পায়। আর সব সময় মখলুকের সেবা কর, তাহলে তুমি যেখানেই থাক না কেন, মখলুক তোমার সেবা করবে।

হযরত আসাম রহমাতুল্লাহ একবার আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি রুজির সন্ধান করেন?

তিনি জবাব দেন, করি বৈকি।

হযরত আসাম রহমাতুল্লাহ-এর প্রশ্নঃ তা কখন করেন? খাওয়ার আগে না পরে, না খাওয়ার সময়েই?

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন ভাবতে থাকেন হযরত ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ। যদি বলেন, খাওয়ার আগে, তাহলে আসাম রহমাতুল্লাহ হয়ত বলবেন, তাতে সময়ের অপচয় হয়। যদি বলেন খাওয়ার পরে, তাহলে তিনি বলতে পারেন, যা গত হয়েছে তার সন্ধান করা বৃথা। আর যদি বলেন খাওয়ার সময়েই, তাহলে তিনি হয়ত বলে বসবেন, উপস্থিত বস্তুর সন্ধান করার কোন হেতু নেই। এরূপ চিন্তা করে তিনি কোন সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে নিরুত্তর রইলেন।

প্রশ্নগুলো এক দরবেশের কানে এল। তিনি বললেন, এর জবাব এরূপ হওয়া উচিত ছিল যে, রুজি অনুসন্ধান করা ফরজ, ওয়াজিব বা সুন্নত নয়। কাজেই এ তিনটির সঙ্গে সময়ের কোন সম্পর্ক নেই। বিশেষ করে যে বস্তু নিজেই আমাদের খুঁজে বেড়ায়, তাকে খোঁজার দরকার কি? হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যা তোমার রিজিক, তা তোমার নিকট এমনিই আসবে।

তিনি আরও বলেছেন, আমাদের প্রতি নির্দেশ হল আল্লাহর এবাদত করা। যেমন, আমরা তাঁর আদেশ পেয়েছি আর তাঁর কর্তব্য হল আমাদের রুজি দান করা, যেমন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

হযরত হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ যুদ্ধে যাবেন। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে পত্নীকে জিজ্ঞেস করলেন, চার মাসের খরচ বাবদ তোমার কত টাকা দরকার?

পত্নী বললেন, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আমাকে ততদিনের টাকা দিয়ে যান।

তিনি বললেন, তোমার বাঁচা-মরা তো আমার হাতে নেই।

পত্নী বললেন, তাহলে আমার রুজির ব্যাপারেই বা আপনার হাত থাকবে কেন?

যাই হোক, তিনি যুদ্ধে গেলেন। তারপর একদিন যখন যুদ্ধ চলছে, তখন এক কাফের তাঁকে বধ করার জন্য তরবারি তুলেছেন, হঠাৎ কোনদিক থেকে তীর এসে তাকে এমনভাবে বিদ্ধ করল যে, তার কাজ শেষ হয়ে গেল। তখন হযরত হাতেমে রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি কি আমাকে হত্যা করলে, না আমিই তোমাকে করলাম।

এক ব্যক্তি বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে তাঁর কাছে কিছু উপদেশ চাইলেন। তিনি বললেন, যদি প্রিয় বন্ধুর আশা রাখ, তাহলে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর যদি সঙ্গী চাও, তাহলে তার জন্য কেরামুন কাতেবীনই ভালো। যদি উপদেশ বা শিক্ষা পেতে চাও, তাহলে দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি দাও। সান্ত্বনা চাইলে কোরআন পাকই সেরা। কাজের ইচ্ছা থাকলে এবাদত উত্তম। উপদেশ চাইলে সেজন্য মৃত্যুই (মৃত্যুর স্মরণ) যথেষ্ট। আর আমি যা বললাম, তা যদি তোমার মনমতো না হয়, তাহলে তোমার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হামেদ লাফলাফ বলেন, হযরত হাতেমে রহমাতুল্লাহ বলেছেন, প্রতিদিন ভোর বেলা ইবলীস তাঁকে ভয় দেখাত, আজ তুমি কী খাবে? তিনি জবাব দিতেন, মৃত্যু।

কী পরবে?

কাফন।

কোথায় থাকবে?

কবরে।

বলাবাহুল্য, আর কথা না বাড়িয়ে শয়তান চম্পট দিত।

এক ব্যক্তি বললেন, হুযুর! ঐ লোকটি বহু ধনরত্ন সঞ্চয় করেছে।

হাতেমে রহমাতুল্লাহ বললেন, মৃতের ধন কি কাজে আসবে?

এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, আপনার কিছু চাওয়ার থাকলে আমার নিকট প্রকাশ করুন।

হযরত হাতেম রহমাতুল্লাহ-এর স্পষ্ট জবাব, আমি যা চাই তা হল তুমি আমার কাছে এসো না। আমিও তোমার নিকট কিছু প্রকাশ করব না।

আপনি নামাজ কিভাবে আদায় করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, নামাজের সময় হলে প্রকাশ্য ওজু করি পানি দিয়ে। আর গোপন ওজু বানাই তওবা দ্বারা। তারপর মসজিদে যাই, তখন মনের মধ্যে কাবার দৃশ্য জাগিয়ে তুলি আর ভাবি, মাকামে ইব্রাহীম আমার দুই ভুরুর মাঝখানে আর ডানদিকে রয়েছে জান্নাত, বামে রয়েছে জাহান্নাম, দু'পায়ের নিচে রয়েছে পুলসিরাত। মালাকুল মওত আযরাঈলকে আমি আমার পেছনে হাজির বলে ধারণা করি। তখন মন-প্রাণ আল্লাহর কাছে সঁপে দিই। পরে পরম ভক্তিভরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করি। মাথানত করে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত হৃদয়ে কেরাত পাঠ করি। অতঃপর সবিনয়ে রুকুতে যাই। আবার সবিনয়ে সেজদায় যাই। তারপর ধ্যান-তন্ময় চিত্তে বসি। তারপর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দু'দিকে সালাম করি। এভাবে আমি আমার নামাজ আদায় করি।

একবার তিনি কয়েকজন আলেমের কাছে গিয়ে বললেন, আপনাদের মধ্যে যদি তিনটি বস্তু থাকে তো ভালোই। যদি না থাকে তো আপনাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

জিনিস তিনটি কি? তাঁরা জিজ্ঞেস করেন। হযরত হাতেমে রহমাতুল্লাহ বললেন,

(১) অতীত দিনের জন্য এভাবে আক্ষেপ করা যে, আমি ঐ দিনগুলোতে এবাদত করিনি এবং কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করা হয়নি।

(২) উপস্থিত সময়কে কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করে কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

(৩) আগামীকাল আপনাদের জন্য উত্তম কী অধম তা অনিশ্চিত জেনে সদা সন্ত্রস্ত থাকা।

তিনি বলেন, অহঙ্কার, লোভ ও আত্মগরিমা-এ তিন অবস্থায় মৃত্যুকে ভয় করো। কেননা–

(১) আল্লাহ্ অহঙ্কারীকে তার চেয়েও বেশী ঘৃণিত, অপদস্থ ও অসম্মানিত না করে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না।

(২) লোভী লোকের গুনাহ যে পর্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, সে পর্যন্ত দুনিয়া থেকে তাকে তুলে নেবেন না।

(৩) অহঙ্কারে স্ফীত মানুষকে মলমূত্র দ্বারা অবলেপিত না করে দুনিয়া থেকে তুলে আনবেন না।

হযরত হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ-এর মুরশিদ হযরত শাকীক বলখী রহমাতুল্লাহ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার সাহচর্যে কত বছর কাটালে? তিনি বললেন, প্রায় ত্রিশ বছর। এতদিন ধরে তুমি আমার নিকট কী কী শিখলে?

মাত্র আটটি মাসআলা শিখেছি।

মাত্র আটটি মাসআলা শিখেছ!

জি, ঐ আটটি ছাড়া আমি আর কিছুই শিখিনি। তবে আমার মনে হয়, সেগুলোই আমার ইহকাল-পরকালের মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

(১) আমি সমগ্র মানব সমাজের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, প্রত্যেকেরই কোন না কোন প্রেমিক রয়েছে। তাদের জন্য তারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। অথচ প্রেমিকের মৃত্যু হলে কেউই তার সঙ্গে কবরে যায় না। এ থেকে আমার মনে হল, হৃদয়হীন বিনাশশীল প্রেমিকের জন্য সময় নষ্ট করা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। তাই কারোর সঙ্গে যদি প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতেই হয়, তাহলে পুণ্য কর্মের সঙ্গে তা করা চাই। কেননা, তা মৃত্যুর পরে সঙ্গে কবরে যায়।

(২) বিশ্ব সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রত্যেকেই প্রবৃত্তির দাস। সেই সঙ্গে আল্লাহর বাণীর প্রতিও আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় আর প্রবৃত্তিকে কুকাজ থেকে বিরত রাখে, তার জায়গাই হল জান্নাত। অতঃপর আমি কোরআন পাকের ঐ বাণীর ওপর আস্থা করে প্রবৃত্তিকে শাসন করেছি। আর সফলও হয়েছি।

(৩) পৃথিবীর সব মানুষকে দেখলাম, দুনিয়া লাভের জন্য তারা নিয়ত তৎপর। অর্থ, যশঃ-খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেই তারা জীবনকে সার্থক মনে করে। অথচ আল্লাহর বাণী হল, তোমাদের যা রয়েছে, একদিন তা বিলীন হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা হল স্থায়ী। এই পবিত্র বাণীর দিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমার যাবতীয় অস্থায়ী বস্তু বিলিয়ে দিয়ে স্থায়ী সম্পদ লাভে সচেষ্ট হয়েছি।

(৪) দেখলাম, অর্থ, যশঃ-খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাকে মানুষ বড় মূল্য দেয় বলে সেগুলো নিয়ে অহঙ্কার করে। অথচ আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানী সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহভীরু। আল্লাহর এই ঘোষণা অনুযায়ী আমি আমার আল্লাহভীরুতা তথা ধর্মনিষ্ঠাকে শক্ত করে ধরলাম।

(৫) দেখলাম, পৃথিবীর একদল মানুষ অন্য দলের অনিষ্ট সাধনে রত। তারা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। অথচ আল্লাহ্ বলেন, আমিই তাদের মধ্যে এই দুনিয়ার রুজি বন্টন করে দিয়েছি। এর দ্বারা আমি বুঝতে পারলাম, পারস্পরিক হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি, মারামারি বৃথা, অর্থহীন। যে যা পেয়েছে বা লাভ করেছে, তা আল্লাহ্রই ইচ্ছায়। একজন আরেকজনের সম্পদ, সম্মান, মর্যাদা বা অন্য কিছু প্রাণপণ চেষ্টা করেও কেড়ে নিতে পারে না। আমি তাই অবিচল ধারণায় মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ মুছে দিয়েছি।

(৬) দেখলাম, বিদ্বান সমাজও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, মতানৈক্য, সমালোচনা ও পরশ্রীকাতরতায় আক্রান্ত। অথচ আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় শয়তান তোমার শত্রু। সুতরাং কেবলমাত্র তারই সঙ্গে শত্রুতা রাখ। অর্থাৎ এই আয়াতের মর্মকথা হল, শয়তান ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমাদের শত্রুতা রাখা বা কারও সমালোচনা করা উচিত নয়।

(৭) দেখলাম, নিজ নিজ জীবিকা অর্জনের জন্য সবাই সদা-ব্যস্ত। এমনকি এপথে গিয়ে অনেকেই বৈধ-অবৈধ রুজির কথা ভুলে গেছে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে সবার রিজিকই আল্লাহর হাতে। এ আয়াতের মর্মানুসারে আমার মনে হয়েছে, আমিও তো একটা জীব। অতএব আমার রুজির জিম্মাদারও তো সেই আল্লাহ্। অতএব রিজিকের চিন্তা পরিত্যাগ করে আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত হয়েছি।

(৮) আরও লক্ষ্য করলাম, পৃথিবীতে জীবিকার ব্যাপারে কেউ ব্যবসার, কেউ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চাকুরীর, কেউ শিল্পের, কেউ সুলতান-বাদশাহর, কেউ মনিবের আবার কেউ পুত্র-কন্যার ওপর নির্ভরশীল। অথচ পাক কোরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ পাকের এ বাণীর ওপর অটল থেকে আমি আমার সকল ব্যাপারে তাঁর ওপরেই নির্ভর করেছি।

মুরশিদ শাকীক বলখী রহমাতুল্লাহু তাঁর সুযোগ্য মুরীদের কথা শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন, আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তোমাকে এ শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তওফীক দান করুন।

হযরত হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ বিভিন্ন সময়ে তাঁর শিষ্য ও অন্যাদের যে অমূল্য উপদেশ দান করেন, তার কিছু উল্লেখ করা হলঃ

হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ-এর উপদেশবলী ঃ

১. আলেম ও যাহেদগণের অহমিকা, আমীর-বাদশাহাদের অহমিকা অপেক্ষায় মারাত্মক।

২. অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে অহঙ্কার করো না। কেননা, বালআম বাউরার পতন ঘটেছে অলৌকিক শক্তির কারণে।

৩. আলেম-দরবেশগণের সাক্ষাত ও সঙ্গলাভের কারণে গর্ব করা উচিত নয়। কেননা, রাসূলে করীম (সঃ) দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রেষ্ঠ রাসূল ও আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য ও সেবায় কালাতিপাত করেও সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এই নৈতিক রোগ দেখা দেয়নি।

৪. কলব বা অন্তকরণ পাঁচ প্রকারের। যথা ঃ (১) মৃত, (২) রোগা, (৩) অলস, (৪) ভিন্নমুখী ও (৫) নিখুঁত। কাফেরদের হৃদয় মৃত। পাপী মুসলিমের হৃদয় রোগাক্রান্ত। অতিভোজী ও লোভীর হৃদয় অলস। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের হৃদয় ভিন্নমুখী। প্রকৃত আল্লাহভীরু মুসলিম সাধক-দরবেশের হৃদয় নিখুঁত।

৫. লালসা আকাঙ্খা তিন শ্রেণীর। যথা ঃ (১) ভোজনের আকাঙ্খা, (২) কথা বলার আকাঙ্খা ও (৩) দেখার আকাঙ্খা। অতএব খাওয়ার সময় এ বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহই খাবার দিচ্ছেন। কথা বলার সময় সততা রক্ষা করবে। আর কিছু দেখার সময় দর্শনীয় বস্তু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

নফস বা প্রবৃত্তিকে চারটি কাজে যাচাই করে নিতে হবে। যেমনঃ (১) সৎ কাজ করার পেছনে লোক দেখানো ব্যাপার আছে কিনা, (২) কথা বলার সময় মনে লোভ-লালসার উদ্দেশ্য আছে কিনা, (৩) দান করার পেছনে প্রতিদানের মনোভাব আছে কিনা, (৪) ধন সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতার প্রশ্রয় আছে কিনা।

৬. আল্লাহর ভয়ই এবাদতের শোভা। আর আল্লাহর ভয়ের নিদর্শন হল পার্থিব আকাঙ্খা ও লোভ-লালসাকে সংযত করা।

৭. অতি দ্রুত কাজ করা শয়তানের রীতি। তবু পাঁচটি কাজ দ্রুত করা চাই। (১) অতিথির জন্য খাবারের আয়োজন করা। (২) মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা। (৩) বয়স্কা কন্যার বিবাহের বন্দোবস্ত করা। (৪) ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া। (৫) পাপ করে ফেললে তওবা করা।

হযরত হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ কারও দেওয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করতেন না। এর কারণ হিসাবে তিনি বলতেন, কারও কোন বস্তু গ্রহণ করা অবশ্য দাতার পক্ষে সম্মান-জনক, কিন্তু গ্রহীতার পক্ষে তা হেয় হবার কারণ বলে আমার ধারণা। একবার তিনি কোন বস্তু গ্রহণ করেন। তাতে সবাই অবাক হয়ে তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি জবাব দেন, দাতা লোকটির সম্মান আমার চেয়ে ঢের বেশী তাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত হাতেম রহমাতুল্লাহ একবার বাগদাদ পরিভ্রমণ করেন। সে খবর খলীফার কানে পৌছায়। তিনি খোরাসানের এই জ্ঞান-তাপসকে তাঁর সভায় ডাকেন। আর সে ডাকে সাড়া দিয়ে তিনিও দরবারে হাজির হন। সেখানে তিনি খলীফাকে সালাম জানান এভাবে ঃ আস্সালামু আল্লাইকুম ইয়া যাহিদু–হে যাহেদ! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

খলীফা বললেন, আমি তো যাহেদ নই। আমি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি। যাহেদ বরং আপনি। হযরত হাতেম রহমাতুল্লাহ বললেন, না না, বরং যাহেদ আপনিই।

আমি যাহেদ হলাম কিভাবে? খলীফা জিজ্ঞেস করেন

হযরত হাতেমে আসাম রহমাতুল্লাহ বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, বলুন দুনিয়ার সম্পদই হল যৎকিঞ্চিৎ। আপনি খলীফা, সামান্য সম্পদ নিয়েই খুশী আছেন, অন্য দিকে পরকালের জান্নাতের সুখ-শান্তি ও অতুল বিভব সব কিছুর আশা পরিত্যাগ করেছেন। এ জন্য আপনাকে আমি যাহেদ বলেছি। আমি এই দুনিয়ার সামান্য সম্পদ লাভে খুশী নই। বরং পরকালের অপরিমেয় সম্পদলাভের বাসনা আমার মনে। অতএব, আমি নিজেকে যাহেদ বলি কী করে?

হযরত মা'রূফ কারখী রহমাতুল্লাহ

সামান্য একটি শিশু, সে কিনা বলে, আল্লাহ্ এক। এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছাত্রদের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলছিলেন, আমাদের স্রষ্টা হলেন তিন আল্লাহর অন্যতম। আর তখনই শিশু বলে উঠল, আল্লাহ্, এক। তিনি শুধু বিরক্ত হলেন, তাই নয়। রাগও হল শিশুর ওপর। তিনি আবারও তিন আল্লাহর কথা বললেন। কিন্তু কিছুতেই এক ফোঁটা শিশুর মুখ দিয়ে তিন আল্লাহর স্বীকৃতি আদায় করা গেল না। বরং ঐ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে সে হাজির হল হযরত আলী ইবনে মূসা রেজা রহমাতুল্লাহ্-এর দরবারে। তাঁর পিতা-মাতা খ্রীস্টান ছিলেন। কিন্তু ছোট ছেলেটি হযরত আলী রহমাতুল্লাহ-এর কাছে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করল। নিজ ধর্মে ও পরিবারে আর ফিরে গেল না।

বলা বাহুল্য, পুত্রের ধর্ম পরিবর্তনে পিতা-মাতা তার প্রতি প্রচন্ড বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে মানসিক অশান্তিও তাদের আচ্ছন্ন করে।

কিছু দিন পর সে আবার ফিরে এল বাড়ীতে। তাঁর পরিবর্তিত আচার-আচরণ তাঁদের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। আর পরিবারটি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়।

যে পুত্রের প্রভাবে পুরো একটি পরিবার ইসলামের পতাকাতলে এসে দাঁড়ায়, তারই নাম হযরত মা'রূফ কারখী রহমাতুল্লাহ। অসাধারণ এক তাপস, যিনি তরীকত ও হাকীকত-পন্থার দিশারী। তাঁর মুরশিদ ছিলেন প্রখ্যাত সাধক হযরত দাউদ তায়ী রহমাতুল্লাহ।

একদিন তাঁর দেহে একটি চিহ্ন দেখে হযরত মুহাম্মদ ইবনে তুসী রহমাতুল্লাহ বললেন, এ চিহ্নটি গতকাল আপনার শরীরে দেখা যায়নি। হঠাৎ আজ এটি এল কোত্থেকে? তিনি বললেন, গত রাত্রে নামাজ পড়ার সময় হঠাৎ আমার মনে কাবা শরীফে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা হয়। আর সেখানে আমি উপস্থিতও হই। কাবা ঘর তওয়াফ করে আমি যখন যমযম কূপের কাছে পৌছাই, তখন হঠাৎ পা ফসকে পড়ে যাই। তারই চিহ্ন এটি।

জায়নামাজ ও কোরআন শরীফ মসজিদে রেখে হযরত কারখী রহমাতুল্লাহ গেছেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নদী-তীরে। আর এদিকে এক বৃদ্ধা তাঁর জায়নামাজ আর কোরআন শরীফ তুলে নিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে বাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। বৃদ্ধার কাছে জায়নামাজ আর কোরআন শরীফ দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, মা আপনার কোন সন্তান কি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে? তিনি বললেন, না বাবা। তাহলে আমার কোরআন শরীফখানা ফেরত দিন। তবে জায়নামাজ খানা আপনাকে দিলাম। হযরত কারখী রহমাতুল্লাহ বললেন, তাঁর কথাবার্তা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধা তাঁর দুটি জিনিসই দিয়ে দিলেন।

একদিন কয়েকজন সঙ্গীসহ তিনি চলেছেন কোথাও। পথে দেখা হল একদল শরাবপায়ীর সঙ্গে তারা তখন মত্ত অবস্থায় নাচানাচি করছিল। তাঁর সঙ্গীরা লোকগুলোকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করল। তিনি তখন তাঁর প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বললেন, প্রভু গো! আপনি যেমন এদের আমোদ-ফুর্তির সুযোগ দিয়েছেন, তেমনি পরকালে এরা যেন আরও বেশী করে আমোদ-ফুর্তি করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিন। তাঁর এ ধরনের দোয়া শুনে শরাবপায়ীরা শরাবের পাত্র দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করল। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন, মিষ্টিতে যার মৃত্যু হয়, তাকে বিষ দেওয়ার কি দরকার?

একবার হযরত কারখী রহমাতুল্লাহ-এর এক অতিথি কেবলার দিক ভুল করে নামাজ শেষ করলেন। কিন্তু পরে দিক ঠিক করতে পেরে তিনি হযরত কারখী রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, নামাজের শুরুতে আপনি দিক ঠিক করে দিলেন না কেন? তিনি জবাব দেন, গরীব পাপীদের অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করা তখন শোভনীয়, যখন তারা নিজেদের কাজ থেকে অবসর লাভ করে।

হযরত কারখী রহমাতুল্লাহ-এর মামা শহরের কাঁজী ছিলেন। তিনি একদিন দেখলেন, হযরত মা'রূপ কারখী রহমাতুল্লাহ এক বনের মধ্যে একটি কুকুরকে নিয়ে আহার করছেন। একবার এক গ্রাস নিজের মুখে দেন, আরেকবার কুকুরকে খাওয়ান। এই দৃশ্য দেখে মামা রেগে আগুন। তুমি একটা কুকুরের সঙ্গে খাচ্ছ? এতটুকু লজ্জা নেই?

তিনি বললেন, লজ্জা আছে বলেই তো কুকুরকে খাবার দিচ্ছি। বলে ওপর দিকে তাকিয়ে তিনি একটি পাখীকে ডাকলেন। পাখী নেমে এসে তাঁর হাতের ওপর বসল আর নিজের পালক দ্বারা চোখ-মুখ ঢেকে ফেলল। তখন মা'রূফ রহমাতুল্লাহ তাঁর মামাকে বললেন, দেখুন, যে আল্লাহর নিকট লজ্জিত, যাবতীয় বস্তুই তাঁর কাছে লজ্জিত। বলা বাহুল্য, মামা বড় লজ্জা পেলেন।

তিনি বলেন, তিনটি কাজে বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। (১) প্রতিশ্রুতি পালন করায়, (২) দান না পেয়ে প্রশংসা করায়, (৩) না চাইতে দিয়ে দেওয়ায়।

একবার তিনি কিছু ভালো খাবার খাচ্ছিলেন। তা দেখে এক ব্যক্তি বললেন, আপনি কি খাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি অতিথি। অতিথি সেবক যা দেন, আমি তাই খাই।

একদিন তাঁর ওযু নষ্ট হল। আর তিনি সেখানেই তায়াম্মুম করলেন। একজন বলল, দজলা নদী এত কাছে, তবুও আপমি তায়াম্মুম করলেন? তিনি বললেন, হয়ত দজলা নদীতে পৌঁছবার আগেই আমার প্রাণবায়ু ফুরিয়ে যেতে পারে।

তিনি বলেন, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বজায় রাখবে। প্রতি কাজে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সব রকম প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন তাঁর কাছে করবে। কেননা, কোন সৃষ্ট জীবই তোমার উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখতেও সক্ষম নয়। কারও কাছে যদি প্রার্থনা করতেই হয় তবে যার কাছে রয়েছে যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁরই কাছে করবে। আর যদি কোন রকমের দুঃখ-কষ্ট আসে, তবে মন প্রফুল্ল রাখবে। এই হল তার প্রতিকার।

তিনি বলেন, ভীত অবস্থা থেকে দূরে থাকবে। যেহেতু আল্লাহ্ সব সময়েই তোমাকে দেখছেন। তাহলে তুমি মিসকীন সম্প্রদায় ভুক্ত হবে না। তিনি আরও বলেন, জিভকে যেমন পর-নিন্দা থেকে সংযত রাখবে, তেমনি বিরত রাখবে প্রশংসা থেকেও।

একবার একদল শিয়া হযরত মা'রূফ কারখী রহমাতুল্লাহ-কে হযরত সূসা রেজার রহমাতুল্লাহ ঘরে একুশ দিন ধরে বন্দী করে রাখে। আর তার ওপর দৈহিক নির্যাতনও চালায়। মারের চোটে তাঁর কোমর ভেঙে যায়। আর তিনি শয্যা-শায়ী হয়ে পড়েন।

একদিন তিনি নফল রোজা অবস্থায় যোহরের সময়ে বাজারে গেলেন। একজন ভিস্তি চীৎকার করে বলতে লাগল, যে ব্যক্তি আমার এই পানি পান করবে, আল্লাহ্ তাকে অনুগ্রহ করুন। একথা শুনে তার কাছ থেকে পানি কিনে পান করলেন। লোকজন বললেন, আপনি তো রোজাদার ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা ছিলাম। কিন্তু আমার লক্ষ্য ও আগ্রহ ছিল তাঁর অনুগ্রহের ওপর।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন স্বপ্নযোগে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন? তিনি বলেন, দয়াময় আমাকে মাফ করেছেন। তখন হযরত হোসাইন তাঁকে আবার শুধালেন, তা কি ধর্মনিষ্ঠার জন্য? তিনি বললেন, না। বরং আমি কুফা শহরে হযরত সাম্মাক রহমাতুল্লাহ-এর পুত্রের মুখে শুনেছি, যেব্যক্তি পার্থিব সম্পর্ক পরিত্যাগ করে আল্লাহর দিকে ধাবিত হন, আল্লাহও নিজ রহমতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন এবং সৃষ্টজগতকে তাঁর দিকে ধাবমান করেন। তাঁর এই পবিত্র কালাম শুনেই আমি যাবতীয় পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হলাম এবং হযরত আলী মূসা রেজার সেবা ব্যতীত অন্য যেকোন কাজ থেকে হাত গুটালাম। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ আমাকে মাফ করেছেন।

হযরত মা'রূফ কারখীর রহমাতুল্লাহ মৃত্যুর পর বিভিন্ন ধর্মের লোক তাঁকে নিজেদের পীর ও গুরু বলে দাবী করে তাঁর মরদেহ নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী কাফন-দাফনের আয়োজন করে। ইহুদী, খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় তুমুল ঝগড়া। তখন হযরত মা'রূফের একজন খাদেম বললেন, হুযুর মৃত্যুর আগে আমাকে বলে গেছেন, যে সম্প্রদায়ের লোক তাঁর লাশ জমিন থেকে তুলে নিতে পারবে, তারাই হবে তাঁর লাশ কাফন-দাফনের অধিকারী।

তাঁর কথামত প্রথমে ইহুদী সমাজের লোক এসে মৃত দেহ তোলার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। ভূমি থেকে এক চুল পরিমাণও ওপরে তুলতে না পেরে লজ্জিত হয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন। এবার এলেন খ্রীস্টান সম্প্রদায়। কিন্তু তারাও ব্যর্থ হলেন। শেষে এলেন মুসলিম সমাজের মানুষ। তাঁরা বিসমিল্লাহ বলে যে-ই লাশে হাত দিলেন, অমনি সেটা ওপরে উঠে গেল। আর তাঁরাই যথাযথভাবে তাঁর পবিত্র দেহের দাফন-কাফন কর্ম সমাধা করলেন।

হযরত সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ একবার তাঁকে স্বপ্নযোগে দেখেন, আরশের নিচে অচেতন অবস্থায় তিনি পড়ে আছেন। এমন সময় আল্লাহ্ পাক বললেন, হে ফেরেশ্‌তাগণ! বল তো, এ কে? তাঁরা বললেন, প্রভু! আপনিই তা অধিক অবগত। তখন আল্লাহ পাক বললেন, এ-ই হল মা'রূফ, যে আমার প্রেমে জ্ঞান হারিয়েছে। আমার দীদার ছাড়া অন্য কিছুতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসবে না।

হযরত মা'রূফ মহান আল্লাহর কতো ভালোবাসার ধন ছিলেন, এ স্বপ্ন তারই সঙ্কেত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
সহল ইবনে আবদুল্লাহ তশ্‌তরী
রহমাতুল্লাহ

আলমে আরওয়াহ অর্থাৎ আত্মিক জগতে আল্লাহ্ যখন তাঁর সৃষ্টি-কুলকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন সবাই উত্তর দেয়, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু। সেই অগণিত আত্মার মধ্যে একটি যখন ধরাধামে মানব দেহ ধারণ করল, তখনও তার সেদিনের কথা স্মরণে ছিল। মাতৃগর্ভের অবস্থাতেও।

এই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন, দেহাশ্রয়ী পবিত্র আত্মার নাম হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ তশ্‌তরী রহমাতুল্লাহ। তশ্‌ততের অধিবাসী ছিলেন বলেই তাঁর নামের সঙ্গে তশ্‌তরী যুক্ত হয়। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ। এ পথের তিনি শ্রেষ্ঠ সাধক। এবাদত-বন্দেগীতে উৎসর্গীকৃত এই পবিত্রাত্মা বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। আর দিবাভাগে রোজা রেখেছেন আজীবন। প্রখ্যাত তাপস হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহ-এর সাক্ষাত লাভ করেন। আর সেখানেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

অতি শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অধ্যাত্ম-সাধনার অনুগামী। তাঁর মামা ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ মানুষ। তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে সারওয়ার। তিনি যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন, তখন তাঁর তিন বছরের ভাগ্নে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি তাঁকে শুয়ে থাকার জন্য বলতেন। কেননা, তাতে তাঁর নামাজে বিঘ্ন ঘটত। কিন্তু শিশু তা শুনতেন না। কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে তিনি তাঁর মামার এবাদত-পদ্ধতি চুপচাপ দেখে যেতেন।

ভাগ্নের কথাবার্তাও ছিল বিচিত্র। একদিন তিনি মামাকে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার আত্মা আরশে আজীমের সাথে সেজদাবনত। মামা বললেন, এ কথা আর কাউকে বলো না। কতদিন থেকে তোমার এ অবস্থা শুরু হয়েছে? তিনি বললেন, বেশ কিছু দিন থেকে। আর সব সময়ই এ রকম হয়। মামা তাঁকে একটি কালাম শিখিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ আমার সঙ্গে আছেন, আল্লাহ্ আমার প্রতি দৃষ্টিকারী, আল্লাহ্ আমার সাক্ষীস্বরূপ—আল্লাহু মাঙ্গী, আল্লাহু নাজিরী, আল্লাহু শাহিদী। প্রতি রাতে তিনি কালামটি পাঠ করতে বললেন। যখন এই কালাম পাঠে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেলেন, তখন প্রতি রাতে এ কালাম সাতবার পাঠ করতে বললেন। কিছু দিন পরে সেটি পনের বার পড়ার নির্দেশ দিলেন। তখন থেকে তিনি এটি নিয়মিত পাঠ করতেন।

তাঁর মামা তাঁকে এক মকতবে ভর্তি করে দেন। মাত্র সাত বছর বয়সেই তাঁর কোরআন পাক খতম হয়ে যায়। আর তখন থেকেই তিনি রোজা শুরু করেন। তিনি সব সময় যবের রুটি দিয়ে ইফতার করতেন। বারো বছর বয়সে তিনি একটি জটিল মাসআলার সম্মুখীন হন। স্থানীয় আলেমগণের কেউই সে সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। কাজেই তিনি গেলেন বসরায়। সেখানে বিখ্যাত আলেম ও সাধক হযরত হাবীব হামজা রহমাতুল্লাহ-এর শরণাপন্ন হলেন। তিনি অবশ্য খুবই সন্তোষ-জনক সমাধান বলে দিলেন। কিছু দিন তাঁর সংস্পর্শে থেকে আবার তশ্‌তরে ফিরে এলেন।

এ সময় থেকে প্রতি রাতে তরকারি সহযোগে তিনি দু'তোলা আন্দাজ রুটি খেতে থাকেন। প্রথম দিকে প্রতিদিন ইফতার করতেন। তাপর ইফতার করতেন তিন দিন অন্তর। পরে পাঁচ দিন, ছয় দিন এবং তারও পরে সাত দিন পর পর ইফতার করতেন। আরও পরে অবস্থা এমন হয় যে, একটানা চল্লিশ দিন পর মাত্র একটি বাদামের শাঁস দিয়ে ইফতার করতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি নানাভাবে নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। কখনও একটানা কয়েক বছর ক্ষুধার্ত থেকেছেন, কখনও প্রাণভরে পানাহার করেছেন। প্রথম প্রথম ক্ষুধা-জনিত দুর্বলতা ও আহার-জনিত সুস্থতা অনুভব করতেন। কিন্তু পরে দেখা গেল বিপরীত ব্যাপার। অনাহারে থাকলে সুস্থ ও সবল বোধ করেন। আবার আহার করলেন অসুস্থ ও দুর্বল বোধ করেন।

শাবান মাসের মাহাত্মের কথা জানতে পেরে তিনি ঐ মাসের অধিকাংশ দিনই রোজা রাখতেন। আর পুরো রমযান মাসে মাত্র একদিন একটি বারই আহার করতেন। অন্য দিনগুলোতে দিনের বেলায় রোজা আর রাতে নফল নামাজই ছিল তাঁর খাবার।

একবার তিনি মন্তব্য করেন, পুণ্যবান ও পাপী উভয়ের জন্য তওবা করা ফরজ। তশ্‌তরের এক বিখ্যাত আলেম তাঁর এ মন্তব্যের প্রতিবাদ করে তাঁকে লোক সমাজে হেয়-প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন। তাঁর কার্যকালাপকে শরীয়ত বিরোধী বলে তিনি ফতওয়াও জারি করলেন। দেশের ছোট-বড় সবাইকে তিনি হযরত সহল রহমাতুল্লাহ-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন। অবশ্য তাতে হযরত বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে নিরিবিলি এবাদত বন্দেগী করতে লাগলেন। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে কোনরূপ তর্কে অবতীর্ণ হওয়ার তাঁর প্রবৃত্তি হল না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যারা প্রকৃতি আল্লাহ প্রেমিক, তাঁরা তাঁকেই সমর্থন করলেন।

এক সময় আল্লাহ প্রেমের তরঙ্গ তাঁর মনে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে যে, পার্থিব বিষয়-আশয় সব কিছু তাঁর কাছে আবর্জনা বলে মনে হল। সুতরাং তাঁর যা কিছু ছিল, তার নাম কাগজের টুকরায় লিখে এক জনসভায় শূন্যে উড়িয়ে দেন। ঐ কাগজের টুকরা যে পেল, আর তাতে যে জিনিসের নাম লেখা ছিল, হযরত সহল রহমাতুল্লাহ তাকে তাই দিয়ে দেন। তরপর রিক্ত-হস্তে মক্কা রওনা হন। তিনি তাঁর মনকে বোঝান যে, তিনি এখন নিঃস্ব। সুতরাং তাঁর কাছে আর কোন জিনিসের আশা করা চলবে না।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন, তশ্‌তরের সর্বস্তরের মানুষ যখন কাফের বলে তাঁকে চিহ্নিত করে, তখন মনের দুঃখে তিনি তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে মক্কার পথে বেরিয়ে পড়েন। কুফায় উপনীত হলে তাঁর নফস বলে, এতদিন আমি তো কিছুই চাইনি। এবার আমাকে কিছু রুটি ও মাছ খেতে দিন। তাহলে মক্কায় পৌছানো পর্যন্ত আমি আর কিছুই খেতে চাইব না।

হযরত সহল রহমাতুল্লাহ শহরে পৌছে এক জায়গায় একটা যাঁতাকল দেখতে পান। একটি উট কল টানছে। তিনি কল মালিককে উটের দৈনিক মজুরির কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল দু'দেরহাম। তিনি বললেন, উটের বদলে আমাকে জুড়ে দিন। আর মজুরি বাবত আমাকে এক দেরহাম দেবেন।

কল-মালিক তাই করলেন। উটের বদলে তিনিই যাঁতাকল ঘোরালেন। আর সন্ধ্যার দিকে এক দেরহাম মজুরিও পেয়ে গেলেন। রুটি আর মাছ কেনা হল। খেতে বসে তিনি তার নফসকে বললেন, এরপর কোন কিছু চাওয়ার আগে ভেবে নিও যে, ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চতুষ্পদ জন্তুর মতো খেটেখুটে তবেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

আগেই বলা হয়েছে, হযরত সহল রহমাতুল্লাহ হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর থেকে তিনি কখনই দেওয়ালে পিঠ রেখে দু'পা প্রসারিত করে বসতেন না। একবার তিনি তাঁর পায়ের আঙ্গুলগুলো বেঁধে রাখেন। এক সাধক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আঙ্গুলগুলো ওভাবে বেঁধে রেখেছেন কেন? কোন রোগ-ব্যাধি হয়েছে নাকি? তিনি বললেন, না। কোন রোগ বালাই নেই। তবে ওভাবে বেঁধে রেখেছেন কেন? দরবেশ শুধালেন। হযরত সহল রহমাতুল্লাহ এ কথার কোন জবাব দিলেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঘটনা ক্রমে কিছু দিন পর ঐ দরবেশ মিসরে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ দরবারে যান। গিয়ে দেখেন তাঁর একখানি পায়ের আঙ্গুল বাঁধা রয়েছে। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে যুননুন রহমাতুল্লাহ জানান, চার মাস ধরে তাঁর পায়ে ব্যথা আছে বলে আঙ্গুলগুলো বেঁধে রেখেছেন।

হযরত সহল রহমাতুল্লাহ-এর পায়ের আঙ্গুল বাঁধা ছিল কেন, দরবেশের কাছে এখন তা পরিষ্কার হয়ে যায়। আসলে মুরশিদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার জন্যই তিনি তা করেন। দরবেশ যুননুন রহমাতুল্লাহ-কে ঘটনাটি বললেন। তিনি শুনে বললেন, হ্যাঁ, সহলই আমার একমাত্র মুরীদ, যে পীরের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে ঐ ভাবে তার সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

একবার দেখা গেল, হযরত সহল রহমাতুল্লাহ দেওয়ালে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে বসেছেন, আর বলছেন, যার যা জিজ্ঞেস করার আছে আমাকে বলতে পার। তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ কান্ড দেখে সবাই অবাক হয়ে বললেন, আপনি তো কখনও এভাবে বসতেন না? তিনি বললেন, যতদিন আমার পীর জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্তব্য ছিল। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঐ দিন ভোরেই হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ পরলোক যাত্রা করেছেন।

একবার বাদশহ আমর লাইস এক মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হন। বহু দামী-নামী চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করেন, কিন্তু কোন ফল হল না। শেষ পর্যন্ত বাদশাহর মনে হল, কোন সিদ্ধপুরুষের দোয়ার বরকতে হয়ত তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেন। কিন্তু কোন্ সাধক দরবেশের দোয়া গ্রহণ করা যায়? তাঁর অমাত্য ও মিত্র-বর্গ হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ-এর নাম সুপারিশ করলেন।

অতঃপর তাঁকে রাজঃ-অন্তঃপুরে আহ্বান করা হল। তিনি এসে বসলেন ব্যাধি-কবলিত বাদশাহর রোগশয্যায়। বললেন, একমাত্র তাঁর দোয়া কবুল হতে পারে, যে আল্লাহর কাছে তওবা করেছে। অতএব আপনাকে তওবা করতে হবে। তাছাড়া আপনার বন্দিশালায় অসংখ্য নির্দোষ যেসব বন্দী রয়েছে, তাদের মুক্তি দিতে হবে।

তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছু করা হল। আর হযরত সহল রহমাতুল্লাহ হাত ওঠালেন আল্লাহর দরবারে। দয়াময়, আপনি বাদশাহকে তাঁর কৃত অপরাধের শাস্তি দিয়েছেন। এখন আমার সুপারিশের মর্যাদা দেখান। তওবার দ্বারা আপনি যেমন তাঁর অন্তরকে নির্মল করেছেন, তেমনি আপনার রহমত দ্বারা তাঁর শরীরের ব্যাধিও নির্মূল করুন।

আল্লাহ্ হযরতের দোয়া কবুল করলেন। অনতিবিলম্বে বাদশাহ রোগমুক্ত হলেন। কৃতজ্ঞ, আনন্দিত বাদশাহ অঢেল ধনরত্নতাঁর সম্মুখে পেশ করলেন। কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করলেন না। বরং বাদশাহকে কিছু অমূল্য উপদেশ দান করে বিদায় নিলেন।

পথে যেতে যেতে তাঁর এক শিষ্য বললেন, আপনি যদি কিছুটা ধন গ্রহণ করতেন হুযুর তাহলে তা দিয়ে অন্তত আমার ঋণটা শোধ করতে পারতাম। তিনি বললেন, তোমার যদি ধনের প্রয়োজন হয়, তাহলে আরও ব্যবস্থা আছে। এক্ষুনি দেখতে পাবে। চার দিকে তাকাও। তাঁর কথামত শিষ্য যেদিকে দৃষ্টি দেয়–সামনে পেছনে ডানে বামে দেখতে পায় সব কিছু স্বর্ণ-স্তূপে পরিণত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ যাকে এত ধন দিয়েছেন, সে অন্যের কাছ থেকে ধন নেবে কী প্রয়োজনে?

হযরত সহল রহমাতুল্লাহ অপূর্ব অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আত্মপ্রচার বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি সে শক্তি প্রয়োগ করেননি।

তিনি অনায়াসে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন। তাতে পানিমগ্ন হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর পা পর্যন্ত ভিজত না। এ বিষয়ে কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, শুনেছি,

আপনি নাকি পানির ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারেন? তাঁর উত্তরে তিনি বলেন, মসজিদের মুয়ায্যিনের নিকট জিজ্ঞেস করতে পারেন। তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না।

মুয়ায্যিনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানালেন, এ বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই। তবে একদিন স্নান করতে গিয়ে স্নানাগারের কাছে পা পিছলে তিনি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তখন আমি তাঁর হাত ধরে কোন রকমে বাঁচাই। কিন্তু শেখ আবু আলী বললেন, উনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধক ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য ঢেকে রাখার চেষ্টা করতেন।

এক জ্ঞান-সাধক কোন এক শুক্রবারে জুমআর আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন, একটা বিষধর সাপ কুণ্ডল পাকিয়ে তাঁর পাশে বসে আছে। ভয়ে তাঁর দিকে না এগিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত তাঁকে কাছে যাবার অভয় অনুমতি দিল ভয়ে ভয়েই তিনি গেলেন। হযরত তাঁকে বললেন, যারা আসমানের সূক্ষ্ম-তত্ত্বে ওয়াকিফহাল নয়, তারা পার্থিব বস্তুকে ভয় পায়।

জুমআর সময় আসন্ন হয়ে ওঠেছিল। হযরত তাঁকে বললেন, জুমআর কী ব্যবস্থা করবেন? আগন্তুক বললেন, জামে মসজিদ তো এখান থেকে প্রায় একদিনের পথ। হযরত সহল রহমাতুল্লাহ তখনই তাঁর হাত ধরে নিয়ে চোখের পলকে জামে মসজিদে গিয়ে পৌছালেন।

একবার হজ্জযাত্রার সময় এক নির্জন প্রান্তরে হযরতের সঙ্গে এক বৃদ্ধার দেখা হয়। আর তাঁকে দেখে তাঁর ওপর মায়াও হয়। তিনি তাঁকে কিছু সাহায্য করতে চাইলেন। বৃদ্ধা তখন তার একখানি হাত শূন্যে তুলে মুষ্টি-বদ্ধ করলেন। তারপর বদ্ধ মুষ্টি যখন খুললেন, তখন দেখা গেল, মুষ্টির মধ্যে ঝকঝক করছে সোনার দলা। বৃদ্ধা বললেন, আপনি অর্থ বে'র করেন আপনার পকেট থেকে; আর আমি অর্থ পাই শূন্যে হাত বাড়ালেই। আর এই কথা বলেই তিনি শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। হযরত সহল রহমাতুল্লাহ বৃদ্ধার কথা ভাবতে ভাবতে বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থায় আরাফাতের ময়দানে পৌছালেন। তারপর কাবা ঘরের কাছে গিয়ে দেখলেন, লোকজন কাবা শরীফ তওয়াফ করছে। কিন্তু অন্য একটি দৃশ্য দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, এক বৃদ্ধা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, আর খোদ কাবা ঘর তাকে তওয়াফ করছে। তিনি আর দেরী না করে বৃদ্ধার কাছে চলে এলেন। কাছে গিয়ে সবিস্ময়ে শনাক্ত করলেন, এ সে-ই বৃদ্ধা, মরু-প্রান্তরে যাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল।

তাঁকে দেখে বৃদ্ধা আবার বললেন, যারা কাবা গৃহের সৌন্দর্য্য দর্শনে এখানে আসে, তারা তো কাবা তওয়াফ করবে। কিন্তু যারা কাবার মাধ্যমে আল্লাহর সৌন্দর্য্য ও কুদরত অবলোকন করতে আসে, তাদেরকে তওয়াফ করা তো কাবাগৃহের জন্যই শোভনীয়।

একজন আবদালের সঙ্গেও হযরত সহল রহমাতুল্লাহ-এর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবদাল থাকতেন পানির ভেতরে। মুয়াযযিন যখন আযান দিতেন, তখন তিনি পানির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে জামাআতে নামাজ পড়তেন। নামাজ শেষ হলেই আবার চলে যেতেন পানির তলায়। অথচ তাঁর শরীরে কখনও পানির চিহ্ন দেখা যেত না। আর তিনি কখনও কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। পানাহার করতেও কখনও তাঁকে দেখা যায়নি। তিনি শুধু কথাবার্তা বলতেন হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহর সঙ্গে। দুর্জ্ঞেয় মারেফত-তত্ত্ব নিয়ে তাঁদের আলাপ-আলোচনা চলত। হযরত সহল রহমাতুল্লাহ আল্লাহর প্রশস্তিমূলক গজল শুনে ভাবোন্মত্ত হয়ে যেতেন। তাঁর শরীর থেকে ঘাম নির্গত হত। এ সময় তাঁকে কেউ কোন প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, এখন আমি যা বলব, তা শুনে তোমাদের কোন উপকার হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গরমের দিন। তিনি বসে আছেন এক মসজিদে। হঠাৎ একটা পায়রা ক্লান্ত পাখা গুটিয়ে ঝপ করে পড়ে গেল মসজিদ প্রাঙ্গণে। এ দৃশ্য দেখামাত্র তিনি বলে উঠলেন, কেরমানের বাদশাহ সম্ভবতঃ ইন্তেকাল করেছেন। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিনি যখন মন্তব্য করেছেন, ঠিক তখনই বাদশাহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শোনা যায়, বনের হিংস্র প্রাণীরাও তাঁর কাছে যাতায়াত করত। তিনি তাদের আদর-যত্ন করতেন। অনেক সময় খেতেও দিতেন। এই জন্য অনেকে তাঁকে বাইতুস সাবা (হিংস্র জন্তুর আশ্রয়স্থল) বলত।

একবার তিনি তাঁর এক শিষ্যকে বললেন, এখন থেকে সারারাত আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দটি মুখে উচ্চারণ করতে থাক। শিষ্য তা-ই করতে লাগলেন। যখন সেটি তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, এখন থেকে সারারাত আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে থাক। মুরীদ তাঁর এ আদেশও পালন করলেন। আর এখন তাঁর আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। এমনকি, ঘুমের মধ্যেও তিনি এই যিকির করতে লাগলেন।

তারপর হযরত সহল রহমাতুল্লাহ বললেন, আর মুখে শব্দ নয় বরং এখন থেকে তুমি মনে মনে আল্লাহর যিকির কর। মুরশিদের নির্দেশক্রমে তিনি তাই করতে লাগলেন। দিনরাত তাঁর হৃদয়ে আল্লাহর যিকির অব্যাহত রইল। একদিন ঘরে বসে তিনি আল্লাহর নামে যিকির করছেন, হঠাৎ ঘরের ছাদ থেকে তাঁর মাথায় একখণ্ড খারী কাঠ পড়ে মাথা কেটে রক্তপাত হয়ে গেল। আর সেই রক্ত থেকে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির ধ্বনি ওঠতে লাগল।

একদিন তিনি তাঁর এক শিষ্যকে জানালেন, বসরা শহরে এক রুটিওয়ালা সিদ্ধি লাভ করেছে। তুমি তার কাছে গিয়ে তোমার ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে পার। মুরশিদের কথা শুনে মুরীদ বসরায় রুটিওয়ালার কাছে গেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, খদ্দেরকে ওজন কম দেবার জন্য অন্যান্য রুটির মালিক দাঁড়িপাল্লায় যে কৌশল করে রাখে, এ রুটিওয়লার পাল্লায়ও অনুরূপ কৌশল রয়েছে। আর তা দেখে তাঁর ওপর তিনি রীত-শ্রদ্ধ হলেন। তাঁর মনে হল, এ যদি সিদ্ধ পুরুষই হত, তাহলে কখনই এমন কৌশল অবলম্বন করত না এবং এতদূরে যখন এসেছ, তখন একটু আলাপ করতে দোষই বা কী। তিনি তাকে সালাম জানালেন দু'একটি প্রশ্নও করলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে রুটিওয়ারা বলল, আপনি যখন প্রথমেই আমার ওপর থেকে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছেন, তখন আমার কোন কথাই আপনার আর ভালো লাগবে না। অতএব যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যান।

হযরত সহল রহমাতুল্লাহ একবার স্বপ্ন দেখলেন, কিয়ামত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে হাশরের মাঠে। এমন সময় দেখা গেল, একটি সাদা পাখী হঠাৎ নেমে এসে এক একটি লোককে ধরে জান্নাতের দিকে নিয়ে চলেছে। হযরত সহল রহমাতুল্লাহ বলে ওঠলেন, এ কোন্ পাখী? তখন কে যেন বলল, আল্লাহ্ পাক তাঁর নিজস্ব রহমতকে সাদা পাখীর রূপে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হযরত সহল রহমাতুল্লাহ দেখলেন, এ সময় একখন্ড কাগজ যেন কোত্থেকে উড়ে এসে তাঁর সামনে পড়ল। তিনি কাগজখানি কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে, এ পাখীর নাম তরকে দুনিয়া অন্য কিছু নয়।

তিনি আর একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তিন জন লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হচ্ছে। তিনি তাঁদের সালাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, পৃথিবীতে আপনাদের সর্বাপেক্ষা ভয়ের বস্তু কী ছিল? তাঁরা তিন জনেই সমস্বরে বললেন, ঈমানের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাসটি পড়ে কিনা।

একবার তিনি ইবলীসকে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে সবচেয়ে দুর্বোধ্য কি? সে উত্তর দেয়, তার কাছে দুর্বোধ্য বলে কিছু নেই। তবে আল্লাহর সঙ্গে তাঁর বান্দার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আন্তরিক ইঙ্গিত-ইশারায় যে যোগাযোগ ও কথাবার্তা হয়, তা তার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য।

হযরত সহল রহমাতুল্লাহ বলেন, তিনি একবার কতগুলো লোকের মধ্যে ইবলীসকে দেখতে পেয়ে বেশ সাহস করে তাকে বন্দী করে ফেলেন। একটু পরে লোকজন চলে গেলে তাকে বললেন, তুমি আল্লাহ্ পাকের তওহীদ সম্পর্কে কিছু না বললে তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না। উপায়ান্তর না দেখে সে ও তওহীদ সম্পর্কে এমন বর্ণনা দেয়, যাতে তার অন্তহীন জ্ঞান ও যুক্তির পরিচয় মেলে। সে বর্ণনা শুনে মনে হয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীগণও বিস্ময় প্রকাশ না করে পারতেন না।

হযরত সহল রহমাতুল্লাহ বলেন, খাবারের বদলে শরাব পান করে পেট ভরানো একদিক দিয়ে অনেক ভালো। তাঁর এ মন্তব্যের তাৎপর্য হিসাবে তিনি বলেন, শরাব পান করে পেট ভরলে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেচনা লোপ পায়। তখন মানুষ তার হাত ও রসনার ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু পেট পুরে খাবার খেলে হালাল খাবারও যদি হয়–রিপু প্রবল হয়, বাসনা তীব্র হয়। তখন নফস নিজের ইচ্ছা পুরণে উন্মুখ হয়ে ওঠে। আর সেই ব্যক্তির দ্বারা অন্যের ক্ষতি সাধন সম্ভব হয়।

হযরত সহল রহমাতুল্লাহ-এর অমূল্য উপদেশ ঃ

১. উদর পূর্তি করে পানাহার করলে তা প্রবৃত্তির লালসাকে চরম মাত্রায় পৌঁছে দেয়। আর তখন মন্দ রিপুগুলো তাদের ইচ্ছা পূরণে ওঠে-পড়ে লেগে যায়।

২. হালাল খাদ্যের অনুপস্থিতি এবাদতের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটায়।

৩. হালাল রুজি অর্জন করা আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

৪. পুণ্য কর্মের চর্চা ও এবাদতের বিশুদ্ধতা রোজা রাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রোজা, দারিদ্র্য, বিনয়, আত্মতুষ্টি ও এবাদতে স্বাদ এনে দেয়। রোজাদার ব্যক্তিকে শয়তান প্রতারিত করতে পারে না। বরং তার থেকে দূরে সরে যায়।

৫. অবৈধ আহার সাতটি অঙ্গকে পাপী করে তোলে। যথা চোখ, কান, জিভ, পেট, হাত, পা ও গুপ্তস্থান। অবৈধ খাদ্য গ্রহণকারী স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পাপ করে। অপর দিকে বৈধ খাদ্য উল্লিখিত অঙ্গগুলোকে পুণ্য কর্ম ও এবাদতের দিকে এগিয়ে দেয়।

৬. যে আল্লাহর এবাদত করে না, সে মানুষের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়।

৭. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর দ্বারা মনের শান্তি বিধান নিষিদ্ধ। কেননা, এ ধরনের মন থেকে ঈমানের গন্ধও উবে যায়।

৮. আলেমগণ তিন শ্রেণীর। যথা ঃ (১) জাহেরী আলেম–যাদের পাণ্ডিত্য প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে প্রকাশিত হয়। (২) বাতেনী আলেম বা তত্ত্বজ্ঞানী–যাদের পাণ্ডিত্য সূক্ষ্ম-তত্ত্বদর্শীদের কাছে প্রকাশ পায়। (৩) এক শ্রেণীর আলেম আছেন, যাদের পাণ্ডিত্যের সন্ধান একমাত্র আল্লাহই রাখেন, আর কেউ নয়।

৯. আমাদের মূলনীতি ছয়টি। যথা ঃ (১) কোরআন পাককে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা, (২) রাসূলুল্লাহর সুন্নত পালন করা, (৩) বৈধ খাবার খাওয়া, (৪) কেউ কষ্ট দিলেও তাকে কষ্ট না দেওয়া (৫) অবৈধ বস্তু থেকে দূরে থাকা ও (৬) অন্যের হক যথা শীঘ্র সম্ভব পরিশোধ করা।

১০. আমাদের ধর্মের মূল বিষয় তিনটি। যথা ঃ (১) রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপের অনুসরণ করা। (২) বৈধ খাবার খাওয়া ও (৩) যাবতীয় কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পন্ন করা।

১১. নিজস্ব-তা পরিত্যাগ করা ও নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে তুচ্ছ ভাবাই হল বান্দার দাসত্ব স্বীকারের প্রথম স্তর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১২. দু'টি বিষয় মানুষের বিনাশের মূল কারণ। যথা ঃ (১) সম্মানলিপ্সা ও দারিদ্র্য-ভীতি।

১৩. পাঁচটি জিনিস আত্মার পক্ষে মুক্তা-সদৃশ। যথা ঃ (১) দরিদ্র হলেও মনকে ধনী রাখা। (২) চিন্তা-ভাবনা থাকলেও মনকে প্রফুল্ল রাখা। (৩) কারও সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও তার সাথে বন্ধুর মতো ব্যবহার করা। (৪) ক্ষুধার্ত হয়েও মনকে তৃপ্ত রাখা। (৫) রাতভর এবাদত ও দিনভর রোজা আদায় করা সত্ত্বেও নিজেকে সুস্থ সবল ব্যক্তির মতো প্রকাশ করা।

১৪. আল্লাহর সঙ্গে বান্দার গভীর সম্পর্কের পথে প্রধান অন্তরায় হল বান্দার মনে অহঙ্কারের অস্তিত্ব। আর বান্দার হৃদয়ে বিনয়ের অস্তিত্ব আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের গাঢ়ত্ব সৃষ্টি করে।

১৫. আরশ থেকে জমিন পর্যন্ত বিশ্বাসী মানুষের অন্তর অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ স্থান আল্লাহ্ আর সৃষ্টি করেননি। কেননা, বিশ্ব সৃষ্টির জন্য আল্লাহর মারেফত অপেক্ষা উত্তম বস্তু আর সৃষ্টি হয়নি। আর মানুষের অন্তরই হল মারেফতের প্রকাশ স্থল।

১৬. আল্লাহ্ ব্যতীত সাহায্যকারী নেই, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছাড়া সৎ পথপ্রদর্শক নেই এবং ধর্মনিষ্ঠা ছাড়া কোন সম্বল নেই।

১৭. যে নিজের আত্মাকে চিনেছে, সে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে। সে আনন্দ ও বিষাদের সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে।

১৮. তওবার প্রথম পর্যায় হল ধর্মের ডাকে সাড়া দেওয়া। দ্বিতীয় পর্যায় হল সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দিকে নিবিড় হওয়া। কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করে আল্লাহর অস্তিত্বের কাছে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া। নিজ অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

১৯. আত্ম-সমর্পণ ছাড়া তাওয়াক্কুল হয় না। সব রকমের কলা-কৌশল পরিত্যাগই হল আত্ম-সমর্পণ। তাওয়াক্কুলের চিহ্ন তিনটি। যথা ঃ (১) কারও কাছে কোন কিছু প্রার্থনা না করা, (২) কেউ কোন জিনিস দিলে তা গ্রহণ না করা, (৩) গ্রহণ করলেও তা খরচ করা বা দান করে দেওয়া।

২০. তাওয়াক্কুলকারী তিনটি জিনিস পায়। যথাঃ (১) অজানা বিষয়ের জ্ঞান, (২) মারেফতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও (৩) আল্লাহর দীদার।

২১. আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্বের অর্থ হল, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকা। আর তাওয়াক্কুলের অর্থ হল তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

২২. প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখাই হল দুনিয়াত্যাগের প্রথম সোপান। দুনিয়া ত্যাগ হল তাওয়াক্কুলের প্রথম সোপান। প্রবৃত্তির আকাঙ্খা পরিত্যাগ করা হল আত্মতুষ্টি। আর সেটাই হল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের প্রথম সোপান।

২৩. নফসের চেয়ে কোন্ জিনিস বেশী কঠিন?

তাঁর উত্তর ঃ প্রত্যেক কাজে বিশুদ্ধতা বজায় রাখা। আল্লাহর আদেশ মাথা পেতে বরণ করার নামই বিশুদ্ধতা।

২৪. চারটি বস্তুর মধ্যে মুক্তি নিহীত। যথা, (১) অনিদ্রায় সময় কাটানো, (২) একাকী বসবাস করা, (৩) অল্প আহার করা ও (৪) চুপ করে থাকা। এক ব্যক্তির উপদেশ প্রার্থনায় তিনি কথাগুলো বলেন। সে যখন তাঁর সাহচর্য কামনা করে, তখন তিনি বললেন, আমি মরে গেলে তুমি কার সাহচর্যে থাকবে? সে বলল, আল্লাহর সাহচর্যে।

২৫. নফসকে চিনতে না পারলে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া কঠিন। অর্থাৎ মন্দ প্রবৃত্তির তাড়নার প্রতি সজাগ না থাকলে আল্লাহর পথে চলা একেবারেই অসম্ভব। মানুষের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মন্দ প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা তিনটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। (১) ধর্ম-ভ্রষ্ঠতা, (২) কপটতা ও (৩) শঠতা।

২৬. সৎ স্বভাবের সর্বনিম্ন স্তর হল মানুষের দেওয়া কষ্ট সহ্য করা ও কেউ অপকার করলে তাকে ক্ষমা করা। তাছাড়া আল্লাহর দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আল্লাহর কাছে এ ধরনের মোনাজাত করতেন–

হে দয়াময়! আমি তো একেবারেই অধম, নগণ্য, তবুও যে আপনি আমাকে স্মরণ রেখেছেন, এটি আমার জন্য অপার খুশী ও আনন্দের কথা।

তাঁর অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন হয়ে ওঠলে তাঁকে জিজ্ঞস করা হল, তাঁর অবর্তমানে কে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন? কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা ও উপদেশ দেবেন? তখন তাঁর কাছে রয়েছেন চারশ' মুরীদ। সুতরাং প্রতিনিধিত্বের সৌভাগ্য কার হয়, এটা জানার জন্য তখন সবাই উদ্‌গ্রীব। সকলের মানসিক চাঞ্চল্য ও হৃদস্পন্দন থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, অগ্নিপূজক দিলশাদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর সেই তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাষণ ও উপদেশ দেবে।

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। কেননা, তিনি যা বললেন তা অকল্পনীয়। কারও মুখে কথা নেই। সবাই ভাবছেন, রোগ-ব্যাধির কারণে হয়ত বা তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন তিনি নিজেই। বললেন, তোমরা চুপচাপ কেন? যাও, তাকে ডেকে নিয়ে এস। মুরশিদের আজ্ঞা অমান্য করার উপায় নেই। দিলশাদকে ডেকে আনা হল। তিনি তাকে বললেন, আমার মৃত্যুর তিন দিন পরে যোহরের নামাজের পর এই মিম্বরে বসে ধর্মোপদেশ দেবে। আর এ কথা বলার পরই তিনি পার্থিব জীবন থেকে বিদায় নিলেন।

হযরত সহল রহমাতুল্লাহ-এর নির্দেশমতো নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে দিলশাদ এসে মিম্বরে বসলেন। পরনে তাঁর জাতীয় পোশাক। প্রচুর জনসমাগম। দিলশাদ জনগণের উদ্দেশে বললেন, আপনাদের নেতা আমাকে তাঁর প্রতিনিধি নির্বাচিত করে বলে গিয়েছেন, তোমার অগ্নি-উপাসনার দিন শেষ হয়েছে। এই বলে তিনি তাঁর পোশাক ও পৈতা খুলে ফেললেন। পরে নিলেন ইসলামী লেবাস। তারপর কালেমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, হযরত সহল রহমাতুল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন আপনাদের নসীহত করতে। আর সে আদেশ পালন করা আমার একান্ত কর্তব্য। সুতরাং আপনারা আমার কথা শুনুনঃ

এখন দিলশাদ তার জাহেরী পৈতা খুলে ফেলে আপনাদের বেশ ধারণ করেছে। আপনারাও যদি হাশরের মাঠে আপনাদের মুরশিদের পুনর্মিলনের আশা করেন, তাহলে আপনাদের বাতেনী পৈতা কেটে ফেলুন। বিস্মিত শ্রোতাবর্গ তার কথা শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেললেন।

শোনা যায়, হযরতের শবযাত্রায় অসংখ্য লোক সমবেশ হয়। মানুষের বিরহ কান্না ও শোকের মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি দেখে একজন ইহুদী তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আমি যা দেখছি আপনারাও কি তা দেখতে পাচ্ছেন? সবাই জিজ্ঞেস করে, কী দেখছেন আপনি? তিনি বলেন, আমি দেখছি, আকাশ থেকে দলে দলে ফেরেশতা নেমে এসে শোক মিছিলে শামিল হচ্ছে। আর এ কথা বলে তৎক্ষণাৎ তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

একদিন হযরত সহল রহমাতুল্লাহ সশিষ্য বসে আছেন। হঠাৎ এক লোক তাঁর সভায় এসে পড়ে। তিনি বললেন, ঐ লোকটি মারেফতের কিছু খবর রাখে। তাঁর কথা শুনে লোকজন তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া মাত্র তিনি চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একদিন এক লোক হযরত সহল রহমাতুল্লাহ-এর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল! একজন মুরীদ লোকটিকে চিনতে পেরে কবর দেখিয়ে বললেন, এখানে যিনি শুয়ে আছেন, বেঁচে থাকাকালীন তিনি আপনাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, আপনি মারেফতের কিছু খবর রাখেন। যে আল্লাহ আপনাকে মারেফতের জ্ঞান দিয়েছেন, তাঁর শপথ, দয়া করে আমাদের কিছু অলৌকিকতা দেখান।

লোকটি তখন কবরের দিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠলেন, হে সহল! কথা বলুন। সঙ্গে সঙ্গে কবর থেকে শব্দ এল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লোকটি আবার বললেন, বলা হয়ে থাকে–এ কালেমা পাঠকারীর কবর কখনও অন্ধকার হয় না। এ কথা কি ঠিক? কবর থেকে উত্তর এল, হ্যাঁ।

হযরত সাররী সাতকতী রহমাতুল্লাহ

ইতিহাসের অনন্য বিখ্যাত শহর বাগদাদ। সেই বাগদাদের এক বাজারে একদিন আগুন লাগল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল আলো ঝলমল পণ্য বিপণি। শুধু একটি ফলের দোকানের কিছুই হল না। সম্পূর্ণ অক্ষত রইল। দোকানের মালিক তখন দোকানে ছিলেন না। তবে তিনি ধরে নিয়েছিলেন, তাঁর দোকানও বেঁচে নেই। কিন্তু যখন জানা গেল তাঁর ফলের দোকানের কোন ক্ষতি হয়নি, তখন তিনি বললেন, যাক, আল্লাহর অনুগ্রহে আমি বেঁচে গিয়েছি।

কিন্তু তাঁর মুখের এই কথাটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্ততঙ্গায়িত হয়ে গেল। এল, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো তাঁর মনের পরিবর্তন। যার অনুগ্রহে তিনি আজ রক্ষা পেয়েছেন, তাঁরই পথে বেরিয়ে পড়লেন দোকানের যাবতীয় ফল-সম্ভার দীন-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে।

এই মহাভাগ্যবান ফল বিক্রেতা হলেন হযরত সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ। একজন সিদ্ধকাম সাধক। সাধনার পথে সংযম, কৃচ্ছ্রতা ও সংগ্রামের তিনি যে স্বাক্ষর রেখেছেন, তার কোন তুলনা নেই। এই মহান তাপস একাধারে ছিলেন জ্ঞানের সাগর মায়া-মমতার নিত্য প্রবহমান নির্ঝরিণী।

হযরত সাররী রহমাতুল্লাহ ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। আর প্রখ্যাত সাধক হযরত মা'রূফ কারখী রহমাতুল্লাহ ছিলেন তাঁর মুরশিদ। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ ছিলেন তাঁর ভাগিনেয়। স্বনামধন্য সাধক হযরত হাবীব রায়ীর রহমাতুল্লাহ সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাত হয়। তাঁর কাছ থেকেও তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন।

আরবী 'সকত' শব্দের অর্থ হল মাটিতে পড়া। প্রথম জীবনে তিনি মাটিতে পড়া ফল কুড়িয়ে বাজারে বিক্রি করতেন। আর এই থেকে তাঁর নাম হয় সাকতী। আমরা আগেই বলেছি, বাগদাদের বাজারে তাঁর একটি ফলের দোকান ছিল। সামনে একখানি পর্দা টাঙিয়ে দিয়ে দোকানেই তিনি দৈনিক হাজার রাকাআত নামাজ পড়তেন। একবার লাগাস পাহাড়ী এলাকা থেকে এক ব্যক্তি এসে দোকানের পর্দা তুলে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, লাগাস এলাকার অমুক পীরজাদা আপনাকে সালাম দিয়েছেন। হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ জবাব দেন, পাহাড়ী এলাকার লোক হয়ে তিনি কোন বীরত্বের কাজ করেননি। বরং বীরত্বের কাজ হল জনবসতি এলাকায় বসবাস করা, মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংস্রব রেখে অন্তরে আল্লাহকে এমনভাবে জাগরূক রাখা, যেন মুহূর্তের তরেও তাঁকে ভুলে না যাওয়া হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যবসায়ী হলেও অতিরিক্ত মুনাফা লাভের বিরোধী ছিলেন তিনি। দশ দীনার বিক্রি করে লাভ করতেন মাত্র আধ দীনার। একবার ষাট দীনার দামে বাদাম কিনলেন। আর তারপরেই বাদামের দাম দারুণ বেড়ে গেল। এ সময় এক দালাল এসে জানতে চাইল, তিনি তাঁর বাদাম বিক্রি করবেন কিনা। তিনি বাদামের দর জিজ্ঞেস করলেন। দালাল জানাল, বাদামের দর এখন নব্বই টাকা। বাদামের দাম শুনে হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ বললেন, আমার নিয়ম হচ্ছে, প্রতি দশ দীনারে আধা দীনার লাভ করা। দালাল বলল, কিন্তু বাজার দর অপেক্ষা কম দামেও তো আমি বাদাম কিনতে পারি না। হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ বললেন, তাহলে আমারও কিছু করার নেই। আমি আমার নীতি বিসর্জন দিয়ে এত চড়া দামে বাদাম বিক্রি করতে পারি না। অর্থাৎ বাদাম তাঁর ভাণ্ডারেই রইল, কেনা বেচা হল না।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার সাধনা পথের সূচনা কিরূপ ছিল? হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ জবাব দেন, একবার মহান তাপস হাবীব রায়ী রহমাতুল্লাহ তাঁর দোকানে আসেন। তিনি তাঁর হাতে কিছু পণ্যদ্রব্য তুলে দিয়ে অনুরোধ করেন, আপনি এগুলো দরবেশগণের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন। হযরত হাবীব রহমাতুল্লাহ বললেন, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। আর এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন থেকে পার্থিব লোভ-লালসা দূরীভূতঃ হয়।

একদিন দোকানে আসেন মুরশিদ হযরত মা'রূফ কারখী রহমাতুল্লাহ। তাঁর সঙ্গে ছিল এক অনাথ বালক। তিনি ছেলেটিকে একখানি কাপড় দিতে বলেন। তিনি তখনই কাপড় দিয়ে দিলেন। আর মুরশিদ দোয়া করলেন, আল্লাহ করুন, দুনিয়া যেন তোমার শত্রু হয়ে যায়। দুনিয়াদারীর কর্মব্যস্ততা ও আসক্তি থেকে তিনি তোমাকে মুক্তি দিন। পীরের দোয়ার বরকতে ঐদিন থেকে দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সমকালের তিনি এক শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ বলেন, হযরত সাররী সাকতী অপেক্ষা বড় সাধক ও আবেদ আর কাউকে দেখিনি। দীর্ঘ আটানব্বই বছরের মধ্যে তিনি কখনও মাটিতে পিঠ লাগাননি। কখনও কখনও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসতেন এবং এভাবেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। অবশ্য মৃত্যুর আগে অসুস্থ অবস্থায় কিছু দিনের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর অমূল্য উপদেশ ঃ

১. চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার মধু পানের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ইচ্ছা পূরণ করিনি। প্রতিদিন বার কয়েক আয়নায় আমার চেহারা দেখতাম। পাপের কালিমা চেহারায় ফুটে ওঠছে কিনা তা দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যা দেখে আমি সাবধান হতে পারি।

সালামের উত্তর দেবার সময় তিনি তাঁর চেহারাকে কিছুটা অস্বাভাবিক করে ফেলতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হাদীস শরীফে আছে, সালাম আদান-প্রদানকারীর প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে একশ রহমত অবতীর্ণ হয়। তবে তার নব্বইটি রহমত লাভ করে সে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে যার চেহারা হর্ষোৎফুল্ল থাকে। এই হাদীসের মর্ম অনুযায়ী আমি আমার প্রতি সালাম দাতাকে অধিক রহমতের ভাগী করতে সালাম বিনিময়ের কালে আমার মুখ খানিকে অমন করি।

এক রাতে তিনি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি আল্লাহর সঙ্গে পূর্ণ প্রেম অক্ষুণ্ন রেখেও কী করে পুত্র ইউসুফ (আঃ)-কে এতে ভালোবাসলেন?

এরূপ প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে এক অদৃশ্য বাণী শোনা গেল, হে সাররী সাকতী! আদব রক্ষা করে কথা বলতে হয়। এরপর এক রাতে তিনি পুনরায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্বপ্নে দেখেন। সে সময় তাঁর অন্তরে এমন এক ভাবের সৃষ্টি হয় যে, বিকট চীৎকার করে বেহুঁশ হয়ে পড়েন। আর তা তেরো দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপরে চেতনা ফিরে এলে আবার আকাশ বাণী শোনেন ঃ হে সাররী সাকতী! স্মরণ রেখো, যে আমার বন্ধুদের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করে, তার এমন দশাই হয়।

একবার তিনি এক আল্লাহ-প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তর দেন, হুওয়া (অর্থাৎ তিনি)। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনি পানাহার করেন কি? এবারও তিনি একই উত্তর দিলেন, হুওয়া (অর্থাৎ তিনি)। এভাবে প্রতি প্রশ্নের জবাবে তিনি যখন হুওয়া বলতে লাগলেন, তখন হযরত সাররী রহমাতুল্লাহ বললেন, হুওয়া বা তিনির মর্ম কি আল্লাহ্? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে তিনি এমন চীৎকার করে ওঠলেন যে, তাতেই তাঁর পবিত্র আত্মা দেহের খাঁচা থেকে বে'র হয়ে তাঁর পরম বন্ধু আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেল।

হযরত সাররী রহমাতুল্লাহ একবার হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-কে ভালোবাসার অর্থ জিজ্ঞেস করেন। বাগদাদী রহমাতুল্লাহ বললেন, কেউ কেউ সদৃশ বস্তুর দ্বারা আবার কেউ কেউ সাঙ্কেতিকতার মাধ্যমে ভালোবাসার অর্থ প্রকাশ করেছেন। বাগদাদীর রহমাতুল্লাহ কথা শোনার পর তিনি নিজের একখানি চামড়া ধরে সজোরে টানতে থাকেন। কিন্তু সে চামড়া স্ব-স্থান থেকে ওঠানো গেল না। তখন তিনি বললেন, আমি যদি একথা বলি যে, কেবল ভালোবাসার কারণেই আমার চামড়া এভাবে শুকিয়ে গেছে, সম্ভবতঃ তা নির্ভুল হবে না। একথা বলেই তিনি জ্ঞান হারালেন। কিন্তু এ সময় তাঁর পবিত্র চেহারা ঝকঝকে চাঁদের মত ঝলমল করে ওঠল।

ভালোবাসা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ বলেন, ভালোবাসা মানুষকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যখন মানুষ তরবারির আঘাতের যন্ত্রণাও অনুভব করে না। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বলেন, ঐ দিনটি পূর্বে আমি সত্যিই ভালোবাসার সংজ্ঞা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলাম। সেদিন থেকে আল্লাহ্ আমাকে ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ জানিয়ে দিয়েছেন।

যখন তিনি বুঝতে পারতেন, কোন লোক তাঁর কাছে বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে এসেছে, তখন আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করতেন, হে দয়াময়! আপনি তাকে এমন বিদ্যা দান করুন যেন তাকে আমার মুখাপেক্ষী হতে না হয় এবং এদের দ্বারা আমার এবাদতের বিঘ্ন না ঘটে।

কোন লোক একটানা ত্রিশ বছর এবাদতে অতিবাহিত করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। সেটি কিভাবে লাভ করেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি একবার হযরত সাকতীর রহমাতুল্লাহ দরজায় করাঘাত করি। ভেতর থেকে প্রশ্ন আসে, আপনি কে,? আমি জবাব দিই, আপনার এক পরিচিত ব্যক্তি। একথা শুনে তিনি দোয়া করেন, হে প্রভু! তুমি তাঁকে এমন কর, যেন আপনি ছাড়া কারও সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকে। আর সেদিন থেকেই আমার মর্যাদা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেল। আমি ওঠে এসেছি বর্তমান পর্যায়ে।

এক ধর্মসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন হযরত সাররী রহমাতুল্লাহ। ঐ সময় খলীফার সভাসদ আহমদ ইবনে ইয়াজীদ বহু অনুচরসহ সভার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ধর্মীয় সভা দেখে তিনি তাঁর সাথীদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে সভায় চলে এলেন। হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ তখন বলে চলেছেন, আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষের চেয়ে দুর্বল কিছু নেই। আবার মানুষের মতো অবাধ্য জীবও আর নেই। হায় রে মানুষ! এমন দুর্বল অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর অবাধ্যতা করছ। বক্তার এই বাক্যটি যেন তীরের মতো ইয়াজীদের বুকে বিদ্ধ হয়। হঠাৎ তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তারপর অচৈতন্য হয়ে

www.AmarIslam.com

পড়ে যান। চেতনা যখন ফিরে এল, তখনও কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বাড়ী ফিরলেন। সেদিন আর কিছুই খেলেন না। কারও সাথে কথাও বললেন না। পরদিন বিষণ্ন-চিত্তে গিয়ে দাঁড়ালেন হযরত সাররী রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। দরবারে তখন আলাপ-আলোচনা চলছিল। তা শেষ হবার পর তিনি সবিনয়ে হযরতকে বললেন, আপনার গতকালের ভাষণে আমার অন্তর বিগলিত। আপনি আমার পার্থিব আনন্দ আর উৎসব নিরানন্দ করে দিয়েছেন। এখন আমি নির্জনতা কামনা করছি এবং মানুষের সংস্পর্শ ত্যাগ করে নিরিবিলি পরিবেশ চাইছি। প্রার্থনা, আপনি আমাকে আল্লাহর পথ ধরিয়ে দিন।

হযরত বললেন, পথ দু'রকমের। একটি সাধারণ পথ—শরয়ী। তা হল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রোযা রাখবে, আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে যাকাত দেবে, হজ্জ আদায় করবে। আর দ্বিতীয় পথ হল বাতেনী বা বিশেষ পথ। তা হল, দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হও। দুনিয়ার কোন আরামের প্রতি দৃষ্টি দেবে না। এমনকি তা তোমার হাতের মুঠোয় এলেও ছুঁড়ে ফেলবে।

আহমদ ইবনে ইয়াজীদের পার্থিব মোহ-মুক্তি ঘটে সম্পূর্ণরূপে। হযরত সাকতীর রহমাতুল্লাহ নির্দেশিত দ্বিতীয় পথই তিনি গ্রহণ করেন। একদিন জমকালো পোশাক ছুঁড়ে ফেলে মোটা কম্বল আর চটের পোশাক পরে নির্জন বনে চলে যান।

বেশ কিছু দিন কেটে গেল। একদিন আহমদ ইবনে ইয়াজীদের বৃদ্ধা জননী বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, কাঁদতে কাঁদতে চলে এলেন হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। আমার একমাত্র সন্তান। আপনার সংস্পর্শে এসে কোথায় যেন বিরাগী হয়ে চলে গেল। আর খবর নেই। বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না। দয়া করে তার একটু খোঁজ দিন।

হযরত সাররী রহমাতুল্লাহ পুত্র বিরহ-কাতর জননীকে প্রচুর প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার পুত্র সৌভাগ্য-ক্রমে সত্য ও খাঁটি পথ অবলম্বন করে পৃথিবীর মোহ ত্যাগ করেছে। নিশ্চয় তার কোন বিপদ ঘটেনি। সে যথাসময়ে আমার এখানে আসবে। আমি তখন আপনাকে খবর পাঠাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

অনেক দিন পর আহমদ ইবনে ইয়াজীদ সত্যিই হযরত সাকতীর রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে এসে হাজির হলেন। আর প্রতিশ্রুতিমতো তিনি তাঁর বৃদ্ধা জননীর কাছে খবর দিলেন। আহমদ তখন ভীষণ কৃশ আর দুর্বল—অস্থি কঙ্কালসার। তিনি হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, আপনি আমার অলস ঘুম ভাঙ্গিয়ে যেভাবে কৃতার্থ করেছেন, তার কোন বিনিময় দিতে আমি সক্ষম নই। আল্লাহ্ পাকের দরবারে বলেছি, তিনিই আপনার পুরস্কার প্রদান করুন।

দুই মহাত্মার মধ্যে কথাবার্তা চলছে। এমন সময় এসে পড়লেন আহমদ জননী। সঙ্গে সন্তানসহ তাঁর স্ত্রী। তাঁরা দেখলেন, একজন জরাজীর্ণ মানুষ। নীরক্ত, বিবর্ণ। শরীর ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। পরনে শতচ্ছিন্ন পোশাক। মাথার চুল অবিন্যস্ত। পুত্রের দুর্দশা দেখে জননী আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে বুকে জড়িয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল স্ত্রী ও সন্তান। তার সে কান্না সংক্রমিত হল সারা দরবারে। স্বয়ং হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ ও অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

পুত্রকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য মা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইবনে ইয়াজীদ আর ঘরে ফিরে যেতে চাইলেন না। আহমদের স্ত্রী তাঁর পুত্র সন্তানটিকে স্বামীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি ফিরতে না চান, আপত্তি নেই। কিন্তু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবনে ইয়াজীদ তখন হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, আপনি কেন আমার চলার পথে এ অন্তরায় সৃষ্টি করলেন? আপনি এদের খবর না দিলে তো আমি এমন বিপাকে পড়তাম না।

আহমদ ইবনে ইয়াজীদের স্ত্রী বললেন, আপনি বর্তমান থাকতে আমাকে বিধবা করেছেন করুন। কিন্তু এই মাসুম ছেলেটিকে অনাথ করতে চলেছেন, এ কেমন বিচার? দয়া করে তাকে সাথে নিন। না হলে এর বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর স্থির থাকতে পারব না।

এবার আহমদ বললেন, তাই হবে। আমি একে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি। এই বলে তিনি তার পরনের পোশাক খুলে নিয়ে পরিয়ে দিলেন এক টুকরো পুরু কম্বল। হাতে দিলেন একটি থলে। তারপর তাকে নিয়ে দরবার ত্যাগ করলেন। এই দৃশ্য দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না আহমদ জননী। কাজ নেই তোমার কলজের টুকরোকে সঙ্গে নিয়ে– বলে তিনি তাঁর আদরের পৌত্রকে পিতার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন।

আবার বনে গেলেন আহমদ ইবনে ইয়াজীদ।

এই ঘটনার কয়েক বছর পর। এশার সময়। এক লোক এসে হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, আহমদ খবর পাঠিয়েছেন, তাঁর সময় খুবই সংকীর্ণ। তিনি একবার তার কাছে গেলে বড় কৃতার্থ হন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ রওনা হলেন। বনে গিয়ে দেখলেন, আহমদ শুয়ে আছেন মাটির বিছানায়। অন্তিম লগ্ন আসন্ন। জিভ আর ঠোঁট নড়ছে কেবল। নিজের কান পেতে তিনি শুনলেন, অস্পষ্ট স্বরে আহমদ বলছেন, এ প্রকারের উদ্দেশ্যে কর্মীদের কার্য্য অবশ্য কর্তব্য।

হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ আহমদের মাথা তুলে নিলেন নিজের কোলের ওপর। তখন আহমদ চোখ খুলে বললেন, হুযুর! একেবারে শেষ মুহূর্তে এসেছেন, আর একটুও সময় নেই। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের শেষ স্পন্দনটি শেষ বারের মতো থেমে গেল।

হযরত সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ নিজেই তাঁর শেষ বিদায়ের আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। কিছুক্ষন পরে দেখা গেল, অসংখ্য দরবেশ আর সাধারণ অসাধারণ মানুষ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি বললেন, আপনারা এমন দল বেঁধে কোথায় চলেছেন? তাঁরা বললেন, হযরত, গতকাল আমরা এক অদৃশ্য আওয়াজ শুনলাম, যারা কোন ওলী-আল্লাহ্‌র দাফন-কাফনে শামিল হতে চাও, তারা অমুক কবরস্থানে কাল হাজির থেকো। আমরা তাই ঐ দিকেই যাচ্ছি।

যুবকদের উদ্দেশ্যে হযরত সাররী রহমাতুল্লাহ বলতেন, তোমরা যারা যুবক, তারা এখনই আল্লাহ্‌র কিছু কাজ করে নাও। বার্ধক্য দেখা দিলে আর কিন্তু সম্ভব হবে না। দুর্বলতা মানুষের কর্মশক্তি নষ্ট করে।

তাঁর অমূল্য বাণী :

১. এবাদত হল যৌবনের কাজ। সুতরাং বেশী করে এবাদত করা চাই। বার্ধক্যে খুশী মতো এবাদত করা সম্ভব নয়।

২. কেউ যদি আশা করে যে, তার ধর্ম রক্ষা হোক, দেহ-মনে শান্তি বিরাজ করুক, চিন্তা দূর হোক, তাহলে তাকে বল, সে যেন লোক থেকে দূরে থাকে। পাঁচটি জিনিস ছাড়া আর সব কিছুই অতিরিক্ত। (১) প্রাণ রক্ষার জন্য খাবার, (২) পিপাসার জন্য পানীয়, (৩) লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র, (৪) মাথা গুঁবার জন্য বাসা ও (৫) চর্চা করার মতো বিদ্যা।

৩. মানুষের মন তিন প্রকার। যথা : (১) পাহাড়ের মত অটল, (২) গাছের মত–সামান্য জোরে হাওয়া বইলে ঝুঁকে পড়ে, (৩) হালকা পালকের মত– সামান্য বাতাসে উড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

পুণ্য-বান লোকের মন সীমিত আশায় আবদ্ধ। জান্নাতই তার আসল কামনা। আর আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য প্রাপ্ত মানুষের মন অগ্রগামী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী কেননা তাঁরা আল্লাহর প্রেমে মত্ত। যতই উন্নতি করেন অগ্রসর হন, ততই তাঁদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। তাঁদের কামনা-বাসনা আরও বেড়ে যায়।

৪. পার্থিব বস্তু যাদের অন্তরে, তাদের মনে পাঁচটি বিষয়ের জায়গা নেই। যেমন ঃ (১) আল্লাহ-ভীতি, (২) আল্লাহ-প্রেম, (৩) আল্লাহর রহমত কামনা, (৪) আল্লাহর প্রতি সম্ভ্রম ও (৫) আল্লাহর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব।

৫. সর্বাধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ তিনিই, যিনি পাক কোরআনের অর্থ ও মর্ম উদ্ধার করতে পারেন এবং তা নিয়ে গবেষণা করেন।

৬. প্রকৃত আরেফ সে ব্যক্তি , যার আহার রোগীদের মতো, নিদ্রা সর্পদষ্ট লোকের মতো, যার জীবন পানিমগ্ন মানুষের মতো। আরেফ লোকেরা সূর্যের মতো সর্বত্র কিরণ দান করেন। মাটির মতো সারা দুনিয়ার বোঝা বহন করেন। সমুদ্রের পানির মতো মানুষের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দেন আর আগুনের মতো চারদিক আলোকিত করে তোলেন।

৭. তিনটি বিষয়ের নাম তাসাওউফ। যথাঃ (১) সেটি এমন মারেফতে–যা মানুষের ধর্মনিষ্ঠা দূর করে দেয় না। (২) সেটি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এমন অলৌকিক যা মানুষকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখতে সহায়ক হয়।

৮. অনুমান বা সন্দেহের ওপর নির্ভর করে কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্ন করা ঠিক নয়।

৯. পাপ থেকে দূরে থাকতে হয় তিনটি কারণে। যথা ঃ (১) জাহান্নামের ভয়ে, (২) জান্নাতের আশায়, (৩) আল্লাহর লজ্জায়।

১০. আল্লাহর প্রতি হযরত সাররী রহমাতুল্লাহ-এর ফরিয়াদ, আল্লাহ্ সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রুতি-সম্পন্ন বলে তাঁর দরবারে তিনি মোনাজাত করতে পারেন না। আল্লাহর পবিত্র নাম এই অপবিত্র জিহ্বায় উচ্চারণ করতে তাঁর অত্যন্ত লজ্জা হয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ বলেন, একদিন সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ উক্তি করেন, আমি বাগদাদ শহরে এই জন্য মরতে চাই না যে, আমার পাপে বাগদাদের মাটি আমাকে কবুল করবে না। যার ফলে আমার ওপর যারা ভালো ধারণা পোষণ করে, তারাও খারাপ ধারণা করবে।

হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বলেন, হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ বেশী অসুস্ত হয়ে পড়লে তিনি তাঁর পরিচর্যার জন্য হাজির হন তখন খুব গরম চলছিল। তাই একখানা পাখা নিয়ে তিনি তাঁকে হাওয়া করতে শুরু করেন। কিন্তু হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ পাখা করতে নিষেধ করে বললেন, বাতাস আগুনের তেজ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

শেষ মুহূর্তে বাগদাদী রহমাতুল্লাহ কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, মানুষের সান্নিধ্য বর্জন করে শুধু আল্লাহর ধ্যান-ধারণা নিয়ে থাক। তাঁর এ উপদেশ শুনে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বলে ওঠলেন, একথা যদি আমাকে আগে বলতেন, তাহলে হয়ত বা আমি আপনার সংস্পর্শে আসতাম না।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
ফতেহ মুসেলী
রহমাতুল্লাহ

ইরানের মুসেল নামক এক স্থানে হযরত ফতেহ জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য তাঁর নামের সঙ্গে মুসেলী শব্দ যুক্ত হয়েছে। কঠোর তপস্যাবলে তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাপস হিসাবে পরিগণিত হন। তাঁর সম্বন্ধে এক দরবেশ বলেছিলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যিনি সংসার ত্যাগ করতে পারেন, তার চেয়ে বড় আলেম আর কে ?

তিনি কিন্তু নিজে চাইতেন না যে, লোকে তাঁকে দরবেশ বলে চিহ্নিত করুক। এই জন্য সব সময়ে তিনি এক গোছা চাবি সঙ্গে রাখতেন। নামাজ পড়ার সময় চাবিগোছা জায়নামাজের ওপর রাখতেন। আপনি এতগুলো চাবি দিয়ে কী করেন? এ প্রশ্নের তিনি কোন জবাব দেননি। একবার সততা সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি তপ্ত উনুন থেকে হাত দিয়ে এক খন্ড জ্বলন্ত কয়লা বে'র করে এনে তা হাতের তালুতে রেখে বলেন, একেই বলে সততা

একবার স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছ থেকে হযরত ফতেহ রহমাতুল্লাহ উপদেশ পান যে, যদি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ধনবান ব্যক্তি গরীব-দুঃখীর সামনে বিনীতভাব দেখাতে পারেন। তা একটি উত্তম কাজ। কিন্তু আল্লাহর ওপর নির্ভরতা রেখে গরীব-দুঃখীরা যদি বিত্তশালীদের প্রতি অবহেলা দেখাতে পারেন, তবে সেটি আরও উত্তম ।

একবার তিনি প্রবল কান্নায় অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। কিন্তু অশ্রুর বদলে তাঁর চোখ থেকে নেমে আসছিল রুধির স্রোত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি এত বেশী কাঁদেন কেন? তিনি বলেন, পাপের কথা মনে এলেই আমার এমন কান্না পায়। আবার পাছে সেটি লোক দেখানো কান্না হয়ে যায়, সেই ভয়ে আমার এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, তাতে আরও বেশী কান্না বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে। আর সেই কাঁন্নার সাথে, অশ্রুর বদলে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়।

একবার এক ব্যক্তি উপহার স্বরূপ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁর সামনে রেখে বলেন, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কেউ কাউকে কোন কিছু অযাচিত ভাবে দান করলে সে যদি তা গ্রহণ না করে, তবে তা তার জন্য আল্লাহর নেয়ামত অগ্রাহ্য করার তুল্য অপরাধজনক কার্যরূপে গণ্য হয়। তার কথা শুনে হযরত ফতেহ রহমাতুল্লাহ মাত্র একটি মুদ্রা তুলে নিয়ে বাকীগুলো রেখে দিতে বলেন।

তাঁর উপদেশাসমূহ ঃ

১. আমি অন্তত ত্রিশ জন দরবেশের সান্নিধ্যে এসেছি। তাঁরা দুনিয়াদার লোকদের থেকে দূরে থাকার ও স্বল্পাহারের উপদেশ দিয়েছেন।

২. দুর্বল রোগীর পানাহর বন্ধ করে দিলে রোগী যেমন প্রাণ হারায়, তেমনি যে হৃদয়কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাধকগণের পবিত্র বাণী আলোচনা থেকে বঞ্চিত করা হয়, সে হৃদয় মরে যায়।

৩. একবার এক সংসারবিরাগীকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ কী? বিরাগী মানুষটি বলেন, তোমার বিবেকের প্রতি আক্ষেপ। তুমি যেদিকে তাকাবে, সেদিকেই তাঁকে দেখবে।

৪. আহলে মারেফত সে ব্যক্তি,যিনি কথা বলার সময় আল্লাহর তরফ থেকেই বলেন। কাজ করার সময় আল্লাহর জন্যই করেন। কোন কিছু চাইবার কালে আল্লাহর কাছেই চান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. নিজের কামনার পরিবর্তে যিনি আল্লাহকে গ্রহণ করেন, তাঁর প্রতি আল্লাহর খুশী প্রকাশিত হয়। তাঁর নফসের বিরুদ্ধে আল্লাহর বন্ধুত্ব প্রকাশ পায়। আর তিনি প্রকৃতই আল্লাহ প্রেমিক হন।

হযরত ফতেহর মৃত্যুর পর স্বপ্নযোগে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করলেন? তিনি জবাব যেন, আল্লাহ্ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত বেশী কাঁদতে কেন? আমি জবাব দিলাম, নিজের পাপের জন্য এতো কাঁদতাম। আমার কথা শুনে আল্লাহ বললেন, কিন্তু আমি তো লেখককে বলে দিয়েছিলাম, সে যেন কোন মন্দ আমল না লেখে। আর এ নির্দেশ কেবল তোমার কান্নাকাটির কারনেই দিয়ে ছিলাম।

হযরত
আহমদ সাওয়ারী
রহমাতুল্লাহ

মুরশিদ রয়েছেন আল্লাহর প্রেমে বিভোর। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় বলে ফেললেন, তুমি নিজে গিয়ে উনুনের মধ্যে বস।

পীরের আদেশ তিনি যা বলেন তাই করতে হয়। পীর-মুরীদের মধ্যে এ রকমই চুক্তি আছে। পীর যা বলেন, তাই বলতে হবে। অন্যথা করা চলবে না। অতএব মুরীদ গিয়ে সত্যিই উনুনের মধ্যে বসলেন।

কিছুক্ষণ পরে মুরশিদের ভাবতন্ময়তা কেটে গেল। তিনি তাঁর নিজের আদেশের মনে পড়ে গেল। দেখা গেল, সত্যিই মুরীদ বসে আছেন উনুনের ওপর। তবে আশ্চর্য এই যে, তাঁর একটি লোমও পোড়েনি।

এই একান্ত অনুগত মুরীদটিই হলেন বিখ্যাত সাধক হযরত আহমদ সাওয়ারী রহমাতুল্লাহ। আর স্বনাম-ধন্য মুরশিদ হলেন হযরত সুলায়মান দারানী রহমাতুল্লাহ। যেমন, পীর তেমনি তাঁর মুরীদ।

আহমদ সাওয়ারী রহমাতুল্লাহ সমকালের একজন বিখ্যাত তাপস। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। সে যুগের সবাই ধর্মীয় জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হত। শিক্ষাগুরু সূলায়মান রহমাতুল্লাহ ছাড়াও প্রখ্যাত হাদীস-বেত্তা সুফিয়ান ইবনে ও আইনিয়ার রহমাতুল্লাহ সাহচর্যও আহমদ সাওয়ারী রহমাতুল্লাহ লাভ করেন।

কথিত আছে, শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি যখন সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তাঁর পঠিত বইগুলো সব নিক্ষেপ করেন নদী গর্ভে । বলেন, এগুলো আমার জন্য এক সময় মূল্যবান দলিল ও পথ-প্রদর্শক ছিল। কিন্তু এগুলোর এখন আর প্রয়োজন নেই। কেননা, মুরীদ যতদিন পর্যন্ত পথের পথিক থাকেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁর পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু গন্তব্য-স্থলে উপনীত হওয়ার পর আর পথ-প্রদর্শনের প্রয়োজন থাকে না।

হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ এক পরমা সুন্দরীকে স্বপ্নে দেখে তাকে বললেন, হে সুন্দরী! তোমার চেহারা সত্যিই দেখবার মতো। রমণী উত্তর দেন, আমার এ সৌন্দর্য আপনার উসিলায়ই পেয়েছি। আপনি এক রাতে কান্নাকাটা করেন, তা আপনার মনে আছে কী! সেদিন আপানর চোখ থেকে ঝরে পড়া পানির কিছুটা আমি আমার চেহারায় মাখিয়ে দিয়েছিলাম্। আর এই জন্যই আমি এমন লাবণ্যময়ী হয়েছি।

হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ বলতেন, মানুষ যতক্ষণ না মনে -প্রাণে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর তওবা কবুল হয় না নিজের সাধনায় পরিশ্রম না করা পর্যন্ত সে অন্যায়-অপরাধ থেকে মুক্তি পায় না। আর এ দু'টি ছাড়া মনের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরিবর্তন ও উন্নতি হয় না যখন সাধকের মনের পরিবর্তন হয় তখন অন্তরে ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠার ভাব জন্মে। নির্ভরতা যখন দৃঢ় হয়, তখন মারেফত জ্ঞানও উদয় হয়। আর তখন প্রেমরসের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায়। তারপর লজ্জার উৎপত্তি হয়। তারপর মনে আল্লাহর ভয় জন্মে। আর ঐ ভয় কোন অবস্থায়ই সাধকের মন থেকে দূর হয় না। যার ফলে আল্লাহর দীদার লাভ সম্ভব নয়।

তাঁর উপদেশ ঃ

১. তিনি আর ও বলতেন, যিনি আল্লাহ্ সম্বন্ধে বেশী জ্ঞান আয়ত্ত করেন, তিনিই সেরা জ্ঞানী।

২. আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশাই ধর্মভীরুর পোশাক। আল্লাহর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যে সময় অতিবাহিত হয়, তার দুঃখে বান্দা কাঁদে। আর এ কান্নাই সেরা কান্না।

৩. পৃথিবী একটি কসাইখানা, তা কুকুরদের সমবেত হওয়ার স্থান। পার্থিব ধন-সম্পদ উপার্জনে যে সর্বদা লিপ্ত , সে কুকুরেরও অধম। কেননা, কুকুরের পেট ভর্তি হলে সে কসাইখান থেকে বিদায় নিয়ে আবাসস্থালে ফিরে যায়। আর মানুষ যতই পার্থিব উন্নতি করে, ততই সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

৪. হৃদয়ের কাঠিন্য ও আল্লাহর প্রতি ওদাসীন্য অপেক্ষা কোন নিকৃষ্ট ব্যাধি আল্লাহ্ মানুষকে দেননি।

৫. পরিচিত হওয়ার জন্য যে সৎকর্ম করে সে মুশরিক। আর আল্লাহর খুশীর জন্য যে এবাদত করে, সে কখনও অন্যের খুশী চাইতে পারে না। যেহেতু সে নিজে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ তার এবাদত দেখুক, এরুপ ইচ্ছাও করে না।

৬. যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন, তার ওপর শান্তি সুনিশ্চিত।

হযরত
আহমদ খাযরুইয়া বলখী
রহমাতুল্লাহ

হযরত আহমদ খাযরুইয়া বলখী রহমাতুল্লাহ সেকালের এক স্বনাম-ধন্য সাধক। শুধু সাধক নন, শুধূ অলৌকিক শক্তির অধিকারী নন, তিনি সু-লেখক ও বটে। বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথম হযরত হাতেম আসাম রহমাতুল্লাহ-এর সান্নিধ্যে থেকে কালা-তিপাত করেন।

খোরাসানের বলখের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। সাধারণত ঃ সৈনিকদের পোশাক পরতেন। তাঁর বিবাহের ঘটনা বেশ চমকপ্রদ। স্ত্রী ফাতিমা ছিলেন এক বিত্তশালীর কন্যা। তিনি স্বয়ং হযরত আহমদের রহমাতুল্লাহ তাঁর এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু নিরাশ না হয়ে ফাতিমা আবার ও তাঁর এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু নিরাশ না হয়ে ফাতিমা আবারও তাঁর কাছে এই বলে লোক পাঠান যে, সত্য পথের পথিক হিসাবে মানুষকে সৎপথ দেখানো আপনার একান্ত কর্তব্য। আর কেউ যদি সু-পথে চলার আগ্রহ পোষণ করে থাকে, তবে তাকে বাধা দেওয়াও আপনার উচিত নয়। হযরত আহমদ আর দ্বিরুক্তি না করে তাঁর আবেদনে সাড়া দেন। তিনি তাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। অতঃপর পতি-পত্নী উভয়েই সাধনমার্গে চলতে থাকেন।

তাঁর সম্বন্ধে বিখ্যাত সাধক হযরত আবু হাফস বলেন, তাঁর মতো সত্য সাধক , ন্যায়-নিষ্ঠ , সৎ সাহসী ব্যক্তি আর কাউকে দেখছি না। তিনি আরও বলেন, আমার মনে হয়, আহমদ খাযরুইয়ার রহমাতুল্লাহ অনুপস্থিতিতে মানুষ সৎ সাহস ও মনুষ্যত্বের পরিচয়ই লাভ করত না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি একবার সস্ত্রীক হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে যান। তাঁর স্ত্রী এই মহতাপসের সঙ্গে যখন কথাবর্তা বলেন, তখন তাঁর মুখের ওপর কোন পর্দা ছিলনা। তাতে হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ বড় ক্ষুব্ধ হন। স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে শ্রদ্ধেয়া ফাতিমা বললেন, আপনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরশিদ। আপনার দ্বারা যৌন কামনা চরিতার্থ করি। আর হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে আল্লাহর নৈকট্যের সন্ধান করি। তিনি আমার সঙ্গ চান না। কিন্তু আপনি আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। এটিই বাস্তব।

হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ অতঃপর আর কোন দিন এ নিয়ে উচ্চ বাচ্য করেননি। ফাতিমাও বায়েজীদের রহমাতুল্লাহ সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলেতেন।

কিছুদিন পরে তিনি হঠাৎ দেখতে পান, ফাতিমার হাতের তালুতে মেহেদী লাগানো আছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যতদিন আমার কোন অঙ্গের ওপর আপনার দৃষ্টি পড়েনি, ততদিন আপনার দরবারে যাতায়াত করা আমর কাছে ছিল আনন্দজনক। কিন্তু আজ যখন তা পড়েছে , তখন এখানে আসা আর সম্ভব নয়। তা আমার জন্য হারাম হয়ে গেল। এই বলে স্বামীসহ সেখান থেকে তিনি ওঠে আসেন। পরে তাঁরা নিশাপুরে চলে যান।

একবার নিশাপুরে এলেন হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মা'আয রহমাতুল্লাহ । তাঁকে বাড়ীতে দাওয়াত জানানোর জন্য স্বামী-স্ত্রী শলা-পরামর্শ করলেন ফাতিমার ইচ্ছা,দাওয়াতের আয়োজন ভালোভাবেই করা হোক। ছাগল, মেশক আম্বর, জাফরান চাই, বিশ ঝুড়ি খেজুর চাই ইত্যাদি। কথাটা হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর তেমন বোধগম্য হল ফাতিমা বুঝিয়ে বললেন, পরম সম্মানিত অতিথির আগমনে পাড়া - প্রতিবেশীদের দাওয়াত করতে হবে। একটা কুকুরকে ও বাদ দেওয়া যাবে না। হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ স্ত্রীর এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। তার নির্দেশমত সবকিছুর আয়োজন করা হল। হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ যথার্থ বলেছেন, যদি তোমাদের কোন নারী বেশী বীরকে দেখার ইচ্ছা হয়, তাহলে আহমদ খাযরুইয়ার রহমাতুল্লাহ পত্নী ফাতিমাকে দেখে নাও।

একবার হজ্জে যাবার সময় হযরত আহমদের রহমাতুল্লাহ পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়। পাছে নির্ভরতার নিষ্ঠা নষ্ট হয়, সেই জন্য তিনি সেটি তুলে ফেললেন না। কাঁটাবিদ্ধ পা নিয়ে চলতে গিয়ে তাঁর পা ফুলে ওঠল। প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি মক্কা শরীফে গিয়ে হজ্জ সমাধা করলেন। ফেরার সময় দেখা গেল, ক্ষতস্থান থেকে পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে। অবস্থা দেখে সঙ্গীরা কাঁটাটি তুলে ফেললেন। আর তিনি পৌছালেন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। তখনও রয়েছে দারুণ ব্যথা। বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ হালকা হাসি হেসে বললেন, তোমার পায়ে যে কাঁটা ফুটেছিল তার কী করলে? হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ বললেন, হুযুর! আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহর ওপরে। এবার রাগে ফেটে গেলেন হযরত বায়েজীদ রহমাতুল্লাহ। বললেন, তোমার আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন কিসের? এটা শেরেক ছাড়া আর কিছু নয়।

এক রাতে চোর এল হযরত আহমদ খাযরুইয়ার ঘরে। কিন্তু কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে সে যখন চলে যাচ্ছে, হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি কুয়া থেকে পানি তুলে ওযু বানিয়ে আমার সঙ্গে নামায আদায় কর। সকালে দেখা যাবে কী দিয়ে তোমাকে বিদায় দেওয়া যায়। তাঁর কথায় রাজি হয়ে চোরটি সত্যিই তাঁর সঙ্গে সারারাত নামায পড়ল। আর ভোর বেলায় এক ধনী লোক হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ-কে একশো' দীনার নজরানা দিলেন। তিনি সেগুলো চোরকেই দিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি সারারাত আমাব সঙ্গে নামায পড়েছ। এগুলো তারই পুরস্কার।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবার চোরের মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। যিনি একটি মাত্র রাতের এবাদতের বিনিময়ে এমন অনুগ্রহ করেন, সেই মহিমাময় প্রভুকে ছেড়ে আমি এতদিন কোথায় ছিলাম। সে হযরতের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। টাকা নয়, দয়া করে আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করুন। হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ তাঁর নবজীবন দান করলেন।

আর একটি মজার ঘটনা। এক গরীব লোক সংসার চালাবার জন্য তাঁর কাছে জীবিকানির্বাহের কিছু উপায় প্রার্থনা করে। তিনি তাঁকে বললেন, বৈধ-অবৈধ টাকা রোজগারের যতগুলো ব্যবসা আছে, এক–একটি কাগজের টুকরায় তার নাম লেখে একটা পাত্রে রাখ। সে তাই করল। তখন তিনি বললেন, এবার যেকোন এক টুকরা কাগজ তুলে দেখ, তাতে যে ব্যবসার নাম লেখা থাকবে, তুমি তাই করবে।

লটারিতে ডাকাতির নাম লেখা কাগজ খণ্ড ওঠে এল। তিনি এবারও জোর দিয়ে বললেন, তুমি তাহলে ডাকাতিই শুরু করে দাও। লোকটি মহাফাঁপরে পড়ে গেল। ডাকাতি করতে মন সায় দির না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হযরত খাযরুইয়ার রহমাতুল্লাহ কথায় ডাকাতিই করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল।

এক ডাকাত দলের সর্দার এই শর্তে তাকে দলে নিল যে, সে যখন যা আদেশ করবে, তৎক্ষনাৎ তা পালন করতে হবে।

কিছুদিন পরে এই দলটি চড়াও হল এক বাণিজ্য -কাফেলার ওপর । ডাকাত সর্দারের নির্দেশ এল, বড় ব্যবসায়ীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে বধ করতে হবে। আর তার ভার পড়ল নবনিযুক্ত লোকটির ওপর। সে ভাবতে লাগল' অযথা লোকটিকে প্রাণে মেরে কী লাভ! মালপত্র যা ছিল , সবই তো হস্তগত হয়েছে। ডাকাতরা যে কত নৃশংস, অকারণে এরা যে কত নিরীহ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়, এসব কথা তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। আর সে মন বিদ্রোহীও হয়ে ওঠল। এদের এই জঘন্য ও মারাত্মক অন্যায়কে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত ডাকাত সর্দারকেই সে খূন করার সিদ্ধান্ত নিল।

বণিক বধের আদেশ পালিত হয়নি বলে ডাকাত সর্দার এবার লোকটিকে তেড়ে এসে গালি-গালাজ দেয়। লোকটি বলল, আল্লাহর আদেশ পালন না করে আমি তোমার আদেশ পালন করব ভেবেছ। বলেই, সে অতর্কিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিরচ্ছেদ করল। অবস্থা দেখে দলের অন্যান্য ডাকাত যে যে দিকে পারল, হতবুদ্ধি হয়ে দৌড়ে পালাল। রেখে গেল যাবতীয় লুটের মাল।

হৃতসর্বস্ব বণিকরা অদূরে বসে সব দেখছিল। তারা এবার এগিয়ে এসে লোকটিকে ধন্যবাদ জানাল এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অর্ধেক মাল তাকে উপহার দিল। আর অচিরেই সে ধনী হয়ে গেল। এই ভাবে হযরত খাযরুইয়ার রহমাতুল্লাহ নির্দেশ সফল হন।

তিনি একবার গেছেন এক সাধকের সাধনালয়ে । পরনে জীর্ণ বসন। দরবারে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। কিছুক্ষণ পরে ওখানকার কুয়ার পানি তোলার বালতির দড়ি ছিড়ে গেলা বালতি পড়ে গেল; কুয়ার তলায়। চেষ্টা করেও তা আর ওঠানো গেল না। স্নান ও ওযুর জন্য বেশ অসুবিধা দেখা দিল। তখন তিনি সাধককে বললেন, আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন বালতি ওঠে আসবে। না হয় আমাকে অনুমতি দিন, আমিই প্রভুর কাছে মিনতি জানাই। দরবেশ অনুমতি দিলেন। দেখা গেল, তাঁর মোনাজাতের সঙ্গে সঙ্গে পানির নিচ থেকে বালতিটি ভেসে ওঠল। আর দরবার-শুদ্ধ লোক এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেল। এবার তিনি সকলের পরম শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠলেন। তিনি দরবেশকে বললেন, তিনি যেন তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দেন কোন মুসাফিরকে তাঁরা যেন কখনও এভাবে অবজ্ঞা না করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ একবার এক স্বপ্নে দেখেন, সব মানুষ গাধা ও গরুর মত ঘাস খাচ্ছে। তাঁর স্বপ্নের বিবরণ শুনে একজন বললেন, আপনি তখন কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, আমিও অবশ্য তাদের সঙ্গে ছিলাম। তবে তফাতটা এই যে, তারা ঘাস খাচ্ছিল, হাসছিল আর আনন্দ করছিল। নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন অনুভূতি ছিল না। আর আমি রুটি খাচ্ছিলাম আর হাঁটুতে মাথা গুঁজে নিজের দুরবস্থার কথা ভাবছিলাম।

তারঁ উপদেশসমূহ ঃ

১. সাধক-দরবেশের সেবকদের তিনটি গুণ থাকে। যথাঃ(১) বিনয়, (২) শিষ্টাচার ও (৩) দানশীলতা।

২. যিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গ কামনা করেন, তিনি যেন সর্বদা সত্যানুসারী থাকেন। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্যপরায়ন লোকদের সঙ্গে থাকেন।

৩. আল্লাহকে অন্তরে বন্ধু মনে করা, মুখে তাঁকে সর্বদা স্মরণ করা ও অন্য যেকোন বস্তু থেকে নিজের মনকে উঠিয়ে ফেলা মারেফতের প্রকৃত তত্ত্ব। যার স্বভাব যত বেশী মোলায়েম ও মধুর, সে -ই আল্লাহর তত নিকটবর্তী।

৪. অন্তর হল একটি আঁধার। তা যখন আলোয় ভরে ওঠে, তখন তার উজ্জ্বল আভা সর্ব অবয়বে প্রতিভাত হয় আর যখন তা পাপে পূর্ণ হয়, তখন তার চেয়েও অধিক কালিমা সর্বাঙ্গে প্রকাশিত হয়।

৫. মুক্তিতেই পূর্ন ও প্রকৃত এবাদত অর্জিত হয়। অর্থাৎ পার্থিব আবর্জনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলেই এবাদত পূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায়।

৬. আল্লাহ্ ছাড়া যে কোন বস্তু থেকে মনকে মুক্ত করাই হল সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ।

৭. নফস্‌কে হত্যা কর। তাহলেই তুমি নিজে বাঁচবে।

অভাব-গ্রস্ত লোককে দান করতে গিয়েই তিনি ঋণগ্রস্ত হন। মৃত্যুকালে তাঁর ঋণের পরিমাণ ছিল সত্তর হাজার দীনার। তিনি আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন, প্রভু গো! আপনি আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিচ্ছেন, কিন্তু ঋণের দায়ে আমার প্রাণ এখানেই বন্দী হয়ে থাকছে। আপনি এমন কাউকে পাঠিয়ে দিন, যিনি এ ঋণ শোধ করবেন। তাঁর দোয়া শেষ হতেই এক লোক দরজায় করাঘাত করে বললেন, যারা পাওনাদার আছেন, তারা বাইরে আসুন। তারা বাইরে গেলে আগন্তুক কড়ায়-গন্ডায় সব টাকা শোধ করে দিলেন। আর এভাবে সকলের পাওনা পরিশোধ হবার পরই হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর পবিত্রাত্মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

হযরত
ইয়াহইয়া মাআয
রহমাতুল্লাহ

কোন কোন সাধক বলেন, পৃথিবীতে আল্লাহর দুজন বিশিষ্ট দাস সৃষ্টি হয়েছেন। একজন হলেন আল্লাহর নবী হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)। আর দ্বিতীয়জন হলেন প্রখ্যাত তাপস হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ।

হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ প্রকৃতই আল্লাহর এক আলোকিত দাস। গূঢ় তত্ত্বভেদে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। আর ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। তাঁর বক্তব্য ছিল মৌলিক, অন্তস্পর্শী আর সুদূর প্রসারী। এই জন্য ইয়াহইয়া ওয়ায়েজ নামেও অভিহিত হন। নিয়মিত কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত এই তত্ত্ব জ্ঞানীর হৃদয় ছিল অত্যন্ত সরল ও পবিত্র। আর গ্রন্থ রচনায় তাঁর যোগ্যতা ছিল তুলনা-হীন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ-ভীতি কাকে বলে, তাঁর জীবন তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার আল্লাহর রহমত লাভের ওপর তাঁর আস্থাও ছিল অবিচল। এদিক দিয়েও তিনি এক আদর্শ স্বরূপ।

পরবর্তীকালে এক তাপস-সমাবেশে প্রশ্ন ওঠে, নবী যাকারিয়া (আঃ)ও নবী ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে কিছু কিছু জানা যায় বটে, তাবে মহানবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত তাপসকূল তিলক হযরত ইয়াহইয়া সম্বন্ধে কিছুই জানা হয়নি। এ সম্পর্কে তাপসগণ কিছু বলুন। এই প্রশ্নের জবাবে তাপসগণ বলেন, আমরা যতদূর জানি, তাতে শিশুকাল থেকে আজীবন তিনি একটিও কবীরা গুনাহ করেননি। আর সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য পরিশ্রমী সে যুগে আর দেখা যায়নি। আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভরতা ও সুকঠিন আল্লাহ-ভীতি সম্বন্ধে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, দুটি কাজই ঈমানের -স্তম্ভ। এর যেকোন একটি ছেড়ে দিলে ঈমান মজবুত থাকে না। আসলে দুয়ের মধ্যে একটা সঙ্গতি আছে। কেননা, আল্লাহর রহমতের প্রতি অবিচল আশাবাদীরাও আল্লাহর রহমত লাভের আশায় তাঁর এবাদত করেন। আবার আজাবের ভয়ে ভীত ব্যক্তিরাও কঠিন আজাবের হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় তার এবাদত করেন। অর্থাৎ একজন এবাদত করেন আল্লাহর বিচ্ছেদ-আশঙ্কায়; আর অন্যজন তাঁর ইবাদত করেন তাঁর সঙ্গে মিলন-কামনায়। তবে, এবাদতের মধ্যে যতক্ষণ না আশা ও ভয় যুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এবাদত পূর্ণ হয় না। আবার ঠিক এভাবেই এবাদত না থাকলে আশা ও ভয়েও উদ্ভবও ঘটে না।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর , একমাত্র হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাআযই সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী যিনি নবী করীম (সাঃ)-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছেন। আর কোন ওলীর ভাগ্যে এমনটি জোটেনি তাঁর ভাষণের প্রভাবে ঘৃণ্য পাপীরাও পাপ কর্ম পরিহার করে পবিত্র পথের পথিক হয়।

হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ-এর এক ভাই মক্কায় বাস করতেন। তিনি একবার হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ-কে এক চিঠিতে লেখেন , আমার মনে তিনটি আকাঙ্ক্ষা ছিল । তার মধ্যে দুটি পূরণ হয়েছে। আশা করি, আল্লাহ্ বাকীটাও পূরণ করবেন। সে তিনটি বাসনা হল, (১) আমি যেন একটি পুণ্যস্থানে বসবাস করতে পারি। আল্লাহ্ যেন আমাকে একজন অত্যুত্তম সেবক দেন, যে আমাকে ঠিক মতো ওযুর পানি যোগাড় করে দেবে আমার এ আশাও পূর্ণ হয়েছে (৩) আমার তৃতীয় কামনাটি এই যে, মৃত্যুর পূর্বে একবার যেন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আশা করছি, আল্লাহ্ এটিও অপূর্ণ রাখবেন না।

চিঠি পেয়ে হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ্ উত্তর দিলেন, ভাই! তোমার চিঠি পেয়েছি। জবাবে আমি যা লেখলাম, মনোযোগ দিয়ে পড়ো আর সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করো।

তুমি লেখেছ, পবিত্র স্থানে বাস করার আশা করেছি, সে আশা পূর্ণ হয়েছে। মনে হয় তুমি ধন্য হয়েছ। কিন্তু শোন, তোমার নিজের পুণ্যবান হওয়া চাই। কেননা, নিজে পুণ্যবান না হয়ে পুণ্যস্থানে বাস করলে তাতে কোন লাভ নেই। পূণ্যস্থান তার অধিবাসীকে কখন পুণ্য করে না বরং পুণ্যবান মানুষের দ্বারা পবিত্র স্থানগুলো পবিত্র হয়ে থাকে। তুমি লেখেছ, তোমার দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল, একটি উত্তম সেবক লাভের , তাও তুমি পেয়েছ। সে ব্যাপারে তোমার জানা উচিত, যদি তোমার সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম কান থাকত, তাহলে, তুমি আল্লাহর এক বান্দাকে তোমার সেবকে পরিণত করে আল্লাহর এবাদত থেকে তাকে বঞ্চিত করে তোমার হুকুম তামিলে নিয়োগ করতে না । আসলে এরুপ মনিব হওয়া অপেক্ষা তোমারই গোলাম হওয়া উচিত ছিল। কেননা, মালিকানার ব্যাপারটি আল্লাহর নিজস্ব; আর দাসত্ব মানুষের ব্যাপার আর এ কথাও ঠিক যে, দাসের দাসত্ব করাই শোভনীয়তা না করে যদি আল্লাহর নিজস্ব বস্তুর আশা করা হয়, তবে তাকে ফেরআউনের আশার তুল্য বলা যেতে পারে।

www.AmarIslam.com

তুমি তোমার তৃতীয় অভিলাষের কথা লেখেছ, আমার সহিত সাক্ষাত করা। এ বিষয়ে দু'টি কথা শোন, তুমি যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করতে, তাহলে আমি তো তোমার খেয়ালেই আসতাম না। তোমাকে বলছি, তুমি মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর, যেন তোমার ভাই-বোনের কথা স্মরণ না হয়। তুমি না জান এমন নয়, যেখানে নিজের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র কোরবানী করা হয়, সেখানে ভাইয়ের কথা তো ওঠতেই পারে না। যদি তুমি আল্লাহকে লাভ করে থাকে, তবে আমার দ্বারা আর কী প্রয়োজন?

তিনি তাঁর এক বন্ধুকেও এই মর্মে চিঠি দেন যে, মনে রেখো, এ পৃথিবী স্বপ্ন-সদৃশ। আর পরকাল জাগ্রতের মতো। যেব্যক্তি স্বপ্ন দেখবে সে তো রোদন করবে, তার অর্থ হল, সে জাগ্রত অবস্থায় হাসবে ও খুশী হবে। কাজেই তোমার স্বপ্ন জগতে বেশী ক্রন্দন করা চাই। তাহলেই বাস্তব জীবনে বেশী করে হাসবে ও সন্তুষ্ট হতে পারবে। অর্থাৎ স্বপ্ন জগতে তথা দুনিয়ায় যারা বেশী হাসবে, বাস্তব জগতে তথা পরকালে তারা বেশী কাঁদবে।

একবার তিনি তাঁর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি সুন্দর গ্রামে বেড়াতে যান। সে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সৌন্দর্য্য দেখে ভাই তার খুব তারীফ করেন। তখন হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ বললেন, এ গ্রামের চেয়ে সুন্দর হল সেই অন্তকরণ, যা আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকে। এ গ্রামের শোভা-সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করে স্বীয় অন্তর জগতের দিকে দেখ। একটি প্রদীপ নিভাতে দেখে তিনি স-খেদে বলে ওঠেন, অলসতা ও পাপের কারণে যেন তাঁর একত্ববাদী বিশ্বাসের জ্যোতি এভাবে হঠাৎ নিভে না যায়। এক ব্যক্তি বলেন, মৃত্যু এ জগত সংসারের মূল্য একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি বলেন, না, তা নয়। বরং মৃত্যু এমন একটি পুল, যা পেরিয়েই বন্ধু বন্ধুর কাছে উপনীত হয়।

একদিন পবিত্র কোরআন পাঠকালে, তিনি যখন এই আয়াতে পৌছালেন আমরা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান গ্রহণ করলাম, তখন তিনি বলে ওঠলেন, আহা! এক মুহূর্তের ঈমান যদি যুগযুগান্তর কুফরী দূর করতে পারে, তাহলে আমার সত্তর বছরের ঈমান সত্তর বছরের পাপরাশিকে নষ্ট করে দিতে পারবে না কেন?

একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আল্লাহ্ যদি আমার হাতে জাহান্নামে কর্তৃত্বভার দিতেন, তাহলে আমি কোন প্রেমিককে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করতাম না। কেননা, সে তো প্রতি মুহূর্তে প্রেমের আগুনে জ্বলে পুড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এক ব্যক্তি বলল, সে যদি পাপে লিপ্ত হয় তবুও?

তিনি বললেন, তবুও তাকে আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া হবে না। কেননা, আল্লাহর প্রেমিক কখনও স্বেচ্ছায় পাপ কাজ করে না। সেগুলো অনিচ্ছাকৃত ভাবে হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, যারা আল্লাহর কাজ করে আনন্দবোধ করেন, দুনিয়ার লোক তাঁর সেবা করে আনন্দ পায়। আর যার চোখ আল্লাহর আলো পায়, দুনিয়ার সব প্রাণীর চোখই তার দ্বারা আলোকিত হয়।

তিনি বললেন; রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ যখন আমাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কী চাও? তখন আমি বলব, আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে অন্য জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামকে একটু ঠাণ্ডা করে দিন। যেমন আপনারই ঘোষণা রয়েছে যে, মুমিনদের নূরের জ্যোতি জাহান্নামের অগ্নি-শিখাকে নিস্তেজ করে দেয়।

তাঁর অমূল্য বাণী সমূহ ঃ

১. অবশ্যই রোজ কিয়ামতে আরেফদের আল্লাহর দীদার লাভ হবে।

২. তোমরা যেমন আল্লাহকে ভয় কর, সৃষ্টিজগতও তেমনি তোমাদের ভয় করে। তুমি নিজেকে যেমন আল্লাহর সেবায় বিলিয়ে দাও, তেমনি অন্য সবাই তোমার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. এবাদতের সময় যে আল্লাহর দরবারে লজ্জাবনত অবস্থায় দাঁড়ায়, আল্লাহও তেমনি তাকে জাহান্নামে ফেলতে লজ্জাবোধ করবেন।

৪. আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা রাখা মানুষের যেকোন ধারণা থেকে উত্তম। তেমন ধারণা সৃষ্টি হয় পুণ্য কর্মের মাধ্যমে।

৫. সেই সর্বাধিক ক্ষতি-গ্রস্ত, বৃথা ও মন্দ কাজে যার সময় ব্যয় হয়, এবং যে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলোকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এরা মরবে, কিন্তু পাপ থেকে বিরত হওয়ার সুযোগ পাবে না।

৬. দুনিয়াতে অসংখ্য উপদেশ আছে। কিন্তু যে উপদেশ গ্রহণ করে না তার জন্য একটিও নেই।

৭. তিন ধরনের লোক থেকে নিজেকে রক্ষা করা চাই। যেমনঃ (১) উদাসীন আলেম, (২) অলস ও (৩) পথ-ভ্রষ্ট দরবেশ।

৮. তাপসগণের তিনটি গুণ। যথাঃ (১) সর্ববিষয়ে আল্লাহ-নির্ভরতা, (২) যেকোন ব্যক্তি বা বস্তুর মুখাপেক্ষী না হওয়া ও (৩) সব কিছুকেই আল্লাহর তরফ থেকে বলে মনে করা।

৯. মৃত্যুকে বস্তাবন্দী করে যদি প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হত, তাহলে পরকালে প্রার্থীদের পক্ষে এই বস্তু ছাড়া আর কিছু কেনা সঙ্গত হত না।

১০. বিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনটি কাজ করা দরকার। যেমনঃ (১) মনের মধ্যে দ্বেষ-বিদ্বেষ না রেখে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমীর ও বড়লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা (২) নিষ্কাম অন্তরে নারীদের কৃপার চোখে দেখা (৩) অহমিকা-শূন্য অবস্থায় সবিনয়ে দরবেশদের সঙ্গে সাক্ষাত করা।

১১. যে গোপনে আল্লাহর আমানত নষ্ট করে, আল্লাহ্ প্রকাশ্যে তার পর্দা তুলে দেন।

১২. যে আল্লাহর হক আদায় করে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন।

১৩. যার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, ধন-সম্পদ লাভ করা আল্লাহর হাতে, সে চিরধনী। আর যে মনে করে, জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য ও উপার্জন দ্বারা ধনী হওয়া যায়, সে চির দরিদ্র।

১৪. আল্লাহ্ এত পবিত্র ও রুচিশীল যে, তাঁর দাস পাপে লিপ্ত হয়, আর তিনি তা দেখে লজ্জা পান।

১৫. যে আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, সে শয়তানের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে।

১৬. মুসলিমদের তিনটি বিষয় আমল করা জরুরী। (১) তাদের উপকার কর। যদি একান্তই তা না পার, তাহলে অন্তত ক্ষতি করো না। (২) ব্যবহার দ্বারা তাদের খুশী কর। যদি তা না পার, তাহলে অন্তত ব্যবহার দ্বারা তাদের অসন্তুষ্ট করো না। (৩) মুসলিমদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন কর। যদি তা কোনরূপেই সম্ভব না হয়, তবে অন্তত তার কুৎসা প্রচার ও দুর্নাম রটনা থেকে বিরত থাক।

১৭. জাহান্নাম লাভের উপযোগী এবাদত করে জান্নাতের আশা করা নির্বুদ্ধিতা।

১৮. তওবা করার পর একটি পাপ তওবা-পূর্ব সত্তরটি পাপ অপেক্ষাও মারাত্মক। দু'পাশে দুটি বাঘের মুখে পড়লে শেয়ালের যে অবস্থা হয়, বিশ্বাসীদের মনে পাপ-ভীতি ঠিক ঐ রকম।

১৯. রোগ বেড়ে যাবে বলে লোকে কুপথ্য আহার করে না। অথচ শাস্তি পেতে হবে জেনেও পাপ কর্ম থেকে বিরত হয় না- মানুষের এই বিপরীত-মুখী ক্রিয়াকলাপ বিস্ময়কর।

২০. দুনিয়া শয়তানের দোকান ঘর। সাবধান, এ দোকান থেকে কেউ যেন কিছু চুরি করো না, তাহলে কিন্তু শয়তান তার পেছনে ওঠে পড়ে লাগবে। আর তার বিনিময়ে তোমার অমূল্য ধন ছিনিয়ে নেবে।

২১. দুনিয়া এক নববধূর মতো। যারা তাকে মনের মতো ভোগ করতে চায় তারা নানাভাবে সাজিয়ে তার রূপ ও সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে নেয়। কিন্তু যাদের নিকট অপছন্দনীয় তারা রাগে ও বিরক্তিতে এর চুল উপড়ে ফেলে মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দেয়।

২২. দুনিয়া এক শরাবখানা। এই শরাবে বিভোর মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্যই পরকালে আজাবের প্রয়োজন হয়।

২৩. আল্লাহ্ বলেন, দাসগণ আমার প্রতি অভিযোগ করে। অথচ তারা ভাবে না, আমি জান্নাত ও জাহান্নামের মালিক হয়েও তাদের মন যুগিয়ে চলি।

২৪. দুনিয়া মানুষের জন্য এমনই এক নিকৃষ্ট বস্তু যে, তার কামনা করলেই সে আল্লাহ্ থেকে দূর করে দেয়। এটা চিন্তার বিষয় নয় কি যে, দুনিয়া হাসিল করলে কী অবস্থা দাঁড়াতে পারে।

২৫. তিন প্রকার লোকই প্রকৃত বুদ্ধিমান। যথাঃ (১) সংসারত্যাগী, (২) মৃত্যুর আগেই যে কবরের মাল-পত্র সঞ্চয় করে ও (৩) আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগেই যে তাঁকে সন্তুষ্ট করে।

২৬. এ যুগে মানুষের সামনে দু'টি বড় বিপদ- যা আগের যুগের মানুষ কল্পনাও করেননি। কেননা, তারা সম্পদ সঞ্চয়ে অভ্যস্ত ছিল না। বিপদ দু'টি হল, এখন না খেয়েও মানুষ সঞ্চয় করে। কিন্তু মৃত্যুকালে তা অন্য হাতে চলে যায়। (২) এই সম্পদের হিসাব কিন্তু সঞ্চয়কারীকেই দিতে হবে।

২৭. ধন-দৌলত হল সাপ ও বিছার মতো। মন্ত্র না শিখে সাপ ও বিছার গায়ে হাত দেবে না। কেননা তাতে প্রাণ-নাশের সমূহ সম্ভাবনা। ধন-সম্পদ বৈধভাবে উপার্জন করা ও সৎপথে ব্যয় করা হল তার মন্ত্র।

২৮. পশমী কম্বল করে দরবেশের পোশাক ধারণ একটি ব্যবসার মতো। আর সংসারত্যাগের আলাপ-আলোচনা একটি পেশার মত।

২৯. উপবাস জ্যোতি সদৃশ আর পরিতৃপ্ত আহার আগুন তুল্য।

৩০. সাধক তিন প্রকার। (১) যাহেদ- যারা ধৈর্য্যের দ্বারা নিজের হৃদরোগের চিকিৎসা করেন। (২) মুশতাক- যারা কৃতজ্ঞতা দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন। (৩) ওয়াসেল- দ্বারা বন্ধুত্ব দ্বারা মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করেন।

৩১. সাধক চারটি স্থানে যেকোন একটিতে শান্তি পান। যথাঃ (১) ঘরের নির্জন কোণ, (২) মসজিদ, (৩) কবরস্থান ও (৪) জন বিরল স্থান।

৩২. ধৈর্যশীলের পরিচয় সঙ্কটকালে।

৩৩. আমল তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। (১) ধর্মীয় জ্ঞান, (২) পবিত্র সঙ্কল্প ও (৩) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য।

৩৪. তাওয়াক্কুল মানুষকে অধীনতা মুক্ত করে। তার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য যুক্ত হয়ে সুফল আনে। আর আল্লাহর নির্দেশে রাজি থাকার কারণে জীবন সুখের হয়।

৩৫. ঈমান তিনটি বস্তুর মধ্যে নিহিত। যথাঃ (১) ভয়, (২) আশা ও (৩) প্রেম। ভয়- আল্লাহর আজাবের ভয় দ্বারা পাপ দূর হয়। আশা- জান্নাতের আশা দ্বারা এবাদতে মন আকৃষ্ট হয় ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর প্রেম- আল্লাহর প্রেম দ্বরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

৩৬. প্রকৃত আরিফ তিনিই, যিনি আল্লাহর যিকির ছাড়া কোন কিছুকেই বেশী ভালোবাসেন না।

৩৭. মারেফাতের হক পুরোপুরি আদায় না করলে অন্তরে তা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৩৮. অন্তরে আল্লাহর ভয় এক বৃক্ষ স্বরূপ। প্রার্থনা আর কান্না তার ফল স্বরূপ। মানুষ

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন আল্লাহ-ভীরু হয়, তখন তার শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার দাসত্ব করে এবং সে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকে। সব জিনিসেরই একটি শোভা বা সৌন্দর্য থাকে। উপাসনার শোভা হল আল্লাহ ভীতি। আল্লাহ-ভীতির নিদর্শন হল পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার বিলুপ্তি। নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করা হল উঁচুদরের ধর্মবীরুতা।

৩৯. তওহীদ হল জ্যোতি আর শেরক হল আগুন। তওহীদের আলো পাপের আগুনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

৪০. ধর্মনিষ্ঠ দু'রকমের। যথাঃ (১) জাহেরী ও (২) বাতেনী। জাহেরী ধর্মনিষ্ঠা তাকেই বলে, যখন আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কিছু করা না হয়। আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্তরে অন্য কিছু স্থান না দেওয়াকে বলে বাতেনী ধর্মনিষ্ঠা।

৪১. যোহদ শব্দ তিনটি হরফ দ্বারা গঠিত। যথা- যা, হা, দাল তিনটি বর্জনীয় বস্তুর আদ্যক্ষর দ্বারা শব্দটি তাৎপর্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। যেমন, যা দ্বারা যীনাত বা সৌন্দর্য্য বুঝানো হয়েছে, যা বর্জনীয়। হা দ্বারা হাওয়া বা ইচ্ছা বুঝানো হয়েছে, তা-ও বর্জনীয়। আর দাল দ্বারা দুনিয়া সাঙ্কেতিত হয়েছে। আর দুনিয়া তো বর্জনীয় বস্তুর মধ্যে প্রধান।

৪২. মৃত্যু ও বিনাশ দুটি বস্তু। সৃষ্টির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নাম মৃত্যু। আর আল্লাহর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়াই হল বিনাশ।

৪৩. খাঁটি তওবার লক্ষণ তিনটি। যথাঃ (১) খুব বেশী রোজা রাখার কারণে খুব কম খাওয়া, (২) বেশী নামাজ পড়ার জন্য খুব কম ঘুমানো ও (৩) আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার কারণে খুব কম কথা বলা।

৪৪. আল্লাহর ধ্যান যাবতীয় পাপকে ডুবিয়ে দেয়। আল্লাহর রেজামন্দী যাবতীয় কামনার অবসাট ঘটায়। আল্লাহর প্রেম অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করে অন্য যেকোন বন্ধুত্বকে ভুলিয়ে দেয়।

হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট কিনা তা কী করে বুঝব?

তিনি বললেন, যদি তুমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাক তবে তা একথার লক্ষণ যে, আল্লাহও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন।

প্রশ্ন ঃ এমন কে আছে যে আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট অথচ মারেফতের দাবী করে?

উত্তর ঃ যে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের প্রতি শিথিল তা প্রদর্শন করে তাঁর গজবে পতিত হয় সেই তো তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট।

প্রশ্ন ঃ রোজ কিয়ামতে সবচেয়ে নির্ভীক কে হবে?

উত্তর ঃ যে দুনিয়াতে সবচেয়ে আল্লাহভীরু।

প্রশ্ন ঃ মানুষ তাওয়াক্কুলের নিকটবর্তী কখন হতে পারে?

উত্তর ঃ যখন সে সব কাজে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করতে প্রস্তুত।

প্রশ্ন ঃ ধনী কে?

উত্তর ঃ যে সব ছেড়ে শুধু আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ঃ আরফে কে?

উত্তর ঃ যে নিজেকে ভুলে যায়।

প্রশ্ন ঃ সাধকত্ব কী?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ার অন্য যেকোন বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে দেওয়া। তিনি বলেন, হাশরের মাঠে কে ধনী কে গরীব তা ওজন করে দেখা হবে না। অবশ্য ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার ওজন হবে। তাই গরীবের ধৈর্য অবলম্বন ও ধনীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য।

www.AmarIslam.com

প্রশ্ন ঃ ত্যাগে দৃঢ় কে?

উত্তর ঃ ধর্মে যার আস্থা অধিক?

প্রশ্ন ঃ প্রেমের লক্ষণ কি?

উত্তর ঃ পুণ্য-কর্মে খুব বেশী আগ্রহ প্রদর্শন ও দুনিয়ার ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।

হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ-এর প্রার্থনা মর্মমূল কাঁপিয়ে দেয়। তিনি প্রার্থনা করতেন- দয়াময়, পুণ্য কর্মের প্রতিদানের বদলে আমি আপনার ক্ষমাই বেশী চাই। কেননা, আমি আমার উপাসনা ও আপনার সন্তুষ্টি কোন ভরসাই করতে পারি না এই কারণে যে, আমি নানা বিপর্যয়ে ব্যতি-ব্যস্ত। কী করে আমি আপনার এবাদত ইখলাসের সঙ্গে আদায় করব? অবশ্য আমি আমার পাপরাশির জন্য আপনার ক্ষমালাভের দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করি। আর তা কেনই বা লাভ করব না, যখন আপনি পরম কৃপাময় ও করুণাময়।

হে প্রভু! আপনি আপনার প্রিয় হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-কে ফেরআউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন তার সঙ্গে শান্ত হয়ে কোমল কথা বলতে বলেছিলেন। হে প্রভু! আল্লাহ্ বলে যে দাবী করল, এমন পাষণ্ডের প্রতি আপনার যখন এতখানি দয়া, তখন যেব্যক্তি মনে-প্রাণে আপনার ধ্যান ও এবাদত করে, না জানি তার প্রতি আপনার কতই না দয়।

প্রভু গো! যে ফেরাআউন বলেছিল, আমিই তোমাদের প্রধান আল্লাহ্, তার মতো পাপীর প্রতি আপনার এ ধরনের কৃপাদৃষ্টি থাকলে জানি না, যে বলে, আমার মহাপ্রভু পবিত্র, তার প্রতি আপনার দয়া কতখানি হবে।

হে মাবুদ! ধন বলতে এই কম্বলখানা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এও আমার অতি প্রয়োজনীয় বস্তু বটে, তবুও যদি অভাবী মানুষ সেটি নিতে আসে, আমি খুশী মনে তাকে তা দান করব।

আপনার রহমতের ভাণ্ডার অফুরন্ত। অথচ একটি কণারও আপনার প্রয়োজন নেই। তবে বলুন দেখি, আপনার রহমতের কাঙ্গাল এই অসংখ্য বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে আপনি কুণ্ঠিত হতে পারেন কি?

হে প্রভু! আপনি না প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেব্যক্তি সামান্য পুণ্য নিয়ে আমার কাছে আসে, প্রতিদানে আমি তাকে তার চেয়েও উত্তম বস্তু পৃথিবীতে আর কী আছে? পরকালে তার চেয়ে উত্তম বস্তু আপনার দীদার ছাড়া আর কী দান করবেন? প্রভু! আমার, সত্তা যেমন তুলনাহীন, আপনার কাজও তাই। প্রভু, যে যাকে ভালোবাসে সে সর্বদা তার সব রকমের আরাম কামনা করে। তবে আপনি যাকে ভালোবাসেন, কী করে তার ওপরে বিপদে বোঝা চাপিয়ে দেবেন?

দয়াময়! পৃথিবীতে আপনি আমাকে যা দিতে চান তা কাফেরদের দিয়ে দিন। আর পরকালে যা দিতে চান তা বিশ্বাসীদের দিন। আমাকে শুধু দুনিয়াতে আপনার ধ্যানের তওফীকও পরকালে আপনার দীদার দান করুন। আমি পাপী বলে আপনার দরবারে প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকব কেন? পাপের কারণে আপনি তো আমাকে দয়া প্রদর্শনে বিরত নন।

হে মাবুদ! আপনার ক্ষমাজনিত ও আমার দুর্বলতাজনিত কারণে পাপ ও অপরাধ ঘটে। আমার দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে বা আপনার ক্ষমা গুণের দিক থেকে- যে দিক দিয়েই হোক! আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রভু! আমি আমার পাপের কারণে আপনাকে ভয় করি। সঙ্গে সঙ্গে আপনার অফুরন্ত রহমতের কারণে আপনার ওপরে ক্ষমার ভরসাও রাখি। অতএব, প্রার্থনা, হে মাবুদ! পাপের জন্য আমাকে আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে প্রভু! আপনাকে ভয় করবই বা কেন? আপনি যে রাহমানুর রাহীম, গাফফার ও করীম। আবার ভয় না করবই বা কেন? আপনি যে জব্বার ও কাহ্হার।

হে মাবুদ! আমি আপনার দরবারে এক গরীব বান্দা আর আপনার ধ্যান আমার কাছে খুবই সহজ-সরল। তাই গরীব হিসাবে আমি সহজ-সরল বস্তুতে খুব ভালোভাবে মন দিয়েছি। কেননা, গরীব ঠিক এমন বস্তুকেই ভালোবাসে।

দয়াময়! আমার প্রতি আপনার মহোত্তম দান হল, আপনার খুশী ও সন্তুষ্টি। আর আমার মুখে আনন্দদায়ক বচন হল আপনার প্রশংসা ও গুণগান। আর জীবনের সর্বাধিক কাঙ্খিত সময় হল আপনার দীদার লাভের সময়।

হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ খুবই দানশীল ছিলেন। আর এই দানের কারণে তিনি ঋণ-গ্রস্থ হয়ে পড়েন। একলক্ষ টাকার দেনা তাঁর ওপর চাপে। মহাজনরা অবিরত তাগাদা দেন। আর তাতে তিনি ভীষণ অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে থাকেন।

এক শুক্রবারের রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, রাসূল কারীম (সঃ) বলছেন, আপনি এত বিষণ্ন কেন? আপনার বিষণ্নতা আমাকে ব্যথিত করে। চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি খোরাসানে গিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দিন। আমি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেব, তিনি আপনার সব দেনা শোধ করে দেবেন।

স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী খোরাসানের নিশাপুরে গিয়ে তিনি সর্বসাধারণের সমাবেশে ভাষণ দিতে শুরু করেন। প্রথমেই তিনি রাসূলে কারীম (সঃ)-এর নির্দেশের কথা উল্লেখ করলেন। তাঁর ঋণের কথাও চেপে রাখলেন না।

এ কথা শোনামাত্র সঙ্গে সঙ্গে একজন চল্লিশ হাজার ও অন্য একজন দশ হাজার টাকা দান করলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ ছিল, একজনেই আমার এক লক্ষ টাকা ঋণ শোধ করে দেবেন।

যাহোক, এরপর তিনি এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন যে, তার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সভাস্থলে সাত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। অতঃপর নিশাপুর থেকে তিনি গেলেন বলখে। আর সেখানে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় অভিভূতঃ হয়ে (বক্তৃতা বিষয় ছিল ধন-সম্পদের ফজীলত) একজন শ্রোতা তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ টাকা উপহার দিলেন। একজন দরবেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, ধন-প্রাচুর্যের এরকম ফজীলত বর্ণনা করা ঠিক হয়নি।

তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সব টাকা লুট হয়ে গেল। তখন দরবেশের বিরক্তির কথা তাঁর মনে পড়ল। হয়ত ঐ বিরক্তির ফলেই তিনি হৃতসর্বস্ব হলেন।

এবার ভাষণ দিলেন হীরায়। সেখানেও তিনি তাঁর স্বপ্নের বিবরণ পেশ করলেন। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এক আমীর দুহিতা। তিনি বললেন, যে রাতে হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ স্বপ্ন দেখেন, ঠিক সেই রাতে তিনিও স্বপ্নে রাসূলে করীম (সঃ)-এর নির্দেশ পেয়েছেন যে, অমুকের দেনা পরিশোধ ও অন্যান্য কাজের জন্য তিন লক্ষ টাকা দান করতে হবে। তাঁকে নিজে গিয়ে টাকা দিতে হবে কিনা তাও তিনি নবী মুস্তাফা (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু রাসূল (সঃ) জানান, না, তিনি নিজেই আসবেন।

আমীর কন্যা টাকা দিতে রাজি হওয়ার পরও তাঁকে একটি অনুরোধ করলেন, হযরত ইয়াহইয়া যেন সেখানে আরও চার দিন ভাষণ দেন। তিনি সে অনুরোধ রাখলেন। কিন্তু ঐ চার দিনের দৃপ্ত ভাষণে পঁয়তাল্লিশ জন প্রাণ হারান। ভাষণ শেষে তিনি যখন বিদায় নেবেন, তখন আমীর কন্যার নগদ তিন লক্ষ টাকা, সোনা, রূপা ও অন্যান্য সামগ্রী এনে হাজির করলেন সাতটি উট বোঝাই করে। আর এসব নিয়ে তিনি যাত্র করলেন। সঙ্গে তাঁর পুত্রও ছিলেন। বাড়ীতে পৌঁছে তিনি পুত্রকে বললেন, দেনা শোধ করে যা উদ্বৃত্ত হবে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তা যেন গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। তিনি নিজে যেন কিছুই গ্রহণ না করেন। কেননা, তাঁর কথা হল, আল্লাহ্ যার সঙ্গী, তার অন্য বস্তুর কী প্রয়োজন?

পুত্রকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন নিশাপুরে। সেখানে পৌঁছে সকালবেলায় সেজদাবনত হয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ একখন্ড ভারী পাথর ছিটকে এসে তাঁর মাথায় প্রচন্ডভাবে লাগে। আর এই পাথরের আঘাতেই তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়।

তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। লোকজন তাঁর মৃত দেহ নিয়ে গেলেন নিশাপুরে। সেখানেই তিনি কবরস্থ হলেন।

হযরত
শাহ শুজা কেরমানী
রহমাতুল্লাহ

হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ কেরমানের শাহী বংশের লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক মার্গের এক আলোকিত পুরুষ। হযরত আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ, হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ প্রমুখ বিখ্যাত তাপসের সান্নিধ্যলাভে তিনি ধন্য। তিনি ধর্মমূলক গ্রন্থের গ্রন্থকার। তাঁর প্রণীত 'মেরআতুল হুকামা' গ্রন্থে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ আছে। কেরমান থেকে তিনি যখন নিশাপুরে যান, তখন তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানান হযরত আবু হাসফ রহমাতুল্লাহ'। উন্নত মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বলেন, যে বস্তু আমার জুব্বার মধ্যে খোঁজ করছিলাম, তা পেয়ে গোলাম কাবার (আমীরী জামার) মধ্যে।

হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ একটানা চল্লিশ বছর বিনিদ্র ছিলেন। উপাসনায় কেটে যেত রাতের পর রাত। কোন দিন চোখের মধ্যে লবণ ছিটিয়ে দিতেন। কাজেই তাঁর দু'চোখ লাল দেখাত। এভাবে চল্লিশ বছর পর একদিন কিছুক্ষণের জন্য তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। আর ঘুমের মধ্যেই আল্লাহকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি বলে ওঠলেন, প্রভু আমার, জাগ্রত অবস্থায় আপনাকে পাওয়ার জন্য কত চেষ্টা করলাম। আর আজ পেলাম ঘুমের ভেতর। তখন অদৃশ্য শব্দ শোনা গেল, এই দীদারই তোমার জাগ্রত অবস্থায় সাধনার বিনিময়।

এরপর থেকে তিনি প্রতিদিনই ঘুমুতে লাগলেন, যদি আল্লাহকে দ্বিতীয়বার স্বপ্নে দেখা যায়। ঐ স্বপ্ন তাঁর কাছে পরম গৌরবময়। তিনি বলতেন, এই স্বপ্নে বদলে তাঁকে যদি দু'জাহানও দেওয়া হয়, তবুও তিনি তা গ্রহন করতে রাজি নন।

তাঁর এক পুত্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন সবুজ কালি দিয়ে তাঁর বুকে লেখা ছিল, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু। কিন্তু সে পুত্র যখন যুবক হলেন, তখন নানা ধরনের গান-বাজনা ও খেলাধুলায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এক রাতে সেতার বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে তিনি চলেছেন ঘুমন্ত মহল্লার পথ ধরে। আর সে গানের সুরে সম্মোহিত হয়ে এক নববধু ওঠে আসে বিছানা ছেড়ে বারান্দায়। পরে তার স্বামীর ঘুম ভেঙে গেলে সে-ও বেরিয়ে এসে দেখতে পায়, সুরের মায়াজালে বন্দিনী বধূ অপলকে তরুণ শিল্পীকে দেখছে। সে তখন যুবককে বলল, তোমার কী তওবা করার এখনও সময় আসেনি? এই প্রশ্নটিও যেন সেতারের ঝংকারের মতো যুবকের মর্ম স্পর্শ করে। মনে সৃষ্টি হয় বিপুল ভাবান্তর। তাঁর বুক থেকে বেরিয়ে আসে পরিবর্তিত স্বর। নিশ্চয় আমার তওবার সময় এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভেঙে ফেললেন সখের বাদ্য-যন্ত্র। আর সেদিন থেকেই নিমগ্ন হলেন আল্লাহর ধ্যানে। অচিরেই তিনি পৌঁছে গেলেন সাধনার এমন এক স্তরে যে, তাঁর পিতা বললেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চল্লিশ বছর সাধনা করে তিনি যা লাভ করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদা লাভ করেছেন তাঁর তরুণ পুত্র– মাত্র চল্লিশ দিনের সাধনায়।

হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ-এর এক সর্বগুণে গুণান্বিতা ধর্মনিষ্ঠ কন্যা ছিল। তাঁর পানি গ্রহনের ইচ্ছা পোষণ করতেন দেশের বিত্তশালী মানুষ, ধনীর দুলাল। স্বয়ং কেরমানের বাদশাহও তাঁদের একজন। তিনি বিবাহের প্রস্তাব রাখলেন শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। প্রস্তাবটি ভেবে দেখার জন্য শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ তিন দিন সময় নিলেন। আর তিন দিন ঘুরে বেড়ালেন মসজিদে মসজিদে– যদি কোন ধর্মভীরু যুবকের সন্ধান পান। সম্পদশালীর ঘরে মেয়ে দিতে তাঁর মন চাইছে না।

এক মসজিদে দেখলেন, এক তরুণ দরবেশ নামাজ পড়ছেন নিবিষ্ট হয়ে। তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করেন, তোমার বিয়ে হয়েছে?

দরবেশ উত্তর দিলেন, জি না।

কোন পুণ্য-ময়ী পাত্রী পেলে বিয়ে করতে রাজি আছ কি?

কে আমাকে কন্যা দেবে। সম্বল বলতে আমার রয়েছে মাত্র তিন দেরহাম।

আমি দেব। তুমি এক দেরহাম দিয়ে আতর নিয়ে এস। এক দেরহাম দিয়ে রুটি। আর এক দেরহাম দিয়ে মিঠাই। বিবাহ হয়ে গেল।

স্বামীর বাড়ীতে সোরাহীর মুখে শুকনা রুটি দেখে কন্যা জিজ্ঞেস করলেন, এ রুটি কিসের?

স্বামী বললেন, গতকালের উদ্বৃত্ত রুটি। আজ খাব বলে রেখে দিয়েছি।

মর্মাহত কন্যা বলল, আপনি আমাকে বাপের বাড়ীতে দিয়ে আসুন। তরুণ স্বামী বললেন, একথা আমি আগেই বলেছিলাম। শাহ সাহেবের কন্যা আমার মতো গরীবের বাড়ীতে কিছুতেই থাকবেন না। শাহ কন্যা বললেন, আপনি ভুল করছেন। অভাবের কারণে আমি পীড়িত নই। আমার দুঃখ আপনার ঈমান বড় দুর্বল। আপনি কী খাবেন, তা চিন্তা করে আগেই ব্যবস্থা করে রাখেন। আল্লাহর প্রতি আপনার নির্ভরতা কই? বিশ বছর ধরে আমার পিতা আমাকে ঘরে রেখেছিলেন, কোন ধর্মভীরুর হাতে তুলে দেবেন বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন লোক মিলল, যার কোন আল্লাহ নির্ভরতা নেই।

স্ত্রীর কথায় স্বামীর চৈতন্যোদয় হয়। তিনি সত্যিই ভুল করছেন। কিন্তু এ ভুল সংশোধনের উপায় কি? স্ত্রী বললেন, ঘর থেকে ঐ রুটি ফেলে দিন। আর তা যদি না পারেন তো ঘর থেকে আমাকেই বাদ দিন। স্ত্রীর কথায় দরবেশ ঐ রুটি অন্যকে দিয়ে দিলেন।

বিখ্যাত তাপস হযরত আবু হাফস রহমাতুল্লাহ হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ-কে এক পত্রে লেখেন, আমার প্রবৃত্তি ও পাপের অবস্থা লক্ষ্য করে আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছি।

হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ পত্রের জবাবে লেখেন, আপনার চিঠির কথাকে আমি আমার অন্তরের আয়না স্বরূপ বানিয়ে রেখেছি। কেননা, নফস থেকে যদি নৈরাশ্যই সৃষ্টি হয়, তাহলে আল্লাহর প্রতি আশা, নির্ভরতা আরও বেশী শক্ত এবং খাঁটি হবে। আল্লাহর প্রতিই বিশুদ্ধ আশা-ভরসা উদয় হলে মনের মধ্যে আল্লাহ-ভীতিও দেখা দেয়। আর প্রকৃতই যখন আল্লাহর ভয় জন্মে, তখন নফস থেকে নিরাশ হয়ে নিজেকে আল্লাহর ধ্যানে বিলীন করা সম্ভব হয়। এভাবে, ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহ্ যখন অন্তরের ধ্যান-ধারণায় পরিণত হয়, তখন তার বিনিময়ে আল্লাহও তাঁর দাসকে স্মরণ করেন। যার ফলে দাস তখন সমগ্র জগত থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র আল্লাহতেই নিজেকে ন্যস্ত করতে পারে। আর এ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েই বান্দা আল্লাহর প্রিয় দাসগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উচ্চতার আসন লাভ করে।

হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ তাঁর শিষ্যদের বলতেন, মিথ্যা বলা, আমানতে খিয়ানত করা ও পরনিন্দা থেকে অবশ্যই বিরত হও। আর এগুলো বাদে যা ইচ্ছা করে যাও।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাআয রহমাতুল্লাহ ও হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ পরস্পর বন্ধু ছিলেন। দু'বন্ধু একবার একই শহরে বসবাস করতেন। হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ একদিন বন্ধুকে তাঁর বক্তৃতা সভায় হাজির থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না। কিন্তু অন্য একদিন বিনা দাওয়াতে বন্ধুবর ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ মাহফিলে শামিল হলেন। এক কোণে গিয়ে বসলেন চোখের আড়ালে।

হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ তখন বক্তৃতা দিচ্ছেন। একটু পরেই তাঁর কণ্ঠস্বর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না দেখে তিনি ইশারায় জানালেন, সম্ভবতঃ তাঁর চেয়েও কোন উত্তম বক্তা সভায় উপস্থিত আছেন। এই অবস্থার কিছুক্ষণ পরে হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ বের হয়ে হযরত ইয়াহইয়া রহমাতুল্লাহ-এর কাছে বললেন, এ ঘটনার জন্যই আমি আপনার বক্তৃতা সভায় আসতে চাই না।

হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ বলতেন, মর্যাদাশালীর মর্যাদা ও তাপসগণের সাফল্য ততক্ষণই স্থায়ী হয়, যতক্ষণ তাঁরা মর্যাদা ও সাফল্য সম্পর্কে গর্বিত না হন। তিনি আরও বলতেন,

(১) সজ্জনের নিদর্শন তিনটি। যথা ঃ (১) দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও শান-শওকত তাঁর মনে স্থান পায় না। (২) তিনি লোক সংসর্গ থেকে দূরে থাকেন। (৩) প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তাঁর ওপর জয়ী হতে দেন না।

(২) আল্লাহ-ভীতির অর্থ হল, মনে সব সময় ভয় থাকা। আর সবচেয়ে বড় ভীরু সে ব্যক্তি যে লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাজ না করে।

(৩) ধৈর্যের তিনটি স্বর রয়েছে। (১) বিপর্যয়ে পড়ে কোনরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করা। (২) বিপদ-আপদ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বরণ করা। (৩) বিপদ-আপদকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বলে মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া।

(৪) যে দুনিয়া তরক করেছে, তার তওবা তো হয়েই গেছে। এখন সে কাম রিপুকে দমন করতে পারলেই মনে করবে যে, তার বাসনা পূর্ণ হয়েছে।

হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর হযরত সিরজানী রহমাতুল্লাহ একদিন তাঁর কবরের কাছে গেলেন গরীব-দুঃখীর মধ্যে খাবার বিলি করতে। কিন্তু সেদিন একটি লোকও পাওয়া গেল না। তখন হযরত সিরজানী রহমাতুল্লাহ অন্তত একটি লোকও পাওয়া গেল না। তখন হযরত সিরজানী রহমাতুল্লাহ অন্তত একটি মেহমান পাঠাবার জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন। আর একটু পরে সেখানে এল একটা কুকুর। তিনি কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য শব্দ শোনা গেল, তুমি নিজে মেহমানের জন্য প্রার্থনা করলে, মেহমান পাঠালাম অথচ তাকে তাড়িয়ে দিলে।

একথা শুনে বিচলিত হয়ে তিনি কুকুরের সন্ধানে ছুটলেন। অনেক খোঁজার পর অদূরবর্তী এক বনে কুকুরটি পাওয়া গেল এবং তার সামনে খাবার ধরে দেওয়া হল। কিন্তু কুকুরটি তার দিকে ফিরেও তাকালো না। তখন হযরত সিরজানী রহমাতুল্লাহ নিজের কাজের জন্য তওবা করলেন।

এবার কুকুর বলে ওঠে, তুমি তওবা করে উত্তম কাজ করেছ। আল্লাহর দরবারে মেহমানের জন্য প্রার্থনা না করে তুমি যদি চক্ষুষ্মান হওয়ার প্রার্থনা করতে, তাহলে তা ঠিক হতো। জেনে রাখ, তুমি যদি হযরত শাহ শুজা রহমাতুল্লাহ-এর মাজার শরীফ ছাড়া অন্য কোন জায়গায় এরকম অশিষ্টাচার ও ধৃষ্টতা দেখাতে, তাহলে অবশ্যই তুমি কঠিন বিপদে পড়তে।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
আবু তুরাব বলখী
রহমাতুল্লাহ

হযরত আবু তুরাব বলখী রহমাতুল্লাহ এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মেন ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত, তেমনি ছিলেন অকুতোভয়। তরীকতপন্থীদের মধ্যমণি। আবার সুফী সমাজেরও শিরোমণি। তাঁর সহিষ্ণুতা, ধর্মনিষ্ঠাও কিংবদন্তী-তুল্য। তিনি খোরাসানের অধিবাসী ছিলেন।

কথিত আছে, হযরত আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ চল্লিশবার হজ্জ করেন। একটানা বেশ কয়েক বছর মাথার তলায় বালিশ দেননি। একবার বায়তুল্লাহর হেরেম শরীফে নামাজ পড়াকালীন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর স্বপ্ন দেখে, জান্নাতের একদল হুর তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। কিন্তু তিনি তখন আল্লাহর প্রেমে বিভোর। অন্য কিছুর প্রতি আসক্তি নেই। হুরগণ বললেন, আপনি আমাদের গ্রহণ করলেন না শুনলে আমাদের অন্য সঙ্গিনীরা বিদ্রুপ করবে। তখন জান্নাতের কর্মকর্তা রেযওয়ান ফেরেশ্‌তা তাঁদের বললেন, তোমরা এ মুহূর্তে তাঁকে বিরক্ত করো না। তিনি এখন আল্লাহ-প্রেমে মশগুল। তিনি যখন জান্নাতে আসবেন, তখন তোমরা সবাই তাঁর পরিচারিকা সেজে এসো। তখন তাঁকে পাওয়া যাবে।

হযরত ইবনে জাল্লা রহমাতুল্লাহ প্রায় তিন হাজার দরবেশ তাপসের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁদের মধ্যে চার জনকেই তাঁর প্রধান বলে মনে হয়েছে। সে চার জনের মধ্যে আবার আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ-ই হলেন সর্বপ্রধান। ইবনে জাল্লা রহমাতুল্লাহ আরও বলেন, মক্কা শরীফে তাঁকে সতেজ ও প্রফুল্ল অবস্থায় দেখে তিনি একবার প্রশ্ন করেন, আপনি কোথায় যান? উত্তরে হযরত তুরাব রহমাতুল্লাহ বলেন, কখনও বাগদাদে, কখনও বা মক্কা শরীফে।

শোনা যায়, তাঁর কোন শিষ্য একমাস উপবাস থেকে অসহিষ্ণু হয়ে অন্য একটি লোকের কাছে তরমুজের ছোলার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত তুরাব রহমাতুল্লাহ তাঁকে ব্যবসা করার নির্দেশ দেন। কেননা, তাঁর পক্ষে মারেফত হাসিল করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আল্লাহর সঙ্গে আমার এই চুক্তি যে, তিনি যখন কোন অবৈধ বস্তুর দিকে হাত বাড়াবেন, তখন আল্লাহ্ তা থেকে তাঁকে রক্ষা করবেন।

তিনি বললেন, কোনদিন তাঁর মনে কোন কামনার উদ্রেক হয়নি। তবে একবার এক প্রান্তর অতিক্রম করার সময় তাঁর মনের গরম রুটি ও ডিম ভাজা খাওয়ার ইচ্ছা জাগে। আর তা যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়, তার জন্য তিনি দ্রুত পা চালান। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তিনি পথ ভুল করলেন। কিছুক্ষণ পরে একদিক থেকে একদল লোক দৌড়ে এসে তাঁকে চোর বলে ধরে ফেলল। কোন কথা বলার সুযোগই দিল না। শুরু হল নির্যাতন। দুশ' চাবুক পড়ল তাঁর ওপর। প্রাণ যায় যায়। তখন তাদের দলের এক বৃদ্ধ এসে তাঁকে চিনে ফেলে হায় হায় করে ওঠলেন। এ এরা কী করেছে! কাকে মেরেছে এভাবে! বৃদ্ধ তাঁর পরিচয় দিলেন। আর সবাই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাইল। কিন্তু তিনি বললেন, এ লাঞ্ছনাকে আমি জীবনের সৌভাগ্য বলে মনে করি। কেননা, আমার প্রবৃত্তি আজ বেশ শায়েস্তা হয়েছে।

অতঃপর বৃদ্ধ তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। খাবার পরিবেশন করা হলে দেখা গেল গরম রুটিও আছে, আবার ডিম ভাজাও আছে। হযরত তুরাব রহমাতুল্লাহ ডিম রুটির দিকে যেই হাত বাড়ালেন, অমনি অদৃশ্য শব্দ শোনা গেল, মনে রেখ, দুশ' ঘা বেত খাওয়ার পর এ খানা পেয়েছ। এখন খাও। ভবিষ্যতে যখনই তোমার মনে কোন বাসনা জাগবে, তখনই এরূপ শাস্তি গ্রহণ করা ছাড়া তা কখনও পূর্ণ হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একবার হজ্জ যাত্রার সময় তিনি ও হযরত আবুল আব্বাসসহ বেশ কয়েকজন লোক এক মরুপ্রান্তর অতিক্রম করছেন। পান ও ওযু করার জন্য পানির প্রয়োজন দেখা দিল। সঙ্গে যে পানি ছিল, তা ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু খোঁজ করে কোথাও পানি মিলল না। তখন সেটা জানানো হল আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ-কে। তিনি মাটির ওপর পা দিয়ে একটি দাগ টানলেন। আর অমনি একটি ঝরণার সৃষ্টি হল। পানির প্রয়োজন মিটল। একজন পেয়ালায় পানি পান করার ইচ্ছা প্রকাশ করল হযরত আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ মাটির ওপর হাত দিয়ে একটি আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে থেকে কয়েকটি সাদা পেয়ালা বে'র হয়ে এল। লোকটির ইচ্ছা পূরণ হল। হযরত আবুল আব্বাস রহমাতুল্লাহ মক্কা শরীফ, পৌছানো পর্যন্ত পেয়ালাগুলো তাঁদের সঙ্গে ছিল।

হযরত আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ আবুল আব্বাস রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করেন, দরবেশদের কাশফ কারামত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, খুব কম লোকই এর ওপরে বিশ্বাস রাখে। তাঁর এ জবাব শুনে হযরত আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ বললেন, যিনি ঈমানদার, তিনি এ দুটি বিশ্বাস না করে পারেন না।

এক গভীর অরণ্যে এক হাবশীর সঙ্গে হযরত তুরাবের রহমাতুল্লাহ দেখা হয়। তিনি ভীত স্বরে বললেন, আপনি কী মানুষ না জ্বিন? হাবশী তার জবাব না দিয়ে পাল্টাটা প্রশ্ন করেন, আপনি কী মুসলমান না কাফের? হযরত তুরাব রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি মুসলমান। তখন হাবশী বললেন, মুসলমান তো কখনও আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে পারে না। হযরত আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ বুঝলেন, তাঁকে সতর্ক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ঘটনাটির অবতারণা করা হয়েছে।

এক নির্জন প্রান্তরে এক দরবেশের সঙ্গে হযরত আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ-এর দেখা। দরবেশের সঙ্গে পাথেয় কিংবা কোন মাল-পত্র নেই। অথচ তিনি সফরে বেরিয়েছেন। এ বিষয়ে দরবেশকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানালেন, আল্লাহ যাদের সঙ্গে থাকেন, তাদের আবার অন্য জিনিসের কী দরকার?

হযরত আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ পুরো একটি বছর কারো কাছে কিছু চাননি। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, আমার যখনই যা কিছুর দরকার হয়েছে, আল্লাহর কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছি। আর যখন দরকার হয়নি তখন কিছুই চাইন। তিনি বলতেন, মানুষ যদি সত্যনিষ্ঠ হয় তাহলে পুণ্য কর্ম করার পূর্বেই সে তার স্বাদ পেয়ে যায়।

তিনি বলতেন, তিনটি বস্তুর প্রতি আসক্তি মানুষে ক্ষতির কারণ। যথাঃ (১) নফসের প্রতি, (২) জীবনের প্রতি ও (৩) ধন-সম্পদের প্রতি। এ তিনটির মধ্যে কোনটিই মানুষের নিজের নয়। বরং প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর। যেমন, নফস হল আল্লাহর দাস। জীবনের মালিকও আল্লাহ্। আর ধন-সম্পদেরও প্রকৃত অধিকারী তিনিই।

মানুষ আরও দু'টি জিনিসের খোঁজ করে। কিন্তু তার খোঁজ পাওয়া সম্ভব নয়। সে দু'টি জিনিস হল শান্তি আর আনন্দ। এ দু'টি জান্তাতের নিজস্ব বস্তু। অর্থাৎ প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ কেবল জান্নাতেই পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, আল্লাহকে পাওয়ার সোপান সত্তরটি। তার মধ্যে সর্বোচ্চ সোপান হল তাওয়াক্কুল ও সর্বনিম্নটি হল আল্লাহকে স্বীকার করা।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ দ্বীন প্রচার ও মানুষকে জ্ঞানোপদেশ দেবার জন্যই আলেমদের সৃষ্টি করেছেন।

তাঁর কথা হল, কোন ব্যাপারে কারও মুখাপেক্ষী না হওয়াই হল সচ্ছলতা। আর অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়াই হল দারিদ্র।

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, আপনার কিছু দরকার হলে আমাকে জানাবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি বললেন, আমার তো খোদ আল্লাহর কাছেই কিছু জানাবার নেই। কেননা, আমি তাঁর খুশীতেই খুশী। তিনি যখন যেভাবে আমাকে রাখতে চান, আমিও ঠিক তখন সেভাবেই থাকতে চাই। অতএব, কারও কাছে আমার কিছু চাইবার ও বলবার নেই।

শোনা যায়, বসরার কোন এক বনে তাঁর মৃত্যু হয়। হয়ত বা লোকের অভাবে তাঁর কাফন-দাফন হয়নি। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পর কিছু লোক ঐ বনে গিয়ে দেখে তাঁর মরদেহ একখানা লাঠিতে ভর দিয়ে কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁট দু'খানি শুকনা। কিন্তু অতদিন পরেও তাঁর মৃত দেহের কোন ক্ষতি হয়নি।

হযরত
ইব্রাহীম ইবনে দাউদ রুকী
রহমাতুল্লাহ

হযরত ইব্রাহীম ইবনে দাউদ রুকী রহমাতুল্লাহ শাম দেশের অন্যতম সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁর কঠোর সাধনা বিস্ময়কর। তিনি ভিন্ন-বিশ্রুত তাপস হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-এর সমসাময়িক। হযরত ইবনে আতা রহমাতুল্লাহ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাল্লা রহমাতুল্লাহ ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। মাত্র একটি ফকিরী পশমী পিরহান পরে একটানা চল্লিশ বছর কাটিয়ে দেন।

একদিন এক বনবাসী দরবেশ এসে তাঁকে বলেন, বনটি হিংস্র-শ্বাপদে পূর্ণ। তাতে এবাদত বন্দেগীতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে। তিনি হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ-এর পবিত্র পোশাকের একটি টুকরো প্রার্থনা করেন। সেটি তাঁর পিরহানের সঙ্গে সেলাই করে দিলে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি নির্বিঘ্ন হতে পারেন বলে তাঁর দরবেশী পোশাকের একটি ছিন্ন অংশ তাঁর জামার সঙ্গে সেলাই করে দিলেন।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বনবাসী তাপস বসে আছেন এক ঝর্ণার পাশে। হঠাৎ গন্ধ পেলেন বাঘের। বনের মধ্যে অন্য জীব-বন্তুর একটি হুটপাট শব্দও শোনা গেল। তিনি কিন্তু নির্বিকার। সহসা বনের একদিক থেকে ভেসে এল গম্ভীর গর্জন। আর দেখতে দেখতে একটি বিশাল আকারের বাঘ সবেগে তাঁকে লক্ষ্য করে লাফ দিল। চলে এল তাঁর খুব কাছাকাছি। কিন্তু, কী যে হল, সে আরও এগিয়ে এসে তাঁর কাছে মুখ নিচু করে দাঁড়াল। মনে হল, সে যেন দরবেশের পিরহানের গন্ধ শুঁকছে। এভাবে আধ মিনিট কাটার পর বাঘটি ধীরে ধীরে গভীর বনে চলে গেল।

হযরত ইব্রাহীম ইবনে দাউদ রহমাতুল্লাহ-এর তত্ত্বপূর্ণ কথাগুলো হচ্ছে ঃ

১. মারেফাত সত্যের সমর্থক।

২. আল্লাহর কুদরত প্রকাশ্য এবং মানুষের চোখও খোলা। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি যে নেই।

৩. আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্বের নিদর্শন হল তাঁর এবাদত-বন্দেগী পছন্দ করা ও আল্লাহর নবীর অনুসরণ করা।

৪. রিপুর লালসা দমনে যে অক্ষম সে দুর্বলতম মানুষ। আর যে সক্ষম সে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

৫. সাহস অনুসারে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয়। অবশ্য সে সাহস পার্থিব কর্মে নয়। সে সাহস অর্থহীন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে সাহস দেখাতে পারে সেই সাহসই আসল সাহস। এ ধরনের সাহসীদের মূল্য অসীম, অফুরন্ত।

৬. আল্লাহর প্রতিশ্রুতির দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তাতে সুখী হওয়ার নামই তাওয়াক্কুল।

৭. আল্লাহ যার যা ভাগ্য নির্দিষ্ট করেছেন, যেভাবেই হোক তার কাছে তা পৌঁছে যাবেই। কোন সন্দেহ নেই।

www.AmarIslam.com

৮. বেশী চাইলেই দুঃখ কষ্ট বরণ করতে হবে।

৯. দরবেশগণের আল্লাহ নির্ভরতাই যথেষ্ট। আর ধনীদের নির্ভরতা ধনের ওপর।

১০. যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ওপর তোমার এতটুকু সন্দেহ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে তোমার ঠাঁই হবে না।

১১. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে ইজ্জতের আশা রাখে, সে ইজ্জত লাভের বদলে বেইজ্জত হয়ে যায়।

১২. হযরত ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি দু'টি জিনিসই পছন্দ করি। একটি হল দরিদ্রের সংস্পর্শ। আর অন্যটি হল আল্লাহর ওলীদের সম্মান প্রদর্শন করা।

হযরত
জুনায়েদ বাগদাদী
রহমাতুল্লাহ

একাধারে আলেম ও দরবেশ, ইসলামী জ্ঞানের প্রকাশ্য শাখার বিদগ্ধ পণ্ডিত, মুফতী, আবার জ্ঞানের গূঢ় শাখার অগ্রগামী পুরুষ হলেন হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ। বাগদাদের অধিবাসী বলেই বাগদাদী উপাধি। প্রখ্যাত তাপস হযরত সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ-এর ভাগিনা তিনি। তাঁর সম্বন্ধে বড় করে বলার কথা এই যে, সমকালের বিভিন্ন পন্থী সাধক এক বাক্যে তাঁকে নিজেদের ইমাম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁকে শায়েখদের কেন্দ্রও বলা হত।

আসলে তিনি ছিলেন শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত সমুদ্রের এক অনুসন্ধানী বিজ্ঞানী। জাতির মুখপাত্র, জাতির গৌরব। এক কথায় তিনি ছিলেন যুগ-প্রবর্তক। তাছাড়া তিনি ছিলেন এক অসাধারণ লেখক। তাঁর রচিত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ পৃথিবীর এক মহামূল্যবান সম্পদ।

অনেকে বলেন, মারেফাতের এত যে বিস্তৃতি ঘটেছে, তার মূলে তিনিই। কিন্তু দুঃখের কথা, এক শ্রেণীর লোক তাঁকে কাফের বলতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু নিন্দুকদের কটুক্তি অসার প্রতিপন্ন করে তিনি সমকালের যুগ-পুরুষ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছেন।

একবার হযরত সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়, মুরীদের মর্যাদা কি মুর্শিদের চেয়ে বেশী হতে পারে? তিনি বলেন, কেন পারে না? এ ব্যাপারে তোমরা আমার এবং আমার ভাগিনার অবস্থাটা দেখতে পার। সে আমার শিষ্য বটে, কিন্তু আল্লাহর রহমতে মর্যাদার দিক দিয়ে সে আমা অপেক্ষা উন্নত।

তাঁর সম্বন্ধে হযরত সোহায়ের তসতরী রহমাতুল্লাহ বলেন, যদিও হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর মর্যাদা অন্যান্য তাপসের চেয়ে উন্নত এবং যদিও তিনি হযরত আদম (আঃ)-এর মতো উপাসনানিষ্ঠ, তবুও তরীকতপন্থার কঠোরতা সহ্য করতে তাঁর কষ্ট হত। হযরত সোহায়েল রহমাতুল্লাহ-এর এ উক্তি খুবই রহস্যময়-যার মর্ম উদঘাটন করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

তিনি যে একদিন বড় হবেন, তা বাল্যকালেই তাঁর চরিত্রে প্রকাশ পায়। তখন থেকেই তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, খুবই সচেতন ও ধর্মভীরু। একদিন মাদ্রাসা থেকে তিনি বাড়ি ফিরছেন, দেখলেন তাঁর পিতা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হযরত সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ-কে [হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর মামা] কিছু যাকাতের মাল পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে ফেরত দিয়েছেন। হয়তো তিনি তাঁর মাল হালাল বলে মনে করেননি। অথচ এগুলো সম্পূর্ণ বৈধ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শিশু জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ পিতার কাছ থেকে যাকাতের অর্থ নিয়ে সোজা চলে গেলেন মামার কাছে। মামার বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। তিনি দরজায় করাঘাত করলেন। ভেতর থেকে শব্দ এল, কে? জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাঁর পরিচয় দিলেন। জানালেন, যাকাতের মাল নিয়ে এসেছেন। মামা বললেন, ওগুলো তিনি রাখবেন না। জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, মামা! কসম আল্লাহর, যিনি আপনার প্রতি অনুগ্রহ ও আব্বার প্রতি ন্যায়বিচার করেছেন।

সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ বললেন, তিনি তোমার পিতার প্রতি কী ন্যায়বিচার করেছেন এবং আমার ওপরই বা কী অনুগ্রহ করেছেন? জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি যে ফকিরী অর্জন করেছেন, এটি তাঁরই অনুগ্রহ; আর আমার পিতাকে দুনিয়ার ধনে ধনী করে সংসারী করেছেন। এটিই তাঁর প্রতি ন্যায়বিচার। এখন ইচ্ছা হলে আপনি এ মাল গ্রহণ করতে পারেন আর না করলে আমার বলার কিছু নেই। হযরত সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ ভাগ্নের কথায় খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, যাকাত গ্রহণের আগে আমি তোমাকেই গ্রহণ করছি। এই বলে তিনি দরজা খুলে দিলেন এবং আদরের ভাগনেকে হৃদয়ের মধ্যে দিলেন।

জুনায়েদের বয়স যখন সাত, তখন তাঁকে নিয়ে হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ হজ্বে গমন করেন। ঐসময় কাবা ঘরে চারশ' জ্ঞানী ব্যক্তি সমবেত হন। একদিন তাঁদের মধ্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা বিষয়ে আলোচনা হয়। সবাই যে যার অভিমত প্রকাশ করেন। অবশেষে হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ শিশু জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-কে কিছু বলতে বলেন। জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নিচু করে সবিনয়ে বললেন, আল্লাহ্ আমাদের যেসব কিছু দান করেছেন, তা লাভ করে আমরা যেন তার অবাধ্য না হই। আর তার অবদানকে পাপের উপকরণে বা কারণে পর্যবসিত না করি। এটাই হল আমাদের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। শিশুর কথা শুনে সবাই একবাক্যে তারীফ করে বললেন, তার কথাটাই সঠিক ও সর্বোত্তম।

হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ কথা কোথা থেকে শিখলে? তিনি বললেন, আপনার সাহচর্যে থেকেই শিখেছি।

হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ বাগদাদে ফিরে এসে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ কাচের ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর দোকানের সামনে একখানি পর্দা টাঙানো থাকত। তিনি পর্দার আড়ালে দৈনিক চারশো' রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করতেন। কিছুদিন পর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে হযরত সাররী সাকতী রহমাতুল্লাহ-এর বাড়ির সামনে এক কোঠায় বসে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হন। ক্রমে ক্রমে তিনি এমন বিভোর হয়ে যান যে, তাঁর সামনের নিম্নভাগ হতে জায়নামাজ সরিয়ে ফেলতেন, যেন আল্লাহর ধ্যান ছাড়া তাঁর মনে আর কোন ভাবনার উদয় না হয়।

এভাবে কেটে যায় চল্লিশ বছর। এর মধ্যে ত্রিশ বছর কাটে বিচিত্রভাবে। এই দীর্ঘ সময় এশার নামাজের পর তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লার ধ্যান করেছেন। আর এশার ওজুতেই ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। একদিন তিনি অদৃশ্য আওয়াজ শুনতে পেলেন। এখন তোমার বুত পোরস্তীর পৈতা দেখাবার সময় হয়েছে। তিনি বলেন, দয়াময়, জুনায়েদের কী পাপ হয়েছে বলুন। তখন আবারও শব্দ এল, তুমি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। এখনও তুমি নিজেকে ডুবিয়ে দাওনি। এর চেয়ে তুমি আর কী পাপ দেখতে চাও? তখন একটি দীর্ঘশ্বাস টেনে লজ্জায় মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, আহা!

হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর নির্জনবাসের বিরোধিতা শুরু হল এবার। লোকেরা

www.AmarIslam.com

খলিফার দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। কিন্তু খলিফা বললেন, আপত্তিকর কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ না পেলে তার প্রতি কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। বিরোধিতাকারী বলল, তাঁর কাজে ও কথায় মানুষ পথভ্রষ্ট হচ্ছে। খলিফা তখন গোপনে তাঁকে পরীক্ষা করার কথা ভাবলেন। তাঁর এক রূপসী বাঁদী ছিল। তিন হাজার দিরহাম মূল্যে তাঁকে ক্রয় করেন। খলিফা স্বয়ং তাঁর রূপমুগ্ধ ছিলেন। এক রাতে তিনি তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে পাঠালেন। সে যেন অভিনয়-ভঙ্গি করে তাঁকে জানায় যে, তার প্রচুর বিত্ত আছে। কিন্তু এখন সে সবের প্রতি বীতস্পৃহ। তিনি অনুগ্রহ করে তাকে যেন আশ্রয় দেন। সে হযরতের ভালোবাসায় থেকে আল্লাহর এবাদতে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। এখন তার মন শুধু এখানেই পড়ে থাকতে চায়। খলিফা টোপ হিসেব রূপসীকে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

যথাসময়ে তাঁর কাছে দাসী তার ঘোমটা খুলল। একবার চোখ তুলতে গিয়ে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর দৃষ্টিও পড়ল তার ওপর। আর তিনি মাথা নিচু করলেন। রূপসী যথারীতি তার শেখানো বুলি আওড়ে গেল। অভিনয়-ভঙ্গি বা বচন কুশলতার কোন ত্রুটি ঘটল না।

হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাঁর সব কথা নীরবে, নতমস্তকে শুনে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে একবার আহ্ বলে চিৎকার করে উঠলেন। সে চিৎকারে কী যেন ঐশী শক্তি নিহিত ছিল। রূপসী তা সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। খলিফার হুকুম তামিল করতে গিয়ে একটি তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেল। ফলাফল কী হয় জানার জন্য খলিফা এক ভৃত্যকেও তার পেছনে পাঠান। সে ফিরে এসে খলিফাকে সবকিছু নিবেদন করে। আর অনুতাপে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল খলিফার মন। কাজটা যে ভালো হয়নি, তা উপলব্ধি করে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ চলে এলেন হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। তাঁর অমাত্যগর্ব অবশ্য পরামর্শ দেন যে, হযরত জুনায়েদের রহমাতুল্লাহ দরবারে না গিয়ে বরং তাঁকেই দরবারে তলব করা হোক। কিন্তু খলিফা আর দ্বিতীয়বার ভুল না করে তাঁর কাছেই গেলেন।

বিনীত কণ্ঠে বললেন, হযরত, আপনি এমন সোনার প্রতিমাকে পুড়িয়ে দিলেন কেন? আপনার প্রাণে কি দয়ামায়া নেই?

হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি জনগণের রক্ষক। অথচ আপনি চাইলেন একটি মানুষের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বিনিদ্র, পরিশ্রম-ক্লিষ্ট সুকঠিন সাধনা সামান্য একটি নারী বরবাদ করে দিক। এটা কী করে সম্ভব? যাই হোক, আশা করি ভবিষ্যতে আর কখনও এ ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হবেন না।

অতঃপর তিনি প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দিতে শুরু করেন। কথিত আছে, তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি নিজে থেকে এই ওয়াজ-নসীহতে শামিল হননি। প্রায় চল্লিশ জন তাপসের ধারাক্রমিক অনুরোধে তিনি এ কাজে ব্রতী হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, প্রায় দুশ' জন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী সাধকের তিনি সেবা করেছেন। আর তাঁর শিক্ষাগুরু সংখ্যাও ছিল প্রায় ষাট। যাই হোক, তাঁর ভাষণের এই ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপদেশমালাও ছিল তেমনি মূল্যবান। তাঁর উপদেশবাণীগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. যিনি ডান হাতে আল্লাহর কুরআন ও বাম হাতে নবীজীর হাদীস নিয়ে পথ চলেন, যাতে কোনরূপ হোঁচট খেতে না হয় বা কোন প্রকার সন্দেহ ও বিপথগামী হতে না হয়, এমন লোকেরই সাধনমার্গে পথ চলা শোভা পায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. তিনি বলেন, তাঁর যা কিছু মাহাত্ম্য মর্যাদা, সবই অর্জিত হয়েছে ক্ষুধা, রাত্রি জাগরণ ও সংসার বৈরাগ্যের ফলে।

৩. হযরত আলী রহমাতুল্লাহ সম্বন্ধে তিনি বলেন, তিনি মারেফাতের মৌলিক তত্ত্ব উদঘাটন করেন। সাধনায় কষ্টসহিষ্ণুতার দরজার উন্মুক্ত করেন। আল্লাহ্ তাঁকে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা পরিশোভিত করেন মারেফাতের ক্ষেত্রে। হযরত আলী রহমাতুল্লাহ বলেন, আল্লাহ্ আমাকে নিজেই তাঁর আত্মপরিচয় দান করেছেন। আল্লাহ্ এমন এক সত্তা, যার কোন তুলনা হয় না। কোন আকারের আদলে তাঁকে কল্পনা করা যায় না। কোন সৃষ্টির দ্বারা তাঁকে অবধারণ করা যায় না। তিনি কোন কিছুর অনুরূপ নন এবং কোন কিছু থেকে সৃষ্টও নন। তাঁর সত্তা এমন নয় যে, অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে তাঁর পরিচয় দান করা যেতে পারে।

সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী তিনি, যিনি আল্লাহর সত্তা বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

হযরত আলী রহমাতুল্লাহ বলেন, দশ হাজার নিষ্ঠাবান শিষ্য নিয়ে আমি মারেফাতের পথে, একত্ববাদের সমুদ্রে ডুব দিয়েছিলাম। সেই সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে আমি ঈমানের এক সূর্যে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম। ব্যস, এতটুকু যে বুঝে নিল, বুঝে নিক, এর বেশী আর ব্যাখ্যা করা চলে না। তাতে পভ্রষ্টতার আশঙ্কা আছে।

৪. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বলেন, হাজার বছরের আয়ুলাভ করলেও আল্লাহর নিষেদ ছাড়া তিনি পুণ্য চর্চা থেকে পলকের তরেও বিরত হবেন না।

৫. সৃষ্টি জগতে যে পাপকর্ম চলে, তা আমার ক্লেশের কারণ। কেননা, সৃষ্টি মাত্রকেই আমি আমার শরীরের অঙ্গ বলে মনে করি। কেননা, মুমিন বা বিশ্বাসী একটি মাত্র সত্তার মতো। এই জন্যে রাসূলে কারীম রহমাতুল্লাহ বলেন, আমাকে যত বেশী দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হয়েছে, ততটা তার কোন নবীকে দেওয়া হয়নি।

৬. আমি দীর্ঘ দিন ধরে পাপীদের অবস্থা কী হবে তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এখন আমার নিরেজ কাছে নিজেরই খবর নেই। আকাশ পৃথিবীর খবরও জানি না।

৭. দশ বছর ধরে হৃদয় আমার হেফাজত করেছে, আমিও তার হেফাজত করছি। কিন্তু এখন অবস্থা এমন যে, আমি তার খবর রাখি না, সে-ও আমার খবর রাখে না।

৮. মারেফাত সাধনার সাধারণ শাখাগুলো বিশ বছর ধরে মানুষকে বলে আসছি। কিন্তু গূঢ় কথা প্রকাশ করিনি। কেননা, সে ব্যাপারে জিভকে নিষেধ করা হয়েছে। আর মনকেও তা অনুধাবন করতে অক্ষম করা হয়েছে।

৯. রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ যদি আমাকে বলেন, আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, তবে আমি বলব, না, দৃষ্টিপাত করব না। কেননা, চোখ তো আমার আপন নয় বরং অপর তুল্য। অতএব, বন্ধুর দিকে নিজস্ব দৃষ্টি মাধ্যমে না দেখা হলে আমি এ কাজ থেকে বিরত থাকব।

১০. যখন জানতে পারলাম, অন্তর থেকে যা বলা হয় তাই হল বিশুদ্ধ কালাম। তখন আমি আমার ত্রিশ বছরের নামাজ আবার নতুনভাবে পড়লাম। তারপর ত্রিশ বছর ধরে আমি এই রীতি পালন করছি যে, নামাজের মধ্যে যদি পৃথিবীর কথা মনে আসে তাহলে আমি নামাজের পুনরাবৃত্তি করি। যার মধ্যে পরকালের কথা মনে হয় তাতে সেজদায়ে সহু আদায় করি।

১১. যদি আমি জানতাম যে, তোমাদের উপদেশ দান করা অপেক্ষা নামাজ আদায় উত্তম, তাহলে নিশ্চয়ই উপদেশ দান থেকে বিরত থাকতাম।

১২. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বছরভর নফল রোজা রাখতেন। তবে ঘরে মেহমান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এলে রোজা ভেঙে দিতেন। বলতেন, মেহমানের সঙ্গে পানাহার করার মূল্য নফল রোজার চেয়ে কম নয়।

১৩. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ ও হযরত আবু বকর আসায়ী রহমাতুল্লাহ-এর মধ্যে মারেফাততত্ত্ব বিষয়ক প্রায় এক হাজার মাসআলা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। হযরত আবু বকর রহমাতুল্লাহ হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-কে মৃত্যুর আগে বলে যান, মাসআলাগুলি যেন তাঁর সাথেই দাফন করা হয়। এর জবাবে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বলেন, মাসআলাগুলি এভাবে অন্যের হাতে পড়ার চেয়ে আপনার ও আমার বুকের মধ্যেই গুপ্ত থাক।

১৪. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ যখন জ্ঞান বিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর মামা হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ তাঁকে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেবার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, আপনার বর্তমানে আমার পক্ষে এ কাজ শোভনীয় নয়। কিন্তু ঐ রাতেই এ বিষয়ে তিনি রাসূটটলে করীমের স্বপ্নাদেশ পান। আর মামার কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলার আগেই তিনি (হযরত সাকতী (রাঃ) বলেন, তুমি কি এখনও চাও যে, ওয়াজ-নসীহতের জন্য মানুষ তোমাকে আরও অনুরোধ করুক? খোদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন নির্দেশ দিয়েছেন, এখনও তোমার আপত্তি আছে কী? হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহর স্বপ্নাদেশের কথা জানালেন কী করে? হযরত সাকতী রহমাতুল্লাহ বললেন, আজ রাতে স্বয়ং আল্লাহ্ পাককে বলতে শুনলাম, আমি মুহাম্মদ (সঃ)-কে এই জন্য প্রেরণ করলাম যে, তিনি জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাগাদা দেবেন। যাই হোক, হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বক্তৃতা দিতে রাজি হলেন, তবে একটি শর্ত আরোপ করলেন এই মর্মে যে, তাঁর সভায় চল্লিশ জনের বেশী শ্রোতা থাকবে না।

১৫. একবার চল্লিশ জনের এক সভায় তিনি ভাষণ দিলেন, বাইশ জন শ্রোতা জ্ঞান হারায়। আর আঠারো জন মারা যায়।

১৬. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ একবার নিজের মন হারিয়ে ফেলেন। তা ফিরে পাবার আশায় তিনি আল্লাহর দরবারে আবেদন জানান। কিন্তু অদৃশ্য শব্দ শোনা যায়- আমি এই জন্য তোমার মন হরণ করেছি, যাতে তুমি আমার সঙ্গে থাক। তুমি কি অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য মন ফিরে পেতে চাও?

১৭. আপনি এতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন কী করে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ চল্লিশ বছর আমার পীরের দরজায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে এ মর্যাদা লাভ করেছি।

১৮. হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ একবার বললেন, আল্লাহ্ যদি তাঁকে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশের অনুমতি দেন তাহলে তিনি জাহান্নামই পছন্দ করবেন। কেননা, জান্নাত হল তাঁর পছন্দের স্থান আর আল্লাহ্ পছন্দ করেন জাহান্নাম। সুতরাং সু বন্ধুর পছন্দনীয় স্থানকে অপছন্দ করা বন্ধুর কাজ নয়। এ কথাটি হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বললেন, আমি তো আল্লাহর দাস হিসেবে কোন কিছুরই অধিকারী বলে দাবীকরতে পারি না। দাসের আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি? তাই আমাকে ঐরূপ অধিকার দিলে বলব, দয়াময়, আপনি আমাকে যেখানে পাঠাবেন আমি সেখানেই যাব। আপনার যা পছন্দ আমি তাতেই সুখী।

১৯. বনবাসিনী এক বৃদ্ধা হযরত রুয়েম রহমাতুল্লাহ-কে বলে পাঠালেন, তিনি যেন বাগদাদে পৌঁছে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-কে বলেন, জনগণের সম্মুখে আল্লাহর ধ্যান করতে তার কি লজ্জা হয় না? একথা শুনে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বলেন, আমি জনগণের সামনে আল্লাহর ধ্যান করি এই জন্য যে, কারও দ্বারাই তাঁর ধ্যানের হক পুরোপুরি আদায় হচ্ছে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২০. এক ব্যক্তির স্বপ্নে দেখলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-কে। কেউ একজন প্রশ্ন করল, নবীজী নিজে উত্তর না দিয়ে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে জেনে নেবার ইশারা করলেন। কিন্তু জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, যেখানে স্বয়ং রাসূলে কারীম হাজির, সেখানে অন্য লোকের কী প্রয়োজন? তখন নবী মুস্তফা (সঃ) বললেন, প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ উম্মতের গৌরব করে থাকেন। বস্তুত আমি আমার উম্মতগণের মধ্যে জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-কে নিয়ে বেশী গৌরব বোধ করি।

২১. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ একবার হযরত জাফর ইবনে নসর রহমাতুল্লাহ-কে একটি দিরহাম দিয়ে আঞ্জীর ও যাইতুনের তেল কিনে আনতে বললেন। ইফতারের সময় আঞ্জীর মুখে দিয়েই আবার তা মুখ থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেললেন। হযরত জাফর রহমাতুল্লাহ এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এইমাত্র অদৃশ্য শব্দ শুনলাম। বলা হল, আল্লাহর ধ্যানের জন্য যে বস্তু বর্জন করেছিলেন, আবার তার দিকে আকৃষ্ট হলেন কেন?

২২. একজন সাধক রোগ-যন্ত্রণায় জর্জারিত হয়ে কান্নাকাটি করছেন। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, এই কান্না দিয়ে আপনি কার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছেন? দরবেশ চুপ করে রইলেন। তিনি তাঁকে আবারও বললেন, এখন আপনি কার জন্যে ধৈর্যধারণ করছেন? রোরুদ্যমান অবস্থায় সাধক বললেন, আমার নিজস্ব কান্নার কোন উপকরণ নেই। আর ধৈর্য ধরারও কোন শক্তি নেই।

২৩. একবার পায়ের ব্যথা শুরু হতেই হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ সূরা ফাতিহা পাঠ করে ফুঁ দিলেন। আর অমনি অদৃশ্য আওয়াজ ভেসে এল, আমার পবিত্র কালামকে তুমি তোমার নফসের কাজে ব্যবহার করছ, এতে কি তোমার এতটুকু লজ্জা হচ্ছে না?

২৪. একবার চোখের অসুখ দেখা দিল। এক অগ্নিপূজক চিকিৎসক চোখে পানি দিতে বারণ করলেন। তিনি বললেন, তা কি করে হয়? ওজু করতে হবে তো। চিকিৎসক কিছু না বলে চলে গেলেন। অতঃপর হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ ওজু করে এশার নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে গেলেন। সকালে ঘুম ভাঙলে দেখা গেল অসুখ সেরে গেছে। তখন তাঁর কাছে অদৃশ্য শব্দ এল-এবাদতের কারণে তিনি চোখের অসুখের কথা উপেক্ষা করছেন। তাই আল্লাহ্ তাঁর অসুখ সারিয়ে দিয়েছেন। পরে তাঁর চক্ষু চিকিৎসক জিজ্ঞেস করলেন, একটি রাতের মধ্যে এ অসুখ সারলো কী করে? তিনি বললেন, ওজু করার কারণে। তখন চিকিৎসক বললেন, আসলে আমিই ছিলাম রোগী, আর আপনি চিকিৎসক। অতঃপর তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

২৫. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে গমনরত এক জ্ঞানী ব্যক্তি দেখলেন শয়তান ইবলীস কোথায় যেন দৌড়ে পালাচ্ছে। আর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ রীতিমত ক্রুদ্ধ। থখন জ্ঞানী বললেন, হুজুর ক্রোধ সংবরণ করুন। কেননা, ক্রোধের অবস্থায় শয়তান জয়লাভ করেন। তিনি পথে দেখা ঘটনাটিও বললেন। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, সে আমাকে ক্রুদ্ধ দেখলেই পালিয়ে যায়। কেননা, প্রবৃত্তিগত কারণে আমি তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করি না। বরং তা' আল্লাহর জন্য। আর অন্য লোকের রাগ হয় নফসের তাড়নায়। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং যদি দুরাচার শয়তানের হাত থেকে অব্যাহতি লাভে প্রার্থনার আদেশ না দিতেন, তাহলে আমি কখনই তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা করতাম না। কেননা, সে নিজেই আমার ক্রোধের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। তার থেকে পরিত্রাণ লাভের কামনা করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

২৬. একবার ইবলীস দাঁড়িয়ে আছে মসজিদের বাইরে মানুষের রূপ ধরে। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাকে সনাক্ত করে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত আদম (আঃ)-কে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সেজদা করতে কে তোমাকে নিষেধ করেছিল? উত্তর না দিয়ে ইবলীস পালটা প্রশ্ন করে, আপনি বলুন তো, আমার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে সেজদা করা কি জায়েজ ছিল?

ইবলীসের এই তাৎক্ষণিক সূক্ষ্ম প্রত্যুত্তর শুনে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ হতবাক হয়ে গেলেন। তখন ধ্বনিত হল অদৃশ্য কণ্ঠঃ তুমি ইবলীসকে বল, তুই ভীষণ মিথ্যাবাদী। সত্যবাদী হলে হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার আল্লাহর আদেশ কখনই অমান্য করতে পারতি না। কেননা, আল্লাহর আদেশ অগ্রাহ্য করার অধিকার কারোর নেই। ইবলীস অনুমান করতে পারলো যে, হযরতের প্রতি অদৃশ্য বাণী এসে গেছে। অতএব, কালবিলম্ব না করে সে দৌড়ে পালাল।

২৭. একটি লোক দরবারে বারবার বলছিল-এ যুগে ধর্ম-ভ্রাতা আর ধার্মিকের সংখ্যা একেবারেই কমে গেছে। হযরত কথাটি কয়েকবার শুনলেন। তারপর বললেন, তুমি যদি এরূপ ধর্ম-ভ্রাতা চাও যে তোমার বোঝা বহন করতে সক্ষম, তাহলে তা সহজে মিলবে না ঠিকই, তবে তুমি যদি এমন লোক চাও যে, তুমি তার বোঝা বহন করবে, তাহলে এমন লোক তোমাকে অনেক দেখাতে পারি।

২৮. একবার তাঁকে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, সারা জীবন ধরে আমি আপদ-বিপদের খোঁজ করছি এই জন্য যে, তেমন কিছু এলে আমিই তার প্রথম শিকার হতে এগিয়ে যাব। কিন্তু, আমি শুধু শুনেই যাচ্ছি যে, আমার সাধনা এখনও বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো শক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন হয়নি।

২৯. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় ইবনে শুরাইহকে। তাঁর উক্তিগুলি কিরূপ মনে করেন?

ইবনে শুরাইহ বললেন, খুবই আশ্চর্যজনক। কথাগুলি তিনি কি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি বলে বলেন? ইবনে শুরাইহ বললেন, তা বলতে পারি না। তবে এটা ঠিক যে, কথাগুলি সবই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয়, যেন আল্লাহ্ তাঁর মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন। তিনি আরও বললেন, আমার এ মন্তব্যের প্রমাণ এই যে, তিনি তওহীদের ওপর কথা বলেন, তখন সেগুলি এমন নতুন ধরনের হয় যে, সবাই তা অনুধাবন করতে সক্ষম।

৩০. একবার একটি লোক তাঁকে বললেন যে, তাঁর বক্তৃতার বক্তব্য তিনি বুঝতে পারছেন না। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি সত্তর বছরের উপাসনা পায়ের নিচে রেখে তথা কবরস্থ করে মাথা নিচু করে বসে যাও। তারপর দেখ বুঝতে পারছ কিনা। যদি তারপরও বুঝতে না পার, তাহলে জানব, আমার ত্রুটিই তার কারণ।

৩১. এক ব্যক্তি তাঁর ভাষণদানের সময় তাঁর খুব প্রশংসা করল তা শুনে তিনি বললেন, আসলে সে আল্লাহ্ পাকেরই তারীফ করছে।

৩২. মনে কখন শান্তি আসে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, যখন আল্লাহ্ অন্তরে বিরাজ করেন।

৩৩. এক ব্যক্তি তাঁকে পাঁচশ' দীনার উপহার দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে আরও অর্থ আছে কিনা। তার ইতিবাচক উত্তরে তিনি বললেন, তুমি এ টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, এতে আমার চেয়ে তোমার প্রয়োজনই বেশী। আমার কাছে যেমন কিছুই নেই, তেমনি আমার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তোমার নিকট যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও তুমি আরও অর্থের মুখাপেক্ষী।

৩৪. এক ভিখারী তাঁর কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করলে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর মনে হল, লোকটি কাজ করে খেতে পারে, সুতরাং তার ভিক্ষাবৃত্তি বৈধ নয়। অতএব তাকে কিছু না দিয়েই ফিরিয়ে দিলেন। ঐ রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাঁর সামনে ঢাকা দেওয়া খাবারের থালা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, খান। ঢাকনা তুলে দেখলেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খাবার নয়, একটি লাশ। আর দিনের বেলা যে ভিখারীকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তারই লাশ। তিনি বললেন, আমি তো লাশ খাই না। উত্তর হল, তাহলে দিনে তাকে কী করে খেয়ে ফেললে? তখন হযরতের খেয়াল হল, আসলে ভিখারীর সঙ্গে যে ব্যবহার হয়েছিল, এ তারই শাস্তি।

৩৫. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তখন মক্কা মোয়াজ্জমায়। এক নাপিত এক ধনী ব্যক্তির মাথা মুড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি নাপিতকে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার চুলগুলি কেটে দেবে কি? নাপিত বলল, নিশ্চয়ই। বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি পানিতে ভরে উঠল। যে লোকটির চুল কাটছিল, তাকে সে বলল, আপনি উঠে গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন। ইনি যখণ আল্লাহর ওয়াস্তে চুল কাটবার কথা বললেন, তখন এঁর কাজটা আগে না করে পারছি না। তাই হল। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-কে আসনে বসিয়ে নাপিত তাঁর মাথায় চুমু দিয়ে চুল কাটতে লাগল। তারপর কাগজের একটি মোড়ক তাঁর হাতে দিয়ে বলল, এগুলি আপনি আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করবেন। দেখা গেল, মোড়কে রয়েছে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা। তাঁর এই বদান্যতা দেখে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ মনে মনে সংকল্প করলেন, যখনই তাঁর হাতে টাকা আসবে তখনই তিনি নাপিতের বদান্যতার বিনিময় দেবেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পর ব্যবসার কিছু লোক তাঁকে এক থলে মোহর পাঠিয়ে দিল। তিনি নাপিতের কাছে গিয়ে থলেটি তাকে নিতে বললেন। নাপিত বলল, সেদিন আল্লাহর নামোল্লেখ করেছিলেন বলে একজনের কাজ স্থগিত রেখে আপনার চুল কেটে দিয়েছিলাম। কিন্তু, কখনও কি এরূপ দেখেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে তার বদলে কিছু নেওয়া হয়? নাপিতের কথায় হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ অবাক হয়ে যান। পরে তিনি বললেন, ঐ নাপিতের কাছ থেকে তিনি বিশুদ্ধ আল্লাহ প্রেমের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

৩৬. এক রাতে কিছুতেই এবাদতে মন বসল না হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-এর। বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, দরজার সামনে পুরু কম্বল পরে একটি লোক চুপচাপ বসে আছে। তিনি তাকে বললেন, তোমার এভাবে বসে থাকার জন্যই হয়তো আমার এবাদতে মন বসেনি। লোকটি বলল, নফসের চিকিৎসা কি? হযরত বললেন, নফসের বিরোধিতা করাই তার একমাত্র ওষুধ। শোনামাত্র লোকটি সেখান থেকে উঠে গেল। সে যে কে, তা বোঝা গেল না। কিন্তু হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ আবার ঘরে গিয়ে এবাদতে রত হলেন। এবার আর কোন মানসিক বিঘ্ন দেখা গেল না। তিনি গভীর সাধনা তলিয়ে গেলেন।

৩৭. একবার হরত সোহায়েল রহমাতুল্লাহ হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-কে এক চিঠিতে লেখলেন, আলস্য ও উদাসীনতা পরিহার করুন। কেননা, নিদ্রাপ্রিয় লোকের মনোবাঞ্ছা কখনও পূর্ণ হয় না। যেমন হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে বলে দাবী করে অথচ রাতে ঘুম যায়, সে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ সে চিঠির উত্তর জানান, আল্লাহর রাস্তায় জেগে থাকা অবশ্যই আমাদের একটি কর্তব্য। কিন্তু আমাদের ঘুমের সঙ্গেও আল্লাহ্ প্রদত্ত কাজের সম্পর্ক আছে। আর জেগে থাকা অপেক্ষা ঐ ঘুমের মূল্য অনেক বেশী। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, নিদ্রা আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর প্রিয় বান্দাগণের প্রতি এক মূল্যবান উপহারস্বরূপ।

৩৮. একদিন এক পুত্রহারা জননী তাঁর দরবারে এসে কাতর প্রার্থনা জানায়, তার একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ। পুত্রের বিরহে তার আহার-নিদ্রা, শান্তি সব ঘুচে গেছে। তিনি যেন তার জন্য দোয়া করেন, সে যেন তার হারানো নিধি ফিরে পায়। হযরত জুনায়েদ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রহমাতুল্লাহ তাকে আশ্বস্ত করে বিদায় দিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে সে আবার এসে অনুরূপ অনুরোধ করে। তিনি আবারও তাকে সবর করতে বললেন। সবর না করেই বা উপায় কী। সে আবার ফিরে যায়। আর অপেক্ষা করতে থাকে দিনের পর দিন। কিন্তু, কোথায় তার পুত্র! এখনও যে তার পাত্তা পাওয়া গেল না। পুত্রের বিচ্ছেদ-বেদনা ক্রমশঃ তার কাছে অসহ্য মনে হল। প্রায় পাগলিনী অবস্থায় সে আবার এল হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। সেই একই আবেদন। দয়া করে দোয়া করুন। আল্লাহ্ যেন আমার ছেলে মিলিয়ে দেন।

হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ পুত্রহারা জননীকে আবারও জিজ্ঞেস করলেন, সে আরও কিছু দিন ধৈর্যধারণ করতে পারে কিনা। কিন্তু বেচারী জানান, তা পক্ষে তার আর মোটেই সম্ভব নয়। আপাততঃ তার যা মনের অবস্থা, তাতে ছেলেকে না পেলে সে হয়তো প্রাণে মারা যাবে। তখন হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তা যদি হয়, তাহলে সে বাড়ি ফিরে যাক। গিয়ে দেখবে যে, তার আগেই ছেলেটি বাড়িতে পৌঁছে গেছে।

আর দেরী না করে মহিলা যেন উড়ে চলল বাড়ির পানে। গিয়ে দেখে, সত্যিই তার হারানো নিধি বহাল তবিয়তে বাড়িতে বসে আছে।

৩৯. একদিন এক চোর হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর একটি জামা চুরি করে নিয়ে গেল। তারপর অন্য একদিন সে যখন জামাটি বাজারে বিক্রি করছে, এমন সময় সেখানে হযরত নিজেই হাজির। জামাটি যে কিনবে সে চোরকে ঝামেলার ফেলেছে। বলছে, যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় যে জামাটি তার, তবেই সে সেটি কিনতে পারে, নইলে নয়। ভারি মুশকিলে পড়ে গেল বেচারা চোর। চোরের হয়ে কে সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু, তার দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ এগিয়ে এসে বললেন, আমি জানি এ জামাটি এখন এর। অতএব ক্রেতার আর অসুবিধা রইল না। দিব্যি সে জামাটি কিনে নিল।

৪০. একদিন এক নিঃস্ব লোক হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর কাছে তার অভাবের ফিরিস্ত দিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। আর তিনি তার অভাব মোচনের জন্য না করে বলে বসলেন, আল্লাহ্ তোমাকে এই অবস্থায়ই রাখুন। লোকটি চমকে উঠে বলল, আপনি আমার ওপর অসুন্তষ্ট কেন হুজুর?

হযরত বললেন, তুমি যা বললে, আল্লাহ তাঁর বিশেষ প্রিয় বন্ধুদেরই তা দান করেন। কিন্তু তাঁরা তোমার মতো আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন না।

একদিন শিষ্য সমভিব্যাবহারে তিনি বসে আছেন। এমন সময় এক ধনী ব্যক্তি সভা থেকে একজন দরবেশকে ডেকে নিয়ে বাইরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ঐ দরবেশের মাথায় খাবারের খাঞ্চা চাপিয়ে দিয়ে তিনি আবার ফিরে আসছেন। দৃশ্যটি দেখামাত্র হযরত বলে ওঠলেন, ওটা লোকটার মুখের ওপর ছুঁড়ে মার। এটা বয়ে আনার জন্য এই দরবেশ ছাড়া সে কী আর লোক পেল না? তার জানা উচিত, তাপস-দরবেশগণ বিত্তশালী না হলেও তাঁদের মর্যাদা ধনীদের চেয়ে ঢের বেশী। আর তাঁরা পার্থিব বস্তুর কিছুটা মুখাপেক্ষী হলেও পরকালের পুরস্কারের অংশ তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট।

৪১. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর এক বিত্তশালী শিষ্য তাঁর কাজে প্রচুর ধন-সম্পদ খরচ করেন। বাকী থাকে কেবল তাঁর বাড়িখানি। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাঁকে বাড়িখানিও বিক্রি করে মূল্যের টাকাটা তাঁকে দিয়ে দিতে বললেন। শিষ্য তাই করলেন। কিন্তু, টাকা দিতে এলে হযরত বললেন, তিনি টাকা নিয়ে কী করবেন। ওগুলো নদীতে ফেলে দেওয়া হোক। শিষ্য আবারও তাঁর আদেশ পালন করলেন। এখন তিনি নিঃস্ব কর্পদকশূন্য হয়ে পীরের সান্নিধ্যে থেকে গেলেন। হযরত তাঁকে তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার জন্য ধমক দিলেন। ভৎসনা করলেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না। বহু অনুনয়-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিনয় ও কাকুতি-মিনতি করে অবশেষে হযরতের অনুমতি আদায় করে ছাড়লেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন।

৪২. একবার এক তরুণ জনসভায় তাঁর বক্তৃতা শুনে এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে, বাড়ি ফিরে গিয়ে তওবা করে সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দেয় আর এক হাজার টাকা উপহারস্বরূপ হযরতকে দিতে যায়। লোকে বলতে লাগল, তুমি এক দীনদার ব্যক্তিকে দুনিয়ায় বাঁধতে চাও? সঙ্গে সে টাকাগুলি দজলা নদীতে ফেলে দিল। তারপর চলে এল হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। সব শুনে তিনি বললেন, তুমি তোমার ধন-সম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করলেও এভাবে কিছু কিছু করে তা বর্জন করলে কেন? তোমার উচিত ছিল একসঙ্গে সবকিছুর মায়া ছেড়ে দেওয়া।

৪৩. একবার তাঁর এক শিষ্যের মনে হয়, সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। অতএব, পীরের সান্নিধ্য সংস্পর্শের আর প্রয়োজন নেই। এখন নির্জনবাসই শ্রেয়। অতএব, শুরু হল তার নির্জনবাস। আর প্রতি রাতে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল, ফেরেশ্‌তারা সঙ্গে একটি উট এনে তাকে বলছেন, চল, তোমাকে আমরা জান্নাতে নিয়ে যাব। একদিন তো সে উটের ওপর চড়েই বসে। সত্যিই ফেরেশ্‌তারা অতি মনোরম একটি স্থানে তাকে নিয়ে যায়। সেখানে সুদর্শন লোকের সমাবেশ ও রকমারি উত্তম আহার্য। কাছেই স্বচ্ছ সুপেয় পানির ফোয়ারা। সে সেখানে নেমে পড়ল, দেখল সে তার বাড়িতেই শুয়ে আছে।

বেশ কিছুদিন ধরে এই অবস্থা চলতে থাকে আর সে নিজের মুখেই মানুষের কাছে তার স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে বলতে থাকে যে, সে রোজ রাতে একবার করে জান্নাতে যায়। অবশেষে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর কানেও কথাটা চলে আসে। তিনি একদিন চলে গেলেন তাঁর শিষ্যের বাড়িতে। দেখলেন বেশ কয়েকজন অনুচর নিয়ে জমকালোভাবে সে বসে আসে। তিনি তাঁর অবস্থার কথা জানতে চাইলে সে সবিস্তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলল। তিনি তাকে বললেন, তুমি যদি আজও এরূপ স্বপ্ন দেখ, তাহলে তোমার জান্নাতে উপস্থিত হয়ে তুমি 'লা হাওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' কালামটি তিনবার পাঠ করবে।

সেই রাতে আবার সেই স্বপ্ন। সেই ফেরেশ্‌তা, সেই জান্নাত। শিষ্য মুর্শিদের নির্দেশমতো জান্নাতে গিয়ে ঐ কালামটি পাঠ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত ফেরেশ্‌তাগণের আনন্দ-মহফিল ভেঙে গেল। তারা তাকে একা ফেলে রেখে কে কোথায় ছুটে পালাল। এবার সে দেখল, সে একটি বিদ্‌ঘুটে ঘোড়ায় চড়ে অতি বিশ্রী একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে। আর সেখানে পড়ে আছে মৃত পশুর দুর্গন্ধে ভরা কয়েকখানি হাড়। তখন সে তার ভুল বুঝতে পেরে অস্থির হয়ে উঠল। সকালে বিছানা থেকে উঠেই ছুটে গেল মুর্শিদের বাড়িতে। এখন সে উপলব্ধি করল, পীরকে পরিত্যাগ করে মুরীদের পক্ষে নির্জনবাস বড় বিপজ্জনক।

৪৪. আর একজন শিষ্যের নির্জনবাসের সময় মন্দ চিন্তা করার ফলে তিন দিন ধরে মুখখানি কালো হয়ে থাকল। তিন দিন পর তার মুখের কালিমা যখন দূর হল, তখন হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাকে এক চিঠিতে জানালেন, আল্লাহর দরবারে পৌঁছে শিষ্টাচার রক্ষা করতে হয়। তুমি তা করনি বলে তোমার চেহারায় যে কালিমা দেখা দিয়েছিল তা দূর করতে আমাকে তিন দিন ধরে ধোপার মতো খাটতে হয়।

৪৫. আর একবার অত্যন্ত গরম পড়ায় এক শিষ্যের নাক থেকে রক্ত পড়তে থাকে। তো শিষ্য গরমের নিকুচি করে ছাড়ল। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাতে ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, তুমি আমার সামনে থেকে দূর হও। তুমি আল্লাহর কাজের সমালোচনা শুরু করছ। আর কিছুতেই আমার সঙ্গে থাকতে পার না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪৬. একবার এক শিষ্য তাঁর সঙ্গে কিছু অশিষ্ট আচরণ করে লজ্জায় এক মসজিদে আশ্রয় নেয়। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঐ শিষ্যের ওপর তাঁর চোখ পড়ে। আর বেচারা সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। একেবারে মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। আর ঐ রক্তধারায় লিখিত হতে লাগল। 'আল্লাহু জাল্লা জালালুহু' কালমটি। তা দেখে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তুমি কি আমাকে দেখাতে চাও যে, তুমি মারেফাতের উচ্চ পর্যায়ে উঠে গেছ? মনে রেখ, ছোট ছোট ছেলেরাও কিরে তোমার সমান হতে পারে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকে তো ধ্যানের সীমা পর্যন্ত পৌঁছুতে হয়। তাঁর কথায় লোকটির মনে এমন আঘাত লাগল যে, সে আর সামলাতে না পেরে তৎক্ষণাৎ ছটফট করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তার মৃত্যুর কিছুদিন পর এক সাধক তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, সে কোন স্তরে আছে? সে বলল, বেশ কিছুদিন ধরে আমি ছুটাছুটি করছি। কিন্তু এখনও কুফরীর সীমানায় রয়ে গেছি। ধর্ম ও তওহীদ এখনও অনেক দূরে। এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, যে, যেসব ধারণা নিয়ে আমি এতদিন গর্ব করতাম, তা ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

৪৭. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাঁকে এক শিষ্যকে বড় ভালোবাসতেন। তা দেখে অন্য শিষ্যদের মনে হিংসা জন্মে। আর সেটি হযরতের নজর এড়িয়ে গেল না। একদিন তিনি প্রত্যেক শিষ্যকে একটি করে মোরগ আর ছুরি দিয়ে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে এমন জায়গায় গিয়ে এগুলি জবাই করে আন, যেন কেউ সেখানেই জবাই করাটা দেখতে না পায়। সবাই তাই করলেন। কিন্তু তাঁর স্নেহভাজন শিষ্যটি মোরগ জবাই না করে ফিরে এলেন। কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি এমন জায়গা খুঁজে পেলাম না, যেখানে আপনার নির্দেশমত মোরগ জবাই করতে পারি। কেননা, আল্লাহর দৃষ্টি সর্বত্রই। তাঁকে এড়িয়ে কোন স্থানেই মোরগ জবাই করা সম্ভব নয়। তাঁর কথা শুনে সবাই তাদের অজ্ঞতা বুঝতে পারলেন। তওবা করলেন। সেদিন থেকে তাঁর প্রতি তাদের হিংসা-বিদ্বেষের অবসান ঘটল।

৪৮. এক ধনী ব্যক্তি সুফী-সাধক ছাড়া আর কাউকে দান করতেন না। কেননা, তিনি বলতেন, আল্লাহর ধ্যান ছাড়া তাঁদের অন্য দিকে লক্ষ্য থাকে না, কিন্তু অভাবগ্রস্ত হলে তাঁর ধ্যান-নিমগ্নতায় বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং হাজার হাজার দুনিয়াদার মানুষকে সাহায্য করার চেয়ে একজন আল্লাহর পথের পথিককে দান করাই শ্রেয়। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ একথা শুনে বললেন, এটি খাঁটি আল্লাহ প্রেমিকের কথা।

যাই হোক, ঐ দাতা মানুষটি এভাবে দান করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। তখন হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাঁকে কিছু অর্থ দান করে বললেন, এ দিয়ে আপনি ব্যবসা-বাণিজ্য করুন। কেননা আপনার মতো লোকের পক্ষে ব্যবসা করায় কোন ক্ষতি নেই। বরং তার প্রয়োজন আছে।

৪৯. হজ্জে গমনের পথে সৈয়দ নাসেরী নামে এক ব্যক্তি বাগদাদে এসে হযরত জুনাযেদ রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি নাসেরীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

নাসেরী বললেন, গীলান থেকে।

-আপনি কোন্ বংশের লোক?

-হযরত আলী রহমাতুল্লাহ-এর।

তিনি দু'খানি তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করতেন। একখানি তরবারি ব্যবহৃত হত নফসের বিরুদ্ধে। অন্যখানি কাফেরদের মোকাবিলায়। আপনি কোন্ তরবারি চালনা করেন?

একথা শুনে সৈয়দ আর স্থির থাকতে না পেরে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন। বললেন, আমার এবারের হজ্জ এখানেই সম্পন্ন হল। দয়া করে আমাকে আল্লাহর পথ দেখিয়ে দিন। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনার বুকখানি হল আল্লাহর খাসমহল। কাজেই এর মধ্যে কোন অপবিত্র জিনিসকে স্থান দেবেন না। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সৈয়দ নাসেরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তত্ত্বজ্ঞানী হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর উপদেশগুলি জটিল। কিন্তু প্রাণিধানযোগ্য। তিনি আপন শিষ্যগণকে বলেছিলেন।

১. দাসগণের সাধনার পথে শত্রুরা প্রতিবন্ধকতার জাল বিস্তার করে। যেমন-ধোকা, মোহ, অনুগ্রহ ইত্যাদি। অতএব, এ পথে অগ্রসর হতে হলে জালগুলির উদ্দেশ্য অনুধাবন করা দরকার। প্রয়োজনে জাল ছিন্ন করার জন্য বীর পুরুষ হতে হবে।

২.সাধকের চোখে যখন আল্লাহর মাহাত্ম্য-মহিমা প্রকাশিত হয়, তখন তার কাছে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ অন্যায় বলে মনে হয়। তিনি যখন আল্লহর আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন করেন, তখন তাঁর শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আর তাঁর চোখে যখন প্রচণ্ড ভীতি প্রকট হয়, তখন তাঁর ভয়ে শ্বাস গ্রহণকে তিনি ধর্মবিরুদ্ধ বলে মনে করেন।

৩. আল্লাহ্ প্রেমে ব্যাকুল হয়ে দরবেশ আক্ষেপের যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে তা প্রভু ও দাসের মধ্যবর্তী পর্দা জ্বালিয়ে দেয়।

৪. দাস দু'শ্রেণীর। (ক) দাসত্ব জ্ঞানের বিদ্যা যারা অর্জন করেছেন। (খ) যারা আল্লাহ্ তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করেছেন।

৫. কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ কর। যে অনুসরণ করে না কেউ যেন তারও অনুগামী না হয়। কেননা, রাসূলে করীম মানুষকে যে পথ দেখিয়েছেন তাই উত্তম পথ। অন্য পথ ভ্রান্ত। নিকৃষ্ট।

৬. প্রভু ও দাসের মধ্যে সমুদ্রতুল্য অন্তরায় হল চারটি। যথা ঃ (ক) দুনিয়া– যা পার হতে গেলে ত্যাগ প্রয়োজন। (খ) মানুষ-মানুষকে সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাই হল মানুষের বাঁচার উপায়। (গ) শয়তান- তার সঙ্গে শত্রুতা করে বাধা দূর করতে হয়। (ঘ) রিপু-রিপু বিরুদ্ধাচরণ করে এই অন্তরায় অপসারিত করতে হয়।

৭. শয়তান ও রিপুর প্রলোভনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 'লা হাওলা' কলোমা পাঠ করে শয়তানের ছলনা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু রিপুকে তাড়ানো খুবই কঠিন। সে যা চায় তা না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই হটে না। কখনও কখনও হয়তো বা উদ্দেশ্য পূরণে সে বিরত হয়, কিন্তু অচিরেই লুপ্ত বা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে সে পুনরুজ্জীবিত করে। অতএব, রিপু শয়তান অপেক্ষা প্রবল। আর এর মোকাবিল করার জন্য পীরের নিকট দীক্ষা নিতে হয়।

৮. আকৃতির দ্বারা নয়, মানুষ পরিচিত হয় তার সৎ স্বভাবের জন্য।

৯. আল্লাহকে যে কখনও চিনতে পারে না, সে কখনও সুখী হতে পারে না।

১০ . আল্লাহ্ পাকের গভীর রহস্য তাঁর বন্ধুগণের অন্তরে নিহিত থাকে।

১১. জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়া অপেক্ষা আল্লাহর প্রতি উদাসীন থাকা কঠিনতর।

১২. প্রকৃত বুদ্ধিমান সে-ই, যে নির্জনতা পছন্দ করে।

১৩. যে জ্ঞান দৃঢ় বিশ্বাস পর্যন্ত, যে দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ-ভীতি পর্যন্ত, সে আল্লাহ্-ভীতি পুণ্যকর্মের চর্চা পর্যন্ত, যে পুণ্য কর্ম বিশুদ্ধতা পর্যন্ত, যে বিশুদ্ধতা প্রতি কাজে আল্লাহর জ্যোতি পর্যন্ত না পৌছায় তার কোন মূল্য নেই। তা দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যায় না।

১৪. দুনিয়া ছেড়ে নির্জনতা অবলম্বন দ্বারা যেমন ঈমান নিরাপদ থাকে তেমনি পরিতৃপ্তিও লাভ করা যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৫. তামাম দুনিয়ার মালিক হয়েও যার মনে লোভের সঞ্চার না হয়, তবে তা দূষণীয় নয়। কিন্তু সামান্য খেজুর বীচি পাওয়ার মতোও যদি লোভ সৃষ্টি হয়, তবে তাই ক্ষতির কারণ।

১৬. দুঃখ-কষ্টে জন্য দোষ না দিয়ে ধৈর্যধারণ করা হল বন্দেগীর উত্তম নিদর্শন।

১৭. অতিথি আপ্যায়ন নফল এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

১৮. দাস যত বেশী আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয় আল্লাহও ততই তাঁর দাসের দিকে অগ্রসর হন।

১৯. যার আয়ু কেবল আত্মার ওপর নির্ভরশীল, আত্মার বিদায় গ্রহণে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু যার আয়ু আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল তার মৃত্যু নেই। বরং সে কৃত্রিম জীবন থেকে অকৃত্রিম জীবন লাভ করে।

২০. সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারিগরি দেখে যে উপদেশ লাভ করতে পারে না, তার চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়া ভাল। যার মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না তার বোবা হয়ে যাওয়া ভাল। যে কান আল্লাহর বাণী শোনে না তার বধির হওয়া উত্তম। আর যে দেহ আল্লাহর এবাদত থেকে উদাসীন তার জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করা ভালো।

২১. শিষ্যদের প্রথমতঃ শরীয়তের বিধান ব্যতীত অন্য কিছু শোনা উচিত নয়। তাদের পার্থিব বিষয়াদির কথাবার্তার তিক্ততা আর মারেফাতের আলোচনা মাধূর্য উপলব্ধি করা চাই।

২২. তারা যেমন আকাশের শোভা বাড়ায়, তেমনি সুফী সাধকগণও মর্ত্যের শোভা বৃদ্ধি করেন।

২৩. ভয় চার প্রকার। (ক) আল্লাহর তরফ থেকে ভয়- যা মানুষকে সতর্ক হতে ডাক দেয়। (খ) ফেরেশ্তাগণের পক্ষ থেকে ভয়-যা মানুষকে এবাদত-বন্দেগীতে উদ্দীপ্ত করে। (গ) রিপুর পক্ষ থেকে ভয়- যা মানুষকে ভোগ-বিলাস ও আনন্দ উৎসবের দিকে আকৃষ্ট করে। (ঘ) যে ভয় মানুষের জন্য শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে- তা মানুষকে পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ, দলাদলি, শত্রুতা, ঝগড়া-ফাসাদ ও খনোখুনি ইত্যাদিতে লিপ্ত করে।

২৪. পুণ্যকর্মে অটল ও অকুতোভয় লোকই হল চক্ষুষ্মান। আর তারাই শীর্ষস্থানীয়।

২৫. এবাদতে যখন মগ্ন হবে তখন যাবতীয় পার্থিব-চিন্তা মন থেকে দূর করে দেবে। এরূপ অবস্থায় নিজের মনকে তুমি আল্লাহর দাস হিসেবে দেখতে পাবে। চার হাজার জ্ঞান-সাধক এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

২৬. তাসাওউফ শব্দটি এসতেফা থেকে উদ্ভূত- যার অর্থ হল, বেছে নেওয়া বা পবিত্র হওয়া। অতএব, যিনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে কোন প্রকার স্মরণ বা উপাসনা থেকে পবিত্র, তিনি সুফী। মূলতঃ যার অন্তর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আত্মোৎসর্গের মতো, যার চিন্তা-ভাবনা ও অস্থিরতা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর মতো পবিত্র এবং আল্লাহর আদেশ পালনে উন্মুখ, যার আত্মোৎসর্গ হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর মতো, যার ধৈর্য হযরত আইউব (আঃ)-এর মতো, যার উদ্যম ও প্রেরণা হযরত মূসা (আঃ)-এর উদ্যম ও প্রেরণার মত, যার নির্মলতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মতো, তিনি হলেন প্রকৃত সুফী।

২৭. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছু বর্জন করে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার নাম হল তাসাওউফ। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ একজন শিষ্যকে বললেন, সুফী তাঁকেই বলা হয়, যিনি নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্য শেষ করে দিয়ে আল্লাহকে পান।

২৮. তত্ত্বজ্ঞানী বা আরেফদের থেকে সকল ব্যবধান দূর করে দেওয়া হয়। আর আরেফ ব্যক্তি আল্লাহ্র গুপ্ত রহস্যের মর্ম জানেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৯. মারেফাত দু'প্রকার। (ক) আল্লাহকে চেনা, (খ) আল্লাহকে চিনে নিয়ে আল্লাহতে মগ্ন হওয়া।

৩০. আল্লাহকে উত্তমরূপে জানার নাম হল তওহীদ। তওহীদের পরম রূপ হল এই যে, তওহীদ সম্পর্কিত যত জ্ঞানই অর্জিত হোক না কেন, তওহীদবাদী এরূপ ধারণা পোষণ করবে যে, তওহীদ সম্পর্কে তার মনোভাব অপেক্ষা তওহীদ আরও বড়।

৩১. আল্লাহর ধ্যান করতে করতে ভাবোন্নত্ত হয়ে, অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে আল্লাহর ধ্যানে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার নামই হল তারীকত।

৩২. তাসাওউফ ও তরীকত হল সেই অবদান, যার ওপরে দাসের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

৩৩. ঐ অবদান আল্লাহর না দাসের? এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বলেন, তরীকতের গুপ্ত কথা আল্লাহর অবদান এবং আল্লাহর রহমত হল দাসের পক্ষে নেয়ামত।

৩৪. ভালোবাসার পাত্র যদি বস্তু বা ব্যক্তি হয় তাহলে ঐ বস্তু বা ব্যক্তির বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসাও বিলুপ্ত হয়।

৩৫. যতক্ষণ না প্রেম ভালোবাসা কায়েম হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে বিলীন করা হয় না। আর প্রেমিকের বহু কথাবার্তা সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মবিরোধী বলে মনে হয়।

৩৬. কোন বস্তু নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করা ও তার সত্তাকে পাওয়ার নামই হল মোশাহাদ।

৩৭. মোরাকবা ও লজ্জা- এ দুয়ের মধ্যে পার্থক কি?

তাঁর উত্তর ঃ অদৃশ বস্তু লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রতীক্ষা করা হলা মোরাকাবা। আর লজ্জা হল উপস্থিতির ক্ষেত্রে পরম প্রদর্শন করা।

৩৮. দরবেশগণের পক্ষে তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কঠিন আর কোন কাজ নেই।

৩৯. পার্থিব কাজে নিমজ্জিত না হওয়াই হল প্রকৃত দাসত্ব।

৪০ দাসত্ব দু'টি স্বভাবের মধ্যে নিহিত। (ক) ভিতরে-বাইরে আল্লাহর সঙ্গে সততা রক্ষা করা। (খ) সব কাজে রাসূলুল্লাহর অনুগামী হওয়া।

৪১. স্বাদে তৃপ্তি আর চেষ্টায় বিশ্বাস-এ দু'টি ত্যাগ করতে পারলেই দাসত্বের হক আদায় হয়।

৪২. নিজেকে নেয়ামতের অনুপযুক্ত বলে ধারণা করাই হল কৃতজ্ঞতা।

৪৩. যেখানে মিথ্য না বললে রক্ষা পাওয়া মুশকিল, সেখানেও মিথ্যা না বলা হল প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা।

৪৪. প্রকৃত আল্লাহ্ প্রেমিকের প্রতিদিন চল্লিশবার ভাবান্তর হয়। অথচ কপট ধার্মিক ব্যক্তি চল্লিশ বছর একইভাবে জীবন কাটায়।

৪৫. প্রকৃত ফকিরের লক্ষণ হল, সে কারও কাছে কিছু চায় না। কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। কেউ ঝগড়া করতে চাইলেও চুপ করে থাকে।

৪৬. আন্তরিক ঈমান ক্রমবর্ধমান। মৌখিক ঈমান স্থির, বাড়েও না, কমেও না। কিন্তু রোকনসমূহ বাড়ে-কমে।

৪৭. ধৈর্যের চূড়ান্ত সীমা নির্ভরতা।

৪৮. ধৈর্য মানুষকে বিনা প্রার্থনায় ও মিনতি ছাড়াই আল্লাহর সাথে যুক্ত রাখে।

৪৯. তিক্ত জিনিস আহার করেও মুখ বিকৃত না করার নাম ধৈর্য আর আহার না করেও আহার করার মতো ভাব প্রকাশ করাকে বলে তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা।

৫০. রুজি-রোজগার না করার নামও নির্ভরতা।

www.AmarIslam.com

৫১. দোজাহানে কারও চেয়ে নিজেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মনে না করে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও মুখাপেক্ষী না হওয়াই নম্রতা।

৫২. চারটি বস্তুর নাম সৎ স্বভাব। (১) বদান্যতা, (২) ভালোবাসা, (৩) উপদেশ, (৪) অনুগ্রহ।

৫৩. মন্দ স্বভাবের আলেম অপেক্ষা সৎ স্বভাবের মূর্খের সাহচার্য উত্তম।

৫৪. আল্লাহর নিয়ামত ও সেই সঙ্গে নিজের অপরাধের কথা চিন্তা করলে যে অবস্থায় সৃষ্টি হয়, তারই নাম লজ্জা।

৫৬. নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নিজেকে ছেড়ে দেওয়াই হল রেজা।

৫৭. তওবার অবস্থা তিনটি। যথা ঃ (ক) আল্লাহর নিকট লজ্জিত হওয়া, (খ) পাপ কাজ বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা এবং (গ) জুলুম ও ঝগড়া-কলহ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা।

৫৮. সাধারণ শিষ্যের পক্ষে শয়তানের বা রিপুর প্রতারণা থেকে নির্ভয় থাকা কবীরা গুনাহ। আর আল্লাহর প্রেমে মশগুল তাপসের পক্ষে শয়তান বা রিপুর প্ররোচনা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া কুফরী।

৫৯. সাধনার মূর কথা কি?

তাঁর উত্তর ঃ সৃষ্টিজগত থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া, স্বভাব ও রিপুর অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা, মানবীয় গুণ থেকে রিপুকে সংহার করা, রিপুর কামনা-বাসনা থেকে দূরে অবস্থান করা, মারেফাতের গুণবৈশিষ্ট্যের ওপর নিজেকে সু প্রতিষ্ঠিত রাখা, আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানে দৃঢ় হওয়া, যেসব বস্তু রোজ কিয়ামতে উপকার দেবে, সেসব বস্তুর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, সবাইকে উপদেশ দান করা, আল্লাহর হক যথারীতি আদায় করা ও শরীয়তের মধ্যে প্রতিটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করা।

৬০. তওহীদ কি?

তাঁর উত্তর ঃ আল্লাহ্র একত্ববাদে নিজেকে নিমজ্জিত করে নিজেকে লুকিয়ে ফেলা।

৬১. ফানা ও বাকা কি?

তাঁর উত্তর ঃ ফানা বা ধ্বংস হল–আল্লাহ্ ছাড়া সৃষ্টির সবকিছুই ধ্বংসশীল বলে বিশ্বাস করা। আর বাকা হল স্থায়িত্ব-স্থায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য বলে বিশ্বাস রাখা।

৬২. গবেষণার স্বরূপ যথাঃ (ক) আল্লাহ্র আয়াত বা নিদর্শনের ওপর চিন্তা-ভাবনা করা, (খ) আল্লাহর নিয়ামত ও এহসান সম্বন্ধে সূক্ষ্ম চিন্তা করা, (গ) কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর প্রতিশ্রুতিসমূহ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা ও (ঘ) নিজ আত্মা এবং আত্মার অসংখ্য গুণরাশি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম চিন্তা করাকে বলে গবেষণা।

৬৩. দাস যখন প্রতিটি বস্তুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্ বলে মনে করে, দুনিয়ার সবকিছুর আত্মপ্রকাশ আল্লাহ্ হতে বলে বিশ্বাস করে, দুনিয়ার সবকিছুর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব আল্লাহর হাতে বলে বিশ্বাস স্থাপন করে, আর প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, তখনই দাসত্বের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

৬৪. সত্যবাদীর গুণের নাম হল সততা। কথায়, কাজে ও অবস্থায় যিনি সৎ, তিনিই সিদ্দীক।

৬৫. আল্লাহর কাজে রিপুকে বের করে দেওয়াই হল বিশুদ্ধতার পরিচয়।

৬৬. প্রতি মুহূর্তে আযাবের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকাকে বলে ভয়।

৬৭. কেউ সরল অন্তঃকরণ কিছু প্রার্থণা করলে তাকে তা দান করে প্রতিদান না চাওয়াকে বলে সহানুভূতি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৬৮. যে দরবেশ আল্লাহর খুশীতে খুশী থাকেন তিনিই সেরা সাধক।

৬৯. যে ব্যক্তি উপকার করে ভুলে যায় ও মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে, তার সাহচর্য গ্রহণ করবে।

৭০. যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে না, সে-ই দাস।

৭১. যে জ্ঞানের এবং আল্লাহর আশ্রয়ে থাকে, তাকেই বলে মুরীদ বা শিষ্য।

৭২. মাথা নত রাখা ও মাটিতে শয়ন করাকেই বলে দীনতা।

৭৩. বৈধ থেকে অবৈধের দিকে মুখ ফেরানো হল আলেমের পদস্খলন।

৭৪. স্থায়িত্ব থেকে ধ্বংসের দিকে আসক্ত হওয়া হল দরবেশদের পদস্খলন আর আল্লাহ্ থেকে অলৌকিকতার দিকে ফিরে আসা হল তত্ত্বজ্ঞানীর পদস্খলন।

৭৫. হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বলতেন, হে দয়াময়, রোজ কিয়ামতে আমাকে অন্ধ করে দেবেন। কেননা, যে আপনাকে দেখে না তার জন্য অন্ধ থাকাই শ্রেয়। তাহলে সে অন্য কাউকেও দেখতে পাবে না।

অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাঁর শিষ্যগণকে বললেন, আমাকে ওজু করিয়ে দাও। শিষ্যগণ ওজু বানিয়ে দিলেন। কিন্তু ভুলবশতঃ তাঁর আঙুল খিলাল করানো বাকী থেকে গেল। তিনিই তা মনে করিয়ে দিলেন। আর তা করা হল। তারপর তিনি সেজদায় গিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। শিষ্যেরা বললেন, সারা জীবন এত নামাজ, এত সেজদা করলেন! এখন শেষ মূহূর্তেও সেই সেজদা! এখনও কি সেজদার সময় আছে? তিনি বললেন, এই সময়ের মতো এত অধিক মুখাপেক্ষী তিনি আর কখনও হননি। অতঃপর তিনি কুরআন পাঠ করতে শুরু করলেন। শিষ্যরা বললেন, এখন আপনি কুরআন পাঠ করতে শুরু করলেন? হযরত বললেন, এ সময় থেকে উত্তম আমার জন্য আর কী হতে পারে? সময় বড় সঙ্কীর্ণ। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই আমলনামা গুটিয়ে ফেলা হবে। আমি চোখের সামনে দেখছি, আমার সত্তর বছরের এবাদতসমূহ শূণ্যে চুলের মতো একটি সূক্ষ্ম সুতায় ঝুলছে আর প্রবল বাতাসে তা দুলছে। আমি বলতে পারি না, ঐ প্রবল বায়ু কি? সে আমার মিলন ঘটাবে নাকি বিচ্ছেদ? একদিকে দেখছি পুলসেরাত। অন্য দিকে অপেক্ষমাণ মালাকুল মওত। কাজীকেও দেখতে পাচ্ছি- যার গুণ সুবিচার করা। তিনি তো আমার দিকে ফিরেও দেখছেন না। সামনে রয়েছে অনেকগুলি পথ। জানি না, কোন্ পথে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

এ সময় তাঁর অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে মুমর্ষু অবস্থা পৌঁছলেন। আর এ সময় পাক কুরআনের সত্তর আয়াত তেলাওয়াত করলেন। সবাই বললেন, আল্লাহ্, আল্লাহ্ বলুন। তিনি বললেন, আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। আমার বন্ধুকে আমি ভুলিনি। অতঃপর তিনি আঙুলে গণনা করে 'সুবহানাল্লাহ্' তাসবীহ পাঠ করতে লাগলেন। পড়তে পড়তে তর্জনি আঙুলে পৌঁছে তা ওপরের দিকে তুলে ধরে বললেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ বুজলেন। আর এভাবেই তিনি মিলিত হলেন তাঁর পরম প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

তাঁকে স্নান করানোর সময় তাঁর চোখের পানি মুছে দিতে গেলে অদৃশ্য শব্দ শোনা গেল, তোমরা আমার বন্ধুর চোখ থেকে তোমাদের হাত দূরে রাখ। কেননা, আমার নাম জপ করতে করতে ঐ চোখ দু'টি বন্ধ হয়েছে। আমার দর্শন ছাড়া তা আর উন্মীলিত হবে না। অতঃপর গোসলদাতাগণ তাঁর বাঁকা আঙুল সোজা করার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। আবার বেজে উঠল অদৃশ্য কণ্ঠঃ আমার নামের তাসবীহ পড়তে পড়তে যা বাঁকা হয়েছে তা আমার নির্দেশ ছাড়া সোজা হবে না।

জানাযার সময় একটি সাদা পায়রা এসে পাশে বসে গেল। সেটি তাড়ানোর বহু চেষ্ট

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করা হল। কিন্তু তাড়ানো গেল না। বরং সেটি বলল, আমাকে কষ্ট দিও না, নিজেরাও বৃথা কষ্ট করো না। কেননা, আমার নিম্নাঙ্গ প্রেমের পেরেক দ্বারা খাটের সঙ্গে আবদ্ধ। তোমাদের এ জানাযা ওঠাবার চেষ্ট করতে হবে না। কেননা, জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর লাশ এখন ফেরেশ্তাগণের হেফাজতে এসে গেছে। এখন যা করতে হয় তাঁরাই করবেন। শুনে নাও, তোমরা এখানে ভিড় না করলে এ লাশ এতক্ষণ সাদা বাজপাখির মত আকারে আকাশে উড়ে যেত।

হযরত জুনায়েদ (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নযোগে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মুনকার নকিরের প্রশ্নের কী জবাব দিলেন হুজুর? তিনি বললেন, তাঁরা এসে যখন আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রভু কে? আমি বললাম, যখন আমার প্রভু স্বয়ং প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?' তখনই তো উত্তর দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, এখন আপনারা আবার এসেছেন এই প্রশ্ন করতে যে, আপনার প্রভু কে? যে ব্যক্তি স্বয়ং বাদশাহর প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, তাঁর ভৃত্যদের প্রশ্নের জবাব দিতে তার আবার ভয়ের কী আছে? তবে আপনরা যখন এসেছেন এবং আমার নিকট প্রশ্ন রেখেছেন তখন তার উত্তর আমি আমার প্রভুর ভাষাতেই দিই-আমার প্রভু তিনিই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। পরে তিনি আমাকে জীবন পথের সন্ধান দিয়েছেন।

ফেরেশ্তাগণ তাঁর উত্তর শুনে সম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পরস্পর এই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন, ইনি দেখছি এখনও প্রেমে বিভোর হয়ে রয়েছেন।

হযরত হারীরী রহমাতুল্লাহ তাঁকে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমার ওপর রহমত করেছেন এবং আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আর মধ্য রাতে আমার যে দু'রাকায়াত নামাজ পড়ার অভ্যাস ছিল, তাছাড়া অন্য কিছুতে তেমন কোন ফায়দা হয়নি।

হযরত
ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাযী
রহমাতুল্লাহ

অপূর্ব জ্যোতিময় এক তরুণ এসে পড়েছেন আরব মরুভূমির এক জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। নিজের জন্মভূমি ছেড়ে এক অচেনা জায়গায়। এ কাফেলার সহযাত্রী হিসেবে তিনি এসেছেন। সঙ্গীদের সঙ্গে বাস করছেন আরবের একটি গোত্রের বাসভূমিতে।

বাতাস যেমন সুগন্ধ ছড়ায়, তাঁর রূপ-লাবণ্যের খবরও তেমনি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র এলাকায়। দীর্ঘকায়, পৌরুষ-দীপ্ত উজ্জ্বল দেহকান্তি। যেন আল্লাহ্ পাকের প্রিয়দর্শী। নয়নরঞ্জন নবী ইউসুফ (আঃ)-এর অনুরূপ ছিলেন হযরত ইউসুফ রায়ী রহমাতুল্লাহ।

এদিকে, ঐ এলাকার গোত্রাধিপতির এক কন্যার রূপের খ্যাতিও মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। বহু তরুণ হৃদয়ের তিনিও মর্মলোক মানসী। ঘটনাক্রমে অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী একদিন দেখে ফেললেন তরুণ প্রবাসীকে। প্রথম দৃষ্টিই তাঁর মনে বুনেছিল প্রণয়ের বীজাঙ্কুর। রূপতৃষ্ণা প্রেম-পিপাসায় পরিণত হল। আর সে পিপাসা এত তীব্র হয়ে উঠল যে, তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। এক গভীর রাত্রে অভিসারিকা হয়ে চলে এলেন প্রেমাস্পদের কাছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, বহু তরুণ হৃদয়ে যে অনন্ত যৌবনা রূপসী তুফান তুলেছিলেন, তিনি এ প্রবাসী তরুণের হৃদয়ে সামান্য একটি তরঙ্গও সৃষ্টি করতে পারলেন না। তাঁর অভিসার তাঁকে লজ্জিত করল। তরুণ একবার চোখ তুলেও তাঁর দিকে তাকালেন না। বরং, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে বুক কেঁপে উঠল তাঁর। বেগম যুলায়খার আকর্ষণ উপেক্ষা করে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইউসুফ (আঃ) যেমন দৌড়ে গিয়েছিলেম দরজার দিকে, তেমনি তিনিও রূপসী তরুণীর প্রেম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করে ঐ এলাকা থেকে চলে গেলেন অন্য এক অচেনা অঞ্চলে।

সেদিন রাতের ঘটনা পরিস্থিতির কথা ভাবতে ভাবতে সেই বিমূঢ় তরুণ হাঁটু ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। স্বপ্নে দেখলেন, তিনি চমৎকার একটি জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন। অসাধারণ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আরও দেখলেন, সবুজ রঙের পোশাক পরিহিত একদল লোক। আবার তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আশ্চর্য সুন্দর একটি মানুষ। আভিজাতিক অস্তিত্ব নিয়ে বসে রয়েছেন এক অমূল্য আসনে। পুলক-চঞ্চল বিস্ময়ে তিনি ঐ সুপুরুষ ও তাঁর দলবলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। একজন উত্তর দিলেন, তাঁরা আল্লাহর ফেরেশ্‌তা। আর ভূবন ভোলানো রূপ নিয়ে যিনি বসে রয়েছেন তিনি হলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)। তিনি আরও বললেন, হযরত ইউসুফ রায়ী রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে তাঁরা সেখানে সমবেত হয়েছেন।

তরুণ বড় লজ্জা পেলেন। তাঁর মতো সামান্য একটি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হযরত ইউসুফ (আঃ) সদল বলে সেখানে উপস্থিত। এও কি সম্ভব। বুক ঠেলে কান্না এল তাঁর। তিনি এসব ভাবছেন, হঠাৎ মহিমান্বিত ইউসুফ (আঃ) আসন ছেড়ে উঠে এসে তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তরুণকে নিয়ে তাঁর পাশের আসনে বসিয়ে দিলেন। তখন আনতমুখে অনুচ্চ স্বরে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার মতো অতি তুচ্ছ এক অধমকে এত বেশী সম্মান প্রদর্শন করছেন কেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, রূপমুগ্ধা সেই অভিসারিকাকে আপনি প্রশ্রয় দেননি। পাপের ছোবল থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আপনি দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সমস্ত ফেরেশ্‌তা ও আমাকে ডেকে বললেন, যুলায়খা যেমন নির্জন কক্ষে আপনাকে পাপ পথে আহ্বান করেছিল, আর আপনি ছুটে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, তেমনি আপনার নামের আর এক ইউসুফ আরবের এক আমীর-কন্যার প্রেম নিবেদন উপেক্ষা করে আমাকে খুব খুশী করেছে। অতএব, আপনি ফেরেশ্‌তাসহ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আমার প্রিয় সাধকদের অন্তর্ভুক্ত করার সুসংবাদ দান করুন। আর তাঁকে একথাও জানিয়ে দিন, সে যেন একালের শ্রেষ্ঠ তাপস যুননুন মিশরীর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে।

বলাবাহুল্য এমন জান্নাতী স্বপ্ন দর্শনে তরুণের মনে প্রভূত আনন্দের সঞ্চার হয়। আর পরদিন প্রত্যুষেই তিনি হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে মিসর অভিমুখে যাত্রা করেন। মিসরে গিয়ে এক মসজিদে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা পেলেন বটে। তবে সাহস করে তাঁকে কিছু বলতে পারলেন না। আর এভাবে সংকোচের শিকার হয়ে পুরো একটি বছর পার করে দিলেন। পরে একদিন হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-ই তাঁকে নামধান ও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন।

এবার সাহস এল মনে। তরুণ বললেন, সে 'রা' প্রদেশ থেকে এসেসে। তাঁর কিছু নিবেদন আছে।

কিন্তু না, আবার হতাশা! হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ তাঁর কথা শুনে আর কিছু বললেন না। কী তাঁর নিবেদন, জানতে চাইলেন না। ফলে তরুণ তাঁর ইচ্ছার কথা এবারও প্রকাশ করতে পারলেন না। আরও একটি বছর কেটে গেল।

তারপর একদিন হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর হঠাৎ প্রশ্ন, তুমি কি যেন বলবে বলেছিলে? বল, শোনা যাক।

আর যায় কোথায়! প্রচুর সাহস নিয়ে তরুণ বললেন, আমি আপনার দরবারে ইসমে আজম শেখার জন্য এসেছি। কিন্তু এবারও সেই শীতলতা। হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ আবারও চুপ করে গেলেন। হাঁ-না কিছুই বললেন না। এভাবে আরও এক বছর অতিবাহিত হল।

তারপর হঠাৎ একদিন যুননুন রহমাতুল্লাহ তরুণের হাতে মুখ-আঁটা কাঠের একটি কৌটা দিয়ে বললেন, নীল নদের ওপারে অমুক জায়গায় একটা লোক আছে। তাঁকে এটা দিয়ে এস। আর সে যা বলে তা মনে রেখো।

কৌটা নিয়ে যেতে যেতে তরুণের মনে হল, এর ভেতরে কী যেন নড়াচড়া করছে। প্রবল কৌতূহল দমন করতে না পেরে তিনি কৌটার মুখ খুলে যেই দেখতে যাবেন, অমনি ওর ভেতর থেকে ছোট একটা ইঁদুর লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বড় বেকুব বনে গেলেন তরুণ। এইবার! খালি কৌটোটা নদী পারের লোকটিকে দিয়ে আসবেন নাকি ফিরে যাবেন হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর কাছে। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি লোকটির কাছেই গেলেন। তাঁকে কিছু বলার আগে তিনিই বললেন, তুমি হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর কাছে ইসমে আজম শিখতে এসেছিলে? তরুণ সঙ্গে সঙ্গে বললে, জি হুজুর। আপনি ঠিকই ধরেছেন। তিনি বললেন, তিনি হয়তো তোমাকে একটু অসহিষ্ণু মনে করে ঐ ইঁদুরটি তোমার হাতে দিয়ে থাকবেন। আর তুমি সামান্য একটা ইঁদুর ধরে রাখতে পারলে না? কী করে সেই মহান মহার্ঘ্য পবিত্র নাম অন্তরে ধরে রাখবে?

তরুণ সত্যিই বড় লজ্জিত হয়ে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এ কাছে ফিরে এলেন। তিনি সবই জানতেন। তাই বললেন, তোমাকে ইসমে আজম শেখাবার ব্যাপারে পর পর সাতবার আল্লাহর কাছে অনুমতি চেয়েছি। পাইনি। শেষে ইঁদুর দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করার অনুমতি পেলাম। পরীক্ষায় বোঝা গেল, এ– ব্যাপারে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি কেন। এখন তুমি দেশে ফিরে যাও। পরে সময়মত আবার এস।

মর্মাহত বিষন্ন তরুণ তখন কাতর প্রার্থনা জানালেন, বিদায় বেলায় আমাকে কিছু উপদেশ দিন হুজুর। হযরত তাঁর এ প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তাঁকে তিনটি উপদেশ দিলেন। তিন শ্রেণীর উপদেশ। উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম উপদেশটি হল, এলেমকালাম যা তিনি শিখছেন সব মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। নিজেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা মূর্খ বলে মনে করতে হবে। তাহলে তাঁর মধ্যে যে যবনিকা রয়েছে তা দূর হয়ে যাবে।

মধ্যম উপদেশ, তিনি তাঁর দীক্ষাগুরুকেও ভুলে যাবেন। কারও কাছে কখনও বলবেন না যে, আমার পীর অমুক বা তিনি আমাকে একথা বলেছেন। কেননা, এ ধরনের কথাবার্তার মধ্যেও আত্মগৌরব বা অহমিকা প্রচার করা হয়।

অধম উপদেশ, মানুষকে আল্লাহর দিকে ও হেদায়েতের পথে ডাক দিতে হবে।

তরুণ ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বললেন, তিনি প্রথম উপদেশটি পালন করতে পারবেন না। আর দ্বিতীয় উপদেশটিও তাঁর পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছা হলে তৃতীয়টি তিনি অবশ্যই পালন করবেন। হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ বললেন, এর মধ্যেও শর্ত রয়েছে, এ কাজে নিজের বা শ্রোতাদের প্রতি তোষণনীতি চলবে না। কোন পার্থিব উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ওয়াজ-নসীহত করবেন।

তরুণ তাঁর এ নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলবেন, একথা বলে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

দেশে ফিরে হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর নির্দেশমত তিনি এলমে মারেফাতের প্রচার শুরু করেন। সেদেশে তখন এলেম মারেফাতের কোন চর্চা ছিল না। সুতরাং সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। তাঁরা তরুণের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলেন। ফলে তিনি একা হয়ে গেলেন। কোথাও মাহফিলের আয়োজন হলে সেখানে আর শ্রোতা পাওয়া যায়

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

না। অবস্থা দেখে তিনি সেখান থেকে চলে যাবার মনস্থ করলেন। কিন্তু তাঁকে বাধা দিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। বললেন, আল্লাহকে খুশী করার জন্যই তুমি ওয়াজ-নসীহত করবে, মানুষকে নয়। হযরত যুননুন রহমাতুল্লাহ-এর কাছে তুমি এরকম অঙ্গীকারই করেছ। তোমার কথা কে শুনল আর কে শুনল না তাতে তোমার কী যায় আসে? অতএব তুমি এখান থেকে চলে যেতে পার না।

তরুণের চৈতন্যোদয় হল। তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং তাঁকে তাঁর কাজ করে যেতেই হবে। করলেনও তাই। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আল্লাহকে খুশী করার জন্যই তিনি ওয়াজ নসীহতের চর্চা চালিয়ে গেলেন। এই অসামান্য তরুণই হলেন ইতিহাসখ্যাত জ্ঞান-তাপস হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রায়ী রহমাতুল্লাহ।

আল্লাহর পথে মানুষকে তিনি যে ডাক দিলেন, সে ডাকে এক-দুই করে ফিরে এল অসংখ্য মানুষ। এমনকি অসৎ প্রকৃতির অসামাজিক মানুষও। এরকম এক যুবকের নাম আবদুল ওয়াহেদ যায়েদ। বংশের কলঙ্ক, কুলাঙ্গার। একদিন সে হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ-এর এক সভায় উপস্থিত ছিল। হযরত তখন বক্তৃতা দিচ্ছেন- উপায়ান্তর না দেখে কোন মানুষ যেমন কোন মানুষকে ডাকে, তেমনি আল্লাহ্ পাকও আপন রহমতে পাপী লোককে ডাকেন। তাঁর এই কথাটি শুনেই আবদুল ওয়াহেদ বিচলিত হয়ে পড়ে। আর যা তার পরনে ছিল পোশাক, টুপি সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে গেল কবরস্থানের দিকে। সেখানে পড়ে রইল তিন দিন ধরে অচৈতন্য অবস্থায়।

এদিকে হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ দৈববাণী শুনলেন, সেই অনুতপ্ত যুবককে খোঁজ করার নির্দেশ পেলেন তিনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে বেহুঁশ অবস্থায় কবরস্থানে পাওয়া গেল। তিনি তার কাছে বসে পরম যত্নে মাথাটি কোলের ওপর তুলে নিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যুবক চোখ মেলে তাকাল। দেখলো, হযরতের কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে আছে। এমন নিশ্চিত আশ্রয় এ জীবনে এর আগে সে কখনও খুঁজে পায়নি।

নিশাপুরের এক বিত্তশালী বণিক। হাজার টাকায় একবার কিনে আনল এক রূপসী বাঁদী। ঠিক এই সময় বণিকের এক খাতক টাকা শোধ না দেবার অভিপ্রায়ে শহর ছেড়ে চলে গেল। তাকে খোঁজ করা খুবই জরুরী। কিন্তু মুশকিল হল বাঁদীকে নিয়ে। এমন রমণী রত্ন তিনি কার কাছে রেখে যাবেন? তেমন আস্থাশীল বিশ্বস্ত মানুষ শহরে কে-ই বা আছে আর! শেষ পর্যন্ত সে সওদাগর আবু ওসমান জাবরীর হেফাজতেই মেয়েটিকে রাখল। আবু ওসমান প্রথম রাজি হননি। কিন্তু পরে তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। নিশ্চিত হয়ে বণিক এবার খাতকের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন আবু ওসমানের নজর পড়ল সুন্দরী বাঁদীর ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল কামনার আগুন। অনন্যোপায় হয়ে অস্থির আবেগে তিনি ছুটে গেলেন তাঁর পীর আবু হাফস হাদ্দাদের কাছে। সব কথা খুলে বললেন। তিনি তাঁকে হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ-এ কাছে যেতে বললেন। আবু ওসমান দেরী না করে তাঁর সন্ধানে গেলেন। হযরতের বাসভবনের কাছাকাছি গিয়ে লোকজনকে তিনি যখন তাঁর বাড়ির নিশানা জিজ্ঞেস করলেন, তখন একবাক্যে সবাই বলতে লাগল, সে তো খুব বাজে একটা লোক। আপনাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। তার কাছে আপনার কী দরকার? আমরা মনে করি, ওরকম বদ লোকের সঙ্গে দেখা না করে আপনার বাড়ি ফিরে যাওয়া ভালো।

লোকের কথায় প্রভাবিত হয়ে আবু ওসমান হযরতের সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে এলেন। আর তাঁর অভিজ্ঞতার কথা খুলে বললেন পীর আবু হাফস হাদ্দাদকে। আবু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাফস খুবই দুঃখিত হয়ে তাঁকে ভৎর্সনা করলেন এবং আরও জোর দিয়ে বললেন, তিনি যেন এখনই অবশ্যই হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে একবার দেখা করেন।

অগত্যা আবু ওসমান আবার বললেন, হযরতের সঙ্গে দেখা করতে। আর প্রতিবেশীদের বাধা, গালমন্দ উপেক্ষা করে হাজির হলেন হযরতের দরজায়। দেখলেন, দশ দিক আলো করে বসে আছেন অপূর্ব জ্যোতির্ময় পুরুষ হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ। আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আশ্চর্য সুন্দর কিশোর। আর কাছেই রয়েছে একটি শরাবের সোরাহী ও পানপাত্র। আবু ওসমান তাঁকে সালাম জানালেন। তারপর শুরু হল কথাবার্তা। হযরতের সুমিষ্ট ভাষণে ও বিনয়পূর্ণ আচরণে অভিভূত হলেন আবু ওসমান। পরে বললেন, আপনি আল্লাহর ওলী, মহাজ্ঞানী। একটা কথা জিজ্ঞেস করার বড় ইচ্ছে আমার। কিন্তু সংকোচবোধ করছি।

হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ তাঁকে অভয় দিলেন। নিঃসঙ্কোচে তিনি বলতে পারেন।

আবু ওসমান সাহস পেয়ে বললেন, আপনার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দাড়ি-গোঁফশূন্য বালক। সামনে রয়েছে শরাবের সোরাহী, পানপাত্র। এর রহস্য কী হুজুর?

হযরত বললেন, মানুষ আসল ব্যাপার না জেনে, ভেতরে তলিয়ে না দেখে শুধু বাইরে থেকে যা দেখে বা শোনে তাকেই আসল মনে করে অনেক কিছু বলে বা ভাবে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল। এই যে ছেলেটিকে দেখছ, এ আমার নিজের ছেলে। আর ঐ শরাবের সোরাহীও শরাবের নয়, পানির। আর ঐ যে পানপাত্র, ও দিয়ে আমি পানিই পান করি।

আবু ওসমান খুব সহজ আর হালকা বোধ করছিলেন। তাই আরও অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন, হুজুর সব সময় তো ভেতরের ব্যাপার সকলের পক্ষে জানা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বরং মানুষ বাইরে থেকে যা দেখবে বা বুঝবে, তারই প্রতিক্রিয় ব্যক্ত করবে। তো আপনি বাইরের দিকটাকে এভাবে উপস্থাপিত করেন কেন?

হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এর কারণ জানতে চাও? কারণ হল এই যে, এ দৃশ্য দেখে কেউ যেন তার সুন্দরী বাঁদী আমার কাছে আমানত রাখতে না আসে।

হঠাৎ যেন আবু ওসমানের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হল। তিনি বুঝতে পারলেন, প্রকৃত যাঁরা ধর্মভীরু, তাঁরা পার্থিব বিষয়াদি থেকে হৃদয় ও দৃষ্টি সরিয়ে নেন। মানুষের দুর্নাম বা অপবাদে তাঁদের কিছু যায় আসে না।

আর এই উপলব্ধি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে যে চাঞ্চল্য ও রূপজ মোহ দেখা দিয়েছিল তা তিরোহিত হয়ে গেল। নির্মূল হয়ে গেল কামনার বীজাঙ্কুর। শুদ্ধ স্নাত হয়ে গেলেন তিনি।

এই মহাতাপস সম্বন্ধে শোনা যায়, এশার নামাজের পর থেকে ফজর পর্যন্ত সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি কাটিয়ে দিতেন। অর্থাৎ, দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি আল্লাহর ধ্যান করতেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলতেন, এশার নামাজের পর রুকু কিংবা সেজদা দেবার মতো শক্তি থাকে না। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এবাদত করি।

বিখ্যাত সাধক হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-কে তিনি একবার এক পত্রে লেখেন, আল্লাহ্ পাক কখনও আপনাকে যেন প্রবৃত্তির স্বাদ উপভোগ না করান। কেননা, সে স্বাদ উপভোগের সুযোগ এলে তখন কোন কিছুই আপনার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হবে না।

প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে এক শ্রেণীর ধর্মভীরু লোক থাকেন, যাঁরা প্রকৃতই আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহ্ সর্বতোভাবে তাঁদের রক্ষা করেন। আর লোকচক্ষুর আড়ালে, গোপনে তাঁদের রেখে দেন। রাসূলে করীমের উম্মতের মধ্যে সুফী সাধকগণ হলেন সেই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শ্রেণীর ধর্মভীরু মানুষ, রাব্বুল আলামীনের একান্ত প্রিয়জন। তাঁর অমূল্য উপদেশসমূহ ছিল নিম্নরূপ যথা ঃ

১. হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ বলেন, মারেফাতপন্থী সুফী সাধকগণের পক্ষে পরিবার-পরিজন বড় পিবজ্জনক।

২. আল্লাহ্ পাকের একাগ্র ধ্যানই মানুষকে আল্লাহ্ছাড়া অন্য কিছু ভুলিয়ে দেয়।

৩. বন্ধুর স্মরণে যে বাধা সৃষ্টি করে তার থেকে দূরে থাকাই হল প্রকৃত বন্ধুত্ব ও প্রেমের লক্ষণ।

৪. গোপন প্রেম ও গোপন সাধনা দু'টিই সাধুতা ও সততার নিদর্শন।

৫. আল্লাহর একত্বে যিনি নিমগ্ন, তাঁর সত্য-তৃষ্ণা ক্রমবর্ধমান। অন্য কিছুতে তাঁর পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। কেননা যিনি সত্যের পিয়াসী, একমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁর তৃষ্ণা দূর হয়।

৬. পার্থিব জীবনে সর্বাঙ্গসুন্দর বস্তু হল ইখলাস। যদিও তা অর্জন করা দারুণ দুরূহ। মন থেকে কপটতা দূর করার বহু চেষ্টা করেছি, চেষ্টা করেছি লোক দেখানো ব্যাপারগুলি অর্জন করতে। কিন্তু দেখলাম, একদিক দিয়ে সেগুলি তাড়িয়ে দিলে অন্য দিক দিয়ে এসে হাজির হয়।

৭. আমৃত্যু আল্লাহর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকাই হল প্রকৃত যেহাদ বা তরকে দুনিয়ার একমাত্র নিশানা।

৮. যে কোন অবস্থায় দাসসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে চুপচাপ থাকাই হল প্রকৃত দাসত্ব।

৯. মানুষের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হল সত্যবাদী আর ধৈর্যশীল। আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোভী ব্যক্তি।

তাঁর অন্তিম প্রার্থনা ঃ

হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ যখন বুঝতে পারলেন, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা জানান, প্রভু গো! আমি মানুষকে কথায় ও নিজেকে কাজের মাধ্যমে উপদেশ দিয়ে এসেছি। অতএব হে প্রভু, সে উপদেশের বিনিময়ে আমার পাপসমূহ মাফ করুন। তাঁর মৃত্যুর পর কোন লোক স্বপ্নে দেখলেন, হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ শান-শওকতের সঙ্গে বেশ আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনা জীবন তো বেশ সুখে-শান্তিতে কাটছে। কোন্ আমলের ফলে আপনি এমন মহার্ঘ্য জীবন পেলেন? উত্তরে তিনি জানান, আমি পার্থিব-জীবনে কোনদিন সত্য ও মিথ্যাকে মিশিয়ে দেইনি।

হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ অসাধারণ এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। সদা-সর্বদা রোজা রাখার অভ্যাস ছিল তাঁর। এক মহাজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ আরেফ। মারেফাতের মাহাত্ম্য প্রচার তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তিনি বহু জ্ঞান-গুণী ও তাপস-দরবেশের সাহচর্যে আসেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য। হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহ-এর প্রধান খলীফাগণের সঙ্গেও তাঁর সু-সম্পর্ক ছিল। খ্যাতনামা সাধক হযরত আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ ও হযরত আবু সাঈদ রহমাতুল্লাহ ছিলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু। কোহিস্তান ও 'রা'-বাসীদের পীর ছিলেন তিনি। আল্লাহর অশেষ ইচ্ছায় তিনি সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। এ জন্য অন্যান্যদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি কাল ধরে আল্লাহর এবাদতের সুযোগ পান।

এবাদত, রিয়াজত ও মারেফাতের সাধনায় হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
আবু হাফস হাদ্দাদ খোরাসানী
রহমাতুল্লাহ

খোরাসানের এক কামার। দারুণ আসক্ত এক রূপসী যুবতীর প্রেমে। তাকে না পেলে কামার বুঝি প্রাণেই মারা যান। ছুটলেন নিশাপুরের এক ইহুদী জাদুকরের কাছে। প্রেমিকাকে পেতেই হবে। জাদুকর বলল, ঠিক আছে। তাকে পাওয়া যাবে। তবে একটা শর্ত আছে। তা হল, চল্লিশ দিন ধরে কামার কোন এবাদত বা কোন রকমের সৎ কাজ করতে পারবেন না।

এর আর এমন কথা কী! কামার রাজি হয়ে গেলেন। প্রেমিকার জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। বন্ধ হয়ে গেল তাঁর এবাদত। কোন ভালো কাজ করাই ইচ্ছাও মূলতবি রইল। এভাবে চল্লিশ দিন কাটানোর পর তিনি জাদুকরের শরণাপন্ন হলেন আবার। কিন্তু জাদুকর তাঁর ওপর জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে বিন্দুমাত্র ফলও পেল না? কারণ কি? জাদুকর সন্দেহ করল, ঐ চল্লিশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই কামার এমন কিছু করেছেন, যা সৎ কাজ বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু কামারও খুব ভালো করে ভেবে দেখলেন, না, তেমন কিছুই তিনি করেননি। তবে হ্যাঁ- হঠাৎ মনে হল, একদিন পথ চলতে চলতে পথের ওপর পড়ে থাকা কিছু পাথর পা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন এই ভেবে যে, হয়তো বা কোন পথচারীর পা ফসকে যেতে পারে।

তা হলে এই! জাদুকর ধরে ফেলল ব্যাপারটা। দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধরে কামার মানুষের জন্য করণীয় আল্লাহর নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন। তবুও দয়াময় আল্লাহ্ সামান্য একটা সৎ কাজের বিনিময়ে তাঁকে পাপাচারে লিপ্ত হতে দেননি। জাদুকর বললেন, এরপরও কি মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলিই তিনি করে যাবেন?

চেতনার ওপর যেন চাবুক পড়ে। ছি! ছি! সত্যিই তো! এ তিনি কী করছেন। একটি নারীর লোভে ডুবে গেছেন পাপের গভীরে? জাদুকরের হাতে হাত রেখে কর্মকার বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আর কোনদিন কোন রকমের কুকাজে লিপ্ত হবো না।

অতঃপর শুরু হল পরিশ্রুত জীবন। কর্মকারের কাজে প্রতিদিন এক দীনার রোজগার করে তিনি তা দান করে দেন। আর দান করেন গোপনে। যেন দানের খবর প্রকাশ না হয়। এশার নামাজের পর মানুষের ফেলে দেওয়া শাকপাতা সংগ্রহ করে রান্না করে তাই দিয়ে রুটি খান। আর এইভাবে দেখতে দেখতে এক বছর কেটে যায়।

একদিন এক অন্ধ তাঁর কামারশালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কুরআন পাকের একটি আয়াত পাঠ করছিল- রোজ কিয়ামতে তারা যা ধারণাও করতো না, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তা বের হয়ে পড়বে।

আয়াতটি শুনে কর্মকার জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। ডুবে গেলেন গভীর ভাবতন্ময়তায়। আর ঐ অবস্থায় একখণ্ড তপ্ত লোহা হাতে তুলে নিয়ে তাঁর সহকারীদের সেটি হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে বললেন। অবস্থা দেখে তারাও হতভম্ব। এ তিনি কী করছেন! গন্‌গনে লাল লোহা তুলে নিয়েছেন হাতের তালুতে। হাতুড়ির ঘা পড়বে কোথায়? কিছুক্ষণ পরে তাঁর অবস্থা যখন স্বাভাবিক হল, তখন হাতের লোহা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আর সেদিন থেকে দোকানের ঝাঁপই বন্ধ হয়ে গেল তাঁর মালপত্র যা ছিল। সবই বিলিয়ে দিলেন। বললেন, চেয়েছিলাম গোপন রহস্য গোপন থাকবে। কিন্তু থাকল না। আল্লাহ্ পাকের কী ইচ্ছা, তিনিই জানেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই কর্মকার তথা গোপন সিদ্ধপুরুষের নাম হযরত আবু হাফস হাদ্দাম খোরাসানী রহমাতুল্লাহ। প্রখ্যাত দরবেশ হযরত আবু ওসমান জাররী রহমাতুল্লাহ-এর মুর্শিদ। তাপস প্রবর শাহা গুজা কেরমানীও তাঁর সংস্পর্শে আসেন। তাঁরা দু'জনেই খোরাসান থেকে বাগদাদে গিয়ে বিশিষ্ট সাধক-দরবেশের কাছে আধ্যাত্মিক জীবনের পাঠ গ্রহণ করেন।

এক প্রতিবেশীর বাড়িতে হাদীস পাঠ হচ্ছে। পাঠ করছেন এক মাহাদ্দিস। হযরত আবু হাফস রহমাতুল্লাহ-কে শোনার জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। বললেন, ত্রিশ বছর আগে তিনি একটি হাদীস শুনেছেন। কিন্তু এখনও তা পুরোপুরি চর্চা করতে পারেননি। আর হাদীস শুনে কী হবে?

তারা বললেন, ত্রিশ বছর আগে শোনা সে হাদীসটি কি? তিনি বললেন, এও এক সৌন্দর্য যে, কোন ব্যাক্তি যে বিষয় তার কোন কাজে না আসে তা পরিত্যাগ করা।

একবার এক অরণ্যে শিষ্য তিনি ধ্যানমগ্ন। একটা হরিণ এসে তাঁর কোলে মাথা গুঁজে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আর এ ঘটনায় হযরত আবু হাফস রহমাতুল্লাহ কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদছেন তো কাঁদছেনই। সে কান্না চলল দীর্ঘক্ষণ। আর ঐ অবুঝ প্রাণীটি কী বুঝল কে জানে, তাঁর কান্না দেখে যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল। তাঁর শিষ্যরা এবার তাঁকে ধরে বসলেন, এর রহস্য কী হুজুর!

তিনি বললেন, আল্লাহর ধ্যান শুরু করার সময় তাঁর মনে একটা ইচ্ছা জাগে, যদি আল্লাহ্ একটি ছাগল জুটিয়ে দেন তো সেটিকে জবাই করে মাংস রান্না করে শিষ্যদের বেশ তৃপ্তি সহকারে খাওয়ান যাবে। আর এই ইচ্ছার স্ফূরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে হরিণ এসে যা করল তা তো সবাই দেখলেন।

এটা তো বেশ আনন্দের কথা, শিষ্যরা বললেন। কিন্তু খুশী না হয়ে আপনি ওভাবে কাঁদতে লাগলেন কেন?

তিনি বললেন, হরিণের আগমনে তাঁর মনে হল, এই নিরীহ প্রাণীটি বুঝি তাঁকে আল্লাহর ধ্যান থেকে সরিয়ে নিতে এসেছে। কেননা, আল্লাহ্ যদি মিসর অধিপতি ফেরাউনের হিত কামনা করতেন তাহলে ফেরাউনের ইচ্ছা ও আদেশক্রমে নীল নদীর পানির প্রবাহ বন্ধ এবং প্রবাহিত হত না।

একবার হযরত আবু ওসমান রহমাতুল্লাহ বলেন, মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি কিছু উপদেশ দিতে চান। আবু ওসমান রহমাতুল্লাহ তাঁকে এও বলেন যে, মানুষের প্রতি তাঁর অসীম মমতা। এমনকি, জাহান্নাম থেকে মানুষকে বাঁচাতে তিনি নিজে শাস্তি গ্রহণ করতেও রাজি।

হযরত আবু হাফস রহমাতুল্লাহ তাঁকে বলেন, অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে উপদেশ নিতে হবে। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক হওয়াও জরুরী। যেমন, বক্তৃতার সময় শ্রোতার সংখ্যা যদি খুব বেশী হয়, তাহলে মনে যেন এতটুকু অহমিকা না জন্মে। সব সময় মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্ সর্বদশী।

এরপর একদিন সত্যিই এক বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গেলেন আবু ওসমান রহমাতুল্লাহ। আর ঐ সমাবেশে হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ-ও গোপনে বসে রইলেন। বক্তৃতা শেষ হল। মিম্বর থেকে হযরত ওসমান রহমাতুল্লাহ নেমে আসবেন, এমন সময় একটি লোক দাঁড়িয়ে সভায় এককানি কাপড় চাইল। আবু ওসমান রহমাতুল্লাহ তৎক্ষণাৎ তাঁর গায়ের চাদরখানি তাকে দান করলেন। আর যায় কোথায়! হঠাৎ হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ তাঁর কাছে এসে ধমক দিলেন, নেমে এস মিম্বর থেকে। তুমি এখনও মানুষকে নসীহত করার যোগ্যতা অর্জন করনি। আবার তুমি দাবী কর, মানুষের প্রতি তোমার প্রচুর ভালোবাসা। তোমার দাবী যদি সত্য হত, তাহলে চাওয়ামাত্র অত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাড়াতাড়ি লোকটিকে তুমি চাদরখানা দান করতে না। তার মানে, অন্য কাউকে এ কাজ করার তুমি সুযোগই দিলে না। অগ্রগামী দাতা হিসেবে তুমি পুন্যের অধিকারী হতে চাইলে। প্রকৃতই তুমি যদি মানবদরদী হতে, তাহলে এ ব্যাপারে একটু সবুর করে অন্য কাউকে অগ্রবর্তী দাতা হওয়ার সুযোগ দিতে।

হযরত আবু হাফস রহমাতুল্লাহ আরবী জানতেন না। কেননা, তিনি ছিলেন খোরাসানের লোক। একবার কিছু শিষ্যসহ হজ্ব সম্পন্ন করে তিনি বাগদাদে যান। তাঁর সঙ্গীরা বলেন, সঙ্গে একজন দোভাষী থাকলে কথাবার্তা বলার বেশ সুবিদা হত। ওদিকে তাঁকে নিজের দরবারে স্বাগত জানাবার জন্য কয়েকজন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিয়েছেন হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ। হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ তাঁদের সঙ্গে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে গেলেন। আর সেখানে পৌঁছে অনায়াস ভঙ্গিতে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে আরবী ভাষায় অনর্গল কথা বলে গেলেন। যেন আরবী তাঁর মাতৃভাষা। আর এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে সবাই তাজ্জব বনে গেলেন।

আর একবার হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ ও হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ-এর মধ্যে কথাবার্তা চলছে। সেখানে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট কিছু লোক। কথা বলার ফাঁকে তাঁরা হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ গুণের মধ্যে দিয়ে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়? তিনি তখন হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনিই এদের ইচ্ছাটা না হয় পূরণ করুন। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, কোন লোক কোন বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে যেন ধারণা না করে যে, কাজটি তার দ্বারা সাধিত হয়েছে। আর সে যে এ ব্যাপারে দুঃসাহস দেখিয়েছে, সে কথা সে যেন নিজের মুখে প্রকাশ না করে। অর্থাৎ বীরত্বপূর্ণ কাজটির সঙ্গে সে যে সংশ্লিষ্ট, তা কোন রক্ষণাদির দ্বারাই যেন প্রকাশ না পায়। এটাই মানুষের প্রকৃত বীরত্ব।

এবার মুখ খুললেন হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর বিশ্লেষণ যে যথার্থ, তা স্বীকার করে তিনি বললেন, তাঁর মতে আসলে বীরত্ব হল এই যে, কোন লোক অন্যের প্রতি সুবিচার করে, কিন্তু বিনিময়ে অন্যের কাছে তা প্রার্থনা করে না।

হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ-এর এই অপূর্ব ব্যাখ্যায় হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ খুব বেশী খুশী হয়ে উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা এটি মনে রেখে আমল করো। আর জেনে রেখো, হযরত আবু হাফস রহমাতুল্লাহ বনী আদমকুলের মধ্যে বীরত্বে সেরা। তিনি বীরত্ব প্রসঙ্গে যা বললেন, তা যদি প্রকৃত হয় তাহলে আমি এখনও বীরত্বের সন্ধান পাইনি।

হযরত রহমাতুল্লাহ-এর শিষ্যগণ তাঁকে যেমন ভক্তি করতেন, তেমনি ভয়ও করতেন। চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বলার কারোর সাহস হত না। তাঁরা দরবারে দাঁড়িয়ে থাকতেন হাত জোড় করে, মাথা নিচু অবস্থায়। বসার ইশারা পেলে তবেই বসতেন। যেন এক সম্রাট বসে আছেন দরবারে-এর রকম ছিল তাঁর দরবারী ব্যক্তিত্ব। এই দৃশ্য দেখে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ একদিন বললেন, আপনি কি আপনার শিষ্যদের রাজসভায় বসিয়ে রাজনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, এ প্রশ্নের কোনও প্রয়োজন নেই। বইয়ের মধ্যে বিষয়ের শিরোনাম দেখেই সে বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-কে এক ডেকচি শাহী প্লায়েস ও হালুয়া তৈরী করতে বললেন। পায়েস ও হালুয়া তৈরী হলে তিনি বললেন, একটি লোকের মাথায় তুলে দিয়ে তাকে যথাসাধ্য দ্রুত হাঁটতে বলুন। তারপর ডেকচি বয়ে নিয়ে যেতে যেতে সে যেখানে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তার সবচেয়ে কাছের বাড়ির

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লোককে ডেকে তা দিয়ে দিতে হবে। তাই করা হয়। পায়েস ও হালুয়ার ডেকচি মাথায় নিয়ে একটি লোক যত দ্রুত সম্ভব চলতে লাগল। তার সঙ্গে গেল আর একটি লোক। তার কাজ হল হযরত হাফসের রহমাতুল্লাহ নির্দেশমত তাদের যথাযথ উপদেশ দেওয়া।

ডেকচি-বাহক সত্যিই একখানি বাড়ির কাছে ডেকচি নামিয়ে বিশ্রাম নিতে বসল। আর তার সাথের লোকটি গেল সবচেয়ে নিকটবর্তী বাড়ির লোকজনকে ডাকতে। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। বললেন, তুমি যদি পায়েস আর হালুয়া দুটোই এনে থাক, তাহলে বল, ঘর থেকে বের হয়ে আসি। তা না হলে এসে কোন লাভ নেই।

সাথী লোকটি তো রীতিমত অবাক! পায়েস ও হালুয়ার খবর ইনি জানলেন কী করে? তার কৌতুহলের উত্তরে বৃদ্ধ বললেন, আমার ছেলেটি অনেকদিন থেকে পায়েস আর হালুয়া খেতে চাইছে। গতকাল মোনাজাতের সময় কথাটি আমার মনে পড়ে। তখন নিজের মনে মনে বলি, এর জন্য দোয করার প্রয়োজন কি? আল্লাহর ইচ্ছা হলে তা আপনিই চলে আসবে। এখন তোমার ডাক শুনেই মনে হল, আল্লাহ্ নিশ্চয় আমার জন্য তা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বৃদ্ধের বিবরণ শুনে আর দ্বিরুক্তি না করে তখনই পায়েস ও হালুয়া বৃদ্ধে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হল।

হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ-এর একজন মুরীদ ছিলেন- যেমন চরিত্রবান তেমনি বিনয়ী। তাঁর সম্বন্ধে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ একদিন জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটি কতদিন ধরে এখানে আছে? হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ বললেন, প্রায় দশ বছর।

হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ বললেন, ভারী সৎ ও চরিত্রবান লোক। হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ শুধু তাই নয়, আমার কাজে সে সত্তর হাজার দীনার ব্যয় করেছেন, আর সেজন্য তার আরও সত্তর হাজার দেনা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার তার সাহস হচ্ছে না।

একবার হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ চলেছেন বাগদাদ থেকে মাদায়েনের পথে। এক সময় পানির অভাব দেখা দিল। কিন্তু কোথাও পানি মিলল না। তিনি নিজেই বলেছেন, একটানা পনের দিন তাঁকে পানির অভাব সহ্য করতে হয়। শেষে পৌঁছেলেন এক নদীর তীরে। আর জ্ঞান ও বিশ্বাসের কথা ভাবতে ভাবতে বসে পড়লেন সেখানে। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলেন আবু তরাব বলখী রহমাতুল্লাহ। বললেন, এভাবে বসে পড়লেন কেন হুজুর? তিনি বললেন, আমি এলম ও ইয়াকীন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করছি। দেখি কোন্‌টা প্রবল হয়। যেটি প্রবল হবে আমি সেটিরই সহযাত্রী হবো। যদি দেখি এলম প্রবল হয়েছে, তবে পানি পান করব। আর যদি ইয়াকীন প্রবল হয়, তাহলে আর পানি পান করব না।

আবু তুরাব রহমাতুল্লাহ বলে উঠলেন, আপনার জীবন অত্যুত্তম ও মহান হবে।

আর একবার এলম ও ইয়াকীনের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তার মনে। তখনও তিনি সফরে ছিলেন। আর তখনও পানির অভাব দেখা দেয়। শেষে ইয়াকীন জয়যুক্ত হয়। আর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনিও পানি পান করা থেকে বিরত থাকেন।

একবার মক্কা শরীফে পৌঁছে তিনি মানুষের দৈন্য-দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্ট প্রত্যক্ষ করেন। তখন ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য কিছু সাহায্য দেওয়ার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব ভাবানুভূতির। একখণ্ড পাথর তুলে নিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে হাত ওঠালেন। হে দয়াময়! আপনার সম্মানের শপথ, এ সময়ে আপনি যদি আমাকে কিছু সাহায্য না করেন, তবে এই পাথর ছুঁড়ে আমি এই মসজিদের সব লণ্ঠন টুকরো করে ভেঙে ফেলব। এই কথা বলে তিনি কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে শুরু করলেন। আর ঠিক এই সময়ে কোন এক অচেনা লোক এসে তাঁর হাতে একটি টাকার থলে তুলে দিয়ে চলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গেলেন। হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ সে টাকা বিলিয়ে দিলেন অভাবগ্রস্ত মানুষদের। তারপর হজ্ব সম্পন্ন করে ফিরে এলেন বাগদাদে। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ তাঁকে বললেন, আমার জন্য কী উপহার এনেছেন? হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ উত্তর দিলেন, আপনার জন্য এবারের উপহার হল, যদি কেউ আপনার সঙ্গে কোন অপরাধমূলক আচরণ করে, তাহলে সে অপরাধ আপনি নিজের বলে মনে করবেন। তবে আপনার প্রবৃত্তি যদি এতে শান্ত না হয়, তাহলে তাকে ধমকে দিন। বলুন, অপরাধী ব্যক্তিকে যদি ক্ষমা করতে না পারেন, তবে তার সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটবে। অর্থাৎ, এভাবে তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলে তার দ্বারা নিজের ইচ্ছা পালন করান।

হযরত আবু হাফস রহমাতুল্লাহ-এর উপদেশ শুনে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, এ ধরনের হিম্মত ও মরতবা আল্লাহ্ কেবল আপনাকেই দান করেছেন।

একবার হযরত আবু হাফস রহমাতুল্লাহ-কে একাদিক্রমে চার মাস হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ-এর মেহমান হয়ে থাকতে হয়। হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ-ও উন্নত মানের মেহমানদারী দেখান। প্রতিদিন নতুন নতুন উপাদেয় খাদ্য পরিবেশন করা ছাড়াও নানাভাবে তাঁর পরিচর্যা করেন। বিদায়কালে হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনি যদি কখনও নিশাপুরে যান তাহলে আমি আশা করি, আপনাকে মেহমানদারীর বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করতে পারব। হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ বললেন, কেন হুজুর, আমার কি কিছু ত্রুটি হয়েছে? হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ বললেন, মেহমানদারী ব্যাপারে আপনি খুব বাড়াবাড়ি করেছেন। এতটা উচিত নয়। মেহমানদারী এমন হওয়া উচিত যাতে মেহমানের আপ্যায়নে মেজবান অসন্তুষ্ট এবং বিদায়কালে খুশী না হন। মেহমানের আগমনে মেহবান যদি কথাবার্তায়, হাবভাবে, চাল-চলনে, আপ্যায়নের উপকরণ সংগ্রহে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে পারেন, তাহলে বোঝা যাবে তিনি প্রকৃত সাহসী ও বীর হৃদয়। আর এর বিপরীত হলে বোঝা যাবে, তিনি ভীরু এবং তাঁর আপ্যায়ন- প্রচেষ্টা কৃত্রিম, আন্তরিকতাহীন।

অবশ্য কিছুদিন পর হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ নিশাপুরে এসে হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ-এর মেহমান হলেন। সেদিন তাঁর বাড়িতে আরও চল্লিশ জন মেহমান ছিলেন। রাতের খাবারের জন্য একচল্লিশ জনের জন্য একচল্লিশটি বাতি জ্বালানো হল। শিবলী রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনিই তো বলেছিলেন, মেহমানদারীতে বাড়াবাড়ি করতে নেই। অথচ আপনি আজ মেহমানদের সম্মানে একচল্লিশটি বাতি জ্বালালেন। আপনার কথামত এটাকে বাড়াবাড়িই বলা চলে। তখনই হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ বললেন, যদি বাড়াবাড়ি মনে হয় তাহলে বাতিগুলি নিভিয়ে দিন।

হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ বাতি নেভাতে গিয়ে একটি ছাড়া অন্যগুলি নেভাতে পারলেন না। অবাক হয়ে তিনি বললেন, বাতিগুলি নেভানো গেল না। এর কারণ কী হুজুর? হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ বললেন, আজকের মেহমানদের পাঠিয়েছেন আল্লাহ্। অতএব, আল্লাহকে খুশী করার জন্য প্রত্যেক মেহমানের জন্য বাতি জ্বেলেছিলাম। যেটি নিভে গেল সেটি জ্বালিয়েছিলাম আমার নিজের জন্যই। অর্থাৎ সেটি আল্লাহর জন্য জ্বালানো হয়নি। তাই আপনি নিভিয়ে দিতে পেরেছেন। আসলে আমি যতটুকু যা করেছি সবই আল্লাহর জন্য। আর বাগদাদের আপনি যা করেছেন, তা শুধু আমাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে। অতএব, আমার আপ্যায়নে কোন বাড়াবাড়ি নেই। সেটা ছিল আপনার মেহমানদারীতে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর উপদেশ বাণী ঃ

১. হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ বলেন, যে লোক সুন্নতের অনুসরণ করে না, নিজেকে নিজে মন্দ ভাবে না, সে মানুষের মধ্যে গণ্য নয়।

২. ওলী আল্লাহদের কথা না বলে চুপ করে থাকা ভালো, নাকি কথাবার্তা বলা ভাল? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কথা বলা ধ্বংসের কারণ হতে পারে! অপর দিকে চুপ করে থাকার জন্য হযরত নূহ (আঃ)-এর মতো দীর্ঘজীবন লাভ করা সৌভাগ্যের কথা।

৩. প্রচুর এবাদত করেও যিনি খুব বেশী নম্র হতে পারেন, তিনিই হলেন দরবেশ।

৪. মানুষের মঙ্গল কামনা করা, তাদের সাহায্য বা উপকার করা, আল্লাহর দরবারে সাহায্যপ্রার্থী হওয়া, সুন্নতের অনুসরণ ও হালাল উপার্জন– এগুলি হল উত্তম মানুষের নির্দশন।

৫. সে ব্যক্তি অন্ধের তুল্য যে সৃষ্ট বস্তুর দ্বারা স্রষ্টাকে চিনতে চেষ্ট করে। আর যেব্যক্তি সৃষ্টি জগতকে আল্লাহর সৃষ্ট বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, সে-ই প্রকৃত চক্ষুষ্মান।

৬. আল্লাহর দরজায় যে স্থির, সব দরজাই তার জন্য খুলে দেওয়া হয়। আর যে শ্রেষ্ঠ শেষ নবীর অনুসরণ করে, সকল সেরা ও নেতা লোকগণ তার অনুগত হয়ে যায়।

৭. দুনিয়া এমন নিকৃষ্ট স্থান যে, প্রতি মুহূর্তে মানুষকে নিত্যনতুন পাপে জড়িয়ে ফেলে।

৮. যিনি প্রবৃত্তির পবিত্রতা ও সরলতার প্রত্যাশী, তিনিই আল্লাহর ওলী।

৯. আল্লাহ্ভীতি অন্তরের প্রদীপ সদৃশ। এই প্রদীপের আলোতে অন্তরের দোষগুণ দেখা যায়।

১০. দান গ্রহণ অপেক্ষা দান করা যে শ্রেয় মনে করে না, সে সাধন মার্গের পথিক নয়।

১১. যিনি দান করে তার প্রতিদান গ্রহণ করেন না, তিনি প্রকৃত পুরুষ। আর যিনি দান করে তার প্রতিদান গ্রহণ করেন তিনি অর্ধ পুরুষ। আর যিনি দান করেন না, কেবল দান গ্রহণ করেন, তিনি আদৌ পুরুষের মধ্যে গণ্য নন।

১২. যে কাজে আল্লাহর দীদার লাভ করা যায়, তার চর্চা করাই দরবেশের একমাত্র লক্ষ্য।

১৩. প্রকাশ্য এবাদতে আনন্দ হয়, কিন্তু এর দ্বারা অহঙ্কার আসে। কেননা, এবাদত করাতেই মনে আনন্দ আসে যে, সে অন্যের অপেক্ষা অগ্রগামী। আর অহঙ্কারী লোক ছাড়া কেউ নিজ কাজে আনন্দিত হতে পারে না।

১৪. আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী কুফরীর হুল তুল্য। যেমন মৃত্যু হুল বিষ।

১৫. বিশুদ্ধ বৈধ খাদ্যেই শুধু ধার্মিকতা নিহিত।

১৬. কুরআন-হাদীসের অনুসরণ করাই হল প্রকৃত সাধনার লক্ষণ।

১৭. মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিজের পাপরাশির কথা মনে করে অনুশোচনার মনকে একেবারে গলিয়ে ফেলা অবশ্য কর্তব্য।

১৮. নিজের মন যে আল্লাহকে সমর্পণ করতে চায়, তার উচিত দরবেশ– তাপসদের সাহচর্য অবলম্বন করা।

১৯. আল্লাহ্প্রেমিকের বড় লক্ষণ হল, তিনি মৃত্যুকালে আনন্দ অনুভব করেন।

হযরত মহমশ রহমাতুল্লাহ বলেন, তিনি বাইশ বছর ধরে হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। কিন্তু কোনদিন তাঁকে অলস অবস্থায় আমাদের মতো আল্লাহকে স্মরণ করতে দেখেননি। বরং তিনি যখনই আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তখন তা করতেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরম ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে। তখন তাঁর মধ্যে এমন ভাবান্তর সৃষ্টি হত যে, উপস্থিত লোকগণ তাঁকে দেখে এক বাহ্য বিস্মৃত ভাবতন্ময় লোক বলে মনে করত।

আপনি কী উদ্দেশ্যে আল্লাহর দিকে এভাবে ফিরলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ জানান, একজন গরীব একজন ধনীর নিকট কী উদ্দেশ্যে গমন করে?

আবদুল্লাহ মুসলামী ছিলেন, হযরত হাফস রহমাতুল্লাহ-এর এক পরম ভক্ত মৃত্যুর পূর্বে বলে যান, আমার মৃত্যুর পর হযরত আবু হাফসের রহমাতুল্লাহ পায়ের ওপর আমার মাথাটি যেন রেখে দেওয়া হয়।

হযরত
হামদুন কাচ্ছার
রহমাতুল্লাহ

আশ্চর্য ধর্মনিষ্ঠ একটি মানুষ। মুমূর্ষু বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে বসে সেবা-শুশ্রুষা করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বন্ধুটির মত্যু হল। আর তিনি ঘরের প্রদীপটি নিভিয়ে দিলেন। কারণ? কারণ, যেহেতু বন্ধু এখন মৃত। অতএব, তার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির মালিক তার অনাথ-এতিম সন্তানগণ। অতএব, তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা জায়েজ নয়।

এই অসাধারণ পরহেজগার মানুষটি হলেন হযরত হামদুন কাচ্ছার রহমাতুল্লাহ। ফেকাহ ও হাদীস শাস্ত্রের এক সুবিখ্যাত পণি। আবার তরীকতের সিদ্ধপুরুষ হযরত সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহ সাধক-দ্বয় ছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য। তাঁর শিষ্যমণ্ডলী কাচ্ছারী নামে পরিচিত। কাচ্ছারী আরবী শব্দ- যার অর্থ হল রজক। রজক যেমন কাপড় পরিষ্কার করে, তেমনি তাঁর শিষ্যরাও কুরআনহাদীসের আলোকে নিজেদের অন্তরলোক পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করতেন। একশ্রেণীর লোক তাঁকে মালামতী বা অসদাচারী নামে অভিহিত করে। অতএব, তাঁর অনুগামীদের মালামতী বলা হয়। বস্তুত নিশাপুরে মালামতী নামে একটি নবীন তরীকার সৃষ্টি হয়। চারিত্রিক বিশুদ্ধতার জন্য কঠোর সাধনা ছিল এই তরীকার বৈশিষ্ট্য।

তখন নূহ নামে এক দৈহিক শক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। আর বুদ্ধিবলেও তিনি ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে। তাঁর সাহকিসতাও ছিল অসাধারণ। তো একবার নিশাপুরের নদী তীরে তাঁর সঙ্গে হযরত হামদুন রহমাতুল্লাহ-এর দেখা হলে তিনি তাকে বীরত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করেন। নূহ জানতে চাইলেন, আপনি কার বীরত্বের কথা বলছেন? আপনার না আমার? তিনি বলেন, দু'জনেরই। তখন নূহ বলেন, আমার বীরত্ব হল, আমি দামী জোব্বা না পরে সুফীদের মোটা জোব্বা পরি। আর সুফীদের মতো চর্চা করে সুফী হিসেবে গণ্য হই। আর লোকলজ্জার ভয়ে এই পুরু পোশাক পরে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকি। আর আপনার জন্য বীরত্ব হল, আপনি যে মোটা জোব্বা পরে আছেন তা খুলে ফেলুন। এভাবে আপনি হাকীকতের গূঢ়তত্ত্ব রক্ষা করবেন। আর আমি শরীয়তের প্রকাশ্য বিধি-বিধানগুলি মেনে চলব। এরকম যদি হয়, তাহলে আপনার জোব্বা দেখে লোক প্রতারিত হবে না। আর আপনিও বিপন্ন হবেন না।

হযরত হামদুন রহমাতুল্লাহ-এর খ্যাতি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে। নিশাপুরের লোক তাঁকে ধরে বসল ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হবে। কিন্তু তিনি রাজি হন না। বলেন, দুনিয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ এখনও বর্তমান। কাজেই তাঁর বক্তৃতায় কাজ হবে না। ওয়াস বা বক্তৃতা তাকেই বলে, যার মধ্যে দয়াময় আল্লাহর সাহায্য যুক্ত হয়। বক্তৃতা দেওয়া উচিত যিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনে করেন যে, মুখ বুজে থাকলে ধর্মের ক্ষতি হয়, আর মুখ খুললে অর্থাৎ ওয়াজ-নসীহত করলে ধর্ম রক্ষা পায়।

বক্তৃতার জন্য যোগ্যতা অর্জনের নিদর্শন কী? তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, এক কথা বারবার না বলা, একটা কথা বলে পরে কী বলা যায়, তার চিন্তার প্রয়োজন না থাকা, এমন ভাব পোষণ করা যে, আল্লাহর তরফ থেকে কথা আসছে। আর বক্তা তা অনর্গল বলে যাচ্ছেন। মনে করতে হবে যেন স্বয়ং আল্লাহ তাঁর মুখ দিয়ে কথাগুলি বলাচ্ছেন। বক্তার কোন ভূমিকা বা কর্তৃত্ব নেই।

পূর্বজ আধ্যাত্মিক পুরুষগণের উপদেশমালা খুব বেশী ফসলপ্রসূ হতো কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তাঁদের লক্ষ্য ছিল ইসলামের মর্যদা বৃদ্ধি, নিজেদের হক আদায় আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর এখন নিজেদের গৌরব ও সম্মান বৃদ্ধি, পার্থিব স্বার্থসিদ্ধি ও মানুষের সন্তুষ্টির জন্য বক্তৃতা বা উপদেশ দেওয়া হয়।

তাঁর উপদেশ বাণী ঃ

(১) জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য প্রথমে পার্থিব দৃষ্টি ও আল্লাহর নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। পার্থিব দৃষ্টি অপেক্ষা আল্লাহর নীতি-নির্দেশ সহস্রগুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

(২) নিজের অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধানী যিনি, তাঁর পক্ষে পরিদৃশ্যমান অবস্থার সন্ধান করা কি সম্ভব?

(৩) অতি গোপনীয় বলে যা মনে হবে তা করোর কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়।

(৪) নফসকেও যে প্রিয় মনে করে, সে নফসের দ্বারা ফেরাউনী কাজ করে। অর্থাৎ অন্যায় অপকর্ম করে তার অশুভ পরিণাম ভোগ করে।

(৫) কোন মদ্যপায়ী মত্ত মানুষকেও ঘৃণা বা ভর্ৎসনা করতে নেই। কেননা, তাতে তোমার বা তার কোন স্বার্থ নেই।

(৬) দানশীলতা ও সেবা সৎ স্বভাবের লক্ষণ। আর কৃপণতা অসৎ স্বভাবের নিদর্শন।

(৭) নিরেজ দারিদ্য নিয়ে যে অহঙ্কার করে, ধনীর অহঙ্কারে চেয়ে তা কম মারাত্মক নয়।

(৮) দরিদ্র ব্যক্তি যদি বিনয়ী ও নম্র হয়, তবেই আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা, তা না হলে নয়।

(৯) পার্থিব লোভ-লালসা যাকে পরকালের থেকে দূরে রাখে, সে নিঃসন্দেহে হেয় ও ঘৃণ্য।

(১০) পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করলেই সকলের সম্মানের পাত্র হওয়া যায়।

(১১) বিপদের সময় যার ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তারাই আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করে থাকে।

(১২) শয়তান ও তার অনুগামীরা তিনটি বিষয়ে খুব বেশী খুশী হয়। যেমন, (ক) কোন মুসলিমকে হত্যা করা, (খ) কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা ও (গ) সাধনার বিষয়ে কারো মনে খুব বেশী ভয়ের সৃষ্টি হওয়া।

(১৩) খুব বেশী চতুরতা মনের মধ্যে অহমিকা সৃষ্টি করে। আর বেশীরভাগ চতুর লোকই ধর্মভ্রষ্ট হয়।

(১৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহ-কে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তুমি যদি পার্থিব জীবনে সফল হতে চাও তাহলে কখনও কারোর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করো না।

(১৫) দাস কাকে বলা যায়?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর উত্তর ঃ যে আল্লাহ্ পাকের এবাদত করে। আর মানুষ তার উপাসনা করুক এরূপ ইচ্ছা পোষণ না করে?

(১৬) তাওয়াক্কুল বিষয়ে তিনি বলেন, যদি কেউ খুব বেশী ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যা হয়তো আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও আল্লাহর ওপর সে ঋণ আদায়ে পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস রাখাই হল প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

(১৭) জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি তাঁর পুত্রগণের সম্পর্কে বলেন, তাদের সম্পর্কে আমীরী অপেক্ষা দরবেশীকে আমি বেশী ভয় করি।

মৃত্যু পুর্ব মুহূর্তে শিষ্য হযরত আবদুল্লাহ মুবারক রহমাতুল্লাহ-এর প্রতি তাঁর শেষ বাণী- মৃত্যুর পর আমাকে স্ত্রীলোকদের মধ্যে দাফন করো না। ২১৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত
মানসুর আম্মার
রহমাতুল্লাহ

পথে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা এক টুকরো কাগজ রাস্তায় পড়ে আছে। পরম করুণাময় আল্লাহর পবিত্র নাম পড়ে আছে পথের ধুলায়। ব্যস্ত হয়ে কাগজখানি তিনি কুড়িয়ে নিলেন। কিন্তু ধারে-কাছে এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে সেটি রাখলে আল্লাহর নামের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা পায়। তাই তিনি করলেন কী, দলা পাকিয়ে সেটি মুখে পুরে একেবারে গিলে ফেললেন। আর কোন চিন্তা-ভাবনা রইল না।

আর ঐ রাতেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন, আল্লাহ্ পাক বলছেন– তুমি আমার নামের যে সম্মান দেখালে, তার বিনিময়ে আমি তোমাকে গূঢ়তত্ত্বে তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সু-পরিপক্ক করে দেব।

অতঃপর নিবিড় সাধনায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি সুবিদিত হয়ে উঠলেন। তিনি হলেন হযরত মানসুর আম্মার রহমাতুল্লাহ। তিনি ইরাকের অধিবাসী। কিন্তু তাঁকে খুব বেশী সম্মান দেন খোরাসানবাসীরা। তাঁর জন্মভূমি নিয়ে মতান্তর আছে। কেউ বলেন, তাঁর জন্ম মার্ভ শহরে। কেউ বলেন বুশেখে, পরে পাকাপাকিভাবে বাস করেন বসরায়। যাই হোক, সমকালের একজন তত্ত্বজ্ঞান ও বাগ্মী হিসেবে তিনি সুপরিচিত হন। বলা হয়েছে, তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন। বড় বড় সুফী সাধকরেও তিনি প্রশংসা ধন্য।

তাঁর বক্তৃতার প্রবাব ও প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিল, মাত্র একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলে তা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

এক ধনীর পুত্র- নানা কুকীর্তি নায়ক। একদিন সে তার এক চাকরের হাতে চারটি দিরহাম দিয়ে বাজারে পাঠায়। উদ্দেশ্য কিছু মিষ্টি খরিদ করা। সে যখন বাজারে যাচ্ছে, তখন এক জায়গায় হযরত আম্মার রহমাতুল্লাহ-এর বক্তৃতা চলছে। তাঁর বাষণ শোনার বড় লোভ হল চাকরটির। সে দাঁড়িয়ে গেল বক্তৃতা সভায়। ঐ সভায় হাজির ছিলেন এক সর্বহারা দরিদ্র দরবেশ। তাঁর জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে হযরত আম্মার রহমাতুল্লাহ বললেন, এই দরবেশকে যে চারটি মুদ্রা দিয়ে সাহায্য করবে, আমি তার জন্য চারটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া জানাব।

এমন সুযোগ হাতছাড়া না করে ভৃত্যটি আর দেরী না করে দরবেশকে ঐ চারটি দিরহাম দিয়ে দিল। হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি কী চাও, বল। সে বলল, আমি স্বাধীন হতে চাই। আমার মনিবের হেদায়েত চাই, এই চারটি দিরহামের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বদলে অন্য চারটি দিরহাম চাই আর চাই আমার মনিবের, আপনার এবং সভায় সমবেত সব লোকের ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হোক।

চাকরের চাহিদামত হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন।

সে কেনাকাটা না করেই মনিবের কাছে চলে গেল। মনিব তার দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করল, আর সে সব কিছু খুলে বলল। তৎক্ষণাৎ মনিব তাকে মুক্তি দিল। বখশিষ দিল 'চারশ' দিরহাম। আর সে তওবা করে সৎ পথে ফিরে এল।

ঐ রাত্রে এবার মনিব স্বপ্ন দেখল, আল্লাহ্ বলছেন, তুমি ঘোর লম্পট হলেও তোমার ওপর, তোমার গোলামের ওপর, মানসুর ও তাঁর সভায় উপস্থিত সকলের ওপর আমার রহমত বর্ষণ করলাম।

আর একদিন তিনি এক সভায় ভাষণ দিচ্ছেন। এক লোক কাগজে একটি কবিতা লিখে তাঁর হাতে দিল। কবিতার মর্ম হল– সেব্যক্তি নিজে ধর্মনিষ্ঠ নয়, অথচ অন্যকে ধর্মনিষ্ঠ হওয়ার উপদেশ দেয়, সে সেই চিকিৎসকের মতো, যে রোগীর চিকিৎসা করে, কিন্তু নিজে কঠিন অসুখে ভুগছে। হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ কবিতা পাঠ করলেন, তুমি কথা অনুযায়ী আমল দেখো না। কেননা, আমার আমলের দোষে তোমার কোন অপকার হবে না।

এক রাতে তিনি কোন এক বাড়ির দরজায় উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন একটি লোক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিল– দয়াময়, আমি যেসব পাপ করেছি, তা আপনাকে অমান্য করার জন্য নয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় তা করেছি। নফস আমাকে বিপথগামী করেছে। আর তাকে সাহায্য করেছে শয়তান। দয়াময়!! আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন তো আর কে আমাকে সাহায্য করবে!! আপনি আমাকে ক্ষমা না করলে আর কে ক্ষমা করবে! এই পাপরাশি নিয়ে আমি কোথা দাঁড়াব প্রভু। আর কার কাছেই বা ক্ষমাপ্রার্থী হবো। লোকটির প্রার্থনা শুনে দারুণ কান্না এল হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ-এর। তিনিও আল্লাহর কালাম বলতে লাগলেন, হে ঈমানদারগণ! নিজেকে ও নিজ পরিবার-পরিজনদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথরের মূর্তিসমূহ।

কালাম পাঠ করে তিনি সেখান থেকে চলে এলেন। পরদিন ভোরে তিনি ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনতে পেলেন কান্নার রোল। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে জানা গেল, গত রাতে একটি লোক এখানে বসে আল্লাহর বাণী পাঠ করছিলেন। তা শুনে বাড়ীর একটি ছেলে আল্লাহর নাম নিয়ে দারুণ জোরে চিৎকার করে ওঠে। আর আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণত্যাগ করে।

হযরত মানসুর (ঃ)-এর মনে হল, তাহলে তো তিনিই ছেলেটির মৃত্যুর কারণ।

একবার খলিফা হারুনুর রশীদ তাঁকে একটি প্রশ্ন করেন। মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? আর সর্বাধিক নির্বোধই বা কে? তিনি তাঁকে ভেবে-চিন্তে উত্তর দেওয়ার জন্য তিন দিন সময় দিলেন। প্রশ্নটি শুনে হযরত মানসুর রহমাতুল্লাহ চলে আসছিলেন। কী মনে হল, আবার ঘুরে গিয়ে খলিফাকে বললেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর শুনুন। মানুষের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী আল্লাহর অনুগত ও তাঁর ভয়ে ভীত, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক জ্ঞানী। আর যেব্যক্তি সব রকমের পাপে লিপ্ত হয়েও আল্লাহর ভয়ে ভীত নয়, বরং সব সময় নিশ্চিন্ত, সে-ই সর্বাধিক নির্বোধ।

তাঁর বাণীসমূহ ঃ

১. তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয় হল আল্লাহ্ পাকের স্মরণ ও ধ্যান-ধারণার কেন্দ্র; আর দুনিয়াদারদের অন্তর হল লোভ-লালসার খনি সদৃশ। আরেফ বা তত্ত্বজ্ঞানী দু'শ্রেণীর।

এক, যাঁরা নিজেরাই দুঃখ-কষ্ট ও সংগ্রাম-সাধনার দিকে প্রলুব্ধ হয়, দুই, যিনি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন হন।

২. তত্ত্ব-জ্ঞান তত্ত্ব-জ্ঞানীর হৃদয়ে ঈমানের ভাষায় কথা বলে। সর্বত্যাগীদের অন্তরে আল্লাহর অনুগ্রহের ভাষায় কথা বলে। শিষ্যদের অন্তরে চিন্তা-ভাবনার ভাষায় কথা বলে। আর আলেমগণের অন্তরে ধ্যানের ভাষায় কথা বলে।

৩. সর্বশ্রেষ্ঠ দাস সে ব্যক্তি, যার পেশা হল এবাদত, যার কামনা আরাধনা হল সাধকত্ব অর্জন করা, যার আবাসস্থল হল নির্জনভূমি। যার লক্ষ্যস্থল হল মৃত্যু ও পরকাল। আর যার অভ্যাস হল তওবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত লাভ করা।

৪. স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মন পবিত্র আলোর মতো। পরে তার ওপর দুনিয়ার কালিমা-কলুষতা পড়ে তা আঁধার হয়ে যায়।

৫. প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। আর বিপদের সময় অধৈর্যশীল মানুষ পারলৌকিক বিপদে জড়িয়ে পড়ে।

৬. সংসারত্যাগীদের সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়। আর যারা নীরবতা অবলম্বন করে তারা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি, ওজর-আপত্তি বা কৈফিয়ত পেশ করা থেকে মুক্ত হয়।

৭. বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় জানা সত্ত্বেও তা অবলম্বন না করা গুরুতর অপরাধ।

হযরম মানসুর রহমাতুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখেন আবুল হাসান শা'রানী। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ অবশ্য প্রথমতঃ জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মানসুর আম্মার নও? যে লোকজনকে সংসার ত্যাগ করার উপদেশ দিত অথচ নিজে তা পালন করত না। তখন আমি বললাম, প্রবু, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আমি এমন কোন বক্তব্য পেশ করিনি যাতে আপনার পবিত্র গুণরাজির প্রশংসা ছিল না। আর আপনার প্রশংসা জ্ঞাপনের পর রাসূলে করীমের প্রতি দরূদ প্রেরণে। কোন ত্রুটি করিনি। এই প্রধন কাজ দু'টি সম্পন্ন করে তবেই মানুষকে উপদেশ দিয়েছি। আমার কথা শুনে রাব্বুল আলামীন বললেন, হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ। অতঃপর তিনি ফেরেশ্তাদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা এর জন্য আসন পেতে দাও। সে এই উর্দ্ধ জগতে বসে ফেরেশ্তাগণের মধ্যে আমার গুণের প্রশংসা করতে থাকুক-যেভাবে সে দুনিয়াতে বসে করেছিল।

হযরত
আহমদ ইবনে আসেম এন্তাকী
রহমাতুল্লাহ

হযরত আহমদ ইবনে আসেম এন্তাকী রহমাতুল্লাহ প্রাথমিক যুগের অন্যতম সাধক। ধর্মতত্ত্বের মর্মোদ্ধারে তিনি এত বেশী দক্ষ ছিলেন যে, হযরত সুলায়মান দরানী রহমাতুল্লাহ-এর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাপসও তাঁকে অন্তরের গুপ্তচর আখ্যায় ভূষিত করেন। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন হযরত হারেস মুহাসেবী রহমাতুল্লাহ। হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ ও হযরত সারবী সাকতী রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হযরত ফোজায়েলের রহমাতুল্লাহ সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। এই সুযোগ্য বিচক্ষণ তাপস দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।

আপনি কি আল্লাহর জন্য ব্যাকুল? এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আহমদ ইবনে আসেম রহমাতুল্লাহ বলেন, মানুষ ব্যাকুল হয় কোন অদৃশ্য ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য। কিন্তু আল্লাহ্

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অদৃশ্য কিংবা দূরবর্তী নন। যাকে দেখা যায় না, কাছে পাওয়া যায় না, তাকে দেখার জন্য, পাওয়ার জন্য মানুষ ব্যাকুর হয়। কিন্তু সেই অদৃশ্য বা দূরবর্তী ব্যক্তি যদি মূর্হ হয়, কাছে আসে বা ধরা দেয়, তার জন্য ব্যাকুলতা থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্ তো কখনও অদৃশ্য, অমূর্ত নন, তিনি সর্বত্র নিয়ত মূর্তমান। সুতরাং তার জন্য ব্যাকুল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

মারেফাত সম্পর্কে তিনি বলেন, মারেফাত তিন অবস্থায় বিভক্ত। যথা ঃ

১. প্রথম অবস্থা হল, আল্লাহর একত্বে অবিচল থাকা।

২. দ্বিতীয় অবস্থা হল, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যেকোন ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৩. তৃতীয় অবস্থা হল, আল্লাহর মহিমা-মাহাত্ম্যের উপযোগী এবাদত বন্দেগী করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় বলে ধারণা রাখা।

তিনি আরও বলেন–

১. উপাসনায় আনুষ্ঠানিকতার স্বল্পতা ও ধ্যান-নিবিড়তার আধিক্য আল্লাহ প্রেমের লক্ষণ। নির্জনে চুপচাপ বসে থাকার প্রবণতাও আল্লাহ প্রেমের একটি নিদর্শন। আনন্দে উদ্বেল না হওয়া ও বেদনায় হতাশ না হওয়াও আল্লাহ্ প্রেমের নিদর্শন।

২. আশাবাদী, কিন্তু আশাব্যঞ্জক বস্তুর অনুসন্ধানী নয়, এমন ব্যক্তি হল মিথ্যাবাদী। ভীতু বলে নিজেকে জাহির করে, অথচ আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করে না, এমন লোকও মিথ্যুক।

৩. মুক্তির পতে অন্তরায় হল নফস বা প্রবৃত্তি। তাকে যে বেশী ভয় করে পারলৌকিক মুক্তির জন্য তাকে তত বেশী আগ্রহশীল দেখা যায়।

৪. হযরত ইউনুস (আঃ) ধারণা করেছিলেন, আল্লাহ্ তাঁকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু তোমরা কি দেখনি যে, পরে তিনি কী কঠিন বিপদের মাঝে পতিত হন?

৫. মারেফাত অভিজ্ঞ সাধক-দরবেশদের সাহচর্য অবলম্বন কর।

৬. যোহদের লক্ষণ চারটি। যেমন, (ক) আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা, (খ) সংসারবিমুখ হওয়া, (গ) শুধু আল্লাহর সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা ও (ঘ) আল্লাহর পথে অবিচল থাকার জন্য নানা অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করা।

৭. মারেফাতে কম-বেশীর ওপরেই আল্লাহভীরুতা ও লজ্জা-শরম নির্ভরশীল।

৮. অন্তরকে পবিত্র রাখার অবলম্বনই হল রসনা সংযত রাখা।

৯. আল্লাহর অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই হল জ্ঞানীর কর্তব্য।

১০. একীন হল আল্লাহ পাকের দেওয়া এক বিশেস আলো সদৃশ, যে আলোর সাহায্যে তাঁর দাস পরকালের বিষয়গুলি স্পষ্ট দেখতে পায়। মাঝখানের সব রকম পর্দা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়।

১১. সৃষ্টি জগত থেকে দূরে সরে আল্লাহকে সামনে হাজির মনে করে তাঁর এবাদত করা চাই।

১২. পাঁচটি বস্তু মনকে শুদ্ধ করে। যথাঃ (ক) উত্তম লোকের সংস্পর্শ, (খ) পবিত্র কুরআন পাঠ, (গ) ক্ষুধিত উদর, (ঘ) রাতের এবাদত ও (ঙ) ভোর রাতে আল্লাহর দরবারে সানুনয় মোনাজাত।

১৩. আদল বা ইনসাফ দু'রকমের। যথাঃ (ক) সৃষ্টির সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠতা ও (খ) আল্লাহর সঙ্গে নিষ্ঠা রক্ষা তথা তাঁর বিধি-বিধানসমূহ যথা যথভাবে পালন করা।

আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মাল ও সন্তানসমূহ পরীক্ষা।

হযরত আহমদ ইবনে আসেম এন্তাকী রহমাতুল্লাহ পরোপকার ও আত্মত্যাগের ওপর বিশেষ জোর দেন। এর রাতে তাঁর বাড়িতে এলেন ঊনত্রিশ জন শিষ্য। তাদের খাবার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরিবেশন করা হল। রুটির পরিমাণ ছিল খুব কম। কাজেই রুটিগুলিকে টুকরো টুকরো করে শিষ্যদের পাতে দেওয়া হল এবং প্রদীপ একটু সরিয়ে রাখা হল। কিছুক্ষণ পরে প্রদীপটি কাছে আনা হলে দেকা গেল, প্রত্যেকের পাতে যা ছিল, তাই আছে। কেউই তা মুখে দেননি। অর্থাৎ প্রত্যেকের মনের কথা হল, যে বেশী ক্ষুধার্ত, তিনি তাঁর অংশটিও নিতে পারেন। ঊনত্রিশ জন শিষ্য এভাবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে কেউউ রুটি খাননি। আহমদ রহমাতুল্লাহ-এর শিক্ষা সার্থক হল।

হযরত
আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইক
রহমাতুল্লাহ

তাপস লোকের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইক রহমাতুল্লাহ। ধর্ম-সমুদ্রের ডুবুরী আর ঈমান-সমুদ্রের রত্নের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ কুপার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত ইউসুফ আসবাত রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে এন্তাকিয়ায় বসবাস করেন। হযরত ইউসুফ আসবাত রহমাতুল্লাহ-এ বহু অনুগামীর সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

তাঁর অমূল্য উপদেশ মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে। হযরত শেখ ফতেহ মুসেলী রহমাতুল্লাহ-কে তিনি বলেন, মানুষকে চারটি জিনিস দেওয়া হয়েছে। যথাঃ চোখ, জিভা, হৃদয় আর রিপু।

চোখের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার হল, আল্লাহ্ যা দেখতে নিষেধ করেছেন, তার দিকে দৃষ্টি না দেওয়া। জিভের কৃতজ্ঞতা হল, পাথির্বব কোন বস্তু মুখে তলব না করা। যে এর বিপরীত করবে, সে নিশ্চয় দুর্ভাগ্যের শিকার হবে। আর রিপুর সঙ্গে যার সম্পর্ক, তার অন্তরে পার্থিব লিপ্সা ও কু ইচ্ছা স্থান লাভ করে।

তিনি আরও বলেন;

১. ভয়ার্ত, ব্যক্তিব্যস্ত মানুষ রিপু বাসনাকে পূরণ হতে দেয় না, বরং তাতে বাধা সৃষ্টি করে।

২. লোভ-লালসা মুক্ত হয়ে সঙ্কুচিত মন নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা পরাকালের জন্য সর্বোত্তম পথ।

৩. পরকালে যা কোন উপকার করে না, এমন বস্তু অর্জন করা সম্পূর্ণ বৃথা। যা দিয়ে জটিলতা দূর হয়, সঙ্কটের অবসান ঘটে, এমন কামনাকেই বলে শুভ কামনা।

৪. মানুষের তিনটি অবস্থা। যথাঃ (ক) মানুষ অন্যায়-অপরাধ থেকে চিরতরে বিরত হয়ে যায়। (খ) তওবাও করা হয়, সাথে সাথে পাপও করা হয়, অবশ্য আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না, এমন একটা আশঙ্কাও মনে থেকে যায়।

৫. পুনঃ পুনঃ পাপ করা ও পুনঃ তওবা করা ও তার মধ্যে ক্ষমার আশা করা একেবারেই বৃথা।

৬. অপকর্মকারীর মনে ভয় থাকে বেশী। তার আশা খুব কম হওয়াই স্বাভাবিক।

৭. সিদ্দিক বা সততা গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা সর্বদা নির্ভীক ও বেপরোয়া।

৮. যে সমস্ত বস্তুর প্রকৃত পরিচয়া জানে, তাকেই বলে সাদেক বা সত্য পথিক।

৯. তুমি যদি সর্বোত্তম লোক হতে চাও, তাহলে সব কিছু ঝেড়ে-মুছে ফেলে একমাত্র আল্লাহর পথ ধরে থাক। এরূপ করতে পারলে দেখবে, তুমি কারও মুখাপেক্ষী নও। কিন্তু সবাই তোমার মুক্ষাপেক্ষী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
আমর ইবনে ওসমান মক্কী
রহমাতুল্লাহ

বিশ্ব-নন্দিত তাপস হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ-এর সুযোগ্য মুর্শিদ ছিলেন হযরত ওসমান মক্কী রহমাতুল্লাহ। বায়তুল্লাহ শরীফে তিনি দীর্ঘ দিন এতেকাফে ছিলেন বলে তাঁকে 'পীরে হরম' খেতাব দেওয়া হয়। তিনি প্রখ্যাত তাপস হযরত আবু সাঈদ খাযযার রহমাতুল্লাহ-এর সংস্পর্শেও আসেন। মক্কায় ও জ্ঞান-সাধকগণ বসবাস করতেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। তরীকতের ওপর অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সুফী-সাধক হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

বহু জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করেন, হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর হাল্লাজের জীবনের যে মর্মান্তিক পরিণতি দেখা দেয়, তা মূলে ছিল হযরত আমর ইবনে ওসমান রহমাতুল্লাহ-এর অভিশাপ।

কিন্তু সে অভিসম্পাতের কারণ কি?

একদিন হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ কিছু লেখছেন। হযরত আমর রহমাতুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি অমন বিভোর হয়ে কি লেখছেন? জবাবে হযরত হুসাইন বলেন, এমন কিছু যা কুরআনের সঙ্গে মোকাবিল করতে পার। কথাটি খুবই মারাত্মক। এ ধৃষ্টতা সহ্য করতে না পেরে হযরত আমর রহমাতুল্লাহ তখনই আল্লাহর দরবারে তাঁর প্রতি বদ দোয়া করেন।

কথিত আছে, একবার হযরত আমর রহমাতুল্লাহ মক্কা শরীফ থেকে ইরাকের তাপস মণ্ডলীকে যেমন– হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ, হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ, হযরত হারীরী রহমাতুল্লাহ প্রমুখকে একখানি চিঠি দেন। তিনি লেখেন, যারা পবিত্র কাবা শরীফের সৌন্দর্য দেখতে চায়, তাদের বলুন নিজেদের রিপুকে ছাঁটাই না করে তা দেখতে পাবে না। আর যারা বায়তুল্লাহ জিয়ারত করে আল্লাহ নৈকট্য লাভের প্রত্যাশী, তাদেরও বলে দিন আত্মাকে নিধন না করে কখনও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না। আর এ পথের পথিকদের এ কথাও জানা দরকার যে, এ পথে দু'হাজার বিশাল আগ্নেয় পর্বত ও এক হাজার অতল গভীর সমুদ্র আছে। যারা তরীকতে পথে যেতে চায়, তাদের এই বিপজ্জনক বাধাগুলি অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। যারা তা করতে সক্ষম, একমাত্র তারাই যেন এ পথে অগ্রসর হয়।

ইরাকে চিঠি পৌছল। আর হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ দেশের সমস্ত সাধককে এক জায়গায় মিলিত করলেন। সাধক সমাবেশে হিজায থেকে আগত হযরত আমর রহমাতুল্লাহ-এর চিঠি পাঠ করা হল। তারপর দু'হাজার আগ্নেয় পর্বতের মর্তোদ্ধারের জন্য সবাইকে বলা হল। সকলে এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, আগুনের পাহাড়ের অর্থ হল, নিজের আত্মাকে দু'হাজার বার বিলীন করা ও প্রকাশ করা। এভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করে তবেই এ পথে পা বাড়াতে হবে। না হলে আল্লাহর মহান দরবারে পৌছানো সম্ভব হবে না।

হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, আমি দু'হাজারের মধ্যে আজ পর্যন্ত মাত্র একটি অতিক্রম করেছি। হযরত হারীরী রহমাতুল্লাহ বললেন, ধন্যবাদ। আমি ওপথে মাত্র তিন পা এগিয়েছি। হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ বললেন, আপনারা দু'জনেই সৌভাগ্যবান। আর আমি এমনই হতভাগ্য যে, আজ পর্যন্ত এ পথ দূর থেকে দেখারও যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একবার হযরত আমর ইবনে ওসমান রহমাতুল্লাহ তাঁর এক অসুস্থ তরুণ বন্ধুকে দেখার উদ্দেশ্যে ইস্পাহানে যান। তরুণ তাঁকে দেখে বললেন, আপনি একজন কাওয়ালকে ডাকুন। তিনি আমাকে দু'ছত্র গজল শুনিয়ে দিন। আশা করি, তাতে আমি আরোগ্য লাভ করব।

বন্ধুর ইচ্ছাক্রমে একজন গজল গায়ককে ডেকে আনা হল। হযরত আমর রহমাতুল্লাহ তাঁকে বললেন, আপনি আমার এই আরবী কবিতাটি একবার পাঠ করে আমার বন্ধুকে শুনিয়ে দিন। এই বলে তিনি কবিতাটি গায়ককে শোনালেন ঃ

আমার অসুখ দেখ দিয়েছে, কিন্তু তোমাদের
কাউকেই আমি শুশ্রূষাকারীরূপে দেখতে পেলাম না।
কিন্তু তোমাদের কেউ যদি রোগাক্রান্ত হত, (তা হলে) আমি
সদা-সর্বদা তার শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকতাম।

কাওয়াল কবিতাটি অসুস্থ যুবককে আবৃত্তি করে শোনানো মাত্র তার অসুখ সম্পূর্ণ রূপে সেরে গেল। হযরত আমর ইবনে ওসমান রহমাতুল্লাহ-এর এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে যুবকটির পিতা পুত্রকে তাঁর হাতেই তুলে দিলেন, যেন সে সত্যিকারের একজন খাঁটি মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। কথিত আছে, সুযোগ্য শিক্ষাগুরুর সাহচর্য লাভ করে যুবকটি অচিরেই বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হন।

'আফামান শারাহাল্লাহু সাদরাহু লিল ইসলামি' —এই কালামটির অর্থ জানতে চাইলে হযরত আমর রহমাতুল্লাহ বলেন, যখন দরবেশের দৃষ্টি আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান, শান-শওকত, তওহীদ, শক্তিমত্তা, সার্বভৌমত্ব প্রভৃতির ওপর পতিত হয়, তখন বুকখানি এমন বড় হয়ে যায় যে, তার কাছে সবকিছু তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বলে প্রতিভাত হয় এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিটি পার্থিব বস্তু ম্লান ও নিষ্প্রভ দেখায়, খুব ক্ষীণ হয়ে ভাসতে থাকে।

তাঁর উপদেশসমূহ ঃ

১. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, বিরাটত্ব ও মহান গুণাবলী বিষয়ে মনে বিন্দুমাত্র সংশয় রাখা উচিত নয়। কেননা, এরূ চিন্তা-ভাবনা মানুষকে ধর্মহীনতার দরজায় পৌছে দেয়।

২. প্রেম-প্রণয় আত্মনিবেদনেরই অন্তর্গত। কেননা, মানুষ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তার সঙ্গেই তো ভালোবাসার সম্পর্ক পাতায়। এই জন্য ভালোবাসা ও প্রণয়কে পরস্পর পৃথক করা যায় না। আবার, যেখানে খুশী বা সন্তুষ্টি নেই, সেখানে প্রেমেওর কোন সম্ভাবনা নেই।

৩. দাস তারই সঙ্গে প্রেম করে, যে ছাড়া অন্য কেউ প্রেমের যোগ্য নয়।

৪. সব রকমের বিপদ-আপদ ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও আল্লাহর আদেশের ওপর সুদৃঢ় থাকাকে বলে সবর বা ধৈর্য।

হযরত
আবু সাঈদ খাযযার
রহমাতুল্লাহ

তাপস নগরী বাগদাদের আরও একজন সুযোগ্য সন্তান হলেন হযরত আবু সাঈদ খাযযার রহমাতুল্লাহ। সাধারণতঃ তিনি মারেফাতের ভাষ্যকার নামে পরিচিত। কেননা, সমকালে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সকলের শীর্ষে। তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অসাধারণ। অধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি চারশ বই লেখেছেন। সেগুলি ইসলামের অমূল্য সম্পদ।

তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় হযরত যুন্নূরাইন রহমাতুল্লাহ ও হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহ-এর সান্নিধ্য-সংস্পর্শে। ফানা (ধ্বংস) ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাকার (স্থায়িত্ব) তত্ত্ব তিনিই সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন। তাঁর মতামত তিনি উক্ত দু'টি কথার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। মারেফারেত কিছু কিছু ব্যাপারে কোন কোন পণ্ডিত তাঁর বক্তব্য অস্বীকা করেন। এমনকি তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী অভিযোগও তোলেন। তাঁর একখানি বইয়ের নাম কিতাবুস সিররি- তত্ত্ব গ্রন্থ। এই বইয়ের কিছু কিছু কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। ধর্মহীনতার অভিযোগের তাও একটি কারণ। যেমন, তিনি লিখেছিলেন, আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে সে আল্লহ্ ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টি এমনকি রিপু পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেই তাহা স্থিত হয়। তখন যদি তাকে বলা হয়, তুমি কোথকার লোক এবং কী কী কামনা করছ? তখন এ প্রশ্নের উত্তরে বলবেন, আল্লাহ, এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বলতে থাকবে, আল্লাহু জাল্লা জালালুহু। কেননা, এই শ্রেণীর সুফীগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আল্লাহর জ্যোতির প্রেমে ডুবে যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের এমন সীমায় পৌছায় যে, কেউ তাঁর সামনে আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণ করলেই তিনি আল্লাহর প্রেমে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এবং ধারণা করেন যে, এই শব্দ দাসের নয়, বরং স্বয়ং মহান প্রভুর থেকে এসেছে। এখানে পৌছেই সমস্ত জ্ঞানীর জ্ঞানের ভরাডুবি ঘটে।

হযরত আবু সাঈদ রহমাতুল্লাহ কয়েক বছর সুফীদের সান্নিধ্যে থাকে। তখন তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোন মতবিরোধ ছিল না। পরে অবশ্য তিনি পৃথক হয়ে যান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, আমার মধ্যে তাদের কাছে থাকার সামর্থ্য দেখতে পাইনি।

একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন, দু'জন ফেরেশ্তা আকাশ থেকে অবতরণ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, সত্য কি? তিনি উত্তর দেন প্রতিশ্রুতি পালন করা। তিনি ঠিক বলেছেন বলে মন্তব্য করে তাঁরা চলে গেলেন।

একবার রাসূলে করীম রহমাতুল্লাহ তাঁকে স্বপ্নের মধ্যে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস? তিনি জবাব দেন, মাফ করবেন, মহান প্রভুর ভালোবাসায় নিমগ্ন হয়ে অন্য যেকোন দিক থেকে আমি গাফেল হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ বললেন, সে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে, সে আমাকেও ভালোবাসে।

একবার তিনি শয়তান ইবলীসকে স্বপ্নে দেখে তাকে মারা জন্য লাটি তোলেন। তখন অদৃশ্যবাণী আসে, ইবলীস লাঠিকে ভয় পায় না। বরং ভয় করে বিশ্বাসীদের অন্তর জ্যোতিকে। তখন আবু সাঈদ রহমাতুল্লাহ ইবলীসকে তাঁর কাছে ডেকে বসতে বললেন। ইবলীস বলল, আর বসে কাজ নেই। কারণ, যে বস্তু দিয়ে আমি মানুষ প্রবঞ্চিত করি, আপনি আপনার অন্তর থেকে তা বের করে দিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বস্তুটি কি? ইবলীস বলল, তা হল দুনিয়া। দুনিয়াত্যাগীরা আমার ছলনায় ভোলে না। অভশ্য আপনার যখন দু'টি পুত্র আছে, তখন কোন না কোন সময় আপনি আমার ফাঁদে পড়বেন।

হযরত আবু সাঈদ রহমাতুল্লাহ-এর দু'টি পুত্র ছিল। একজন তাঁর জীবিতকালে মারা যান। মৃত পুত্রকে স্বপ্নে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন। ছেলে বললেন, তিনি আমাকে তাঁর দরবারে ঠাঁই দিয়েছেন। আবু সাঈদ রহমাতুল্লাহ আবারও বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দাও। পুত্র বলল, কপট অন্তর নিয়ে আল্লাহকে কোন আচরণ প্রদর্শন করবেন না।

আবু সাঈদ রহমাতুল্লাহ বলেন, আরও কিছু বল। পুত্র বললেন, আরও বললে আপনি তা কাজে পরিণত করতে পারবেন না। পিতা বললেন, কাজে পরিণত করার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করছি। পুত্র বলল, আল্লাহর উপাসনা করার জন্য সর্বদা মনকে স্বাভাবিক রাখবেন। আর একটির বেশী জামা কখনও ব্যবহার করবেন না। শোনা যায়, সেদিন থেকে আমৃত্যু ত্রিশ বছর তিনি কোনদিন একটির বেশী জামা ব্যবহার করেননি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একবার তাঁর মনে পার্থিব কিছু বস্তুর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু অদৃশ্য বাণীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহর দরবারে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য প্রার্থনা সমীচীন নয়। তিনি বলতেন, আল্লাহ্ যখন আমাদের রুজিদাতা, তখন আগামীকালের জন্য কিছু সঞ্চিত রাখা লজ্জার বিষয়।

একবার পথ চলতে চলতে তিনি ক্ষধার্ত হয়ে পড়েন। রিপু তাঁকে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করার তাগাদা দেয়। তিনি শুনলেন না। তখন রিপু অন্যভাবে তাঁকে প্রতারিত করে। রিপু বলে, খাদ্য না চাও, অন্তত আল্লাহর কাছে ধৈর্য্য ভিক্ষা কর। তিনি ধৈর্যের প্রার্থনা করতে উদ্যত হয়েছেন। আর তখনই তাঁর মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। তিনি অদৃশ্য বাণী শুনতে পেলেন, আমার বন্ধু জানেন যে, আমি তাঁর খুব কাছে আছি। আর এ সত্য যে, যে আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি তাকে ধ্বংস করি না। আমার নিকট খাদ্য চাইতে তার মন চায় না। কেননা, খাদ্য আল্লাহর বিপরীত। বরং নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা স্মরণ করে সে মনে করে যে, আমার সাহায্য ছাড়া সবরও করতে পারে না। তবুও আমার নিকট ধৈর্যের প্রার্থনা করতেও সে ইতস্তত বোধ করেন। আমি এমন লোককে কখনও বিনষ্ট করি না।

এভাবে প্রবৃত্তির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তিনি একটি খেজুরের বাগানে হাজির হলেন। বাগান দেখে প্রবৃত্তি কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করে। কিন্তু তিনি ওদিকে না গিয়ে নেমে পড়লেন মাঠে। এ সময় কাফেলার একটি লোক জোর করে তাঁকে ধরে নিয়ে এল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে এখানে এসছি, তা তুমি জানলে কী করে? সে বলল, আমি অদৃশ্য শব্দের নির্দেশে এখানে এসেছি। ঐ শব্দ আমাকে বলে যে, আল্লাহর এক বন্ধু এক বালুস্তুপের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। তাকে গিয়ে নিয়ে এস।

তিনি দিনে মাত্র একবার খেতেন। কিন্তু একবার দিনে অনাহারে থাকেন। আর দুর্বলতাবশতঃ এক জায়গায় বসে পড়েন। তখন অদৃশ্য আওয়াজ শোনা যায়, তুমি খাদ্য চাও না শক্তি? তিনি শক্তি কামনা করলেন। আর সত্যিই তাঁর মধ্যে এমন প্রবল শক্তি অনুভূত হল যে, অভুক্ত অবস্থায় তিনি বারো মঞ্জিল পথ পার হয়ে গেলেন।

এক নদী তীরে একজনের সঙ্গে তাঁর দেখা। লোকটির পরনে দরবেশী জোব্বা। হাতে দোয়াত-কলম। হয়ত কোন সাধক হবেন। অথবা কোন ধর্মতত্ত্ববিদ। এরূপ ধারণা করে তিনি তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, আল্লাহকে পাওয়ার মতো পথ কি? সে বলল, দু'টি পথ আছে। একটি সাধারণ লোকের জন্য, অন্যটি বিশেষ লোকদের জন্য। তবে আপনি যে পথের অনুসারী, তা সাধারণ জনতার পথ। কেননা, আপনি এবাদতকেই মিলনের উপলক্ষ্য ও ধন-সম্পদকে তার পর্দাস্বরূপ মনে করেন।

একবার এক বনে দশটি শিকারী কুকুর তাঁকে ধরে। উপায়ান্তর না দেখে তিনি মোরাকাবায় বসে গেলেন। তখন কোথা থেকে একটি সাদা কুকুর এসে অন্য কুকুরগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ায়। তারপর তিনি যখন গন্তব্য স্থানে দিকে রওনা দিলেন, তখন সে তাঁকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হযরত আবু সাঈদ রহমাতুল্লাহ বলেন, আল্লাহ্ যখন কাউকে বন্ধুরূপে মনোনীত করেন, তখন তার জন্য ধ্যানের দুয়ার খুলে দেন। তারপর তাঁকে তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আর তাঁর ওপর নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করেন। আর বন্ধু যখন তা দর্শন করেন, তখন আমিত্ব ভুলে গিয়ে তিনি তাঁর মধ্যেই শরণ নেন।

তিনি বলেন, সাধনার প্রথম স্তর হল দীনতা। বিনয়ের সঙ্গে অস্থির চিত্ততা, তারপর পরম বন্ধুর মিলন লাভের আনন্দ। তারপর সচেতন দৃষ্টি নিয়ে প্রেমিকের প্রেমে হারিয়ে যাওয়া। অবশেষে প্রেমিকের সঙ্গে স্থায়ী মিলনের প্রতীক্ষায় থাকা। এই স্তরের ওপরে কেউ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পৌঁছাতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও কী নয়? হ্যাঁ, তিনি পৌঁছেছেন্তবে তা হল শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার পরিমাণ। যেমন বলা হয়, নিখিল বিশ্বের ওপর আল্লাহর জ্যোতি একবার মাত্র পতিত হয়। কিন্তু হযরত আবু বকর রহমাতুল্লাহ-এর প্রতি পতিত হয়েছিল একশ বার।

একবার তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত আব্বাস মুহতাদী রহমাতুল্লাহ বলেন, প্রভুর পৃথিবীতে বাস করে, পৃথিবীর নদী-নালার পানি ব্যবহার করে ধর্মনিষ্ঠার কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা করে না? তাঁর কথা শুনে হযরত আবু সাঈদ খাযযার রহমাতুল্লাহ লজ্জায় মাথা নিচু করে বললেন, আপনি সত্যিই খাঁটি কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ্ সকলের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করেন। অতএব, তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার। যিনি আল্লাহকে নিজের প্রতি এহসানকারী বলে মনে না করেন, তিনি কখনও আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করতে পারেন না। তিনি বলেনঃ

(১) সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীন। দারেস অন্তরে তাঁর ছায়া প্রতিফলিত হলে আল্লাহ্ ছাড়া সব দূরীভূত হয়।

(২) অভিজ্ঞতা বা বিচক্ষণতার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে মূলত তা আল্লাহর জ্যোতির আলোকেই দেখা হয়। তাঁর জ্ঞানের মূল্য আল্লাহ্। কাজেই তাতে ভুল-ভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই। বরং তাঁর মুখ থেকে যা বের হয়, তা আল্লাহর কথা বটে।

(৩) আল্লাহর দাসগণের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যিনি আল্লাহর কালামসমূহ প্রকাশে খুবই দক্ষ, পারদর্শী। তাঁরা বাকপটুও বটে। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে একেবারে নির্বাক।

(৪) অন্তরে যাঁর আল্লাহর মারেফাত, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুই দেখতে পান না। আল্লাহর কালাম ছাড়া কারও কথা তাঁর কানে প্রবেশ করে না। আর আল্লাহ্ ছাড়া কারও দিকে মুখও করে না।

(৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব বস্তু থেকে মনকে মুক্ত এবং পবিত্র রাখা ও তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকাতেই শান্তি।

(৬) ধ্যান তিন ধরনের। যথাঃ (ক) জিভের যিকির, অন্তর অনুপস্থিত, (খ) জিভের যিকির ও সেই সঙ্গে অন্তরের উপস্থিতি (এটি সফল ও পুণ্যযোগ্য), (গ) ধ্যানে হৃদয় নিমগ্ন কিন্তু জিভ নির্বাবক। (এর মূল্য একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।)

(৭) সবকিছু থেকে সম্পর্ক শূন্য হয়ে শুধু আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ার নামই তওহীদ।

(৮) তত্ত্ব জ্ঞানী পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্বে পার্থিব বস্তুর কামনা করে। পূর্ণতা-প্রাপ্তির পর আর এ অবস্থা থাকে না। তখন সবকিছু তারই মুখাপেক্ষী।

(৯) যার নৈকট্য প্রাপ্তি হয় তাকে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কোন কল্পনা মনে আসে না। এলেও তার দিকে দৃষ্টি যায় না। এটিই হল নৈকট্যের নিদর্শন।

(১০) আমল যুক্ত হলেই তা খাঁটি জ্ঞান হয়। যা উন্নত করে তাই হল খাঁটি ঈমান।

(১১) আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুর যিনি মুখাপেক্ষী নন, বরং সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী, তিনিই হলেন আরেফ– বা তত্ত্বজ্ঞানী।

(১২) যিনি আরেফ– আল্লাহর পথে আবিরাম ক্রন্দনশীল। অতঃপর তিনি যখন তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হন, তখন তাঁর অন্তর হতে সবকিছু বিলীন হয়ে যায়।

(১৩) সাধকের আনন্দ সাধনাতেই। অন্য কিছুতে তাঁর শান্তি নেই।

(১৪) মনে-প্রাণে আল্লাহ্ নির্ভরতাই হল প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

(১৫) নিরেজ ও আল্লাহর মধ্যে মিলনের বাধা যিনি দূর করতে পারেন না, তার তাকওয়া, মোরাকাবা, কাশফ ও মোশাহাদা প্রভৃতি কিছুই সফল হয় না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত
আবুল হাসান নূরী বাগদাদী
রহমাতুল্লাহ

অন্তরের বাদশাহ (আমীরুল ক্বলুব) নামে পরিচিত হযরত আবুল হাসান নূরী বাগদাদী রহমাতুল্লাহ হলেন অসাধারণ তত্ত্বদর্শ, তাপসকুল শিরোমণি। এই জন্য তাঁকে আবার 'কামারুস সুফিয়া' বা সুফীগণের চাঁদও বলা হয়। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত আহমদ হাওয়ারী রহমাতুল্লাহ-এর সাহচর্যে থেকে তিনি আলোকময় হয়ে ওঠেন।

তিনি অন্ধকারে বসে যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দের সঙ্গে আলো কিচ্ছুরিত হতো। আর সে আলোয় অন্ধকার হতো আলোকোজ্জ্বল। এই জন্য তাঁকে 'নূরী' উপাধি দেয়া হয়। বনের মধ্যে তাঁর একটি ক্ষুদ্র সাধনালয় ছিল। যেখানে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তিনি ঐ ঘরে পদার্পণ করা মাত্র তাহা আলোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

তিনি দারিদ্র্য ও সাধকত্বের চেয়ে ত্যাগ ও উৎসর্গের ওপর খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন। প্রথমে পরের উপকার কর, পরে নিজের- এই ছিল তাঁর শিক্ষানীতি। তিনি বলতেন, সাধক দরবেশের সঙ্গ ও শিক্ষা গ্রহণ কর ফরজ। নির্জনবাস তাঁর খুব একটা পছন্দ ছিল না। তাঁর মতো এবাদত নিষ্ঠ আর কেউ নেই বলে একবার আবু আহমদ মাগবেরী মন্তব্য করেন। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর নামল্লেখ করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, তিনিও নন।

একবার তিনি বলেন তাঁর কয়েক বছরের সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। মহান নবীগণের উপদেশাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়, তাঁর সাধনার মধ্যে হয়ত অহমিকার ছোঁয়া লেগেছে। পরে তিনি নিশ্চিত হন, যে, সত্যিই তাঁর আত্মা রিপু কবলিত। অবশেষে তিনি রিপুর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন। আর তখন থেকে কিছু কিছু গূঢ়তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হতে থাকে। রিপুর কোন ইচ্ছাই আর পূর্ণ হয় না। তারপর তিনি দজলা নদীতে মাছ ধরার ফাঁদ পেতে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, যতক্ষণ না ফাঁদে মাছ পড়ছে, তিনি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। আল্লাহ্ তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন। প্রচুর মাছ আটকা পড়ল। আর এই বৃত্তান্তটি পেশ করলেন হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর দরবারে। জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, মাছের বদলে সাপ ধরলে নিশ্চয়ই তাকে অলৌকিক কাণ্ড বলা যেত।

তুমি এখন তরীকতের মধ্যম মঞ্জিলে। অতএব, এটিকে অলৌকিক না বলে প্রতারণা বলতে হবে।

তিনি তখন খ্যাতির তুঙ্গে। সে সময় বাগদাদের এক তরুণ তরীকতপন্থীদের পেছনে লাগল। এঁদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাল রাজ দরবারে। তার অভিযোগ ছিল, এরা গান গায়, নাচে, আজে-বাজে কথা বলে। এদের গান ও গজলের ভাষায় ধর্মশূন্যতার পরিচয় প্রকাশ পায়।

খলীফা তাঁদের- যথাঃ হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ, হযরত আবু হামযা, হযরত রোকাম রহমাতুল্লাহ, হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ প্রমুখকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হল। সবাইকে হাজির করা হল দরবারে। আর খলীফা তাঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

বধ্যভূমিতে প্রথমে আনা হল হযরত রোকাম রহমাতুল্লাহ-কে। কিন্তু হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দাঁড়িয়ে গেলেন মধ্যভূমিতে। সবাই তাজ্জব। জল্লাদ কর্কশ কণ্ঠে বলল, তরবারি খুব প্রিয় জিনিস নয়, তার তলায় আসার জন্য এত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। তোমার পাল এখনও আসেনি। তুমি সরে যাও। সময় হলে ঘাড় পেতে দিও।

হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ বললেন, আমাদের নীতি হল নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া, প্রয়োজনে প্রাণও উৎসর্গ করা। পৃথিবীতে প্রাণই সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। তাই নিজের প্রাণ দিয়ে যদি অন্যের প্রিয় বস্তুকে কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা করা যায়, তা হলে আমরা পিছিয়ে না গিয়ে এগিয়ে যাই। এজন্য আমি আমার তরীকতের বন্ধুর স্থলে উপনীত হয়েছি।

খলীফা গভীর মনোযোগ সহকারে কথাগুলি শুনলেন। তারপর কী যে হল, ঘাতককে বিরত হতে বললেন। আরও জানালেন, কাজীর দ্বারা নতুনভাবে এদের বিচার করাতে হবে। অতএব, বিচার উঠল কাজীর আদালতে। কাজী ব্যক্তিগত ভাবে এঁদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতেন না। বিশেষ করে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-কে তিনি মহাজ্ঞানী বলে জানতেন। হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ-সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। তবুও পরীক্ষা করার জন্য তিনি হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, বলুন তো, সাড়ে বিশ দীনারের জাকাত কত দিতে হবে। হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ-এর চটপট উত্তরঃ সাড়ে বিশ দীনার দিতে হবে। সে আবার কেমন কথা? কাজী স-বিস্ময়ে বলেন, এ আপনি কার কাছে শিখেছেন?

হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ বললেন, হযরত আবু বকর রহমাতুল্লাহ শিখিয়েছেন। তাঁর কাছে চল্লিশ দীনার ছিল। তিনি সবই দান করেন। একটিও নিজের জন্য রাখেননি। কাজী বললেন, সে হিসেবে তা হলে তো বিশ দীনার জাকাত হতে পারে। আরও আধা দীনার দিতে হবে কেন? শিবলী রহমাতুল্লাহ বললেন, ওটা দিতে হবে জরিমানাস্বরূপ। বিশ দীনার জমা করে রাখা হল কেন?

এর পর কাজী হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ-কেও একটি প্রশ্ন করলেন। আর তার উত্তরও পেয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ। বলাবাহুল্য, কাজী এবার লজ্জিত হলেন। এবার কাজীকে প্রশ্ন করলেন হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ। আপনি এসব কি জিজ্ঞেস করছেন? আসল কথা তো জিজ্ঞেস করলেন না? শুনুন, দুনিয়াতে এমনও আল্লাহর দাস রয়েছেন, যারা আল্লাহর ভয়েই ভীত। যাদের জীবন-মরণ, নিদ্রা-জাগরণ সবই আল্লাহতে সম্পর্কিত। আল্লাহ্ দর্শন থেকে মুহূর্তের জন্যও বঞ্চিত হলে তাঁরা মৃতবৎ হয়ে যান। তাঁরা আল্লাহর কাছেই শুয়ে থাকেন। তাঁর দ্বারাই পানাহার করেন। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছেই চান। এগুলিই হল প্রকৃত জ্ঞান ও বিদ্যা। আপনি যা জিজ্ঞেস করলেন, তা কোন জ্ঞানে বিষয় নয়। কাজী এ কথা শুনে দিশেহারা হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি খলীফাকে জানিয়ে দিলেন, এসব লোক যদি বিধর্মী হয়ে থাকেন তা হলে আমাকে বলতে হয়, দুনিয়াতে একজনও তওহীদবাদী নেই।

কাজীর কথা শুনে খলীফা দরবেশগণকে আবার দরবারে ডাকলেন। এবার যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, আপনাদের কিছু কাম্য থাকলে আমাকে বলুন। তাঁরা সবাই বললেন, আমাদের কাম্য এই যে, আপনি আমাদের কথা ভুলে যান। আমাদের অন্তরে গ্রহণ না করে পৃথক করে দেয়াই আমাদের জন্য উত্তম।

খলীফা এ ধরনের উত্তর শুনে খুবই অনুতপ্ত হলেন। কাঁদলেনও। তারপর সসম্মানে তাঁদের বিদায় জানালেন।

একদিন হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ বললেন, এক ব্যক্তি নামাজ পড়াকালীন দাড়ির মধ্যে হাত বুলাচ্ছে। তিনি বললেন, আল্লাহর দাড়ি থেকে তোমার হাত দূরে রাখ। আর কেউ খলীফার কাছে নালিশ করল যে, হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ এ ধরণের কুবাক্য বলেছেন। খলীফা হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ-কে বললেন, আপনি এ ধরনের কথা বলেন কেন? হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বললেন, দাসের ওপরে আল্লাহর অধিকার। সে হিসেবে দাসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাঁর। অতএব, বান্দার দাড়িকে আল্লাহর দাড়ি বললে অন্যায় বলা হয় না। খলীফা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এই জন্য যে, তিনি তাঁকে কতল করার হুকুম দেননি।

একবার হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বর সমাধান জানতে চাইলেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে দীর্ঘ ত্রিশ বছর। আর তাতে তিনি জর্জরিত, শক্তি ও উদ্যমহীন। দ্বন্দ্বটি হল এই যে, যখন প্রভু প্রকাশিত হয়, তখন তিনি থাকেন না। আর যখন তিনি প্রকাশিত হন তখন প্রভু থাকেন না। এ নিয়ে আল্লাহর দরবারে বহু কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয়, অনুরোধ-উপরোধ করেছেন। কিন্তু কাজ হয়নি। তাঁর ঐ এক কথা। হয় তুমি থাকবে, না হয় আমি। তাঁর কথা শুনে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ তাঁর শিষ্যদের বললেন, যদি আল্লাহর প্রেমে, ভাবনায় বিভোর কাউকে দেখতে চাও তো হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ-কে দেখে নাও। হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে বললেন, আপনার এরূপ হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ প্রকাশিত হোন বা গোপন থাকুন, কোন অবস্থায়ই আপনি থাকবেন না, কেবল তিনিই থাকবেন।

একবার কয়েকজন লোক এসে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-কে খবর দিলেন যে, হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ একখণ্ড পাথরের ওপর বসে শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করছেন। নাওয়া-খাওয়া, নিদ্রা-বিশ্রাম কিছু নেই। শুধু নামাজের সময় হলে উঠে গিয়ে নামাজ পড়ছেন। হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ বললেন, তিনি ফানার স্তরে (বেহুঁশ অবস্থায়) নেই, বরং এর দ্বারা তাঁর চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, অচেতন হলে তাঁর নামাজের খেয়াল থাকত না। তিনি আরও বললেন, তিনি প্রমত্ত হয়ে আছেন। এ অবস্থায় তিনি নিশ্চেতনায় ডুবে থাকলেও আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখেন। যাতে করণীয় কর্তব্য থেকে তাঁর বিচ্যুতি না ঘটে। অতঃপর তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন, যদি জানতাম যে চিৎকার করে লাভ হয়, তবে আমি তাই করতাম। আপনি চুপ থেকে খুশী থাকুন। হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ নীরব হলেন। বললেন, আপনিই আমার উত্তম শিক্ষক।

এক ইস্পাহানী তরুণ হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য খালি পায়ে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ তাঁর শিষ্যকে এক ক্রোশ পথ ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করতে বললেন। কেননা, তরুণ ভক্ত আসছেন খালি পায়ে। তরুণ তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে আসছ? তিনি বললেন ইসপাহান থেকে। হযরত বললেন, যদি ইস্পাহারেন বাদশাহ হাজার দীনার ব্যয়ে তোমার জন্য এক সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করতেন হাজার দীনার মূল্যের এক রূপসী দাসী কিনে আরও মূল্যবান সামগ্রীসহ তোমাকে উপঢৌকন দিয়ে বলতেন, তুমি যে উদ্দেশ্যে বাগদাদ যাচ্ছ, তা ত্যাগ কর, তা হলে সেসব ছেড়ে আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাটা কি তোমার বহাল থাকত?

আসলে কিন্তু এই ব্যাপারই ঘটেছিল। ইস্পাহানের বাদশাহ তাঁকে এরূপ প্রস্তাবই দিয়েছিলেন। কিন্তু যুবক সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বাগদাদে চলে আসেন। কিন্তু সেটি কী করে হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ জেনে ফেলেছেন ভেবে তরুণ সত্যিই বিস্মিত হলেন। কোন রকমে বললেন, ও কথা বলে আমাকে আর অপ্রস্তুত করবেন না। হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ বললেন, খাঁটি মুরীদ এরূপই হয়। সমগ্র বিশ্ব উপহার দিলেও যিকিরের বিনিময়ে তাঁরা তা গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হন না।

একবার এক লোকের বিপুল কান্না দেখে তিনিও কাঁদতে শুরু করেন। তারপর লোকটি চলে গেলে তিনি বললেন, এই লোকটি ইবলীস। সে নিজের এবাদতের উল্লেখ করে এমনবাবে কাঁদতে লাগল যে, আমিও না কেঁদে পারলাম না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একবার কাবা ঘর তওয়াফকালে তিনি প্রার্থনা করেন, তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যের যেন কোন পরিবর্তন না হয়। তখন এমর্তে অদৃশ্য বাণী ধ্বানি হয় একমাত্র আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্যেরই কোন পরিবর্তন হয় না। সেটি তাঁর নিজস্ব বিশেষ ব্যাপার। কিন্তু দাসেদের তা হয়। না হলে তাদের দাসত্ব কিংবা আল্লাহর প্রভুত্ব প্রকাশিত হয় না। তিনি কি আল্লাহর সমতুল্য হতে চান?

হযরত জাফর রহমাতুল্লাহ হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ-কে একবার মোনাজাত করতে শোনেন। তিনি বলেন, দয়াময়, আপনি আপনার তৈরী দাসকে জাহান্নামের আগুনে দিতে চান? আপনার মধ্যে তো এমনও শক্তি আছে, যার দ্বারা আপনি আমাকে দিয়ে জাহান্নামের উদর পূর্তি করে সমস্ত জাহান্নামীদের জান্নাতে পাঠাতে পারেন। হযরত জাফর রহমাতুল্লাহ বলেন, ঐ রাতেই তিনি স্বপ্ন দেখেন কে যেন বলছেন, হযরত আবুল হাসান নূরী রহমাতুল্লাহ-কে আমার পক্ষ থেকে এই সংবাদ শুনিয়ে দাও, সৃষ্টির প্রতি তাঁর মমত্বের কারণে আমি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিলাম।

হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহ বলেন, তিনি একবার হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ-কে এমন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন দেখেন যে, তাঁর একগাছি চুলও নড়ছিল না। এমন ধ্যানমগ্নতা তিনি কোথা থেকে শিখলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ বলিলেন, তিনি তা শিখেছেন বিড়ালের কাছ থেকে। কেননা, বিড়াল ইঁদুর ধরার জন্য এমন নিশ্চুপভাবে ওৎ পেতে থাকে যে, কেউ তা এতটুকুও টের পায় না।

একবার তিনি নিজের কাপড় যথাস্থানে রেখে স্নান করছিলেন। একজন কেউ তাঁর কাপড়খানি নিয়ে চলে গেল। কিন্তু হঠাৎ তার দু'খানা হাত অবশ হয়ে গেল। পরে সে কাপড় ফিরিয়ে আনলে তিনি মোনাজাত করলেন, প্রভু গো! লোকটি আমার কাপড় ফেরত দিল। আপনিও তার হাত দু'খানির শক্তি ফিরিয়ে দিন। লোকটির হাত আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

তাঁর মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করছেন? তিনি বললেন, আমি যখন স্নান করি, তিনি আমার কাপড় পাহারা দেন। লোকটি বলে, সে আবার কি তখন হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ উল্লিখিত কাপড় চুরির ঘটনা বলে বলেন, সম্ভবতঃ সেজন্য এমন ঘটেছে।

একবার বাগদাদের বাজার এলাকায় বিষম বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ড হয়। রোমের দু'টি সুশ্রী ভৃত্য আগু আটকা পড়ে। তাদের উদ্ধার করতে না পেরে তাদের মনিব আর্তস্বরে ঘোষণা করেন, কেউ তাঁর চাকর দু'টিকে উদ্ধার করে দিলে তিনি দু'হাজার দীনার বকশিস দেবেন। কিন্তু সাহসী লোক দেখা গেল না। হঠাৎ সেখানে এসে পড়লেন হযরত আবুল হাসান নূরী রহমাতুল্লাহ। আর বিন্দুমাত্র দেরী না করে আল্লাহর নাম নিয়ে ঢুকে পড়লেন আগুনের ভেতর। আর চাকর দু'টিকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন অক্ষত অবস্থায়। বলাবাহুল্য, মনিব খুবই খুশী হয়ে প্রতিশ্রুত দীনার তাঁকে দিতে গেলেন। কিন্তু তিনি বললেন, ওগুলি রেখে দিন। আর কঠিন বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানান। আমি তো আখেরাতের জন্য দুনিয়া ছেড়েছি। এ টাকা নিয়ে আমি কি করব?

একবার তিনি একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিয়ে রগড়ালেন। তাঁর হাতের তালু পুড়ে গেল। আর এ সময় পরিচারিকা তাঁর জন্য দুধ রুটি এনে হাজির। আর তিনিও হাত না ধুয়েই খেতে শুরু করলেন। তা দেখে দাসীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। লোকটির কি কোন রুচিবোধ নেই? আনাড়ি নাকি? ঠিক এ সময় বাড়ির বাইরে পুলিশের উপস্থিতি। হুড়মুড় করে তাঁরা ঢুকেও পড়লেন। আর হুমকি দিলেন, তাকে কোতায়ালের হাতে তুলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেয়া হবে। কেউ কেউ তাকে মারতে যায় আর কি! হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ মোটেই বিব্রত না হয়ে শান্ত গলায় বললেন, আপনারা এর প্রতি অবিচার করবেন না। এ অপরাধী নয়। আসল চোর মাল নিয়ে এখনি এখানে আসছে। কথাটা বলতে না বলতেই একটি লোক সেখানে হাজির। আর তার সঙ্গে সেই চুরি যাওয়া বস্তু। পুলিশরা দাসীকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। এবার পরিচারিকাকে লক্ষ্য করে হযরত বললেন, কী আমার মতো জঘন্য আনাড়ি লোকই তো দেখি তোমার কাজে এসে গেল। পরিচারিকার তখন কথা বলার শক্তি নেই। সে অনুতপ্ত আর ক্ষমাপ্রার্থী।

একবার পথে যেতে যেতে তিনি দেখেন, একটি গাধা মরে পড়ে আছে। আর সেটি পিঠে মালগুলি পড়ে আছে আলোমেলো অবস্থায়। আর গাধার মালিকও দিশেহারা হয়ে কাঁদছে। এ অবস্থা দেখে তিনি মৃত গাধাটিকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, কি হে, রাস্তা কি শোবার জায়গা! ওঠো, তাড়াতাড়ি চলতে থাক। অবাক কাণ্ড! মুহূর্তমাত্র দেরী না করে গাধা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গাধার মালিকের কান্না থামল। মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হল।

একবার তিনি দারুণ অসুস্থ। কিছু ফলমূল নিয়ে তাঁকে দেখতে এলেন হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পরে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ পড়লেন অসুখে। আর কিছুটা সুস্থ হলে-শিষ্য তাঁকে দেখতে গেলেন আবুল হাসান নূরী রহমাতুল্লাহ। তাঁর বিছানার পাশে বসে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, এস, আমরা হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ-এর রোগ নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু বন্টন করে নিই। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাঁর সাথে সায় দিলেন। আল্লাহর রহমতে অল্পক্ষণের মধ্যে হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

তখন হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ তাঁর মুরীদদের বললেন, দেখলে! ঘটনাটা মনে রেখ। যখনই কোন রোগীকে দেখতে যাবে, তখন ফলমূলের বদলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তার রোগ সবাই নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেবে।

একবার এক দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তিকে জোরে করে জেলে দেয়া হল। বেচারা কিন্তু হা-হুতাশ না করে চুপচাপ থাকল। ঘটনাটি ঘটল হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ-এর সামনেই। তিনি জেলখানায় গিয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ওদের অত্যাচার কি করে সহ্য করলেন?

বৃদ্ধ বললেন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সম্পর্ক মনোবল ও সাহসিকতার, দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের নয়।

ধৈর্যের স্বরূপ কি?

বিপদকে খুশী মনে মেনে নেয়া। বিপদমুক্ত হলে মানুষ যেমন খুশী হয়। হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ বলেন, মারেফাত এমন একটি জিনিস যা লাভ করতে হয়ে আগুনের সাত সমুদ্র তেরো নদী অতিক্রম করে। কিন্তু তা লাভ হলে ইহকাল-পরকালের জ্ঞান আয়ত্ত হয়ে যায়।

একবার হযরত আবু হামযা রহমাতুল্লাহ আল্লাহর নৈকট্য সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ আবু হামযার রহমাতুল্লাহ-এর এক শিষ্যের কাছে তাঁকে সালাম জানিয়ে বলে দিলেন, আমরা আল্লাহকে নিকট থেকে নিকটতর বলে মনে করি। আসলে আমরা কিছু তাঁর থেকে অনেক দূরে আছি।

মানুষ কখন লোককে উপদেশ দান করার যোগ্যতা লাভ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যখন মানুষ আল্লাহকে চিনতে সক্ষম হয় এবং তার মধ্যে এমন শক্তির সঞ্চার হয় যে, লোককে উপদেশ দিতে ও বোঝাতে পারে। আর সে যদি নিজেই আল্লাহকে চিনতে না পারে তা হলে অন্যকে আর কী উপদেশ দেবে, আর তার ফলই বা কী হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর মূল্যবান উপদেশ ঃ

১. রাসূলুল্লাহ সুন্নাহ অনুসরণ ছাড়া কখনও ইসলামের পথ লাভ করা যায় না।

২. সুফী কারও অধীন নয়, তার অধীনে কেউ নয়। অর্থাৎ তিনি কারও প্রভু নন, আবার কারও দাসও নন। সুফীদের প্রাণ কালিমামুক্ত, রিপুর তাড়না থেকে পবিত্র। নির্জনে শুধু আল্লাহকে নিয়ে তাঁরা আরাম বোধ করেন।

৩. যে কারও বন্দিশালার বন্দী নয় এবং তার বন্দিশালায় অন্য কেউও বন্দী নয়, সে-ই প্রকৃত সুফী।

৪. কতকগুলি নিয়ম পালন বা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত হয় না। আল্লাহর স্বভাব ও প্রকৃতি অবলম্বন দ্বারাই তা লাভ করা যায়।

৫. আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সৃষ্টির সঙ্গে শত্রুতাকেও তাসাওউফ বলা যায়। আর প্রকৃত সুফীর স্বভাবও হবে এরূপ।

৬. একদিন একটা অন্ধ লোক আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে পথ চলছেন, হযরত নূরী রহমাতুল্লাহ-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তিনি তাঁকের প্রশ্ন করলেন, তুমি আল্লাহকে জানলে কী করে? আর যদি জেনেছ, তবে বেঁচে আছ কিভাবে? বলেই তিনি অজাঞান হয়ে গেলেন। পরে জ্ঞান ফিরলে তিনি এক নলবনের ভেতরে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। নলের ডগা তাঁর শরীরে বিঁধে রক্ত ঝরতে লাগল। প্রতিটি রক্ত ফোঁটা পড়ল বাঁশের পাতায় আর তাতে এক একটি শব্দের আকার ধারণ করল। এরপর ধরাধরি করে তাঁকে বাড়ীতে আনা হল। মৃত্যু আসন্ন অনুমান করে তাঁকে বলা হল, পড় ন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বললেন, আমি তো ওখানেই যাচ্ছি। আর বলার সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাসটি বেরিয়ে গেল।

তাঁর মৃত্যুর পর হযরত জুনায়েদ রহমাতুল্লাহ মন্তব্য করে, এখন আর সত্যের কথা বলার মতো কেউ থাকল না। যেহেতু এ কালের তিনিই সিদ্দীক।

হযরত ইউসুফ আসবাত রহমাতুল্লাহ

হযরত ইউসুফ আসবাত রহমাতুল্লাহ তাবেঈদের সমসাময়িক যুগের সাধক। সাধারণতঃ তিনি আরাধনা করতেন লোকচক্ষুর অগোচরে। তিনি একজন বিখ্যাত যোহদ অর্থাৎ সংসারবিরাগী ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি সত্তর হাজার টাকার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু নিজের জন্য এক কপর্দকও খরচ করেননি। খেজুর পাতার তৈরী তসমা বিক্তি করে তিনি জীবিকানির্বাহ করতেন। আর সমুদয় অর্থ বিতরণ করেন গরীব-দুঃখীদের মাঝে। একটি মাত্র দরবেশী জোব্বা পরিধান করে তিনি প্রায় চল্লিশ বছর কাটিয়ে দেন।

একবার হযরত ইউসুফ রহমাতুল্লাহ হোযায়ফা নামক এক দরবেশকে লেখেন- শুনতে পেলাম, আপনি দু'টি মাত্র জোব্বার বদলে নিজ ধর্মকে বিক্রি করেছেন। আর তা করেছেন এভাবে যে, বাজারে কোন জিনিস কিনতে গেলে জিনিসের মালিক যা দাম বলেন, আপনি তার তিন ভাগের একভাগ দাম দেন। আর যেহেতু আপনি পুণ্যবান, পরিচিত, কাজেই দোকানী লজ্জায় কিছু বলতে পারে না। বাধ্য হয়ে কম দামেই তাকে জিনিস বিক্রি করতে হয়। তিনি আরও লেখেন, যে লোক ধনোপার্জনের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করে, সে যেন আল্লাহর সঙ্গে ঠাট্টা উপহাস করছে। আমার আশঙ্কা, আমাদের যে সৎ সর্মগুলি লোকসমক্ষে প্রকাশিত হয় তা আমাদের অপকর্মের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর উপদেশসমূহ ঃ

১. মাত্র একটি রাতের স্বনিষ্ট এবাদত জেহাদের পুণ্য অপেক্ষাও মূল্যবান।

২. নিজের চেয়ে অন্য যেকোন লোককে উৎকৃষ্ট মনে করাকেই তাওয়াযু বিনয় বলে।

৩. সামান্য বিনয়ের মূল্য অধিক ধর্ম সাধনার সমান।

৪. বিনয়ীর পরিচয় হল, সে শরীয়তের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে। সকলের সঙ্গে নম্র ও ভদ্র আচরণ করে, নিজের চেয়ে উচ্চপদস্ত লোককে সম্মান দেয় আর যেকোন ক্ষয়ক্ষতিতেই ধৈর্য ধারণ করে। আল্লাহর অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহকে স্মরণ করে, উপাসনার দ্বার ক্রোধ প্রশমিত করে এবং আত্মমর্যাদা নিয়ে গণ্যমান্যদের কাছে যাতায়াত করে।

৫. তওবার চিহ্ন হল দশটি। যথাঃ (১) দুনিয়া থেকে দূরত্বে থাকা, (২) নিষিদ্ধ কাজ না করা, (৩) অহঙ্কারী লোকদের সঙ্গে মেলামেশা না করা, (৪) বিনয়ী ও নম্র লোকদের সঙ্গ অবলম্বন করা, (৫) পুন্যবান লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, (৬) তওবার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা, (৭) তওবার পর পাপ কর্ম না করা, (৮) অন্যের হক আদায় করা, (৯) গনিমতের মাল গ্রহণ করা ও (১০) অন্যায় শক্তি বর্জন করা।

৬. যোহদেরও দশটি চিহ্ন। যথা (১) সঞ্চিত জিনিসপত্র ছেড়ে দেওয়া, (২) ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করা, (৩) দান করা, (৪) গুপ্ত শুদ্ধতা অর্জন করা, (৫) সম্মান্তি ব্যক্তির সম্মান করা, (৬) বন্ধুজনের সম্মান করা (৭) সিদ্ধ কাজ অবলম্বনের ক্ষেত্রেও যোহদ রক্ষা করা, (৮) পরকালের কল্যাণ কামনা করা, (৯) আরাম-আয়েশ হ্রাস করা ও (১০) সুখ-শান্তির লিপ্সা কমিয়ে দেয়া।

৭. কোন কিছু গ্রহণ ও বর্জনের সময় সংশয়ের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে।

৮. সন্দেহ যুক্ত জিনিসপত্র পরিহার করতে হবে।

৯. ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

১০. সুদ-ঘুষ থেকে মুক্ত হতে হবে।

১১. অসৎ চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

১২. আল্লাহর ইচ্ছার ওপর রাজি থাকতে হবে।

১৩. আমানত রক্ষা করতে হবে।

১৪. সমকালের দুঃখ-বিপর্যয় সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যেতে হবে।

১৫. বিদ্রোহ-বিপ্লবকালে ভীতিপ্রদ ব্যক্তি ও বস্তু সমূহ থেকে দূরে অবস্থান করা।

১৬. ধৈর্যের চিহ্ন দশটি। যথাঃ (১) রিপু সংযত রাখা, (২) শিক্ষা দৃঢ় রাখ, (৩) তালেবের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখা, (৪) চঞ্চলতা বর্জন করা, (৫) ধর্ম-নিষ্ঠার শক্তি সঞ্চয় করা, (৬) এবাদতে সহায়তা করা, (৭) ওয়াজেব কাজগুলি সম্পূর্ণ আদায় করা (৮) আচারে-ব্যবহারে ভদ্রতা রক্ষা করা, (৯) সাধনার ধারা অব্যাহত রাখা, (১০) অপরাধ ও পাপ কর্মের প্রশ্রয় না দেয়া।

১৭. মোরাকাবার চিহ্ন হল ছয়টি। যথাঃ (১১) আল্লাহর প্রিয় বস্তু পছন্দ করা, (২) আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক রাখা, (৩) কম-বেশী যাই হোক, সবই আল্লাহর তরফ থেকে হয় বলে ধারণা করা, (৪) আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, (৫) সৃষ্টি থেকে দূরে থাকা ও (৬) আল্লাহর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

১৮. সত্য ও সততার চিহ্ন ছয়টি। যথাঃ (১) মন ও জিভকে শাসন করা, (২) কথায় ও কাজে মিল রাখা, (৩) প্রশংসার আকাঙ্খা না করা (৪) প্রভুত্বের প্রত্যাশা না করা, (৫) সৃষ্টি থেকে দূরে থাকা ও (৬) আল্লাহর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা।

১৯. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ নিভংরতার চিহ্ন নয়টি। যথাঃ (১) আল্লাহর দেয়া বস্তু দ্বারা শান্তি ও ধৈর্য লাভ করা, (২) যা কিছু পাওয়া যায় তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, (৫) দাসের মতো জীবন যাপন করা, (৬) তাকাব্বুরী থেকে বিরত থাকা, (৭) নিজের অধিকার বিলীন করে দেয়া, (৮) সৃষ্টিজগতের কোন কিছুরই প্রত্যাশা না করা, (৯) হাকীকতের ভেতরে ঢুকে গুপ্ততত্ত্ব অর্জন করা।

২০. যে আমল ছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই, চিন্তা-ভাবনা করে সেগুলিই গ্রহণ করবে। আর মনে এই দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে নির্ভরতা অবলম্বন করবে যে, যা আগেই নির্দিষ্ট হয়েছে তার বেশী পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

২১. প্রেমের লক্ষণ পাচটি। যথাঃ (১) সর্বদা নির্জনে থাকা, (২) মানুষের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ না করা, (৩) শুধু আল্লাহর যিকিরেই স্বাদ পাওয়া, (৪) মোজাহাদা ও সাধনায় শান্তি লাভ করা, (৫) এবাদতের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা।

২২. কথা বলার আগে পরিণতির কথা চিন্তা করা খুব জরুরী। কিন্তু যে ক্ষেত্রে খোজ নেয়া লজ্জাজনক, সেক্ষেত্রে ঐসব থেকে দূরে থাকা।

২৩. মুখে কোনরূপ কুকথা বলবে না, কানে কোনরূপ অশ্লীল কথা শুনবে না, ব্যভিচার থেকে দূরে থাক, হালাল রুজি ভক্ষণ কর, দুনিয়া ত্যাগ কর ও মৃত্যুকে চোখের সামনে রাখ।

২৪. সুখ-শান্তির সময় মৃত্যুকে স্মরণ করবে। আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলে জীবনকে শত্রু মনে করবে। সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় নিজেকে আল্লাহর ধ্যানে ডুবিয়ে দেবে। আল্লাহর কোন নেয়ামত নষ্ট হলে অস্থিরতা প্রকাশ করবে। আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টিকলা সম্বন্ধে গবেষণা করবে। আর হৃদয়পটে কিছু ভেসে উঠলে আনন্দ প্রকাশ করবে।

২৫. জামাজে নামাজ আদায় করা ফরজ নয়, কিন্তু হালাল রুজির অন্বেষণ করা ফরজ।

=== o ===

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com